রাধারাণী দেবীর
রচনা-সংকলন ২

রাধারাণী দেবীর রচনা-সংকলন ২

ভূ মি কা

শর্মিলা বসু-দত্ত

সং ক ল ক

অভিজিৎ সেন

অনিন্দিতা ভাদুড়ী



পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০০

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৯

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ
কলকাতা - ৪

ভূমিকা

১

রাধারাণী দেবীর রচনা সম্পর্কে প্রথম ঔৎসুক্য জাগল অপরাজিতা দেবীর লেখা পড়ার পর। তার আগে রাধারাণী দেবীর দু'একটা টুকরো কবিতা যে পড়িনি তা নয়, তবে নবনীতাদির সম্পাদনায় অপরাজিতা দেবীর লেখাগুলো যখন একত্রিত হয়ে প্রকাশিত হল তখন কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে অদ্ভুত একটা চমক লাগল। মনে হল, এমন লেখা এর আগে বাংলায় তেমন পড়িনি। কেন জানি না, একথাও মনে পড়ল, এই কবিতাগুলো যিনি লিখতে পারেন তাঁর মধ্যে গল্প বলার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ তিনি তাঁর কথিত 'কথক গিন্নি' হয়ে যেতে পারেন। আরো আবিষ্কার করলাম, একই মানুষের ভিতরে তিনটি স্বতন্ত্র সৃজনী অস্তিত্ব—রাধারাণী দত্ত, রাধারাণী দেবী, অপরাজিতা দেবী। নির্যাতিতার কাহিনীর মত কবিতা যিনি লেখেন, তিনিই আবার লেখেন 'মীরার বঁধূয়া', তিনিই আবার লেখেন 'স্ক্যাণ্ডাল'। একই কলমের তিনটি বিচ্ছুরণ যার কোনটির দীপ্তির সঙ্গে অন্যটির দীপ্তির মিল নেই। অথচ প্রত্যেকটি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। বালবিধবা রাধারাণী দত্ত তাঁর রচনায় হয়ত বা যেমন খানিকটা কনভেনশনাল, রাধারাণী দেবী জীবনে যেমন রচনাতেও তেমনি প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে যেতে চাইছেন। আর অপরাজিতা নামের আড়ালে তো আগাগোড়া একটা চ্যালেঞ্জ কাজ করে যাচ্ছে। মনে পড়ে যায় প্রয়াত লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর কথা। তাঁর সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে যখন লেখার রসদ জোগাড় করতে তাঁর কাছে হানা দিয়েছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের কালের গল্প শুনতে চাও তো রাধারাণীর কাছে যাও, ও পুরো সময়টাকে ধরতে পারবে।' কথাটার তাৎপর্য তখন তেমন করে বুঝিনি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীচর্চা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত রাধারাণী দেবীর রচনা সংগ্রহের প্রথম খণ্ড দেখতে গিয়ে তাঁর গদ্য-রচনা অর্থাৎ গল্প এবং প্রবন্ধগুলো পড়তে গিয়ে মনে হল লেখকের লেখার দর্পণে একটা সময়ের যে প্রতিফলন ঘটে সেটা বোধহয় রাধারাণী দেবীর লেখা সম্পর্কে একান্ত করে বিশ্বাস্য।

আসলে বিশ শতকের গোড়ার তিনটি চারটি দশক—বলা যায় প্রাক্-স্বাধীনতা কালপর্বে বাঙালীর জীবনটা আজকের এই বিশ-একুশের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে একেবারেই অন্যরকম। একদিকে বিদেশী কলোনিয়ালিজমের প্রভাব, অন্যদিকে নবজাগ্রত আত্মসমীক্ষণ, একই সঙ্গে আধুনিকতার প্রথম পদক্ষেপ, তার পাশাপাশি গতানুগতিক কিছু পুরনো মূল্যবোধ—সব মিলেমিশে তখন একাকার। অপরাজিতা দেবীর কবিতায় ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে কাজ করেছে জীবন সম্পর্কে এই ধরণের মূল্যবোধ। একই মূল্যবোধ রাধারাণী দেবীর গল্পেও অনেকটা সক্রিয়। তবে অপরাজিতা দেবী যতটা মুক্ত স্বচ্ছ, রাধারাণী দত্ত তা নয়। পরিবর্তনই মানুষের জীবনের অনিবার্য ধর্ম। ফলে রাধারাণী দত্ত থেকে অপরাজিতার এই পরিবর্তন তো খুবই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য নির্বাচিত গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় বাংলা তথা সাহিত্যে

শরৎচন্দ্র-কেন্দ্রিক যে ধারা ভাবীকালকে আপ্লুত করে রেখেছিল, রাধারাণী দেবীর গল্পগুলো সেই ধারারই শরিক। এখানে যুক্তিবুদ্ধি বা নৈর্ব্যক্তিকতা ততটা ক্রিয়াশীল নয়, যতটা কাজ করে সেন্টিমেন্ট। মানুষের কিছু যুক্তিহীন অনুভূতি আর আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা এই গল্পগুলোতে আজকের পাঠক যে ধরণের পরিণতি আকাঙ্ক্ষা করে তা অনেক সময়ই অনুপস্থিত। ফলে আজকের পাঠকের পক্ষে গল্পগুলি যে খুব পাঠলোভন সে দাবীও না করা ভাল। তবে ঐ যে মণীন্দ্রলাল বসুকে উল্লেখ করে বলেছিলাম একটা সময়ের কথা, সেই সময়কেই এই গল্পগুলোর মধ্যে টের পাওয়া যায়। যখন বাঙালী মেয়ের বারো-তেরো বছরে বিয়ে হয়ে যেত, বাড়িতে বসে 'দেবতার গ্রাস' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যালবাম তৈরী করা, দস্তানা বানানো বা মোরব্বা তৈরী করা তার পালনীয় কর্ম ছিল, কিংবা গরবা গানের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত নাচতে নাচতে যাওয়া মেয়েটির মুহূর্তেই খাদ্যপরিবেশন থেকে সেবায় একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠা—তাকে আজকের এই কমোডিটি-সভ্যতার যুগে হৃদয়ঙ্গম করা বোধহয় খুব মুশকিল। তখন প্রায়ই অকালে মৃত্যু হয় টি.বি.তে, টাইফয়েডে বা ইনফ্লুয়েঞ্জায়। আর বাঙালীর জীবনে এইসব মৃত্যু একধরণের রোমান্টিকতা নিয়ে আসে, যাকে মরবিডিটির নামান্তর বলা যায়। কেন সুধা তার মৃত প্রেমিকের ধ্যান করে যাবে সারা জীবন ধরে নিজেকে বঞ্চিত করে, আজ তার উত্তর খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অথবা কেন অসমবয়সী মাসীর মন মাতৃত্ব ছাড়া আর কোনো অনুভূতিতে সিঞ্চিত হবে না, তার উত্তর আজ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আজকের বিচারে সেদিনের যে কনভেনশনেব সীমানার মধ্যে লেখিকাকে আনাগোনা করতে হয়েছে তা বোঝা অসুবিধাজনক। আসলে সমাজের সর্বজনগৃহীত চালচিত্রে হঠাৎ করে বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া সেদিনের লেখিকার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর গল্পগুলো কখনোই গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে না। কখনো কখনো একঘেঁয়ে বা ক্লান্তিকরও বটে। তবে ইটারনাল ফেমিনিজম-এর কথা যদি বলা যায় তাহলে প্রেমিকা হিসেবে, মা হিসেবে বা স্ত্রী হিসেবে গল্পের নারী চরিত্রগুলো নারীত্বের অনড় ভাবমূর্তিতে বিদ্যমান। রাধারাণী দেবী নারীর এই ভাবমূর্তির কথা নিজেই বলেছেন তাঁর 'নারী' প্রবন্ধে : 'আমি নারী, আমি সেবিকা, আমি কন্যা, আমি ভগ্নী, আমি পত্নী, আমি মাতা।'

মাতৃত্ব রাধারাণী দেবীর গল্পে নারীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় চাবিকাঠি। যে-কোন বয়সে যে-কোন সামাজিক অবস্থায় মেয়েরা যে এই মাতৃত্বের হৃদয়বৃত্তির দ্বারা সবচেয়ে বেশী উদ্বেলিত তা রাধারাণী দেবীব গল্পে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। কন্যা-বধূ-সেবিকা এই পরিচয়গুলির মধ্যেও যে নিহিত মাতৃত্ববোধ কাজ করে, রাধারাণী দেবী তাঁর গল্পে প্রায় প্রতিটি নারী চরিত্রের ভিতর দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধে তিনি যে বলেছেন : 'নারীজীবনের পূর্ণতম বিকাশ পরিণতি ও সার্থকতা মাতৃত্বে। এই মাতৃত্ব জগতে যে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও পূজা-লাভ করিয়াছে তারা কেবলমাত্র সন্তান-সৃষ্টির জন্য নহে, আত্মত্যাগ বা সত্য ভালোবাসার জন্যই।' এই আত্মত্যাগ এবং সত্যিকারের ভালোবাসাকে বারবার গল্পের মধ্যে দিয়ে রাধারাণী দেবী ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আসলে তাঁর মনে হয়েছে মাতৃত্ব এমন একটা অনুভূতি যা দেশ-কাল নিরপেক্ষ সার্বিক সর্বোচ্চ। আসলে রাধারাণী দেবীর সমকালীন অন্যান্য অনেক লেখকের মত ইনিও, যাকে তিনি প্র্যাকটিস বলে মনে করতেন, তাকেই তিনি থিওরিতেও কাজে লাগাতেন। জীবনকে বাদ দিয়ে কোন জীবনবোধ নয়, মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো মানব-মূল্যবোধ নয়। তাঁর গল্পগুলির সিদ্ধি

এখানেই। সুখপাঠ্য না হোক, চিন্তাধারার দিক থেকে এই গল্পগুলি কখনই বহুগামী নয়।

২

শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে তাঁকে নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়। রাধারাণী দেবীর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্র: জীবন ও সাহিত্য' রচনাটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সময় পাঠকমহলে আলোড়ন তুলেছিল। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে এখানে এমন কিছু কিছু কথা লিখিত হয় যা চিরদিনের ভাবপূজারী বাঙালীর পক্ষে মেনে নেওয়া একটু কষ্টকর। বাঙালী পাঠক শ্রীকান্তের জীবনে রাজলক্ষ্মীকে একটু ভাবতে পারে কারণ সেখানে যা কিছু ঘটমান তা সাহিত্যের আঙ্গিনায় ঘটে। কিন্তু সেই ভাবালু পাঠকই কোনো মানুষের জীবনে বিবাহ ছাড়া কোনো দাম্পত্য সম্পর্ককে মেনে নিতে পারে না। শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ী দেবী সম্পর্ক প্রচলিত সমাজবিধির মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ না থাকে তাহলে পাঠকের পক্ষে তাকে মেনে নেওয়া প্রায় অসম্ভব। এই বোমাটিই সেদিন ফাটিয়েছিলেন রাধারাণী। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে তিনি জানেন হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী নন। কথাটা বাঙালী পাঠকের একেবারেই সহ্য হয়নি। আর তাই বোধহয় রাধারাণী দেবীর লেখাটিকে ঘিরে এত বাক্‌বিতণ্ডা, এত বিতর্ক। 'দেশ' পত্রিকায় চিঠিপত্রে হাত দিয়েছিলেন বেশ কিছু প্রথিতযশা শরৎচন্দ্রের পূর্বপরিচিত নিকটজনেরা।

কিন্তু একটা কথা সেদিন বোধহয় যাঁরা তর্কে যোগ দিয়েছিলেন অথবা তর্কে যোগও দেননি তাঁরা সবাই ভুলে গিয়েছিলেন— বইটি আসলে কোন জীবনী আকর-গ্রন্থ নয়। একজন বিরাট মাপের কথাশিল্পীকে কাছ থেকে দেখার, তাঁর মুখের কথা শুনে সেই কথার উপর নির্ভর করে তাঁর সম্পর্কে কিছু রচনা করার, অন্তরঙ্গ আলাপচারিতে যে মানুষটা তাঁর বাইরের পোষাকী আভবণ থেকে বেরিয়ে আসে, তাঁকে পরিচিত করানোর দায়িত্ব থেকেই এই ধরণের গ্রন্থ লেখাব প্রয়োজনীয়তা। মনে পড়ে যায় রাণী চন্দের 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' বইটার কথা। এত সহজভাবে কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া অন্য কোথাও সম্ভব হয়নি। শরৎচন্দ্রকেও জীবনের মধ্য থেকে এইভাবে আবিষ্কারও বোধহয় আর কেউ কখনো করেননি। অন্তরঙ্গ কথোপকথনে শরৎচন্দ্রের গোটা ব্যক্তিত্ব যেভাবে উঠে এসেছে তা ইতিপূর্বে একান্তই বিরলদৃষ্ট ছিল। শরৎচন্দ্রের নিজের জবানবন্দীতে অনেকসময় তাঁর জীবন সম্পর্কে যে ছবিগুলো আমরা পাই তা ব্যক্তি এবং শিল্পী দুই শরৎচন্দ্রকে বোঝার পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সেইজন্যই বোধহয় বইটির নাম 'জীবন ও সাহিত্য'— যেখানে সাহিত্যের উদ্দীপন হিসেবে জীবন কাজ করে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রোহিণী-অভয়া কোন্ মূল্যবোধ থেকে সেই সন্তানের স্বপ্ন দেখে, যে সন্তান সামাজিকভাবে স্বীকৃত না হয়েও সত্যের জাতক, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না শরৎচন্দ্রের জীবন থেকে। বিবাহ একটা সামাজিক বন্ধন মাত্র, তার থেকে অনেক বড় মানুষের মানবিক বন্ধন। শ্রীকান্তের মধুডোমের কন্যার বিয়ে উপলক্ষে মন্ত্র এবং পুরোহিতের অসাড় আড়ম্বর থেকে শিল্পী শরৎচন্দ্রের যে মূল্যায়ন আমরা পাই তাকেই যদি ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি, তাহলে বোঝা যাবে কোন্ প্রতিবেশ থেকে শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে অনেক মূল্যবোধ আহরণ করেন। রাধারাণী দেবীর গ্রন্থে এই দুই শরৎচন্দ্রকে মিলিয়ে দেবার একটা অসাধারণ প্রবণতা

আছে—মনে হয়, ঠিক প্রচলিত জীবনীগ্রন্থ না হয়েও ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের অন্তরালে যে শিল্পী মানুষটি বাস করে তাকে আবিষ্কার করাই বৃহত্তর অর্থে জীবনী রচনার সার্থক প্রয়াস। এই বইটি বাংলা সাহিত্যের মনস্ক পাঠকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। স্রষ্টা রাধারাণী দেবীর বহুমুখী প্রতিভার এ আর একটি দিক। তিনি যে একইসঙ্গে প্রাবন্ধিক এবং গল্পলেখক তা যেন গল্প বলার ছলে তাঁর একান্ত আপন শরৎচন্দ্রের জীবনকে বর্ণনা করার মধ্যে আভাসিত হয়।

অনেকদিন পরে রাধারাণী দেবীর গল্প, প্রবন্ধ এবং 'শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য'কে একত্রে প্রকাশ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবীচর্চা কেন্দ্র একটি মহৎ কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন। রাধারাণী দেবীর গোটা ব্যক্তিত্বকে বোঝার পক্ষে রাধারাণী-অপরাজিতার কবিতার পাশাপাশি এই লেখাগুলি ছাপানোর একটা বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। শ্রী অভিজিৎ সেন এবং শ্রীমতী অনিন্দিতা ভাদুড়ী নিরলস পরিশ্রমে এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের আমার শুভেচ্ছা জানাই। আমার মত অসুস্থ অযোগ্যকে দিয়েও তাঁরা যে ভূমিকা লেখার পর্বত ডিঙোবেন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁদের সেই সাহসকে দুঃসাহস বলতে বাধ্য হলাম। শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ আমাকে আগাগোড়া সাহায্য করেছে। তাকে আমার স্নেহ-শুভেচ্ছা জানাই।

শর্মিলা বসু-দত্ত

১, রাজা সীতারাম রোড
কলিকাতা-৭০০০২৯

সংকলন প্রসঙ্গে

১৯৯৯-এর ৩০ নভেম্বর রাধারাণী দেবীর ৯৬তম জন্মদিবসে তাঁর রচনা-সংকলনের প্রথম খণ্ড সময়মতো প্রকাশিত হয়েছিল। মাত্র দু'মাসের ব্যবধানে ২০০০ সালের কলকাতা বইমেলায় রচনা-সংকলনের দ্বিতীয় এবং শেষ খণ্ডটি প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত ও গর্বিত। দু'বছর আগে যে-কাজের সূচনা হয়েছিল, তা এবারে সম্পূর্ণতা পেল। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ছোটদের জন্য লেখা গল্প, রূপকথা বা উপকথা এবং ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত সামান্য কিছু গদ্যরচনা ব্যতীত সম্ভবত রাধারাণী দেবীর সমগ্র গদ্য আমরা পাঠকদের উপহার দিতে সক্ষম হলাম। শুধুই ঐতিহাসিক মূল্যের প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ যে রচনাটি আমরা অনেক সন্ধান করেও পাইনি, সেটি হল তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য'—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত 'শরতের ফুল' সংকলনে ১৯২৫ নাগাদ তা প্রকাশিত হয়েছিল।

বর্তমান সংকলন বিষয়ে এবারে কয়েকটা কথা বলে নিই। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশে পুনর্মুদ্রিত হল 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প'। ১৯৭০ সালে রাধারাণী দেবী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালা দেন তারই ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথমে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এবং ১৯৭৬-এর অক্টোবর মাসে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে এই প্রদত্ত বক্তৃতামালা পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করে। মার্চ, ১৯৮০-তে আনন্দ পাবলিশার্স এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন। এর পর এই বইটি আর কোনোদিনই ছাপা হয়নি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। পরিশিষ্ট সমেত বইটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ আমরা গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের উপহার দিতে পেরে আনন্দিত। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে প্রধানত শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহপ্রসঙ্গ এবং শরৎচন্দ্রের জীবনের অন্তর্গত অন্যান্য আরো কিছু বিষয়ে "আলোচনা" বিভাগে বেশ কিছু উত্তপ্ত ও উত্তেজনাকর বাদ-প্রতিবাদমূলক চিঠি প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক যুগের তিন বিখ্যাত ব্যক্তির চিঠি বইয়ের 'পরিশিষ্ট' অংশে আগেই সংযোজিত হয়েছিল—এঁরা হলেন : রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন। এই অংশে মুদ্রিত চতুর্থ চিঠিটি লিখেছিলেন স্বনামধন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রয়াত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১০ এপ্রিল, ১৯৭৬-এ 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর লেখা এই চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ-ছাড়াও এই বিষয়ে

অন্যান্যদের লেখা ১২টি বিতর্কমূলক পত্র সংকলনের 'সংযোজন ২' অংশে ছাপা হল। প্রতিটি চিঠিই 'দেশ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প'—বিতর্কের ঝড়-তোলা অসামান্য এই গ্রন্থটিই প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রধান আকর্ষণ।

প্রথম খণ্ডে ১১টি ছোটগল্প সংকলিত হয়েছিল। এই খণ্ডে বাকি ১০টি গল্প প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ডের গল্পগুলোর সময়সীমার মধ্যেই বিভিন্ন সাময়িকীতে এগুলো প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের শেষ ছোটগল্পটির নাম 'একটি গল্প'। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের শাবদ সংখ্যা 'গল্প-পুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। গল্পটি রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রেব মুখে শুনেছিলেন। গল্পের প্রধান কথক শরৎচন্দ্র। শুধুমাত্র 'বড়দা' নামে অভিহিত কথকটিকে তাঁর চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যে খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। 'শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প'-এর সম্পূরক হিসেবে পড়লে গল্পটি একটি পৃথক মাত্রা পেয়েও যেতে পারে।

এর পরে আছে 'চিঠিপত্র' অংশ। রাধারাণী/অপরাজিতা দেবীকে প্রদত্ত অসংখ্য চিঠির মধ্যে প্রথম পত্রদাতার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর শেষতম ব্যক্তি হলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। এঁদের মধ্যবর্তী পত্রদাতাদেব নামের তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে যে সারস্বতমণ্ডলীর প্রায় সকলের নামই এখানে আছে। ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৩-তে রাধারাণী দেবীর ৮০-তম জন্মবার্ষিকীতে 'টুকরো চিঠি' নামে যে পত্র-সংকলনটি শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী নবনীতা দেবসেন প্রকাশ করেন, এখানকার প্রায় সব চিঠিই সেই পত্র-সংকলন থেকে নেওয়া।

'চিঠিপত্র' অংশের পরে সংকলিত হল রাধারাণী/অপরাজিতা দেবীর একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জি। প্রতিটি বই সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচিতি এবং সাধ্যমতো গ্রন্থ-সমালোচনা উদ্ধার কবে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৩১ সালের ১৭ মে নবেন্দ্র দেবের সঙ্গে রাধারাণী দত্তের বিবাহ (যে বিবাহে কন্যা নিজেই আত্ম-সম্প্রদান করেছিলেন) সম্পর্কে তৎকালীন জনমানস ও প্রচারমাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার সামান্য কিছু অংশ নিয়েই 'সংযোজন ১' অংশটি গ্রন্থিত হয়েছে। এই অংশের সব শেষের লেখাটি ('রাধারাণী দত্ত + নরেন্দ্র দেব') বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য শৈলসুতা দেবীর 'পরিণয়ে প্রগতি' বই থেকে সরাসরি তুলে দেওয়া হল। নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দত্ত বিষয়ে কিছু কৌতূহলপ্রদ তথ্য লেখাটিতে পাওয়া যায় (যদিও সব জায়গায় প্রদত্ত এই তথ্যাবলীর সত্যতা যাচাই করা কঠিন)—লেখাটির মূল্য সম্ভবত সেখানেই। সর্বশেষ অংশ, 'সংযোজন ২' বিষয়ে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য সুলিখিত একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী শর্মিলা বসু-দত্ত। শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও অসুস্থতা উপেক্ষা করে যেভাবে তিনি কাজটিকে সুসম্পন্ন করলেন সেজন্য তাঁর প্রতি আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমাদের জানা নেই। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা

করি। এই কাজে তাঁকে সর্বক্ষণ বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন তাঁর সুযোগ্যা ছাত্রী শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষ। তাঁকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। কৃতজ্ঞতা জানাই চৈতন্য লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষকে। দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা 'গল্প-পুষ্পাঞ্জলি' তাঁরা নির্দ্বিধায় আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। শ্রীসুধাংশুশেখর দে ও শ্রীঅরিজিৎ কুমারের অটুট স্থৈর্য ও অসীম সহানুভূতি ছাড়া এই রচনা-সংকলন প্রকাশিত হতো না। দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত প্রবেশক-চিত্রটি প্রয়াত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক গৃহীত।

সংকলন ও সম্পাদনায় নানা ত্রুটিবিচ্যুতিতে পবিপূর্ণ রচনা-সংকলনের এই দুটি খণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে, এই ভরসাতেই সংকলন-বিষয়ে আমরা আমাদের সামান্য কয়েকটি কথা বলে নিলাম।

কলকাতা,
জানুয়াবি, ২০০০

অভিজিৎ সেন
অনিন্দিতা ভাদুড়ী

সূচিপত্র

রাধারাণী দেবীর
রচনা-সংকলন ২

পুনর্মুদ্রণ

শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প

বন্ধনহীন গ্রন্থি

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা তাঁর রচনা প্রথম মুদ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছিল। আলোচনা নয়, বিস্ফোরণ। বিস্ময়চকিত আনন্দবিহ্বল আলোড়ন।

১৩১৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' গল্প প্রকাশের কথা আমি বলছি। আটষট্টি বছর আগের কথা। বাঙালী পাঠকসমাজে ঠিক এই ধরনের অভ্যর্থনা এর আগে আর কোনও লেখক পাননি। তার পর থেকেই তাঁর লেখা নিয়ে নানা উত্তেজনা বয়ে গেছে সম্পাদক-পাঠক-প্রকাশক মহলে। বিরুদ্ধ সমালোচনাও বড় কম হয়নি। পরবর্তী সময়ে 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'শ্রীকান্ত', 'গৃহদাহ', 'দেনাপাওনা', 'শেষ প্রশ্ন', 'শেষের পরিচয়' ইত্যাদি আরও অনেক বই নিয়ে দুর্নীতির কুরুচির অভিযোগ উঠেছে। সাহিত্যে অস্বাস্থ্য আনার নানা সাহিত্যিক-মামলা। 'পথের দাবী' নিয়ে দেশবাসীর মনের ভিতরে আর রাজদরবারে নিঃশব্দ ঝড়ঝাপটা।

চলতি কালের বিরুদ্ধ-সমালোচনার ধরনটা আলাদা। যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ উপস্থিত না করে উপর-উপর অজুহাত দেখিয়ে সিদ্ধান্ত-ঘোষণা। এখন শোনা যায়, শরৎসাহিত্যে ধারও নেই, সারও নেই; অর্থাৎ—আসলে কোনও ভারই নেই। মানসিকতায় ব্যাপকতার অভাব, বৈদগ্ধ্যের অভাব, জটিলতার অভাব। শিল্পের মানও নাকি তেমন উঁচু নয়। কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তি নিয়ে মেয়েলী কান্নায় ভরা সীমায়িত সামগ্রী। যা সময় আর পরিপার্শ্বের দ্বারা এত দুঃশাসিত যে, দূরবর্তী কালের কাছে তার মূল্য কেবল ঐতিহাসিক মাত্র, শৈল্পিক নয়। অর্ধশিক্ষিত পুরুষ আর অন্তঃপুরিকা মেয়েদের মন ভেজানোর মত বস্তু ভিন্ন শরৎসাহিত্যে বিশেষ কিছু নেই।

এ কথার উত্তরে প্রকাশকেরা বলবেন—আজও শরৎচন্দ্রই কিন্তু বেস্ট-সেলার লিস্টের চূড়ামণি হয়ে আছেন—মৃত্যুর আটত্রিশ বছর বাদেও। তার মানে কি, অন্তঃপুরিকা আর অর্ধশিক্ষিতরাই প্রধানত বই কেনেন? আমি অবশ্য একবারও বলছিনা —বিক্রয়তালিকা দিয়েই মহৎশিল্পের মান নির্ণয় করা যায়। তবে, জনপ্রিয়তা, শিল্পের কালোত্তরণের একটি প্রমাণ তো বটেই।

শরৎসাহিত্য 'কিছুই নয়' একথা যাঁরা বলছেন, বলুন। বলা ভাল। 'কিছুই নয়' বললে তবেই না সেটিকে 'কিছু বটে' প্রমাণ করার প্রয়োজন ঘটে। তখন তা নিয়ে আলাপ আলোচনা বিশ্লেষণ হয়। অস্বীকৃতি তো অবহেলা নয়। আসলে, কালজয়ী শক্তি থাকে যে-রচনার মূলে, খণ্ডকালের ঝড়ে জলে খরায় তা মরেনা,—শীর্ণ হতে পারে মাত্র। সময়ের সঙ্গেসঙ্গে নিজের জীবনীশক্তি নিজেই প্রমাণ করে আবার তাজা হয়ে ওঠে।

আমি শরৎসাহিত্য নিয়ে পণ্ডিতি আলোচনার যোগ্যব্যক্তি নই। পণ্ডিতেরাই আছেন সে-কাজের জন্যে। নিরবধি কালের তীব্র দৃষ্টির সামনে খোলা রইলো শরৎসাহিত্য।

কিন্তু, মানুষ-শরৎচন্দ্র ক্রমশই ঝাপসা থেকে ঝাপসাতর হতে থাকবেন। আমি সেখানেই সাধ্যমত হাত দিতে চাই। শিল্প স্বনির্ভর। শিল্পী কিন্তু তা নয়। সমকালীন মানুষদের সাক্ষ্য, বন্ধুবান্ধব আত্মজনের স্মৃতিচারণ, দিনপঞ্জি, চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁকে পৌঁছুতে হয় পরবর্তী কালে। অন্যেরা যতটুকু প্রমাণসহ ভাবে লিখে রাখেন, ততটুকুই বিধৃত থাকে ভবিষ্যতের দপ্তরে।

স্বর্গত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত আমাকে বহুকাল ধরেই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে স্মৃতিকথা লেখার জন্য অনেকবার অনুরোধ করেছেন। বিশেষ করে, তাঁরা শরৎচন্দ্রের জীবিতকাল থেকেই জানতেন এবং 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস সমাপ্ত হয়ে প্রকাশের পরে জেনেছিলেন শরৎচন্দ্রের অন্তর্জীবনের কিছু জরুরী তথ্য আমার গোচরে আছে। এঁরা দুজনে ছাড়া, আরও অনেক সাহিত্যিক সতীর্থ আমাকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লেখার জন্য অবহিত করেছেন। এঁরা জানতেন এবং জানেন, শরৎচন্দ্রের জীবনের এমন একটা দিক আমার স্বামীর ও আমার জানার সুযোগ হয়েছিল, যা হয়ত ঠিক সেভাবে অন্যদের জানা হয়নি।

কিন্তু শরৎদাকে নিয়ে স্মৃতিকথা লিখতে কিছুতেই আমাব হাত সরেনি। চেষ্টা করেও না। প্রায় চারদশক হতে চলল শরৎচন্দ্র তিরোহিত হয়েছেন, আমারও দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখনও না বলে গেলে হয়ত আর সময় থাকবে না, তথ্যগুলি বিনষ্ট হবে। তাছাড়া, সেই রঙ্গমঞ্চে মানুষেরাও তো সব একে-একে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন। এখনও সামান্য কয়েকজন মাত্র আছেন—তার মধ্যে আমি একজন।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করার আরও একটি বিশেষ বাধা ছিল সেই সময়ে। তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে একটি বাস্তবযোগ ঘনিষ্ঠভাবে যেখানে ঘটেছিল, সেটি নিয়ে তখন কোনও মতেই বাইরে কথা কওয়া সম্ভব ছিল না। যাঁর অটল ইচ্ছার সম্মানে শরৎদা আমৃত্যুকাল নিশ্চুপ থেকেছেন। জীবনের সেই করুণ অন্তরায়ও এখন সরিয়ে নিয়েছে মহাকাল। শরৎদার কণ্ঠ খুলেছিল সাহিত্যের মধ্যে, সমাজে নয়। আজ তাঁরা সমাজ-সংসারের সংকীর্ণ কুটিল দৃষ্টিব বাইরে, সকল সংকোচ কুণ্ঠার ঊর্ধ্বে চলে গেছেন।

প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে একটি বিষয় উল্লেখ করা বোধ হয় ভাল। শরৎচন্দ্র বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। তার মধ্যে কতক বইতে আমার ও আমার স্বামীর মুখে শোনা কথাবার্তা, আমাদের নিজস্ব অভিমত, ব্যাখ্যা লেখকেরই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এমনভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে শরৎচন্দ্রের কিংবা আমাদের কিছুই ক্ষতি হয়নি। কিন্তু এখন আমাকেই না অন্যেব কথা ধার নেওয়ায় উলটো বিপত্তিতে পড়তে হয়, এই ভাবনা। লেখক নিজে কখনই এমন অভিযোগ তুলবেন না নিশ্চয় জানি। তবে, ভবিষ্যতে গবেষকরা সন তারিখ মিলিয়ে আমার লেখার আগেই এমন কথা অন্যের বইতে মিলেছে, লিপিবদ্ধ করবেন। আমার এবং আমার স্বামীর মুখ থেকে অনেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সামান্য মাত্র দুই একটির স্বীকৃতি আছে।

অন্যগুলির দিতে ভুল হয়েছে।

এই প্রবন্ধমালায় আমি যা যা বলবো, তার দায়িত্ব আমার নিজের।

তিনদিন ভাষণের প্রয়োজনে রচনাটি আমি তিনটি ভাগে সাজিয়েছি। প্রথম ভাগের শিরোনাম—'বন্ধনহীন গ্রন্থি'। তাতে দেখব মানুষ-শরৎচন্দ্রের জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক চেহারাটি। কোনো শিল্পীরই একটিমাত্র চেহারা থাকে না। প্রায় সমস্ত মানুষেরই বাইরে একটি চেহারা, ভিতরে অন্য আরেকটি চেহারা থাকে জানি। এই দুটি সত্তার অস্তিত্ব সবাইকার চেনাজানা। শিল্পীদের কিন্তু বাইরেও অনেক সত্তা আর ভিতরেও অনেক সত্তা লক্ষ করা যায়, নিজের মধ্যে বিভিন্ন সত্তাকে বশ মানিয়ে এঁদের চলতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান-লিখিয়ে সত্তার সঙ্গে ছবি-আঁকিয়ে সত্তার কোনই মিল ছিল না। বাবামশায় রবীন্দ্রনাথে ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিসত্তা উদ্ভাসিত। শরৎচন্দ্রেরও অনেকগুলি ব্যক্তিসত্তা ছিল। ভিতরের মানুষটির সঙ্গে বাইরের মানুষটির মিল ছিল না।

শরৎচন্দ্র নিজের অন্তরের গভীরতার দিকটিকে এতই সংগোপনে অসূর্যম্পশ্য রাখতেন, সেই লোহার দুর্গ ভেদ করে অন্দরে পৌছুনো কঠিন ছিল। তিনি নিজে ইচ্ছা না করলে, কারুরই শক্তি ছিল না সেখানে প্রবেশের। যেন একটি অতি পবিত্র আর দামী কিছু সেখানে আছে, বাইরের চোখের দৃষ্টির ছোঁয়া লাগলে মলিন অশুচি হয়ে যেতে পারে, এমনি একটি ভাবভঙ্গি। অথচ তাঁর বাইরের আচরণে ছিল হালকাপনার মজবুত মুখোশ।

শরৎচন্দ্রের প্রকৃত বিশেষত্ব ছিল এইখানেই। ব্যক্তিগত জীবনে নিজের হৃদয়কে তিনি কোনদিন প্রকাশ্যে শোভাযাত্রা করিয়ে নিয়ে বেড়াননি। তাঁর স্বনির্ভর প্রেম, তার নিঃশব্দ বেদনা, তাঁর গভীর অভিমান, নিরুপায় ব্যর্থতার কষ্ট—সবই থাকত তাঁর নিজের ভিতরে লোহার তালা-আঁটা সিন্দুকে তোলা।

তিনি কবিতা লিখতেননা। লিরিক লিখে আত্মমুক্তির সহজ পন্থায় নিজের জীবনে অন্তত তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কবিরা অন্তরের বোঝা নামিয়ে হালকা হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের এক-একটি গানে কী অনাবিল মুক্তি, হৃদয়ের গ্লানি-ধৌতি, যন্ত্রণা-উত্তরণের আরাম নিহিত, ঔপন্যাসিকের তো ঠিক সেইভাবে আত্ম-কথনের সুযোগ হয় না। তাঁরা ঢুকে পড়েন নিজের ভিতরে নিজে। আরও—আরও ভিতরে। আরও গভীরে। নিজেকেই কুরে কুরে খান। শেষ পর্যন্ত প্রসৃত হয় একটি উপন্যাস। সার্থক বা ব্যর্থ যাই হোক না।

শরৎচন্দ্রের ভাগ্যদোষে এখানেও মুক্তির পথ ছিল বন্ধুর। শিল্পের মাধ্যমে ইচ্ছাপূরণের স্বচ্ছন্দ খেলাটা 'শ্রীকান্তে' খেলেছেন বটে, কিন্তু এখানেও তাঁকে বাধায় ঠেকতে হয়েছে। প্রথম দিকের বইগুলিতে তাঁর ইচ্ছা অবাধ স্বাধীনতা পায়নি সর্বত্র। তবে এই বাধাটিই আবার শরৎচন্দ্রের শিল্প-জীবনে শাপে বর হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কলম নিরুচ্চার-ভাষণের আঙ্গিকে অভ্যস্ত হতে হতে সিদ্ধহস্ত হয়ে গেল।

শরৎচন্দ্র জীবনে ছিলেন বঞ্চিত মানুষ। যে-যন্ত্রণা, যে-বঞ্চনা তাঁকে আজীবন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সেই অবরুদ্ধ কষ্টই সহজ-সরল অথচ ইঙ্গিতকুশল আঙ্গিকের আড়ালে থেকে তাঁর লেখাকে গভীর অন্তস্পর্শী করে তুলেছে। তিনি তাঁর প্রধান বক্তব্যকে শব্দের মাধ্যমে নয়, নিঃশব্দে উচ্চারণ করে গেছেন। জীবনের মহৎ বঞ্চনা, একান্ত অপ্রাপ্তি, শিল্পে তাঁকে প্রাপ্তিতে পৌছে দিয়েছে। তাঁব সব রচনাই অনুভব দিয়ে লেখা, অনুভব দিয়েই তাকে ধরা যায়, নইলে ভুল হয়।

যাঁরা সমাজের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভিত্তিতে শবৎচন্দ্রেব রচনাকে সাহসিকতা-ভীরুতার মানদণ্ডে খোলামেলা বিচার করেন, তাঁরা এটি লক্ষ্য কবলে ভাল হয়। সমাজ তাঁর শিল্পের মূল লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি আরও গভীবে কলম ডুবিয়েছেন। সমাজ ব্যাপারটি যেখান থেকে, আর যাব প্রযোজনে উদ্ভব হয়েছে, তিনি আছেন সেইখানে। তিনি আছেন মানুষে। মানব-মন আব মানব-চরিত্র তাঁর গোটা সাহিত্য। এই মানব-মন আব মানব-জীবনেব চাহিদাতেই তো সমাজ ব্যাপারটির উৎপত্তি। ধীবে ধীরে নানা দেশে নানা আকাবে সমাজ গড়ে উঠেছে, কালে কালে চেহাবা বদলিয়ে বিভিন্ন আকৃতি গ্রহণ কবেছে বিশ্ব দুনিযায়।

শরৎচন্দ্রেব বচনায এই মানব-মন আশ্চর্য, অদ্ভুত। সে কুলিশ-কঠিন, আবাব কুসুম-কোমল। সে উন্মত্ত ভোগী অথচ সর্বত্যাগী। তার গতি-প্রকৃতির হদিশ মেলা ভার। যুক্তির জাল বিছিয়ে একে ধরা যায় না সহজে, অঙ্ক কসে ফল বাব করা অসম্ভব।

স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি সব মানুষের থাকেনা। এটি প্রকৃতিদেবী কাউকে দেন, কাউকে দেননা। বিদ্যা-বৈদগ্ধ্য, চেষ্টায আব পবিশ্রমে অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু তৃতীয় নেত্রটি যার থাকে, তার আপনিই থাকে। শবৎচন্দ্র একটি কথা তাঁর সাহিত্যে লিখে বেখে গিয়েছেন—'সংসাবে যে যত ভাল বেসেছে, পবের হৃদযের ভাষা তার কাছে তত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।' এটি একটি মৌলিক সত্য।

এই রচনার দ্বিতীয় ভাগের শিরোনাম 'অদৃশ্য তর্জনী'। সেখানে প্রবেশ করব শরৎ সাহিত্যের কেন্দ্রীয় সত্তা এবং সমস্যাব অন্তঃস্তলে। কী ছিল তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির এবং সাহিত্য-দৃষ্টির প্রেরণা, কী ছিল তাঁর শিল্পপথেব বিঘ্ন, কিসের নেশায তিনি বিভোর ছিলেন আযৌবন মৃত্যু পর্যন্ত।

আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতায, আর তাঁব সঙ্গে অন্তরঙ্গ অকপট সংস্রবে, সত্য বলে যা জেনেছি—সততার সঙ্গে সাবধানে তা আলোচনা করব।

শরৎচন্দ্রের একখানি অসমাপ্ত উপন্যাস সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব আমার মত অনুপযুক্তের উপরে পড়েছিল। কী-কারণে, কেন ঐ গুরুদায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছিল, সে কথাটিও বলে যাওয়া উচিত মনে করি।

শরৎ-সাহিত্যেব প্রথম যুগের কিছু নায়ক-নায়িকাদের চরিত্র আমাব আলোচনাবস্তু হবে। সেই চরিত্রগুলির মধ্যে লেখকের নিজের অন্তর্জীবনেব অনুভূতি কতটা পবিস্ফুট, সেটাও আমি দেখতে চেষ্টা কবব। শরৎ-সাহিত্যের মূল ছিল লেখকেব বাস্তবজীবনেব মর্মমূলে গভীরভাবে প্রোথিত। তাঁর বইগুলিতে সব ঘটনা, সব চবিত্র বাস্তব মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন থেকেই উঠে-আসা। কল্পনা থেকে নয়। কল্পনা আছে, কিন্তু তা মূলে নয়, বহিরঙ্গে। কোথাও যেমন তাঁব কষ্টকল্পনা ছিলনা, তেমনিই কোথাও বাস্তব-অতিবিক্ত স্বপ্নেব তির্যক আলোকপাতও ঘটেনি। সেই কারণেই হয়ত এতটা সৎ, এতটা সত্য, এতদূব জীবনভিত্তিক তাঁব শিল্প। অথচ এই কারণেই আজ আমরা কেউ কেউ বলছি, তাঁর শিল্প সীমায়িত, ব্যাপ্তিহীন, সংকীর্ণ।

বিদগ্ধজনেব দৃষ্টিব উৎসকেন্দ্র মস্তিষ্ক। এঁদেব চোখে জীবনেব মধ্যেই জীবনোত্তরণেব নিহিত ছন্দটি সহজে ধরা পড়েনা। মহৎশিল্পীর দৃষ্টির উৎস হৃদয়ানুভব। প্রকৃত শিল্পরসিক পাঠকেরও তাই। খাঁটি শিল্পীব শিল্পসৃষ্টির লগ্নে মস্তিষ্ক প্রভু হয়ে হাজিব থাকেনা, প্রহরী হয়ে সতর্ক থাকে। হৃদয়ানুভব এখানে প্রেরণারূপে কাজ কবে, খেলা করে, মস্তিষ্ক সেবকের নিপুণতায় তাকে যথোচিত উপযুক্ত কবে বাইরে এনে ধরে।

শবৎ-শতবার্ষিকী এল। এই ৩১শে ভাদ্র তাঁর জন্মতারিখ নিরেনব্বুই পূর্ণ হয়ে শতকে পদার্পণ কবেছে। শরৎচন্দ্রকে এখন নতুন করে বিচাব করাব, নতুন চোখে পড়াব, নব মূল্যাযণের সময এল। এখন যেমন বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুন করে পড়া হচ্ছে, তেমনি শবৎচন্দ্রকেও নতুন করে পড়া দরকার। কোনও বিশেষ ধবনের মানসিক প্রত্যাশা নিয়ে নয়, ধারণাবদ্ধ মন নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে নতুন কবে শবৎ-সাহিত্যকে দেখুন। ধাবণাবদ্ধ মন, বা অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে উঠলে নবীন পাঠকবা হয়ত এবার তাঁকে চিনতে ভুল করবেন না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সংসাব যাত্রা নিয়ে লিখলেই শিল্পীব নজরটা সংসাবী হয় না, গল্পে বিধবার বিয়ে না দিলে লেখক বিধবাবিবাহ-বিরোধী হননা, ছাপোষা মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র আঁকলেই ছাপোষা মধ্যবিত্ত মানসিকতা হয়না। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক শিল্পীটি স্বকীয় জীবৎকালে সহজ ঔদাস্যে হাসিমুখে সমকালীনদের ভুল বোঝার পর্বত প্রমাণ ভার স্বেচ্ছায কাঁধে নিয়ে বেড়িয়েছেন। শিল্পকর্মেও বিনা দৃকপাতে স্বেচ্ছায় কিছু বিভ্রান্তি রেখে গেছেন, যাতে ভবিষ্যতের অসীম আকাশেও তাঁর ভাবমূর্তি সেই বিভ্রান্তির বোঝাটি কাঁধে নিয়েই ভেসে বেড়াবে।—এই বিভ্রান্তি মোচনের দায়িত্ব আছে সৎ সমালোচকের।

আমি একদা তাঁর কাছে যে-পিতৃস্নেহ পেয়েছি, তাতে ঋণমুক্ত হওয়াব এই একটি সুযোগ। শরৎদার অন্তর্মুখটি আমার তুচ্ছশক্তিতে যতটুকু সাধ্য উদঘাটিত করার চেষ্টা করব ভবিষ্যৎ কালের সামনে।

শবৎদার মত এমন অবাস্তব, অমধ্যবিত্ত, অসামাজিক অথচ অপার্থিব মানুষ,

আমার জীবনে তো আমি আর কাউকে দেখিনি। অসামাজিক শব্দটি ছাড়া ঠিক এই বিশেষণগুলিই গুরুদেবকেও দেওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি ছিলেন অপার্থিব মানুষ, এই পার্থিব জগতে এ কথা কে না বলবে? তার কারণ, তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ। তাঁর ব্যক্তিত্বে মহিমার সীমা ছিলনা। এমন উজ্জ্বল আলোকিত মানব-ব্যক্তিত্ব পৃথিবীতে হয়ত কদাচিৎ মেলে। কিন্তু শরৎচন্দ্র? তিনি তো সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বহীন, নিরুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ একটি গ্রামীণ মানুষ মাত্র। চরিত্রে, চেহারায়, আচরণে জীবনের মূল ভিত্তিতে এবং জীবন-সাদৃশ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবুও আমি উপরোক্ত বিশেষণ ক'টি তাঁর ভিতরকার শিল্পী মানুষটির প্রতি প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত নই। সেই কথাই বলতে চেষ্টা করব।

শরৎচন্দ্রের শিল্পরচনায় যেমন দেখতে পাই, সৎ আর মহৎ সুন্দর মানবসত্তা বহির্জীবনে একটি বিপরীত খোলসে ঢাকা থাকে—তিনি নিজেই আসলে সেই বিপরীতে ঢাকা প্রচ্ছন্ন মানুষ ছিলেন। তাঁর বাইরের আচরণগত মূর্তির সঙ্গে ভিতরের মানুষটির সাদৃশ্য ছিলনা।

আমার সুদীর্ঘ জীবনে পরিচিত যত মানুষ দেখেছি, তার মতন ভালবাসবার শক্তি আর কারুর মধ্যে এতখানি দেখেছি বলে মনে পড়েনা। তার মতন অসম্পৃক্ত মন আর নিঃশব্দ আত্মত্যাগও দ্বিতীয়টি দেখিনি।

ব্যক্তিগত জীবনে মহৎ ত্যাগ স্বীকার, প্রবল দুঃখ বহন অনেক মানুষই করেছেন, করেন। সহিষ্ণু আদর্শবাদী মানুষের পক্ষে তা শক্ত নয়। কিন্তু শিল্পীরা যে স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক হন। তাঁদের স্বার্থপর হতে হয় বেশ একটু। যেহেতু, শিল্পের দাবী তাদের কাছে জীবনের দাবীর চেয়ে বেশি। যিনি শিল্পী—বিশেষ করে যিনি সচেতনভাবেই নিজের শিল্পসত্তার মান জানেন—তার পক্ষে শিল্পের ক্ষতি করেও জীবনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা সহজ নয়। এ ত্যাগের বিশেষ চরিত্র আলাদা। শিল্প চিরকালের জন্য, জীবন আপাতকালের জন্য, সবারই জানা। সেই আপাতকালের আনন্দের জন্য চিরকালের আনন্দকে বঞ্চিত করা শিল্পীর পক্ষে কঠিনতম আত্মত্যাগ। —ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ কেটে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার কাহিনীটি মনে পড়ে যায়। একলব্য, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের মাটির মূর্তি সামনে রেখে নিজের চেষ্টায় ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হন। যে-গুরু নিষাদ বালককে হীনজাতি বলে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেননি, তাঁকেই গুরুদক্ষিণা দিতে হয়েছিল একলব্যকে—তীর-নিক্ষেপের প্রধান আঙুলটি কেটে ফেলে। শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনায় একটি মানুষের মহত্ত্ব আর অন্য মানুষের আপাতকালীন প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টান্ত দেখে মহাভারতের ঐ কাহিনীটিই আমার মনে পড়ত।

শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম যৌবনে যাঁকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর সান্নিধ্য থেকে চিরকাল নিজেকে অনেক দূরে রেখেছিলেন, নিজের সামাজিক অযোগ্যতার জন্য। মনের ভিতরে তাঁর সান্নিধ্য গড়ে নিয়ে শিল্পে তা প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেখানেও তাঁকে

বঞ্চিত হতে হয়েছে। শিল্পীর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ কেটে তিনি নিজের নিঃশব্দ প্রেমের নিঃশর্ত দক্ষিণা দিয়েছিলেন।

তিনি আমাকে লেখা একটি বহুপরিচিত চিঠিতে 'আমার একটি গারজেন আছে' বলে যাঁর উল্লেখ করেছিলেন, তিনি শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন—শরৎচন্দ্র যেন বালবিধবা চরিত্র নিয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাসে আলোচনা না করেন। আরও তো অনেক রকমের নারী-চরিত্র আছে, বালবিধবা বাদ দিলে ক্ষতি হবেনা।

শরৎচন্দ্র এর উত্তরে জানিয়েছিলেন—'আমার কলমে যে-সকল চরিত্র আপনা থেকেই সহজে আসতে চায়, তাকে রোধ করে রাখা আমি উচিত মনে করিনা। তবে কোনও ভয় নেই, আমি এমন বালবিধবা কোনওদিন আঁকবনা, যা তোমার সম্মানে বা মনে আঘাত দিতে পারে।'

এই করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনীটি আমার কাছে গল্প করার পরে শরৎচন্দ্র আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন কখনও কাউকে এ-তথ্যটি জানাবে না। বলেছিলেন, 'তোমাদের পেটে খবর কখনই হজম হয়না। তুমি যদি এটা প্রকাশ করে ফেল, মুশকিলে পড়বে। আমি তখন সরাসরি অস্বীকার করে বসব ও-কথা আমি তোমাকে বলিনি। তুমিই অপ্রস্তুতে পড়ে যাবে কিন্তু।' আমি বলেছিলুম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বড়দা। মেয়েদের মধ্যে অনেক কিছুই আপনি দেখতে পেয়েছেন, যা অন্যে দেখতে পায়নি। শপথ নিলুম মনে, আমার মুখ থেকে আপনার যা একান্ত গোপন, তা বাইরে আসবেনা।'

হেসে আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন। আর কিছু বলেননি।

আজ দূরলোকবাসী শরৎচন্দ্রের কাছে শপথ ভঙ্গ করে তাঁর মুখ থেকে পাওয়া দু'চারটি তথ্য আমার দেশের বর্তমান ও অনাগতকালের মানুষদের সামনে প্রকাশ্যে রেখে যাচ্ছি। মহাকালের স্রোত সেদিনের সেই তীব্র উৎকণ্ঠা আর কলঙ্কভীতির অস্বস্তিকর আবহাওয়া ধুয়ে নিয়ে গেছে। আজকের দিনের সামাজিক আবহাওয়ায় শরৎচন্দ্রের জীবনসত্য প্রকাশিত হলে কোনও ব্যক্তি কিংবা কোনও পরিবারের সামাজিক অস্বস্তি ঘটবেনা। কারও কোনও হানির সম্ভাবনা নেই।

স্বভাব-বিদ্রোহী বেপরোয়া-প্রকৃতির মানুষটির সামাজিক বিদ্রোহের স্বাধীনতা হরণ করে দক্ষিণা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর স্বনির্মিত 'গারজেন'। মূল কথা, শরৎচন্দ্রেরই স্বনির্ভর প্রগাঢ় প্রেম—তাঁর শিল্প যন্ত্রণা বুঝতে হলে এটি নিশ্চয়ই একটি জরুরী তথ্য। সন্দেহ নেই, একজনের কাছে আত্মশপথ-পালনের দায়িত্বে শিল্পী শরৎচন্দ্রের নিজস্ব বিশ্বাসের পথে অবাধ চলায় বাধা ঘটেছে। সামাজিক কলঙ্কভীতি নিন্দাভীতি শরৎচন্দ্রের নিজের তখন যে আদপেই ছিলনা তা বলা বাহুল্য। সারা যৌবনকাল কেটেছে তাঁর নিরঙ্কুশ সমাজবিদ্রোহিতায়।

২

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখতে বসে প্রথমেই আমার বাধা ঠেকছে নিজেকে নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত কথা বলতে গেলে সর্বত্রই নিজেকে উপস্থিত রাখা ছাড়া উপায় নেই। অথচ, শরৎ-মঞ্চে নিজেকে জাহির করা একান্তই আমার অমনঃপূত এমন কি রুচিবিগর্হিত ঠেকছে। কিন্তু কোনও উপায় নেই, নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে লেখার,—যেহেতু এক্ষেত্রে নিজে তৃতীয় ব্যক্তি হওয়ার উপায় নেই।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের ধরনটি যেমন অনন্যপূর্ব, তাঁর জীবনচরিতও তেমন অনন্যপূর্ব। পরস্পর-বিরোধী এমন অদ্ভুত গল্প-ছড়ানো জীবনকাহিনী লেখকের জীবৎকালেই প্রচলিত হতে বড় একটা শোনা যায়না। রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও নানা কাল্পনিক গল্প তাঁর জীবনকালে আমরা শুনেছি। সে কিন্তু অন্য ধরনের। তাতে আপত্তি করার মত কিছু থাকতনা, বরং বোঝাই যেত, তাঁর শিল্প ও সৌন্দর্য সাধারণ মানুষের মনে—যারা তাঁকে চেনেনা, তাঁর জীবনযাত্রা জানেনা—তাদের কল্পনায় তাঁর সম্বন্ধে কী ধরনের অসম্ভব অনুমান বানিয়ে তোলে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে গল্পগুলি ছিল যথেষ্ট আপত্তিজনক। অখ্যাতিমূলক এই সব বাজে গল্প শুনে তিনি কিন্তু প্রতিবাদ করতেননা, বরং উপভোগ করতেন যেন। অনেক সময়ে কোনও আপত্তিকর কাহিনী শুনে বিস্মিত হয়েছেন, দুঃখিতও হয়েছেন কখন-সখন। কিন্তু প্রতিবাদ করতে বললে সম্মত হতেন না, অবিচলিত থাকতেন। সুখ্যাতিতে তাঁর লোভ ছিলনা বলব না, পত্র-পত্রিকায় নিজের লেখার প্রশংসা পড়লে শিশুর মতন উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি, মিথ্যা গুজবের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প কানে শুনেও স্থির থাকতে দেখে। প্রতিবাদের কথা কেউ তুললে—একটি গভীর উদাস হাসি ফুটে উঠত মুখে। বলতেন—কী হবে প্রতিবাদ করে? যারা আমাকে চেনে, তারা কখনই এ-গল্প বিশ্বাস করবে না। যারা চেনে না, তারা যদি ভুল ধারণা করে, তাতে এসে যায় না। কত অচেনা মানুষ সম্পর্কে আমরাও হয়ত কত ভুল ধারণা নিয়েই বেঁচে থাকি।

এই গুজব সম্পর্কে একটা অদ্ভুত কথা বলব। শরৎচন্দ্র নিজেই নিজের সম্বন্ধে নানা রকম বাজে গল্প বলতেন। পরে বলেছেন,—ওটা ঠিক আমার জীবনে ঘটেনি বটে, কিন্তু আমারই জানা অন্য একজনের ঘটেছে। একবার তাঁর নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে একটি খুনের গল্প বলেছিলেন। আমরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলুম। সেদিন জনকতক বিশিষ্ট ভদ্রব্যক্তি নতুন এসেছেন তাঁকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে। গল্পটি ছিল কয়েকজন মিস্ত্রির মত্ত অবস্থায় বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া। জায়গাটা বেশ নোংরা। মত্ততার ঝগড়া বাড়তে বাড়তে তাদের আচরণ কত অদ্ভুত হয়ে উঠল, তাদের কথাবার্তা আর আচরণ কত অসংলগ্ন অর্থহীন হয়ে গেল,—শেষ পর্যন্ত একজন মত্ত ব্যক্তি অপরাধীর ভূমিকায় কী-রকম কাতরভাবে সকলের পায়ে ধরে মার্জনাভিক্ষা করতে লাগল,—আর অন্য একজন সুরামত্ত লোক বিচারকের

ভূমিকায় প্রচণ্ড রাগে হাতের কাছে একটি কুড়ুল পড়েছিল, তাকে সেই কুড়ুলের ঘায়ে সত্যি সত্যি খুন করে ফেললো। শরৎচন্দ্র সেই খুনের আসর থেকে কেমন করে বাইরে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে পালিয়েছিলেন, হাত পা কেটে ছড়ে রক্তাক্ত কাপড় ফালা ফালা ছিঁড়ে,—তার আতঙ্ককর বিবরণ তিনি চমকপ্রদভাবে বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। ঘরের সমস্ত মানুষ আমরা তখন বিস্ময়ে ভয়ে উত্তেজনায় নিঃশ্বাসরুদ্ধ কাঠ হয়ে গিয়েছিলুম।

শরৎচন্দ্রের লেখা যেমন পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায়না, গল্প বলাও ছিল তেমনি আকর্ষণীয়। নিঃশ্বাস রোধ করে শুনতে হত, এমনি ছিল বলার ভঙ্গি। প্রত্যেক কথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকতনা।

সেদিন যে-ভদ্রলোকেরা শরৎদার সঙ্গে নতুন আলাপ করতে এসেছিলেন, তারা তো স্তম্ভিত। আড়ষ্ট হয়ে শুকনো মুখে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে উঠে দাঁড়ালেন একে একে সকলে। যত ভাল লেখকই হন না, ঐ রকম পরিবেশের মানুষ যিনি, আর ঐ গল্প ভদ্রসমাজে বিস্তৃত বর্ণনা স্বচ্ছন্দে করতে যাঁর রুচিতে বাধেনা, সেই ব্যক্তিটির সঙ্গ-সাহচর্যের জন্য তাঁদের তখন আগ্রহ উবে যাওয়া আশ্চর্য নয়। পাড়ার দু'-একজন ভদ্রলোকও এটা-ওটা ছুতো করে উঠে পড়লেন। গল্পটি রোমহর্ষক হলেও বিস্ফোরকও ছিল। সভ্য ভব্য ছাপোষা গৃহস্থের পক্ষে একটি খুনে ডাকাতের সাহচর্যটা খুব স্বস্তিজনক নয়। তাঁরা উঠে গেলে, শরৎচন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন,—ওরা আমার সম্বন্ধে আজ যা ধারণা করে গেল, সেটা ওদের উপন্যাস-পড়া খুশির সঙ্গে মিলবে না। এই জাতের একটা নোংরা মানুষকে এত খাতির করে গেল ভেবে—ওদের গা ঘিনঘিন করবে।

ঐ গল্প বলার কিছুদিন পরে একদিন শরৎদা আমাদের বাড়ির বৈঠকে গল্পগুজব করছেন বিকেলবেলায়। বর্মারই গল্প। প্রসঙ্গক্রমে সেই মিস্ত্রিদের কথা এসে পড়ল। বললেন—'সেই যে—বীরেন মিস্ত্রি—খুনের হাঙ্গামায় যে পড়েছিল, যার দাদা তাকে আরাকানে পাঠিয়ে দিয়ে বাঁচিয়েছিল—' ইত্যাদি। আমি তাড়াতাড়ি জেরা করতে লাগলুম তাঁকে। জানা গেল, সেই খুনের কাহিনীটি ওদেরই মুখে শরৎদার শোনা। তিনি স্বয়ং ঘটনাস্থলে আদপেই উপস্থিত ছিলেননা। অথচ, সেদিন নিজের বৈঠকখানায় একঘর লোককে পাথরের মূর্তি বানিয়ে দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা নিয়ে গল্পটি বলেছিলেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বললুম—'তবে যে আপনি সেদিন বললেন, আপনিও ওদের সঙ্গে ছিলেন। বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে লোহার তারের কাঁটায় হাত পা ছড়ে, জামাকাপড় ছিঁড়ে পালিয়েছিলেন?'

শরৎচন্দ্র হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন—ওটা সত্যি কথাই। পালিয়েছিল ট্যারা কানাই। সে-ই তো আমাকে সমস্ত গল্পটা পরে এক সময়ে বলেছিল। গল্পটা কিন্তু যথার্থ সত্যি।

আমি খুব বেগে গিযেছিলুম। 'তা বলে ঐ বকম একটা বিশ্রি জাযগায মিস্ত্রি মজুবদেব মাতলামি খুনখাবাপিব মধ্যে নিজেকে "হিবো" কবে গল্প বলতে ভদ্রলোকদেব সামনে আপনাব বাধলোনা বড়দা? অতলোক আপনাকে সেদিন কী না কী ভাবল বলুন তো? আমাব মবে যেতে ইচ্ছে কবচে।'

শবৎদা হেসে উঠে বলেছিলেন—ওটি চাক্ষুস ঘটনা না বললে ঐ বকম জমে উঠত কি? বাগ কবিস কেন? আমি ছিলুমনা বটে, কানাই তো সত্যিই সেখানে ছিল। তাব কাঁটাতাবে হাত পা ছড়ে বক্তপাত হযেছিল, কাপড় ছিঁডেছিল, সমস্তই সত্যি। শুধু কানাই নামটাব বদলে 'শবৎ চাটুয্যে' বসিযে দিযেছি মাত্তব।

সেদিন আমাব চোখ দিযে জল পড়েছিল মনে আছে। নিজেকে এমন হেনস্থা কবতে পৃথিবীতে আমি দ্বিতীয মানুষকে দেখিনি। নিজেব নামে নিন্দে কবতে, নিজেকে মন্দ বলতে তাঁব যেন একটুও বাধতনা। অন্যেব প্রতি তিনি যত বেশি কোমল করুণার্দ্র ছিলেন, নিজেব প্রতি ততই নির্মম ছিলেন দেখেছি। নিজেকে যেন তিনি সর্বদাই তীব্র বিদ্রূপ কবতেন, আমাব মনে হত। কাবও চোখে জল তিনি সইতে পাবতেন না। সেদিন আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে সুন্দব সুন্দব কথায বুঝিযেছিলেন। আমি লিখে বাখিনি বলে এখন খুবই অনুশোচনা হয। যতটা মনে আছে, বলি। বলেছিলেন,—তুই এত কাতব হচ্চিস কেন বাধু? ভেবে দেখ, কানাই একটি ব্যক্তি, আমিও একটি ব্যক্তি। তাব অভিজ্ঞতা আব আমাব অভিজ্ঞতায তফাৎ কিছুই নেই। তফাৎ শুধু ব্যক্তিত্বে। আমি কিন্তু সব মানুষেবই ব্যক্তিত্ব নিজেব মধ্যে অনুভব কবতে পাবি। তখন, সেখানে ওবা মাতাল হযে আসামী আব বিচাবক বনে গিযেছিল। মত্ত অবস্থায, ওবা কে কী-বকম অনুভব কবছিল, সেটাও আমি ঠিক বুঝতে পেবেছি। ঘাড়ে কোপ মাবা পর্যন্ত ওবা একবকম কাল্পনিক অনুভূতিব জগতে বাস কবছিল, —বক্তেব ফিনকি ওদেব সহজ চৈতন্যে ফিবিযে এনেছিল। চৈতন্য যখন হল, তখন ওদেব প্রথমেই হযেছিল প্রচণ্ড ভয,—তাবপবে মৃত বন্ধুব জন্যে মর্মান্তিক কষ্ট।

এই বকম অনেক বিশ্লেষণ কবে সেদিন বুঝিযেছিলেন, মানুষ আসলে সকলেই সমান। জন্মসূত্রে বা অবস্থাসূত্রে তাবা বিভিন্ন বকম হযে দাঁড়ায যেটা—সেটা বহিবঙ্গেব ব্যাপাব। কেউ বিদ্বান, কেউ মূর্খ, কেউ ধনী, কেউ দবিদ্র, কেউ পবিশীলিত, কেউ অমার্জিত—ভিতবে কিন্তু একই নিযমে মানুষ থাকে, তাব শবীবেব আব মনেব ক্ষুধা-তৃষ্ণা সুখ দুঃখবোধ একই।

শবৎদা এই ধবনেব কথা অনেক সময়েই বলতেন। 'ভেতবেব মানুষ' 'ভেতবেব মানুষ' এই বাক্যটি তাঁব ঘনিষ্ঠ কথাবার্তাব মাত্রা ছিল। মুড না এলে তিনি সিবিযস কথা কইতেন না। বেশিক্ষণ সিবিযস থাকতেনও না। একলা থাকলে, মন খাবাপ থাকলে, শবীব খাবাপ হলে,—তিনি ঠাণ্ডা গভীব সুবে কথা কইতেন আত্মগতভাবে। —যেন খুব অতল থেকে কথাগুলো একটা একটা কবে তুলছে। বলে মনে হত। কথা এমন কিছুই নয, সাধাবণ সহজ কথাই। কিন্তু সে অন্য বকম। মনে হত,

তার চেয়ে খাঁটি, তার চেয়ে সত্যি বুঝি সংসারে আর কিছু হতে পারে না। তখন আমার মুখ থেকে একটিও শব্দ ফুটত না। সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে থাকতুম। কারণ, তখন তো তিনি অন্য একজন মানুষ। যাঁকে ঠিক আমি চিনি না। ভয়ে আর সম্ভ্রমে মন আড়ষ্ট থাকত।

আর-একদিনের একটি ঘটনা বলি। সেদিন রবিবার। আমরা দুজনে সকাল সাড়ে ন'টা আন্দাজ সময়ে অশ্বিনী দত্ত রোডে গিয়েছি। গিয়ে দেখি, তখনও শরৎদা একতলায় বৈঠকখানায় নামেননি। রবিবারে সকাল-সকাল বৈঠকখানায় নামতেন। চাকর বললে—এখনও ওঠেননি, শুয়ে আছেন।

অসুখ করেছে নাকি মনে করে উদ্বিগ্ন মনে দুজনে আমরা দোতলায় উঠে গেলুম। তাঁর শোবার ঘরের দরজার মুখে বাড়িসুদ্ধ লোকের জটলা। ফিসফিস কথাবার্তা।

—কী ব্যাপার?

প্রকাশবাবু নিচু গলায় বললেন—মুশকিল হয়েছে। কাল শেষরাত্রে দুটো চোর বাড়ির সামনে ধরা পড়েছিল। তাদের পুলিশে দেওয়া হয়েছে—সেই দুঃখে দাদা বিছানা নিয়েছেন। একটু কৌতুকের সুরেই বললেন যদিও, তবুও তাঁর বেশ উদ্বেগ হয়েছে, বোঝা গেল। বউদি (হিরণ্ময়ী দেবী) ব্যগ্র হয়ে আমার স্বামীকে বললেন —ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে এসে পড়েচ, খুব ভাল হয়েচে। কিছুতেই তো তোমার দাদাকে ওঠানো যাচ্চে না। চা দেওয়া হয়েচে,—পড়ে আছে, তামাক পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে নিবে গেল। তোমরা একটু ভেতরে গিযে দেখ না,—যদি ওঠাতে পার।

কাহিনীটি এই,—ভোর রাত্রে বাড়ির সামনে রাস্তায় হৈ-চৈ চেঁচামেচি শুনে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। উনি উঠে নিচে নেমে যান। গিয়ে দেখেন ওঁদের বাড়ির ঠিক সামনেই, দুটো অল্পবয়সী ছেলেকে পাড়াসুদ্ধ লোক দারুণ ঠেঙাচ্ছে, তাদের চোখ মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তিনি তাড়াতাড়ি গেট খুলে বেরিয়ে চোর দুটিকে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে বাড়ির মধ্যে টেনে এনে গেট বন্ধ করে দেন। জনতা এতে আরও রেগে যায়, আপত্তি করতে থাকে। তাদের হাতে ওদের ফিরিয়ে দিতে বলে। শরৎচন্দ্র তাদের বলেন—বামাল যখন ধরা পড়েছে, তখন ওদের পুলিশে দিতে পার তোমরা, কিন্তু খুন করে ফেলতে পার না।

তখন পাড়ার লোকেরা শরৎদার বাড়ির দোতলায় উঠে এসে পুলিশে খবর দেয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে বামাল সমেত চোর দুটিকে পাওয়া যাবে পুলিশ স্টেশনে বলে দেওয়া হয়।

চোর দুটির চোখ মুখ তখন ভিমরুল কামড়ানোর মতন ফুলে উঠেছে। উনি নিজে তাদের আইডিন তুলো টুলো এনে শুশ্রূষা করেছেন। খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন তাদের জন্যে। দু-গেলাস গরম চা বানিয়ে দেবার হুকুম করেছেন। এদিকে চোরেবা

কিন্তু ওঁর দুই পা জড়িয়ে কান্না শুরু করেছে—'আমাদের পুলিশে দেবেননা বাবু, যত খুশি আপনারাই মারুন। আর কখনও এমন কাজ করবনা।' কিন্তু তখন তো আর উপায় ছিলনা। একটু পরেই পুলিশের গাড়ি এসে ছেলে দুটোকে ধরে নিয়ে চলে গেল। পাড়ারই পণ্ডিতিয়া বস্তিব ছেলে ওরা।

সেই থেকে উনি বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বলছেন—আমিই ছেলে দুটোর জীবনের সর্বনাশ কবে দিলুম।

হিরণ্ময়ী দেবী, প্রকাশচন্দ্র ও রামকৃষ্ণের মুখে সব কাহিনী শোনা গেল। ওঁরা বড়বাবুর ঘরের মধ্যে বুড়ি ও বাঘাকে (শরৎচন্দ্রের ভাইয়ের ছেলে ও মেয়ে) পাঠিযে ওদের দুজনকে দিয়ে 'জিয়া'কে ওঠাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। শরৎদা ভাইপো ভাইঝি দুটিকে খুবই ভালোবাসতেন। শ্রীমান অমলকে তিনি তখন নাম বলতেন, অমূল্য। ডাকতেন 'বাঘা' বলে। বলতেন, ও আমাদের ভবিষ্যতেব অমূল্যধন। মুকুলকে বলতেন 'বুড়ি'। 'বুড়ু'। ওরা ওঁকে ডাকত 'জিয়া'।

আমরা তো আস্তে আস্তে তাঁর ঘবে ঢুকলুম। তিনি চোখ মেলে তাকালেন। দৃষ্টি বিষাদ-ভারাতুর, মুখ শোকাচ্ছন্ন।

আমার স্বামী কথায়-কথায় তাঁকে কিছুটা স্বাভাবিক কবে আনলেন। চা ঠাণ্ডা হযে গেছে। নতুন করে চা বানিযে আনতে বলা হল। শরৎদা কেবলই বলতে লাগলেন—কুড়ি-একুশ বছর বযসেব ছেলে দুটো, এবারে দাগী-চোব হয়ে গেল ওরা। ওদেব বাঁচবার পথ আমিই বন্ধ করে দিলুম নরেন। পুলিশে যে আরও ওদের মাববে-না তারই বা কি গ্যারান্টি আছে?—শুধু নিজের নার্ভকে, নিজেব বিবেককে আবাম দেবার জন্যে আমি ওদের মারধোর বন্ধ করে ফোন করিয়ে জেলে পাঠালুম। এটা মোটেই করুণা নয়, উদারতা তো নয়ই, এ কেবল স্বার্থকেন্দ্রিকতা। আমি ঐ বীভৎস মার চোখে দেখতে পারছিলুমনা, সহ্য করতে পারছিলুমনা। আমার মুহূর্তের অস্বস্তিটাই বড় কথা হল। তাই, মেরনা, বরং পুলিশে দাও—বলে বসলুম।

শরৎচন্দ্র উঠলেন, চা খেয়ে গড়গড়া নিয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন। নিচে খবর পাঠানো হল, তিনি আজ নিচে নামবেননা, শরীর ভাল নেই। রবিবার বলে অনেক দর্শনার্থী নিচে বৈঠকখানায় বসে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা ফিরে গেলেন।

শরৎদা পড়ারঘরে সেদিন আমাদের কাছে অনেকক্ষণ ধরে ঐ বিষয় নিযে অনেক কথা বলেছিলেন। যতটা মনে আছে বলছি।

উনি বলতে লাগলেন—ওরা যে চোর হয়েচে, এটা কাদের দোষ? এই আমরা, আমাদেরই দোষে। আমরা যারা ওদের ধরে ঠ্যাঙাচ্ছিলুম, ওদের পুলিশে দিলুম—আমরাই ওদের চোর বানিয়েছি। এই উচ্চবিত্ত সমাজের অন্যায়ে, অত্যাচারে, স্বার্থপরতায় আর অবিশ্বাসে বস্তির ছেলেগুলো চোর হয়। ওরা তো চোর জোচ্চোর হত না—যদি কপালগুণে এই সব দোতলাবাড়িতে জম্মাত।

কোথায় ওদের নিঃস্ব জীবনটাকে গড়ে তোলাব জন্যে হাত বাড়িযে দেব, তা নয়, সর্বদা ওদের অবিশ্বাসের নজবে আর ঘেন্নাব নজবে ঘিবে বেখেচি। কী করে ওবা সৎ হবে, সাধু হবে? কী আছে ওদের আশেপাশে সম্বল? অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা ছাড়া জীবনে কিছুই পায় না ওবা।

এই আমাকেই দেখ না! কী করলুম আমি ওদেব জন্যে? পুলিশে ধবিযে দিলুম। কোথায় ওদের ভ্রষ্ট জীবনটাকে নতুন কবে গড়বাব সুযোগ করে দেব, তা না করে থানায় পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। তার ফল এই, ওরা দাগী হয়ে গেল, ক্রমশ আবও বদ্ কাজ কবতে করতে নিচে নামতে থাকবে। কারণ, ওরা কাজ কবাব আব সুযোগ পাবেনা। ওদেব তো আমি পানিত্রাসে নিযে যেতে পারতুম, চাষবাসেব কাজ শেখাতে পারতুম। ওদের চুরি কবাব মূল কাবণটা দূব করাব চেষ্টা করা উচিত ছিল নাকি? তা নয, জন্মের শোধ ওদেব দাগী চোব কবে ছেড়ে দিলুম।

শরৎদাব সেদিনের আপসোস, গভীরভাবে আমাদেব মনকে স্পর্শ কবেছিল। সত্যিই সেদিন উপলব্ধি কবেছিলুম শ্রেণীবিভক্ত সমাজেব বিষাক্ত বাষ্প কীভাবে দেশের প্রাণ শুষে নেয। কীভাবে একের পাপে অন্যে শাস্তি ভোগ করে। শরৎদাব কাছেই আমাব সমাজচেতনা প্রথম জাগ্রত হয়েছিল। তাঁব মনেব মধ্যে সত্যি সত্যিই মানুষেব শ্রেণীভেদ ছিলনা। সামাজিক শ্রেণীবিচারকে তিনি গ্রাহ্য কবতেননা, মূল্য দিতেননা। তাঁব নিজেব জীবনে তা ববাবর প্রমাণিত কবে গেছেন। উনিশ শতকেব সমযে শরৎদা নিজেব বাস্তবজীবনে শ্রেণীভেদেব বিরুদ্ধতা কবেছেন আচবণে, চিন্তায আর লেখাতে তার প্রবল প্রকাশ দেখা গেছে। তখন কিন্তু সোভিয়েট বিপ্লবের চিহ্ন দেখা দেয়নি।

চোর ধবলে মধ্যবিত্ত-সচ্চবিত্র-চিত্তে যে বিমল আহ্লাদ হয়, যে আত্মতুষ্টি জাগে —'ঐ লোকটা চোর, আমি কেমন সাধু সৎ', এই মধ্যবিত্ত আত্মপ্রতাবণা শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল না। অন্যকে চোর বলার আগে তিনি নিজেব দিকে তাকাতেন।

সমাজের যত অবহেলিত, অপমানিত, অপ্রীতিভাজনদের জন্যেই তাঁর হৃদয়ের দ্বার অবারিত ছিল। সমাজ যাদেরই একটু বাঁকা চোখে দেখেছে, শবৎচন্দ্র তাদের বুকে টেনে নিয়েছেন। অত্যাচারিতের প্রতি তাঁর মমতার অবধি ছিল না।

৩

শরৎচন্দ্রেব মধ্যে বালকোচিত ভাবটি মাঝে মাঝেই নানাভাবে ফুটে উঠত। কৈশোরে মানুষ এক একটি সামান্য কাজে নিজের ইচ্ছাকে বিজয়ী করার জন্যে অসামান্য পরিশ্রম করে। শরৎচন্দ্রকে ছোটখাট সামান্য ব্যাপারে সেই ধরনের উৎসাহ-উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে মাঝে মাঝে দেখা যেত। হয়ত কোনও পাড়ার ছেলেরা একটি ক্লাব গড়তে চেষ্টা করছে, কিছু বাধা বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে—শরৎদা সেই ব্যাপারে এতই সিরিয়স্

হয়ে তাদের জন্যে ভাবনা চিন্তা চেষ্টাচরিত্র শুরু করতেন, মনে হত তিনি নিজেই যেন একজন কিশোর উদ্যোক্তা। কোথায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কোথায় থানার ও সি, কোথায় কোন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট,—কাকে ধরতে পারলে সমস্যাটির ফয়শালা হতে পারে—তার জন্যে তাঁর মহা উদ্বেগ। সাহায্যপ্রার্থী উদ্যোক্তা ছেলেদের সঙ্গে তিনি যেন তাদেরই বয়সী হয়ে গিয়ে শলাপরামর্শ করতেন। তাঁর অন্তঃস্তল থেকে চঞ্চল একটি ছেলে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত দুরন্ত বেগ নিয়ে, বয়স্ক সত্তার দেহ-দৃশ্যের স্থির পটটি অস্বীকার করে। সবাই আমরা বলতুম—বেজায় খেয়ালী মানুষ।

এইরকম ব্যাপারে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত একটি গল্প বলি। এ-গল্পটি রবিবাসর সংস্থার 'রবিবাসর' নামে বইতে বোধ হয় খুব সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে বলে মনে পড়ছে। বইটি হাতের কাছে নেই। ব্যাপারটি বিস্তারিত ভাবে খুলে বললে শরৎচন্দ্রের চবিত্রের একটি দিক কিছুটা স্পষ্ট হতে পারে।

'রবিবাসর' নামে সাহিত্যিকদের একটি মিলন-সংস্থা তখন নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কয়েক বছর। সদস্যরা সকলে কিন্তু সাহিত্যিক নন। বেশির ভাগই সাহিত্যরসিক, সাহিত্যপাগল, সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী মানুষ। এঁরা সাহিত্যিকদের সাহচর্যের জন্যে উৎসাহিত সদস্য হয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে প্রথম দিকে বছরে বার দুই, শেষদিকে প্রতি বছরে একবার করে 'রবিবাসরে'র বৈঠক বসত। রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন মশায় একদিন ৫নং হিন্দুস্থান পার্কের আমাদের অস্থায়ী বাড়িতে বললেন —রাধাকে এবারে আমাদের রবিবাসরের সদস্য করে নিতে হবে। শরৎচন্দ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রবলভাবে আপত্তি করে উঠলেন—না; কখনও না। রবিবাসরে মেয়েসভ্য নেওয়া চলবেনা। আমার আত্মসম্মানে লাগল। আমি বিদ্রোহ করে বললুম —কেন? মেয়েরা কি সাহিত্যিক নয়? সাহিত্যসংস্থার যে-কোন পুরুষ-মেয়ের যোগ দেবার সমান অধিকার। মেয়েরা কি লিখছে না? তারা কি সাহিত্য-পাঠক নয়? শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন—মেয়েরা সাহিতিকও বটে, পাঠকও বটে। কিন্তু তাদের স্বজাতীয় নিজস্ব আড্ডা অনেক আছে, যেখানে পুরুষরা উঁকিও দিতে পারেনা। তারা অবাধে যা খুশী প্রাণমন খুলে বলতে পারে। রবিবাসরকে 'সাহিত্যসভা' করে তোলা হবেনা, ওটাকে সাহিত্যিকদের 'সাহিত্য-আড্ডা' করে গড়ে তোলা দরকার। তোমরা এসে ঢুকলে আমাদের জিভে লাগাম লাগিয়ে কথাবার্তা কইতে হবে। না, —না —সে ঠিক হবে না। ভুল হবে। এমনিতেই তো কেউ কেউ ওটাকে সাহিত্যসভা বানাবার মতলবে উঠে পড়ে লেগেছেন। সভাপতি, প্রস্তাবক,—ঘোষণা মাফিক সাহিত্যপাঠ—ধন্যবাদজ্ঞাপন—আরে ছি—ছি, গোটা জ্যান্ত জীবটাকে কবরে ঠেলে দিয়ে তার চমৎকার স্ট্যাচু বানিয়ে আহ্লাদ করা। স্বচ্ছন্দ অবাধ ব্যাপার হতে না দিয়ে আড়ষ্ট কৃত্রিম ব্যাপার করে তোলা। রবিবাসর হবে স্রেফ্ আড্ডা। পরস্পরে দেখাশুনো, গল্পগুজব, চা, তামাক চুরুটের ধোঁয়ায় রাজা-উজীর মারা। তারই মধ্যে যে যা লিখেছে বা লিখচে তাই নিয়ে পরস্পরে আলোচনা। চলতি-সাহিত্য মাসে মাসে বাজারে যা

নতুন উঠছে—তাদের নিয়ে মত বিনিময়। এছাড়া অন্য কিছু ঠিক নয়। জলধর সেন বললেন—কিন্তু সাহিত্যসংস্থায় মহিলা সাহিত্যিকরা বাদ পড়লে অসম্পূর্ণ হবে না কি? আমিও বিতর্কে যোগ দিয়েছিলুম। উপস্থিত সকলেই মহিলা সদস্য নেওয়ার স্বপক্ষে একমত—একমাত্র শরৎচন্দ্রই অটল বিরোধী। তর্ক বেশ উত্তেজনায় পৌঁছে গেল—শরৎচন্দ্র বললেন —বেশ, রবিবাসরে মহিলা সদস্য নেওয়া হবে কি হবে না, এটা কবির উপরে বিচারের ভার দেওয়া হোক। তিনি যদি বলেন 'রবিবাসরে' মেয়েসদস্য নেওয়া হোক,—তাহলে তাই হবে। কিন্তু আমি বলচি,—তিনি কখনই মেয়েসদস্য নেওয়ার সম্মতি দেবেন না।

আমরা উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলুম—তিনি কখনোই অমত করতে পারেননা। করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

শরৎচন্দ্র হেসে বলেছিলেন—আচ্ছা, দেখা যাবে। ঐ কথাই তাহলে রইল।

জলধরবাবু বলেছিলেন—কবি বোলপুর থেকে কলকাতায় এলে আমি একদিন জোড়াসাঁকোয় গিয়ে তাঁকে জানিয়ে, তাঁর মত জেনে আসব।

এর বোধ হয় মাসখানেক বাদে গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এসেছেন। তাঁর নতুন লেখা বই পড়া হবে, খবর পাঠিয়েছেন।

তাঁর পাঠ শোনার সময়ে অনেক লোকের ভিড় থাকে। কাছে গিয়ে বসা, কথা শোনা বা বলার সুযোগ থাকেনা। তাঁর কাছে যাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় ছিল ভোরের বেলা। সদ্য সূর্যোদয়ের পরেই গিয়ে পৌঁছলে বেশ কিছুক্ষণ বসা যেত। যদিও সেই সময়েও আমাদের মত আরও অনেকে আসতেন। কবির মন মেজাজ ঐ সময়টিতে বেশ তাজা থাকত। আমি চেষ্টা করেও সেদিন বেশি সকাল-সকাল পৌঁছতে পারিনি। প্রায় আটটা বেজে গিয়েছিল। বিচিত্রা বাড়ির কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি—চেয়ে দেখলুম, সিঁড়ির ঠিক সামনের ছোট ঘরটির ভারী পর্দা ঠেলে শরৎদা বেরিয়ে আসছেন, তাঁর পিছনে বেরুলেন তুলসী গোঁসাই মশায়।

আমি তো অবাক! কালও রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত শরৎদা আমাদের বাড়ি আড্ডা জমিয়েছেন; কৈ? এখানে আজ আসবেন, কিছুই তো বলেননি! শরৎচন্দ্র দরজার বাইরে নিচু হয়ে জুতো পরতে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে কী যেন ভাবলেন, তারপরে জুতো না পরে আবার চট করে পর্দা ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। তুলসীবাবু বেশ একটু অবাক হয়ে গেলেন মনে হল।

আমি উপরে উঠে বাঁ-হাতি বিচিত্রা ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, বেশ কয়েকজন মহিলা, অধিকাংশই আমার পরিচিত, কেউ কেউ মুখচেনা—কবির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। আমি সেখানে গিয়ে তখন না বসে দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রইলুম শরৎচন্দ্র বেরিয়ে যদি কিছু কথা বলেন। অল্প সময় পরেই শরৎচন্দ্র আবার পর্দা ঠেলে বেরিয়ে বাইরে এলেন। চেয়ে দেখি সারা মুখ চাপা হাসিতে যেন ফেটে পড়ছে।

তুলসী গোঁসাই একটু বিস্ময়ের সুবে বললেন—কী হল দাদা? আবাব কোন কথা আপনাব মনে পড়ল? ·

শরৎচন্দ্র জবাব দিলেননা, নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন 'না'-সূচক। আমি তাঁব দিকে অবাক হযে তাকিয়ে আছি। তিনি আমাব দিকে চেযে কৌতুক-ঝলমল মুখে ডান হাতেব তর্জনী তুলে ইঙ্গিত কবলেন। যাব ভাষা—'কেমন জব্দ।' কিংবা 'ঠিক হযেছে এবাব!' তাবপবে জুতো পবে তুলসীবাবুব সঙ্গে নিচে নেমে গেলেন। আমি তো হতভম্ব। কিছুই বুঝতে পাবলুমনা। বাবান্দায বেবিযে দেখলুম, তুলসীবাবুব মোটবে তাঁব সঙ্গে শবৎচন্দ্র চলে গেলেন।

আমি বিমূঢ মনে বিচিত্রায গিযে অন্য মেযেদেব কাছে বসলুম। কেদাব চট্টোপাধ্যায মশাযেব পত্নী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায উৎসুক হযে প্রশ্ন কবলেন—শবৎ চাটুজ্যে না? তুমি তো চেন শুনেছি।

অন্য আবও দুই একজন বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যা, শবৎ চট্টোপাধ্যায নিশ্চযই। আমি ওঁকে দেখেছি অনেকবাব।

আমি বললুম—হ্যাঁ, উনিই।

কবি এসে ঘবে ঢুকলেন। আমবা সকলে উঠে তাঁকে প্রণাম কবতে চেয়াব ঘিবে দাঁড়ালুম। প্রসন্ন হাসিতে সকলেব মুখেব দিকে তাকিযে, কাবও কাবও মাথায হাত ছুঁইযে আশিস-স্পর্শ দিলেন—প্রত্যেকেব ব্যক্তিগত কুশল কিংবা অন্য প্রশ্ন কবলেন। আমাব দিকে তাকিযে বলে উঠলেন—এই যে তুমিও এসেচ দেখছি। না বাপু, আমিও শবতেব সঙ্গে একমত। তোমবা ছেলেদেব একটুও জিবোতে দেবে না, সব জাযগায় পাহাবা দিযে হাজিব থাকবে—এ হযনা। ওবা একটু আড্ডায় আলগা হয়ে যা-খুশি কথা কইতে—হো হো—কবতে পাবেনা এ কী কবে হবে? ওটা তো ঠিক সভা-সমিতি নয, আড্ডা। বন্ধু-বান্ধবেব, সাহিত্যিকদেব বিশুদ্ধ আড্ডা। ওখানে ওবা তামাক চুরুট খাবে, খোলাখুলি কথা কইবে, হাসি-তামাশা যেমন খুশি কববে।

আমাব মনে পড়ে গেল ববিবাসবেব কথা। আমি একেবাবেই ভুলে গিযেছিলুম ব্যাপাবটি।

আমি কবিকে জিজ্ঞেস কবলুম—উনি কি ঐ মতামত নিতে এখন আপনাব কাছে এসেছিলেন?

কবি বললেন—না, না। ওকে তুলসী ধবে এনেছিল, ওদেব বাজনীতিব একটা কাজেব দবকাবে। আমি 'পাবব না' বলে দিয়েচি। ওরা ভুলে যায়, আমাব বযস আব শবীবেব কথা।

আমি বুঝতে পাবলুম, শবৎচন্দ্রকে তুলসীবাবুই ধবে এনেছেন। বেরুবার সময় আমাকে সিঁড়িতে দেখতে পেযে শবৎচন্দ্রেব মনে পড়ে গেছে সেই বিতর্কের কথা। মনে পড়া মাত্রই এবাউট টার্ন। তৎক্ষণাৎ কবিব ঘবে দ্বিতীযবাব বিনা খবরেই ঢুকে পড়লেন।

ঘরের ভিতরে শরৎচন্দ্র কি বলেছেন, কবির কাছে জেনে নিতে অসুবিধা হলনা। কবি বললেন—শরৎ বললে, তোমরা দুই মতের দল আমাকে নাকি আম্পায়ার করেচ। আমি তো প্রথমে বলে ফেলেছিলুম—মেয়েসদস্য নিশ্চয়ই নেবে বৈকি। তারাও তো সাহিত্যিক। এতে রবিবাসরের আকর্ষণ আরো বাড়বে।

শরৎ বলে—তাহলে ওটি আলোচনাসভার সিরিয়স মূর্তি ধরবে নাকি? শুনেছিলুম, আপনি নাকি পরামর্শ দিয়েছিলেন—রবিবাসরকে তোমরা সাহিত্যিক-আড্ডা করে গড়ে তোল। কথাটা আমারও ভারি পছন্দ হয়েছিল। মেয়েসদস্য নিয়ে সভা করা যায়, আড্ডা দেওয়া যায়না। তখন নাকি কবি বলেন—হ্যাঁ, এটা ঠিকই বটে। জিভের রাশ ছেড়ে যা খুশী বলা—মেয়েদের সামনে—সম্ভব হবেনা। ওটা তাহলে তোমরা স্বজাতির মধ্যে নির্ব্যূঢ় শর্তে লেখাপড়া করে নাও। ভিন্ জাতের কাউকে ঢুকতে দিওনা;

কবি কৌতুক করে সমস্ত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সেদিন ববিবাসরকে নারীবর্জিত সংস্থা কবার কথা বলাব সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর পরিহাস করেছিলেন। সবগুলি সুস্পষ্ট মনে না থাকায়, আবছা স্মৃতি থেকে কোনও কিছু লিখলুমনা।

আমার উজ্জ্বলভাবে মনে আছে—শবৎচন্দ্রের সেই মামলায় জয়ী হওয়ার উল্লাস-বিকীরিত দৃষ্টি। আনন্দ যেন ফেটে পডছিল চাউনিতে।

আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, কবি কখনও নারীবর্জিত রবিবাসর চাইবেননা। শরৎচন্দ্র যদি তুলসীবাবুব প্রয়োজনে আকস্মিক ওখানে গিয়ে না পড়তেন, কিংবা আমাকে যদি হঠাৎ ওখানে তিনি দেখতে না পেতেন তাহলে হয়ত তাঁর মনেই পড়তনা রবিবাসরের কথা। তিনি নিজে কবিকে ব্যাপারটি খুলে না বোঝালে মামলার ডিক্রিটা আমাদের দিকেই এসে যেত। কবি বলেছিলেন—শিল্পস্রষ্টাদের কিছুটা মানসিক মুক্তির জায়গা না থাকলে সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। কড়া সমাজে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মন আব অভ্যস্ত নীতি নিয়ম কানুনে সর্বদা বন্দীদশায় থাকে সামাজিক মানুষেরা। এরা যদি নিজেদের বন্ধুবান্ধবের কাছেও কিছুক্ষণের জন্য আলগা না হতে পারে, তাহলে রুদ্ধশ্বাস হয়ে জড়ত্বপ্রাপ্ত হবে।

আমার কিন্তু তখন ওসব কথা শুনতে বিশেষ মন ছিলনা। রবিবাসবে প্রবেশের জন্যে বিন্দুমাত্র কিছু এসে যায়নি আমার। আসল ক্ষোভ শরৎদার কাছে হেরে যাওয়ার জন্যে। তাও আবার গুরুদেবের এজলাসে। অপমানে অভিমানে মন তখন অভিভূত।

এসব মিটে যাওয়ার কয়েকমাস বাদে (১৯শে জুলাই, ১৯৩৬) শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে রবিবাসরের বৈঠক বসল। রবীন্দ্রনাথ এলেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে সেই বৈঠকে, শরৎচন্দ্রের এবং রবিবাসরের নিমন্ত্রণে।

সাজ-সাজ রব উঠে গেল। শরৎচন্দ্র এসে আমার হাত দুখানি ধরে বললেন —রাধু, সমস্ত ভার কিন্তু আমি তোদের দুজনের উপরে রাখচি। তোরা গিয়ে কী

করতে হবে না হবে সব ব্যবস্থা করবি।

আনন্দিত উৎসাহে দুজনে মিলে লেগে গেলুম। শরৎদার বৈঠকখানা খালি করে ধোওয়ান মোছান, সাজান হল। শ্বেতপদ্মগুচ্ছ, কদমফুল কেয়াফুল পানিত্রাসের দিকের গ্রাম থেকে ঝুড়ি ভরে এসে গেল। সুগন্ধি ধূপ জুঁইফুলের সুদীর্ঘ মাপের মোটা গোড়ে মালা, রজনীগন্ধারাশি। ফটকের দুই পাশে আর বাড়ির দরজার দুপাশে চিত্রিত মাটির ঘট, সশীর্ষ ডাব, কলাগাছ কিছু বাদ গেল না। বারান্দায়, চৌকাটে আলপনা।

ওদিকে উপরতলায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। প্রায় শতাধিক লোকের খাওয়ার মত আয়োজন হয়েছিল। পোলাও, লুচি, মাছ, মাংস, দই, রাবড়ী, মিষ্টান্ন। ভূরিভোজ। আমরা সকাল থেকেই অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়িতে আছি। সারাদিন পরিশ্রমের পরে বিকেলের দিকে জোড়াসাঁকোয় মোটর পাঠান হল কবিকে আনার জন্যে। সেই গাড়ীতে শরৎচন্দ্রের ভাইঝি মুকুলমালাকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে দেওয়া হল শরৎচন্দ্রের বাড়ির পক্ষ থেকে। সে তখন খুব ছোট ছিল। রবিবাসরের পক্ষ থেকে গাড়িতে কে গিয়েছিলেন, মনে নেই।

জোড়াসাঁকোয় গাড়ি রওনা হওয়ার পরেই আমি অশ্বিনী দত্ত রোড থেকে হিন্দুস্থান পার্কে চলে এলুম। শরৎদা কিছুতেই আসতে দেবেননা। এইখানেই গা ধুয়ে কাপড় বদলে নাও না! আবার বাড়ি যাবে কেন? এখন? এখন তোমার চলে যাওয়া ঠিক হবেনা। আমি বাড়িতে কাপড় বদলানর সুবিধের অজুহাতে পালিয়ে এলুম। উনি বলতে লাগলেন—খুব শিগ্রি ফিরে এসো। কবিকে গাড়ি থেকে নামাবার সময়ে তোমার থাকা চাই। এখানে তো সবই তাঁর অচেনা মুখ,—চেনামুখ দেখলে তাঁর ভাল লাগবে। অচেনা মুখের ভিড়ের ভেতর চেনামুখ দেখতে পেলে আরাম লাগে, আমি জানি। দেরী কোরনা।

আমি তখন মনে মনে হাসছি। আমি জানি, আমি আর ফিরবনা। রবিবাসরে উপস্থিত থাকবনা।

শরৎদার বাড়িতে গুরুদেব আসচেন,—এটি আমার কাছে কতখানি আনন্দের আর আগ্রহের ব্যাপার উল্লেখ করা বাহুল্য। অল্প বয়সের অভিমান উত্তেজনায় শরৎদার উপর প্রতিশোধ নিতেই বোধহয় সেদিন আমি নিজেকে দারুণভাবে বঞ্চিত করেছিলুম। এখন ভাবলে লজ্জা আর আফশোস হয়।

আমার ফিরতে দেরী দেখে তিনি মহা ব্যস্ত হয়ে সবাইকে অস্থির করে তুলেছিলেন বারে বারে হিন্দুস্থান পার্কে লোক পাঠিয়ে। গুরুদেব এসে পৌছে যাওয়ার পরে কালী ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এল—পিসিমা, চলুন। বড়বাবু সবাইকে অস্থির করে তুলছেন, আপনার দেরীর জন্যে। সভা শুরু হয়ে গেছে, আপনাকে এখুনি যেতে বলেছেন বড়বাবু।

আমি সেদিন কী জানি বোধহয় পাষাণ হয়ে গিয়েছিলুম। বলেছিলুম—বলে দিও কালী, পিসিমা বলেচেন—রবিবাসরে মেয়েদের যেতে নেই। তাই তিনি আসতে

পারলেননা। গাড়ি ফিরে গেল।

শরৎদা এলেন রাত প্রায় সাড়ে এগারটার সময়ে আমার স্বামীর সঙ্গে। লোকজনের খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে সবাইকে বিদায় দিতে এগারটা বেজে গেছে। শরৎদা বলেছেন—নরেন, তুমি বাড়ি চলে যেওনা। আমি তোমার সঙ্গে তার কাছে যাব।

আমার স্বামী তাঁর জন্য অপেক্ষা করে এত রাত অবধি বসেছিলেন। গাড়ি থেকে এক ঝুড়ি লুচি পোলাও ইত্যাদি নামিয়ে নিয়ে এল একটি চাকর। শরৎদার সেই রাত্রির বিষাদ-মলিন কাতর মুখটি মনে পড়লে এখনও তীব্র আঘাত অনুভূত হয় মনে। কী করে যে অমন ছেলেমানুষী করেছিলুম—ভাবলে কষ্ট আর লজ্জা হয়। রবিবাসর সংস্থার ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের রেকর্ড দেখলে দেখা যাবে, সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে রবিবাসরে মহিলা সদস্য নেওয়া হবেনা। প্রস্তাবক—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সর্বাধ্যক্ষ—জলধর সেন।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র আকাঙ্ক্ষিত মহিলাবর্জিত 'সাহিত্য-আড্ডা' হয়ে ওঠেনি সংস্থাটি। যথারীতি সাহিত্যসমিতির চেহারা নিয়েছে। কিন্তু আমি ঐ সংস্থায় যোগ দিতে আর কখনও পারিনি।

৪

শরৎচন্দ্রের জীবনকালে বালবিধবারা বাঙালী সমাজের একটি বিরাট অবহেলিত অংশ ছিল। অত্যাচারিতও বটে। তারা সমাজব্যবস্থায় শোষিত হত, শাসিত হত, তা থেকে বাঁচার কোনও সুযোগ পেত না।

আমার মনে হয়,—আমার প্রতি শরৎদার মমতার একটি বড় কারণ, আমার তের বৎসর আট মাস বয়সে বৈধব্য। হয়ত বা প্রধান কারণ সেটাই।

আমাদের কাছে একটি বিস্ময়, শরৎদা তাঁর বইতে বিধবাবিবাহ কোথাও দিতে পারেননি, বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আগে বিষবৃক্ষে যা দিতে পেরেছিলেন। বইতে বিধবাবিবাহ না দিলেও, তাঁর গ্রামের বাড়িতে 'দুর্গা' নামে একটি বালবিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহিত অবস্থায় আমি দেখেছি স্বামীসহ শরৎদারই বাড়িতে আশ্রিতা রয়েছে। শরৎচন্দ্রই উদ্যোগী হয়ে মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের বিবাহেও শরৎদার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ওঁর কাছে উৎসাহ আর সাহস না পেলে আমি কোনও দিনই হয়ত মনঃস্থির করতে পারতুম না। আমাদের বিয়েতে অনেকটাই তাই শরৎদার কৃতিত্ব ছিল বলতে পারি। কৃতিত্ব ছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও। ঐ সম্পর্কে এঁদের দুজনের লেখা চিঠিপত্রও রয়েছে। এঁদের দুজনের কাছ থেকে উৎসাহ সহানুভূতি আর সাহস আমার মনে জোর জুগিয়েছিল।

হিন্দুসমাজের প্রচলিত মানসিক সংস্কারের বিরুদ্ধতা করে এরকম জীবনের

মোড় ফেরান আমার মত সাবেকী বাড়ির শুদ্ধতাবাদী মেয়ের পক্ষে তখন প্রায় অসাধ্য কর্ম ছিল বললে ভুল বলা হবে না। আমার জীবনের মহৎ ঋণ মানুষ-রবীন্দ্রনাথ ও মানুষ-শরৎচন্দ্রের কাছে আমি আমরণ বহন করে যাবো।

আমাদের বিয়ে শরৎচন্দ্রের মনে পরম তৃপ্তি দিয়েছিল আমি জানি। তখনকার সকলেই এটি লক্ষ্য করেছিলেন। যেন তাঁর নিজের মেয়ের জীবনের নিরুপায় নিষ্ফলতা দূর করে তিনি তাকে সাফল্যে উত্তীর্ণ করেছেন, এমনিই একটি বিজয়ীসুলভ ভাব তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যেত।

এ-সম্পর্কে তাঁর একখানি চিঠি এখানে পুরোপুরি সবটাই উদ্ধৃত করছি। শ্রীমান গোপালচন্দ্র রায় কোনও সূত্রে খবর পেয়ে এই চিঠিখানি নেওয়ার জন্য অনেক আনাগোনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত শরৎদার এই চিঠিখানি তাঁর বইতে না দিয়ে পারিনি।

তিনি আমাদের বাড়িতে বসে চিঠিখানি কপি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ-চিঠি যে অন্যের মারফতে প্রকাশ করতে কেন অনিচ্ছুক ছিলুম, এখন হয়ত তিনি বুঝে এই চিঠি দিতে না-চাওয়ার অপরাধ আমাব মার্জনা করতে পারবেন।

সামতাবেড়,
পানিত্রাস পোস্ট
হাওড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

স্নেহের রাধু, তোমার কাছ থেকে ফিরে এসে অবধি মনটা অত্যন্ত বিমনা হয়ে আছে। কোনও কাজেই যেন মন দিতে পারছিনে। জলধরদা লেখার তাগিদ দিয়ে পাঠিয়েচেন, নিজেরও কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী কাজের দরকার রয়েছে, কিন্তু কিছুই হচ্চে না। কলকের পর কলকে পালটে গুড়গুড়ি টেনে চলেছি আর ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে ক'দিন ধরে তোমাদের কথাই ভাবচি।

মনে হোলো, তোমাকে একখানা চিঠি লেখা দরকার। জানোই তো, কেমন কুঁড়ে মানুষ আমি, চিঠি লেখা আমার বাঘ! তবু, উদ্যোগী হয়ে কাগজ কলম নিয়ে বসেচি এই মনে করে,—তোমাকে কতগুলো কথা যদি ভালো করে বোঝাতে পারি, তা হলে আমার কি হবে ঠিক জানি না রাধু, তবে তোমার যে এতে সত্যিকারের কল্যাণ হবে এটুকু নিশ্চিত বলতে পারি। আমার যে খুব তৃপ্তি হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কথাটা হচ্চে এই তোমরা মেয়েরা,—অন্যের মন অর্থাৎ পুরুষ মানুষের মন যতখানি আশ্চর্য রকম বুঝতে পারো, ঠিক ততখানিই আশ্চর্য রকম বুঝতে পার না নিজেদের মনটি। এ তথ্যটি আমার এতই নিঃসন্দেহরূপে জানা যে এটি তুমি (বড়দার কাছে) প্রমাণিত সত্য বলেই গণ্য করে নিতে পার।

রাধু, আমার সবচেয়ে বড়ো ভয়, বেশির ভাগ গভীর প্রকৃতির ভালো মেয়েদের মতন তুমিও না নিজের কাছে আত্ম অস্বীকার করে আত্মপ্রতারণা করে বোসো। এই আত্ম-অস্বীকৃতির মত আত্মহত্যা আর নেই।

আমার একটা কথা মনে রেখো বোন, সত্যিকারের ভালবাসা সব মানুষের জীবনে আসে না। এ দুর্লভের আবির্ভাব যাদের জীবনে ঘটে, তারা যদি একে ঠিক চিনতে পারে, তবেই এর সার্থকতা। অতি-দুর্লভ হীরেও অজ্ঞ লোকে কাঁচ বলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এ তো জানো। তবে একথাও বলতে পারো, সংসারে নব্বুই ভাগ মানুষই কাঁচ কুড়িয়ে নিয়ে তার ঝকমকানিতে খুসি হয়ে গলায় গেঁথে পরে গর্বিত হয়ে বেড়ায়। যা নিয়ে তারা গর্ববোধ করে, আসলে তা তুচ্ছ কাচ খণ্ড মাত্র। দেখতে অবশ্য হীরেরই মতন।

তুমি হয়তো বলবে—পাকা জহুরী না হোলে হীরে চেনা তো সহজ নয় বড়দা।

ঠিক কথা দিদি! আমি তোমাকে বলি শোনো, হীরে আর কাচ পরখ কবার সহজ উপায় তো রয়েছে। জোরে আছড়ে ফেললেই কাচ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, হীরে কখনও টসকায় না। হীরে দিয়ে কাচ কাটা যায়, কাচ দিয়ে হীরে কাটা যায় না।

সত্যিকারের ভালবাসার পরখ্ হোলো ত্যাগের প্রবৃত্তিতে। যে-ভালবাসায় যতো বেশি কল্যাণবুদ্ধি, যতো আত্ম উৎসর্গের প্রবৃত্তি, ত্যাগের প্রবৃত্তি আপনা হতেই গভীরতর আর দৃঢ়তর হতে থাকে, সেই ভালবাসাই জেনো খাঁটি জাতের।

দুনিয়ার সব জিনিসেরই আসল নকলের যাচাই আছে যখন, ভালবাসারও যাচাই আছে। অকৃত্রিম ভালবাসা পাত্রের দোষ-গুণ-নিরপেক্ষ হয়। সে তার প্রিয় ব্যক্তির সমস্ত কিছুই সুন্দর দেখে, আশ্চর্য দেখে, মহৎ এবং মাধুর্যময় দেখে। এই দেখার দৃষ্টি এক আশ্চর্য দৃষ্টি।

রবিবাবু যে লিখেছিলেন—আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—এর থেকে পরম সত্য আর কিছু নেই।

ভালবাসা যখন হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তখন সে চায় আধার বা আশ্রয়। এই আধার সর্বক্ষেত্রেই যে উপযুক্ত অথবা সুন্দর হয়, তা নয়। ভালবাসা আপনিই আপন হৃদয়রসে রচনা করে নেয় তার পাত্রকে। ভালবাসার প্রতিমা রচনায় পাত্রটি খড়-বাঁশ-দড়ি মাত্র। যার উপরে চড়বে মাটি, চড়বে রঙ, চলবে তুলি, মাখানো হবে ঘাম-তেল, পরানো হবে কেশ-বেশ অলঙ্কার। এর অনেকটাই তো নিজেরই হাতে।

বড়ো ভালবাসা স্বভাবতই নিঃস্বার্থ। এ কেবল উপলব্ধির সামগ্রী রাধু। হৃদয়ের মহৎ বৃত্তিগুলির সাহায্যে, উপলব্ধির দ্বারাই স্পর্শ করা যায় একে। বুদ্ধি, বিচার, জ্ঞান, তর্ক, যুক্তি দিয়ে নয়, এই আমার নিজস্ব ধারণা।

একটা অত্যন্ত সত্যি কথা তোমায় চুপি চুপি বলি শোনো। সংসারে এমন ভালবাসাও আছে রাধু, যে, সমস্ত জীবন যাকে ভালবেসেছে, তার কাছ থেকে

বহু যোজন দূরে বহু তফাতেই থাকতে চেয়েছে। তার ভালবাসাই তাকে এই দূরে সরে থাকার প্রবৃত্তি দিয়েছে।

কাছাকাছি থাকা, চোখে দেখার আকাঙ্ক্ষা,—ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেই ব্যাকুল ও তীব্র প্রবৃত্তিকেও সংবরণ করার শক্তি জোগায়—খাঁটি ভালবাসাই। সত্যকার ভালবাসা, তার পাত্র বা পাত্রীকে সুস্থ এবং সুখী দেখতে চায়, তাকে সার্থক এবং গ্লানিহীন দেখতে চায়। আত্ম পরিতৃপ্তি তার ঐখানেই।

কোনো মিলন যদি ভালবাসার পাত্রকে অগৌরবের মধ্যে নতশির করে আনে, তার জীবনের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে আনে, লজ্জা দুঃখ বা অনুতাপ অনুশোচনা উন্মেষের সামান্যতমও ছিদ্র রেখে দেয় তার জীবনে,—সে মিলন কখনই কল্যাণকর হোতে পারে না, সুতরাং—বাঞ্ছনীয়ও নয়।

আবার এও সত্য, বলিষ্ঠতার অভাবে, প্রেমের প্রতি স্থির বিশ্বাসের অভাবে, আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে মিলনকে জীবনে বরণ করে নিতে যারা ভয় পায়, সেই ভীরুদেরও প্রেমের দুর্গতি সমানই ঘটে।

সত্যকার গভীর ভালবাসা—কল্যাণ বুদ্ধির আলোয় কোথাও সার্থক হয়ে ওঠে চিরবিচ্ছেদের মধ্যে, কোথাও সার্থক হয়ে ওঠে চিব মিলনের মধ্যে। যে-ক্ষেত্রে বিচ্ছেদেই আসে প্রেমের কল্যাণ—সেখানে সংযমের অভাবে মিলন এনে ফেললে সর্বনাশ। আবার যেখানে মিলনেই আছে প্রেমের কল্যাণ, সেখানে বলিষ্ঠতার অভাবে বিচ্ছেদ রচনা করলেও ঠিক তেমনিই সর্বনাশ ঘটে।

গভীর ভালবাসায় সকলের চেয়ে প্রয়োজন মনের বলিষ্ঠতার। মিলনে এবং বিচ্ছেদে উভয়েই কঠিন সংযম এবং দৃঢ় বলিষ্ঠতার প্রয়োজন। বেছে নিতে হয় প্রেমে, কাকে তুলে নিতে হবে মিলন, কাকে নিতে হবে বিচ্ছেদ। এরই মধ্যে প্রেমের আসল পরীক্ষা। আত্মদানেই শুধু প্রেমের সার্থকতা নয় ভাই, আত্মসংবরণেও।

আজ সন্ধ্যা বেলায় তোমাকে চিঠি লিখতে বসে এই পর্যন্ত লিখে উঠে যেতে হয়েছিল। এখন রাত্রি সাড়ে দশটা। চিঠিখানা শেষ করে খামে পুরে ঠিকানা লিখে রেখে তার পরে ঘুমুতে যাবো। সংক্ষেপে কথাটা এইবার শেষ করি।

আজ তোমার জীবনে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত করেছেন তোমার 'জীবন দেবতা'। যে 'জীবন-দেবতা'র পানে তাকিয়ে তুমি ওঠো, বসো, ঘুমোও, জাগো। যাকে সামনে দাঁড় করিয়ে তুমি সবাইকেই ধমক দাও। সেই তোমার 'জীবন দেবতা' তোমাকে সত্যপথ দেখিয়ে দিন—এই তোমার হিতার্থী বড়দার উদ্বিগ্ন হৃদয়ের আশীর্বাদ।

আমি তো তোমাকে সেদিনই বলেছি রাধু, আমার প্রথম জীবনে যদি এই স্বর্গীয় আশীর্বাদ না নামত আজকের এই 'আমি'র অস্তিত্বই সম্ভব হোতো না।

আমার সাহিত্যে তোমরা যা পেয়েছ, তা যদি আমি নিজের জীবনে না পেতুম ভাই, এ সাহিত্য সম্ভব হোতো কি? সুতরাং—আমি তোমাকে পথনির্দেশের অনধিকারী নই, বিশ্বাস করতে পারো। রাগ কোরো না। সেদিন তুমি রাগ করেছিলে বলেই

এত কথা লিখলুম। তোমার বুড়ো বড়দার জীবনটা একেবারেই ফাঁকিতে গড়া নয় রে ভাই! কখনও যদি সম্ভব হয়, তোমাকে বলবো একটি কাহিনী। শুনতে গল্প উপন্যাসের মতই অবাস্তব লাগবে, কিন্তু তার চেয়ে বাস্তব সত্যি আমার জীবনে আর কিছুই ঘটেনি।

আমার আশীর্বাদ জেনো। মনস্থির করে ফেল। আগামী সপ্তাহে কলকাতায় যাচ্চি। দেখা হবে। আশীর্বাদক—বড়দা।

এ চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলো, আমার অনুরোধ।

৫

আমাদের নতুন সংসার রচনায় তাঁর উৎসাহ আগ্রহের সীমা ছিল না।

বাঃ, পর্দাগুলো তো চমৎকার কিনেছিস তোরা? রাস্তা থেকে দেখতে ভারি সুন্দর লাগছিল। কে পছন্দ করল? তুই না নরেন? ওঃ, বুঝেচি, দুজনে মিলে কিনতে গিয়েছিলে নিশ্চয়। কত দাম পড়ল রে?

ও—রাধু, তোদের জন্যে কয়েকটা টোকা, কয়েকটা চুবড়ি আর একটা কুলো রাসের মেলা থেকে কিনে আনলুম।—কেমন? পছন্দ হয়?

ও বড়দা, এতগুলো টোকা কী হবে?

—আরে, ও যে ভারী জরুরী জিনিস। আমি লক্ষ্য করেচি তোদের রান্নাঘর অনেক দূরে—বাগানের কোণে। বৃষ্টির দিনে গুণনিধি দুহাতে খাবারের বাসন ধরে রান্নাঘর থেকে আনাগোনা করতে জলে ভিজে যায়। ছাতা ধরার উপায় থাকে না। ওর জন্যে এই বড় টোকাটা নিলুম। তোদের মালীর জন্যেও এইটে এনেচি। আর এই দ্যাখ, এই ছোট্ট টোকাটি তোর জন্যে। এটি টুপির মতন মাথায় চড়িয়ে বাগানে বেরুতে পারবি।

—ও বড়দা, এত্ত বড় কুলো কী হবে?

স্বামী এতক্ষণ হাসিমুখে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাদা আর বোনের কথাবার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন—ঐটে করে বেশ বাতাস দিতে পারবে আমার বন্ধুবান্ধবদের।

বড়দা স্প্রিংএর মতন লাফিয়ে উঠলেন।—কী-ই—কী বল্লে? এমন অলুক্ষণে কথা! ছি-ছি। —দেখে নিও নরেন, তোমার ঘরে আমি লক্ষ্মী তুলে দিয়ে গেলাম। তোমার বন্ধুবান্ধবদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এখন।...রাধু, তুই ওর ঐসব অপয়া কথায় কান দিসনে। দ্যাখ্ তো চুবড়িগুলো, কুনকে দুটো কেমন হয়েচে।

সবুজ আর লাল রঙের নকশা-তোলা বাঁশের চেঁচাড়ির চুবড়ি নানা সাইজের। গোটা দুই ছোট সাইজের বেতের ধামা আর দুটো কুনকে। জিনিসগুলো সত্যিই সুন্দর। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠব স্বাভাবিক।

আমার উল্লাস তিনি পরিতৃপ্ত হাসিতে গ্রহণ করে গুণনিধির হাত থেকে গড়গড়া নিয়ে বাগানে বাঁধান বেদীতে গিয়ে বসলেন।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি ঠিক জানি, রাধু এগুলো পেলে আহ্লাদে আটখানা হবে। মেয়েরা দেখেচি ঘরকরনার সামগ্রী পেলে বেজায় খুশি হয়। ছোট্ট ছেলেরা দেখবে ব্যাটবল, মার্বেল, তীরধনুক পেলে খুশী,—কিন্তু ছোট মেয়েরা হাঁড়িকুঁড়ি বেনেপুতুল পেলে ভারী খুশী।

আমার স্বামী সেদিন বলেছিলেন—আর ধেড়েছেলেরা কী পেলে খুশী হয়, বললেন না তো শরৎদা।

শরৎচন্দ্র অল্পক্ষণ আমার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তিত সুরে বলেছিলেন—শক্ত প্রশ্ন করেচ। ধেড়েছেলেরা কী পেলে খুশী হয়, কেউ জানে না। তারা নিজেরাও জানে না। আমি কী করে জানব বল?

শরৎচন্দ্র লঘু কৌতুকের হালকা মেজাজেই বেশী সময় থাকতেন। কিন্তু এক এক সময়ে হঠাৎ সিরিয়স মেজাজ এসে যেত। সমস্ত ব্যক্তিত্বটাই তখন যেত পালটে। সিরিয়স শরৎদার কাছে আমাদেব আড়ষ্টতা এসে যেত মনে। অবাধে খুশিমতন কথা কইতে বাধত।

একবার পাঁচসেরী ঘিয়ের ঢাকনা-আঁটা কৌটোয় তিন টিন চিঁড়ে, মুড়ি আর খৈয়ের মোওয়া নিয়ে এসে হাজির হলেন লিলুয়ার 'দেবালয়' বাগানে। এই বাড়িটি আমার শ্বশুর-পরিবারের সম্পত্তি ছিল তখন। এখানেই আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

শরৎদা এসেই বললেন,—দ্যাখ রাধু, সেদিন চার ঘণ্টা তোর এখানে বসে বসে দেখলুম, প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন আসে, আর প্রতি ট্রেনেই কলকাতা থেকে কেউ না-কেউ তোদের 'দেবালয়ে' হাজির হচ্চে। আমি তোকে সংসার করা শিখিয়ে দিচ্চি। অর্ডার দিয়ে কর্পূর এলাচ দেওয়া মোওয়া করিয়ে এনেচি। ভাঁড়ারে তুলে রেখে দে। ভেবে দেখলুম, অতিথি-সমাগমের জন্যে খরচও তো তোদের বেশ হচ্চে। একটা ব্যবস্থা করা দরকার। যে যখন আসবে, দুরকম মোওযা সাজিয়ে চায়ের সঙ্গে দিলে বেশ হবে। বাগানে কলাগাছের ঝাড়ে কয়েকটা কাঁদি পড়েছে দেখেচি। কলার কাঁদি কাটিয়ে ভাঁড়ার ঘরে দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে রাখবি। সবাইকে মোওয়ার সঙ্গে কলাও দিতে পারিস। হরদম্ ময়রার দোকান থেকে সামাজিকতা করতে গেলে ফতুর হয়ে যায় গেরস্থ মানুষে।

আমার চোখ ভিজে উঠেছে তখন। বুকের মধ্যে অব্যক্ত বেদনাভরা আনন্দের চাপ। একলার সংসার, দেখিয়ে শুনিয়ে দেবার কেউ ছিল না আমাদের। সাংসারিক অভিজ্ঞতায় দুজনের তখন শূন্য-নম্বর।

—মোওয়া ফুরিয়ে গেলে চিঠি লিখে আমাকে জানাবি একটু আগে থেকেই। লজ্জা করবিনা কিন্তু। আমি আবার পাঠিয়ে দেব কাউকে দিয়ে—কিংবা, নিজেই নিয়ে আসব।

আমি গভীর সত্য উচ্চারণে স্বীকার করে যাব, আমাদের বিবাহিত জীবনে শরৎচন্দ্রের দান অনেকখানি। মনের সাহসই শুধু জোগাননি, বিয়েব পরেও পক্ষপুট দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন অনেক দিন অনভিজ্ঞ দুটি মানুষকে, দুজন ব্যক্তি—শরৎচন্দ্র আব জলধর সেন। সর্বজনপ্রিয় জলধর সেন বাংলা সাহিত্যে তখন সবচেয়ে বেশি সুপরিচিত নাম। তিনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার দপ্তর থেকে উঠে সোজা হাওড়া স্টেশনে সাড়ে তিনটের ট্রেন ধরতেন লিলুযার। আমার স্বামী কলকাতা থেকে না-ফেরা পর্যন্ত তিনি জলযোগ করতেন না, এক কাপ চা খেয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন। তিনি বাড়ি ফিরলে দুজনে একসঙ্গে জলযোগে বসতেন। এটি আমাদের দৈনন্দিন নিয়ম ছিল।

শরৎচন্দ্র আশ্চর্য মানুষ। একদিকে সামাজিক নিয়ম, রীতি, নীতি কিছুই মানেননি কোনও দিন। যার জন্য বাবে বারে বিভিন্ন জায়গায, বাংলাদেশে, বিহারেও, অপাঙক্তেয় হয়ে তাঁকে শাস্তি পেতে হযেছে। সেই সামাজিক বন্ধনছেঁড়া বোহেমিয়ান মানুষটি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে হৃদয়েব গ্রন্থনা করেছেন অন্যের জন্য ঘর বাঁধার আগ্রহে।

আমাদের নতুন সংসাব হযেছিল যেন তাঁব আনন্দের খেলাঘর। তাঁর মধ্যে একদিকে উড়নচণ্ডে অসংসারী মন, অন্যদিকে ছিল লক্ষ্মীশ্রীর তৃষ্ণা।

আমার প্রতি শরৎচন্দ্রেব স্নেহ ছিল অনেকটা যেন মায়ের মমতার মতই। অতি কোমল, দ্রবীভূত,—একটু যেন অন্ধও। আমার খুব অবাক লাগত। ঠিক এই ধরনের পুরুষমানুষ এব আগে আমি দেখিনি। পরেও আর দেখিনি। প্রথম প্রথম কেমন যেন আড়ষ্ট বোধ হত। আমার স্বামী বলতেন—শরৎদা বড় স্নেহপিপাসু মানুষ। স্নেহ করবার, ভালবাসবার অবলম্বন খুঁজে বেড়ান। ওঁর হৃদযটা মাতৃহৃদয়। তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে ওঁর খুব উদ্বেগ। আমাকে যে কতরকম উপদেশ দেন তোমার সম্বন্ধে, তাব শেষ নেই। অন্তত সাত আটটি টোটকা ওষুধের খবর লিখে দিয়েছেন তোমার হাঁপানির জন্যে। শরৎদার প্রতি আমার আড়ষ্টতা লক্ষ করে তিনি উদ্বিগ্ন হতেন, পাছে শরৎদার মনে কোনও আঘাত লাগে আমাদের থেকে।

তখন প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই হাওড়া থেকে লিলুয়ায় আর লিলুয়া থেকে হাওড়ায় যাতায়াত সহজ ছিল। প্রত্যেক ট্রেন লিলুয়ায় থামত। ডাউন মেল ট্রেনগুলির লিলুয়াতে টিকিট চেকিং হত। থার্ড ক্লাসের ভাড়া চার পয়সা, ইণ্টার ক্লাসের ছয় পয়সা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ট্রেনের সুবিধা আর স্টেশন থেকে বাড়ি আসতে দুমিনিটও লাগে না —এইজন্যে শরৎদা দারুণ খুশী ছিলেন। বলতেন—তোমরা স্বর্গরাজ্যে আছ বাপু। আমার ভাগ্যে যা ঘটেছে, গ্রীক পুরাণে শাপগ্রস্তদেরও এত শাস্তিভোগ করতে হয়নি। একেই তো বাড়ি স্টেশন থেকে ক্রোশখানেক দূরে,—তাও কি মানুয-হাঁটা পথ আছে? পথ নেই। চষা জমি, ধানখেত। বর্ষাকালে আল দিয়ে সাপের ভয়ে মনসা-মনসা জপ করতে করতে হাঁটে ওদেশের মানুষ। শহুরে মানুষেরা একদিন সেই পথ পাড়ি দিয়েই নাকে খৎ দিয়ে পালিয়ে আসে।

লোকজন ভালবাসতেন শরৎদা। সবাইকেই বলতেন—সামতাবেড়ে যেও। আগে কিন্তু একটা পোস্টকার্ড লিখে ডাকে ফেলে দিও, স্টেশনে পাল্কী পাঠাব, নইলে কষ্ট হবে।

আমি বরাবর পাল্কীতে গেছি। তিনি পাল্কী পাঠাতেন। আমার স্বামী পাল্কীতে চড়তেন না, তিনি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন। আমি কখনও সখনও হেঁটে যাওয়ার আগ্রহ করলে শরৎদা রেগে যেতেন। সম্মতি দিতেননা।

আমার স্বামী বলতেন—শরৎদা, আপনি 'দেবালয়ে'র এত গুণ ব্যাখ্যা করছেন, আর একটা বাড়তি সুবিধে তো ধরলেননা। কলকাতা সুদ্ধু সমস্ত মানুষের চট করে আউটিং-এর একটা সুব্যবস্থা করে ফেলেছি আমরা। অতিথি সৎকারের বিপুল পুণ্য অর্জন করছি, সেটা তো ধরা হয়নি।

শরৎদা হো হো করে হেসে উঠেছেন।—হ্যাঁ, তা যা বলেছ। এমন কারুর সঙ্গেই এখন কলকাতায় দেখা হয়না, যে না বলে—অমুক রবিবারে লিলুয়ায় গিয়েছিলুম। এক কাজ কোর তোমরা। রবিবার এলেই ভোরেই ট্রেনে তোমরাও আউটিং-এ বেরিয়ে পোড় দুজনে।

আমাদের অতিথিসৎকারের সুবিধের জন্যে শুধু রকমারি মোওয়াই নয়, একবার তিনি কয়েকখানি মিহিবুনট্ খেজুর পাতার চ্যাটাই এনে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন —বাগানে চবুতারায় বিছিয়ে বসতে বেশ সুবিধে হবে। সহজে নষ্ট হবেনা।

রূপনারায়ণের তাজা তপসে মাছ পাঠাতেন লিলুয়ায়। কলকাতাতেও বরাবর পাঠিয়েছেন।

৬

আজকাল 'হাইজ্যাকিং' বলে একটা কথা চালু হয়েছে। শরৎচন্দ্রকে একবার সাহিত্যিকরা 'হাইজ্যাক' করেছিলেন। তিনটে বড় বড় ইলিশমাছ সমেত হাওড়া স্টেশন থেকে তাঁকে 'হরণ' করে 'দেবালয়ে' এনে ফেলেছিলেন ভারতীগ্রুপ। শিশির ভাদুড়ি মশায়ও সেদিন ছিলেন সেই দলের সঙ্গে। হেমেন্দ্রকুমার রায় সেদিন ট্রেনে বসে মুখে মুখে ফেরিওয়ালাদের সুরে একটা গানই বানিয়ে ফেলেছিলেন।

—বাবু, পাঁচ মিনিটের ট্রেন জার্নি—
টিকিট এক আনা—
দেব-দেবী দর্শন মিলেগা—
ইলিশ মুর্গী খানা—

গল্পটা বলি। সেদিন রবিবার। বেলা তখন প্রায় তিনটে বাজে। আমাদের কাছে যথারীতি সকালের দিকে কিছু বন্ধুবান্ধব এসে এক দফা আড্ডা দিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। আমরাও স্নানাহার শেষ করে সাড়ে তিনটে নাগাদ কলকাতায় রওনা হব বলে বারান্দায় বসে আছি। কলকাতার আপ ট্রেন এসে স্টেশনে থামল। বারান্দা

থেকে প্ল্যাটফর্ম স্পষ্ট দেখা যায়। আমরা অভ্যাসমত ট্রেনের দিকে নজর ফেলেছি। দেখি, ট্রেন থেকে একে একে নামছেন শিশির ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, চারু রায়, মায়া রায়, গিরিজাকুমার বসু, তমাললতা বসু এবং আরও দুটি অচেনা অল্পবয়সী কলেজছাত্রমার্কা ছেলে।

স্বামী তো ওঁদের দেখে মহা খুশী,—উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত গলায় বললেন—আরে, ভাগ্যিস আমরা এখনও বেরিয়ে পড়িনি! ওরা যে সব্বাই মিলে দল বেঁধে আসচে — আমি বললুম—গুণনিধি কোথায়? শীগগির দুটো উনুনে আগুন দিক। বেলা যে অনেক হয়ে গেছে।

স্বামী বাগানে নেমে পড়ে তাড়াতাড়ি গেটের দিকে যেতে যেতে বললেন —এত বেলায় কি আর না-খেয়েদেয়ে এতগুলো মানুষ বেরিয়েছে?

হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর সদ্যপ্রসূত 'বাবু, পাঁচ মিনিটের ট্রেন জার্নি' গানটি ট্রেনের কামরার ফেরিওয়ালাদের সুরে গলা খুলে গাইতে গাইতে আসছেন, সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন চারু আর মায়া। মস্ত মস্ত তিনটে ইলিশ মাছ চারু, মায়া আর প্রেমাঙ্কুরের হাতে দুলছে। শিশিরবাবু উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে গেটে ঢুকছেন—

বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এককোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা—

শিশিরবাবুর পাশে শরৎদার প্রসন্ন মুখে উজ্জ্বল পরিতৃপ্তির হাসি।

ব্যাপারটি এই। ভারতী-গ্রুপের ওঁরা সবাই আজ দশটার সময়ে শিশিরবাবুর থিয়েটারের আড্ডায় গিয়েছিলেন। গিরিজাকুমার ও তমাললতাও ঐ দলে আটকে গেছলেন। ওঁরা তমালবৌদিকে সুদ্ধু নিয়ে থিয়েটারে গিয়েছিলেন। বেলা দেড়টা বেজে গেলে তমালবৌদি চুপি চুপি ওঁদের তাড়া দিচ্ছিলেন ওঠার জন্যে। হেমেন্দ্রকুমার বিদ্রোহের সুরে বলেন—রবিবারে এত শীগগির বাড়ি ফিরলে তাজা মুড্ নুন হয়ে গলে যাবে। আমি বাগবাজারে যাব না, লিলুয়ায় যাব।

ব্যস্। সব্বাই হৈ হৈ করে উঠলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভাল।

চারুবাবু বলেছেন—ওখানে মুর্গী দারুণ শস্তা। স্টেশনের পাশে জমীর মিঞার বাড়ি থেকে কয়েকটা মুর্গী কিনে নিয়ে দেবালয়ে বলি দিয়ে প্রসাদ পাওয়া যাবে। তারপরেই তিনি বলেছেন—কিন্তু গুণনিধি যদি বাড়ি না থাকে, পুজোপাঠের ব্যবস্থা করবে কে? কুছ্ পরোয়া নেই, আমিই আজ গোয়ানিজ-বাবুর্চির পার্টটা দেখিয়ে দেব। এই সময়ে চারু রায়ের ফোন এসে পড়ল। চারুর বাড়িতে চারুর জন্যে কে এক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বসে আছেন। বলছেন, জরুরী কাজ আছে। চারুবাবু মায়াকে বলে দিলেন—বলে দাও, আমরা লিলুয়ায় চলে গেছি। রাত্তিরে

বাড়ি ফিরব। কিন্তু তুমি এক্ষুনি হাওড়া স্টেশনে রওনা হও, এই মুহূর্তেই। সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের পাবে। তোমাকে গিয়ে মুরগী-মুসল্লেম রাঁধতে হবে।

বলা মাত্রই মায়া ট্রামে চেপে হাওড়া স্টেশনে রওনা। সেকালে একা একা একটি মেয়ের পক্ষে দূরে যাতায়াত, তাও ট্রামযোগে, মোটে সহজ ছিলনা। তখন পুরো হাওড়া ব্রীজটি পায়ে হেঁটে পার হতে হত। বাস তখনও কলকাতায় হয়নি। মায়া রায়ের মত স্মার্ট মেয়ে সে-যুগে অল্পই দেখা যেত। যেমনি হাসিখুশী প্রফুল্ল স্বভাব, তেমনি পরিশ্রমী আর স্বচ্ছন্দপ্রকৃতি।

এঁদের তোড়জোড় দেখে শিশিরবাবু বলেছেন—আমি 'ঘরে-বাইরে' বইটা নাটক করতে নরেনকে দিয়েছি। সেটা তৈরী হয়ে গেছে, সে খবর দিয়েছে। আমার এখানে সর্বদাই নানা লোকের ভিড় থাকে, নাটক নিয়ে আলোচনায় ডিস্টার্ব করে। চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই, তাহলে, সকলে মিলেই নাটকটা শুনে আসা যাবে। তোমরাও মতামত দিতে পারবে।

অত বেলায় অস্নাত অবস্থায় সবাই মিলে হাওড়া স্টেশনে এসেছেন। এসে দেখেন—শরৎচন্দ্র তিনটি মস্ত মস্ত ইলিশ মাছ তাঁর সঙ্গী ছোকরার হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে স্টেশন থেকে বেরুচ্ছেন।

আর যায় কোথায়? ডাকাত পড়ার মতন সবাই রূপনারায়ণের রুপোলী ইলিশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এর মধ্যে নাকি চারুবাবুই দলপতি। গিরিজা তাঁর পার্শ্বচর।

কোথায় ইলিশ যাচ্ছে?...

ছোকরাটি উত্তর দিয়েছে—শোভাবাজার।

শরৎদা এগিয়ে এসে বলেছেন—একজনদের ইলিশ খাওয়াব বলে প্রতিশ্রুত আছি, তাই—

চারু-প্রেমাঙ্কুর সমকণ্ঠে বলে উঠেছেন—আপনি রূপনারায়ণ থেকে ইলিশ ধরে শোভাবাজারে প্রতিশ্রুতি পালনে চলেছেন—আমরা ইলিশ সমেত আপনাকে ধরে দেবালয়ে রবিবার পালনে চলেছি। শীগগির ট্রেনে উঠে পড়ুন আমাদের সঙ্গে।

শরৎচন্দ্র এঁদের সবাইকে খুব ভালবাসতেন। বিশেষ করে শিশিরবাবু সুদ্ধু যাচ্ছেন দেখে তিনি আর বাক্যব্যয় না করে মহা উল্লাসে ওঁদের দলে ভর্তি হয়ে গেলেন। হাইজ্যাকড হয়ে শোভাবাজারের ইলিশ লিলুয়ায় চলল।

সেই দিনটির কথা মন থেকে মুছবার নয়। সারাটি দিন খুব আনন্দ করা হয়েছিল। শরৎদাও বেশ দিলখোলা মেজাজে ছিলেন সারাদিন। 'ঘরে-বাইরে'র নাট্যরূপ পড়া হয়নি। শরৎদা পড়তে দেননি। বললেন—আউটিং-এ বেরিয়েও কাজ-গুছোবার মতলব ভাল নয়, শিশির। ও অন্য একদিন হবে। নাটক পড়তে বসলে আবহাওয়াটা সিরিয়াস হয়ে উঠবে। না, না, সে হবেনা। মতলবী লোকেরা ঐরকম রথ দেখতে গিয়ে কলা বেচে আসে।

সেদিন শিশিরবাবুর উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদ" "গান্ধারীর

আবেদন", "কচ ও দেবযানী"—আর শেক্সপীয়রের বিভিন্ন বইয়ের বিভিন্ন নাট্যাংশ —সবাইকে অন্য এক রসাস্বাদের জগতে পৌছে দিয়েছিল। 'চয়নিকা' থেকে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে "সাজাহান" কবিতা আবৃত্তি করান হল। তিনি কিছুতেই পড়বেননা —শিশিরের কণ্ঠস্বরেব পাশে আমার গলার স্বর? পাগল হয়েছ তোমরা। সিংহের গর্জ্জনের পাশে ব্যাঙের গোঙরানি। শেষ পর্যন্ত পড়েছিলেন। "সাজাহান" শবৎচন্দ্রের খুব প্রিয় কবিতা ছিল। ওর বিভিন্ন স্তবক প্রায়ই তাঁর মুখে আবৃত্তির আকারে স্বগতোক্তির মত লেগে থাকত। "হায় রে হৃদয়,/তোমার সঞ্চয়/দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়"/কিংবা—"হীরামুক্তা মাণিক্যের...যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক শুধু থাক/একবিন্দু শুভ্র অশ্রুজল/কালের কপোলতলে—" ইত্যাদি অনেকেই তাঁর মুখে শুনেছেন, এখনও নিশ্চয় মনে করতে পারবেন।

মুরগী সেদিন চারু-প্রেমাঙ্কুরবাবুর কেনা হয়নি, রান্নাও হয়নি। প্রায় এক কাঁদি পাকা কলা আর সেবখানেক মুড়ি কাড়াকাড়ি করে অদৃশ্য করে ফেললেন সকলে। তাবপরে চাযেব পরে চা। ওদিকে, মায়া আর তমাললতা আমাকে ও গুণনিধিকে নিযে প্রকাণ্ড ফলসা গাছেব তলায় ইট সাজিয়ে খিচুড়ি চাপালেন। মায়া ইলিশ মাছ কুটতে বসে গেলেন। সুযি প্রায় পাটে এসে গেল বাগানেব মস্ত চবুতাবায় কলাপাতা পেতে সারিবন্দী হয়ে বসতে। সাড়ে চারটে আন্দাজ, জলধব সেন আব অমল হোম একসঙ্গে এসে পৌছুলেন। তাঁরাও পঙক্তিভোজনে আনন্দ করে বসে পড়লেন। সেদিন ওঁদের সঙ্গে যে দুটি তরুণ ছেলে এসেছিলেন (হয়ত শিশিরবাবুরই কোনও সাগরেদ হতে পারে), তাঁদের নাম মনে নেই—তাঁরা কিন্তু সেদিন অপূর্ব গান গেয়েছিলেন সাবাদিন শিশিরবাবু আর শরৎদার ফবমাস মত। রবীন্দ্র-সংগীত, দ্বিজেন্দ্র-সংগীত, নজরুল-সংগীত।

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিরূপেব মোটামুটি একটি রেখাচিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলুম শিল্পী শরৎচন্দ্রের পটভূমিকা হিসেবে। তাঁব সমকালীন সাহিত্যিকদেরও একটি ছবি রইল।

তিনি নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সম্পর্কে নিঃশব্দ থাকতেন। একান্ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সম্পর্কে মুখ খুলতে চাইতেননা। সাহিত্যেও তিনি ব্যক্তিগত জীবনকে বেশী স্পষ্ট করে উন্মোচনের পক্ষপাতী ছিলেননা। আড়ালটা জরুরী মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের মনে পড়বে লীলারানী গঙ্গোপাধ্যাযকে তিনি লিখেছিলেন—সাহিত্যে ব্যক্তিগত জীবনের হুবহু ছবি দিতে নেই। দিলে সার্থক সাহিত্য হবেনা। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সমস্যাও উপস্থিত হয় বলে তিনি শৈলবালা ঘোষজায়ার উল্লেখ করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন মহলকে তিনি সম্মান দিতেন, মূল্য দিতেন।

শরৎচন্দ্র খুব ভাল শ্রোতা ছিলেন। অপরেব কথা মন দিয়ে শোনার আগ্রহ ছিল তাঁর। এই গুণটি শিল্পীদের মধ্যে প্রায়ই অনুপস্থিত দেখা যায়। শিল্পীরা অন্যকে

শোনাতেই ব্যগ্র থাকেন, নিজে শুনতে বড় চাননা। অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, সহানুভূতি শরৎচন্দ্রকে ধৈর্যশীল শ্রোতা করেছিল মনে হয়। নিজের সম্পর্কে যেমন, নিজের সাহিত্য সম্পর্কেও তেমনি, জনসমাজে চুপচাপ থাকাই ছিল তাঁর প্রকৃতি।

বলতেন—আমার বইয়ের চরিত্রগুলি বিভিন্ন পাঠকের মনে কত বিভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া আনে—দেখে আমার বেশ মজা লাগে। কে যে কার কাছে কোন তাৎপর্যে, কোন রস নিয়ে দেখা দেয়, এর বাঁধাধরা মাপজোক তো নেই। সবারটাই সত্য, অথচ—সবটাই তার সত্য নয়। জীবন্ত মানুষ নিয়েও সংসারে এই ব্যাপারই চলে। আমাকে তুমি যে-মানুষটি দেখতে পাচ্ছ, অন্য একজন সম্পূর্ণ আলাদা আরেকটি মানুষ দেখচে। কারুর দেখাই ভুল নয়। কিন্তু একটা কথা। বহিরঙ্গ-দৃষ্টির মানুষ সংসারে নব্বুই ভাগ। এঁরা ভেতরের আসল মানুষটাকে মোটে নজরই করতে পারেন না। বহিরঙ্গ দৃষ্টির মানুষদের বিদ্যার সম্পদ জ্ঞানের সম্পদ, যুক্তি আর বিচারের ধারাল হাতিয়ার সমস্তই হয়ত ঝক্‌ঝক্‌ করে—কিন্তু হায়, থাকে না শুধু নিজস্ব গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলো। শিল্পের রসসৃষ্টির জন্যে যেমন—শিল্পের রসাস্বাদনের জন্যেও তেমনি অন্তরের চক্ষুটি মেলে রাখা একান্ত জরুরী।

৭

বড় বিজ্ঞানী বা শিল্পী কেউ কেউ অনেক সময়ে একটু ক্ষ্যাপাটে কিংবা একটু শিশুসুলভ স্বভাবের হয়ে থাকেন শুনেছি। ওটি নাকি গুণীদের চরিত্রের অসামান্যতারই অঙ্গ।

শরৎচন্দ্র অভিমানী ছিলেন বালকের মত। প্রত্যাশিতকে না পেলে তিনি শিশুর মত রাগে দুঃখে অধীর হয়ে বারে বারে নিজেকেই আঘাত করতে চাইতেন। এ এক মুশকিলের ব্যাপার ছিল তাঁর কাছাকাছি আত্ম পরিজনদের কাছে। সকলকেই বেশ একটু সশঙ্ক হয়ে থাকতে হত,—কখন কোথা দিয়ে তাঁর মনে আঘাত লেগে যাবে—যার ফলে তিনি নিজের মাথা ঠুকে অন্যকে শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতিতে সবাইকে শাস্তি দেবেন।

আমাদের বিয়ের সময়ে দুর্ভাগ্যবশত একটি বিভ্রাট ঘটে গিয়েছিল। যার বেদনা আমরা সারা জীবন বহন করেছি। সে-সময়ে এ জন্যে আমরা দারুণ বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। সৌভাগ্যের কথা, শরৎচন্দ্র নিজেই সেই আক্ষেপ আর দুঃখের অন্ধকার আবহাওয়া—নিজের করুণার্দ্র সান্নিধ্য দিয়ে, স্নেহ দিয়ে পরে দূর করে দিয়েছিলেন। তাঁর অকপট ভালবাসার কবোষ্ণ রৌদ্রে আমাদের আহত মনের মেঘ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু তার আগে এসেছিল শরৎচন্দ্রের দুর্দান্ত অভিমানের পালা।

ত্রুটিটা ঘটে গিয়েছিল আমাদেরই দিক থেকে। শরৎচন্দ্রের প্রেরণায়, উৎসাহিত পরামর্শে আর ব্যবস্থায় আমাদের বিবাহ ঠিক হয়ে গেল। দিনস্থির হয়েছিল পরেশনাথের বাগানে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে। আমাকে নিয়ে আমার দাদা বিভূতিভূষণ ঘোষ (ইনি জীবিত আছেন) সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র এসেছিলেন আমার স্বামীর

সঙ্গে। সেদিন আমার দাদা বিভূতিবাবুকে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি কি ভালবেসে বিয়ে করেচ? আমাদের বিয়েতে আমার দাদার সমর্থন ও সহায়তা দেখে তিনি এই প্রশ্নটি করেছিলেন। আমার দাদা এখনও সেকথা উল্লেখ করেন।

পাছে কোনও বিঘ্ন ঘটে, সেজন্য বেশি আগে এ-খবর বাইবে প্রচার করতে তিনি বিশেষভাবে মানা কবেছিলেন। বলেছিলেন নিমন্ত্রণপত্র ছাপিওনা। নিজে গিযে মুখে সবাইকে জানিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসবে। আত্মীয় কুটুম্ব প্রত্যেককে নিমন্ত্রণ করবে। কারা বিয়েতে যোগ দেন বা না দেন এইতে বোঝা যাবে কারা তোদের সমর্থক বা অসমর্থক।

আমার স্বামী বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, শবৎদা, আমি একলা মানুষ। বাড়ী-বাড়ী ঘুবে ঘুরে নিমন্ত্রণ করার সময় পাব কখন? এদিকে আবার বলছেন বেশি আগে প্রচার করা চলবেনা, কেউ বাধা সৃষ্টি করতেও পারে। আমার মনে হয়, সংক্ষিপ্ত কয়েক লাইন লিখে আমি নাম সই করে লোক মারফৎ যদি পাঠিয়ে দিই, সেই ভাল হবে না কি? সমযে তো একেবারেই কুলুবে না।

শবৎচন্দ্র অনড় হয়ে বলেছিলেন—সময়ে কুলোতেই হবে যে-কবে হোক। লোক-মারফৎ নয়, নিজে যেতে হবে।

তিনি নিজে নিমন্ত্রণের ফর্দ করে দিয়েছিলেন, কাদের বলতে হবে। বলেছিলেন —অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। বাইরের লোকদের মধ্যে কাগজওয়ালাদের সব্বাইকে নেমন্তন্ন কর। নইলে ওরা বেগে গিযে উল্টো গাইতে পারে। আর, সর্বদা যেসব বন্ধুদের সঙ্গে ওঠা বসা কর, মুখোমুখি হও, তাদের ডেকো। বেশি ছড়িয়ে নেমন্তন্ন কোরনা। সামলাতে পারবেনা। তুমি নিজে তো তখন থাকবে শেকলে বন্দী। জলধরদা আর আমি সব দেখাশুনো করব, সামলাব। সবসুদ্ধু লোক শ'খানেকের বেশি না হয়। আরও কম হলেও ভাল হত। পাঁচ মতের মানুষ এক জায়গায় জড়ো হলে তাদের মধ্যে হয়ত নানা তর্ক-বিতর্ক উঠবে,—একদল অন্য দলকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করবে। তখন একটা অপ্রিয় আবহাওয়া তৈরী হয়ে উঠতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না। আমাদের দেশে এখনও অনেক এমন লোক আছে বিয়ের সভায় শ্রাদ্ধসভায় এরা নতুন মতের লোকদের দেখলে আঘাত না করে পারে না। পুরোনোদেরই তুষ্ট রাখ। যাদের বলা গেলনা পরে বরং তাদের একদিন ধীরে-সুস্থে ডেকো। তারা মনে ক্ষোভ রাখবেনা।

কল্লোল গ্রুপকে বলা গেলনা। শুধু ভারতী গ্রুপকে বলা হয়েছিল। পরে কল্লোল গ্রুপের সাহিত্যিকেরা তাঁদের সর্বজনীন দাদাব উপরে খুব অভিমান করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরাই সবচেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলেন মনে আছে। কল্লোল গ্রুপ বলতে প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব-অজিত দত্ত-যুবনাশ্ব-নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এঁদের কজনকেই তখন বোঝাত। খবর পেয়ে খুশী হয়ে নিজেরাই আনন্দ করে ছুটে এসেছিলেন অচিন্ত্যবাবু,—প্রেমেন্দ্রবাবু সবার আগে। তারপরে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। দীনেশরঞ্জনবাবুও নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের

সঙ্গে এসেছিলেন। এঁদের খুশীতে একটুও ভেজাল ছিলনা, বরং উল্লাসের প্রাচুর্য ছিল। বুদ্ধদেব অভিনন্দন জানিয়ে তিনছত্র চিঠি লিখেছিলেন। বুদ্ধদেব ঢাকায় তখন 'প্রগতি'র অফিস থেকে প্রায়ই চিঠিপত্র লিখতেন আমার স্বামীকে।

শরৎচন্দ্র ভয় পেয়েছিলেন কলকাতার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেব-পরিবারকে। এখান থেকে প্রতিবাদের গোলমাল ওঠার অনুমান করেছিলেন। কিন্তু আমার শ্বশ্রূমাতা মৃণালিনী দেবী এবং বড় ননদিনী সরলাসুন্দরী বিয়েতে উপস্থিত থেকে তাঁদের সমস্ত কর্তব্য আনন্দের সঙ্গে পালন করে আমাকে ববণ করে তুলেছিলেন। দেব-পরিবারের যাঁরা তখন প্রধান,—প্রত্যেকে নিজেরা দাঁড়িয়ে আনন্দেব সঙ্গে অতিথি সংবর্ধনা ও পারিবারিক যথাকর্তব্য পালন করেছিলেন। কোনও গোলমাল ত্রুটিবিচ্যুতি হয়নি। আত্মীয় কুটুম্ব সামান্য দুই-একজন ছাড়া প্রত্যেকেই উপস্থিত হয়েছিলেন। বিবাহের সন্ধ্যায় আমাব ভাসুর রাজেন্দ্রচন্দ্র দেবের মধ্যপ্রদেশ থেকে টেলিগ্রামে আশীর্বাদ এবং রবীন্দ্রনাথের দার্জিলিং থেকে আশীর্বাদ এসে পৌছেছিল।

আসা হযনি শুধু শরৎচন্দ্রের। আমাব স্বামী বলতেন—যাঁব সবচেযে বেশী খুশী হয়ে ওঠার কথা,—তিনিই বিয়েতে যোগ দিতে পেলেননা। স্বামীর মনে এর জন্যে চিরদিন গভীর আক্ষেপ ছিল।

একটি জটিল দুর্ঘটনায় শরৎচন্দ্র বিয়েতে উপস্থিত থাকতে পারলেননা। যে-ছেলেটির হাতে আমার স্বামী বিয়ের তারিখ ও সময় জানিয়ে সামতাবেড়ে চিঠি পাঠালেন, সে-ছেলেটি হঠাৎ বাবার কলেরা হয়েছে খবর পেয়ে সেই চিঠি পকেটে নিযেই তার নিজের গ্রামে চলে গিয়েছিল। তাব বাবার মৃত্যু হওয়ায় সময়মত আর চিঠি পৌছে দেওয়া হয়ে ওঠেনি তার। শরৎদার কাছে চিঠি যে পৌছুল না এ-খবরটি আমার স্বামী জানলেননা। বিয়ের দিন সকাল থেকেই উনি উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন শরৎচন্দ্রের জন্য। সাহিত্যিকেরাও সকলে তাঁর জন্য উৎসুক প্রতীক্ষিত। সকাল থেকেই সমস্ত সাহিত্যিকরা সস্ত্রীক 'দেবালয়ে' জড়ো হয়ে সেদিন গভীর রাতে কলকাতায় ফিরেছিলেন লিলুয়া থেকে।

ভোর থেকে শরৎদার জন্যে স্টেশন প্ল্যাটফর্মের দিকে প্রত্যেকখানি আপ-ট্রেনের আওয়াজে তাকিয়ে থেকে থেকে বিকেল হয়ে গোধূলিলগ্ন এসে গেল। কলকাতার নিমন্ত্রিতেবা প্রতি ট্রেনেই কেউ-না-কেউ নামছেন, শরৎচন্দ্র শেষ-পর্যন্ত এসে পৌছুলেননা।

দুর্ভাবনায় সবার মন ভারাক্রান্ত। শেয অবধি সকলেই স্থির অনুমান করলেন—নিশ্চয়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এদিকে শরৎচন্দ্র আদপে খবরই পাননি। ১লা জুন তারিখে সমস্ত ইংরেজি বাংলা খবরের কাগজে বিয়ের খবর প্রকাশ হল বড় হেডিং দিয়ে। তিনি খবরের কাগজে দেখলেন ৩১শে মে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে। সেটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ। আগে খবর না পাঠিয়ে সামতাবেড়ে যাওয়ায় তখন শরৎচন্দ্রের মানা ছিল। উনি

পাল্কী পাঠাতেন স্টেশনে।

আমাব স্বামী ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সকালেই তাঁকে ডাকে চিঠি লিখলেন, আমাকে নিয়ে সামতাবেড়ে যাবেন, অথবা শরৎদাই আমাদের কাছে আসবেন, কোনটা সুবিধা হবে জানতে চাইলেন। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তাবিখে লেখা তাঁর অভিমানভরা চিঠি এল—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সই নিয়ে।

সামতাবেড়, পানিত্রাস,
জেলা হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

খববের কাগজে দেখলাম তোমাদেব বিয়ে হয়ে গেছে। পবে তোমাব চিঠি পেয়ে আব সন্দেহ বইল না যে খবরটা পাকা।

সেদিন তোমাদের নতুন গৃহস্থালি দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এদিকের জরুবী কাজ সাবতে সাবতে স' আটটা বেজে গেল। তখন লিলুয়া গিয়ে ফিরে এসে স' নটার ট্রেন ধরা সম্ভবপর ছিল না। তাই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পাবলাম না। যাই হোক, আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও। ইতি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎদাকে না চিনলে, হয়ত এ-চিঠির ভিতবকার দুঃখ ও রাগ বোঝা না যেতে পাবে। যদিও, চিঠির শেষ স্বাক্ষরটিতে রাগের চেহারা তিনি সুস্পষ্ট রেখেছেন। আমাদের দুজনের চিঠিতে উনি 'বড়দা' 'বড়দাদা' 'শরৎদা' সই করতেন।

বিযেব পব আমাদের দুজনের কাছে একসঙ্গে লেখা প্রথম চিঠিতে শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সই,—এবং একদম শীতল সুদূর অসম্পৃক্ত ভাষায় অতি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে লিলুয়ায় না-আসার মামুলি কৈফিয়ৎ দেওয়া—এটা যে কতটা গভীর অভিমানের চিহ্ন,—তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

আমার স্বামী অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় শরৎদার মানভঞ্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদেব মনের দুঃখ যে তাঁর চেয়েও ঢের বেশি, সেটি তাঁকে বোঝাতে বেশ সময় লেগেছিল। বুঝবার পরে অবশ্য তিনিই আমাদের অনেক সান্ত্বনা দিয়েছেন।

গুরুদেব তখন দার্জিলিং-এ। তাঁর শুভ-আশীর্বাদ নিয়ে সেদিন টেলিগ্রাম এসেছিল। পরে তাঁর চিঠিও যথাসময়ে এল। শরৎচন্দ্র যখন আমাদের কাছে 'দেবালয়ে' প্রথম এলেন, সেদিনও তাঁর মনের উত্তাপ আর অভিমান শান্ত করতে আমার স্বামীকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় জলধর সেন মশায় তখন

'দেবালয়ে' উপস্থিত ছিলেন, তিনিই শরৎচন্দ্রকে বুঝিয়ে শান্ত করেছিলেন, এটি দায়িত্বহীনতার ত্রুটি বা কর্তব্যের অবহেলা নয়, অভাবিত দুর্ঘটনার ফলে গোলমাল।

সেদিন শরৎচন্দ্রের সেই অবুঝপনার মধ্যে সত্যিই শিশুসুলভ অযৌক্তিকতা ছিল। পরে অবশ্য তিনি হাসতে হাসতে বলতেন—আমার কপালে লেখা আছে সামাজিক কাজে 'একঘবে' হয়ে থাকতে হবে। ঠিক 'বয়কট' হয়ে গেলুম। তোমাদের বিয়েতে প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু করে সব্বাই এলেন, কত আনন্দ করে গেলেন; গুরুদেব কলকাতায় থাকলে তিনিও হয়ত একবার এসে তোমাদের আশীর্বাদ করে যেতেন,—শুধু আমিই একা বাদ পড়ে গেলুম। একেই বলে বিধির লিখন।

আমাদেব জীবনের বিশেষ মুহূর্তটিতে তাঁর এই অনুপস্থিতি নিয়ে বরাবর শরৎদার মনে একটা খেদ থেকে গিয়েছিল। ছোট ছোট জিনিসও তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মনের কাছে কত মূল্যবান হয়ে উঠত, এ থেকে বোঝা যায়।

অন্য কেউ হলে সহজেই ঝেড়ে ফেলতেন তুচ্ছ ঘটনা বলে। এমন সামান্য বিষয়কে এতদিন ধরে ঠাঁই দিতেননা মনে।

এটি আমার স্মৃতিচারণ। কাজেই, সে-সময়কার সাহিত্যিক ব্যক্তিসমাজের কিছুটা ছবিও এতে থাকল। এটিকে আত্মবিজ্ঞাপন বলে ভুল করবেননা পাঠকেরা, আশা বাখব। বিভিন্ন সাহিত্যিকরাও যাঁরা এই লেখার মধ্যে এসেছেন, তাঁরা সকলেই শরৎচন্দ্রের অকপট অনুরাগী ছিলেন।

মানুষ শরৎচন্দ্রকে সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে আরও কিছু ঘটনাগত গল্পে তাঁর স্কেচটি ফুটিয়ে তুলতে চাই। যদিও জানি, এতে তাঁর সেই উপচে-পড়া টগবগে প্রাণের উত্তাপ আর চাঞ্চল্য ধরা যাবেনা, তবু কিছুটা আভাস বা ইঙ্গিত থাকতে পারে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের।

আমাদের বাড়ীতে ঠিকে কাজ করত বিনুর মা ঝি। শরৎদা সেদিন সান্ধ্যআসরে যথারীতি গল্প করছিলেন। রাত্রি তখন প্রায় আটটা হবে। শীতকাল। বিনুর মা এসে কেঁদে আমার স্বামীর পায়ে পড়ল।—বাবু আমার বিনুকে বাঁচান।

আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। কী ব্যাপার? বিনু গাছ থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। মাথা ফেটে গেছে। বস্তীর লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে ছেলেকে—কিছু টাকা চাই। আমরা তাড়াতাড়ি উঠে কিছু টাকা, সে যা চাইল, দিলুম। শরৎদা গড়গড়ার নল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন —চল নরেন, আমরা যাই। দেখি,—ছেলেটার কী হল। সেখানে যে কজন ছিলেন, সকলেই বিনুর মার সঙ্গে তাড়াতাড়ি রওনা হলেন পণ্ডিতিয়া বস্তীতে। বস্তী বেশি দূরে নয়। শরৎদা সেখানে গিয়ে ছেলেটিকে দেখে নেড়েচেড়ে বললেন—মাথা ফাটেনি। কপাল আর কানের পাশটা কেটে গেছে। তখন তার জ্ঞানও ফিরেছে। শরৎদা কাছাকাছি একটি দোকানে গিয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে নিজেই ফোন করলেন তাঁর চেনা ডাক্তারকে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ছেলেটিকে পাঠান হল। শরৎদা

বস্তীর মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ রইলেন। বিনুর মার ঘর দেখলেন। কাঁচা নর্দমা সাফ রাখেনি বলে বস্তীর অধিবাসীদের বকাবকি করলেন। বিভিন্ন ঘর থেকে মেয়েরা পুরুষেরা বেরিয়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। তারপরে বললেন—বিনুর খবর কাল সকালবেলাই যেন আমরা অশ্বিনী দত্ত রোডে তাঁর কাছে পাঠাই। সকালে খবর দেওয়া হল। সন্ধ্যায় শরৎদা এসে বললেন—তোদের এখানে আসার সময়ে পণ্ডিতিয়া বস্তিতে ঘুরে ছেলেটার খবর নিয়ে এলুম। কাঁধের হাড় ফ্র্যাকচার হয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে। ভুগবে কিছুদিন, তবে অল্প বয়েস তো, হাড় জুড়ে যাবে ঠিক। ওর মা'টা খুব কান্নাকাটি করছে।

সেইদিন শরৎদা বস্তিবাসীদের প্রসঙ্গে পতিতা পল্লীর কথা গল্প করেছিলেন। পরেও তাঁর মুখে ওখানকার নানা গল্প শুনেছি।

শরৎদা বর্মা থেকে কলকাতায় যখন আসতেন, তখন উঠতেন শিবপুরে খুরুট রোডে একটি পতিতা পল্লীতে, মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে, আর চিৎপুর রোডে—এই তিন জায়গায়। খুরুট রোডেই তাঁর প্রধান আস্তানা ছিল। এইখান থেকেই তিনি অনেক আগে একটি মেয়ের জীবন দেখে চরিত্রহীনের সাবিত্রী চরিত্রের কল্পনা করেন। শরৎদা হাসতে হাসতে গল্প করতেন—বর্মা থেকেই আসি আর বেহার থেকেই আসি—আমি এসে দাঁড়ালেই ওদের মধ্যে একটা খুশীর সাড়া পড়ে যেত। তক্ষুণি ঘাটে নিয়ে যাওয়ার একখানা খাট এসে পড়ত আমাব জন্যে। বুঝলি?—আমি তো অবাক। শুনতে অস্বস্তিও খুব লাগছে। কিছু জিজ্ঞেস কবতেও ইচ্ছে করছেনা। তবু বলি—সে আবার কী? ঘাটে নিয়ে যাওয়ার খাট মানে কী?

—আরে, শ্মশানে দেহ নিয়ে যাওয়ার খাটিয়া! বুঝতে পারছিসনা? দড়ির খাটিয়া রে! বিরক্ত হয়ে বলি—ওসব অদ্ভুত গল্প শুনতে চাইনা। অন্য গল্প বলুন।

আমার অস্বস্তিতে আরও উৎসাহিত হয়ে শরৎদা হাসতে হাসতে বলেন—শুধু কি খাটিয়া? এক প্রস্থ বিছানা তার সঙ্গে। সেই খাটেব মাপের তোষক চাদর বালিস। শীতকাল হলে নতুন লেপ বা কম্বল একখানা।

আমি চুপ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলেন—আরে, সে কী ব্যতিব্যস্ত আয়োজন যদি দেখতিস? এত্তবড় (হাত ঘুরিয়ে থালার আয়তন দেখিয়ে) কাল কষ্টিপাথরের থালায় জুঁইফুলের মতন ভাত সুন্দর চুড়ো করে বেড়ে, সাদা পাথরের বাটী গেলাসে নানা তরকারি আর জল। আরে, গুরু-পুরুত এলেও তেমন খাতির তোরা করতে পারবিনা। আমি ছিলুম বাড়ীউলি বুড়ীর বাবাঠাকুর। একবার ওকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছিলুম। সেই থেকে সে আমাকে সত্যি সত্যি 'ঠাকুর' করে তুলেছিল। আর, সেই বস্তীর ঘরে ঘরে যত মেয়ে ভাড়াটে ছিল, আমায় তারা ডাকত বাবাঠাকুর। আমায় দেখলে তাদের আহ্লাদের সীমা থাকতনা। সবাই মিলে আমাকে খাওয়াত। যত্ন-আত্মি করত।

যখনি ওখানে গেছি, নতুন খাটিয়ায়, নতুন বিছানায় ধোয়ামোছা একখানা ঘরে

শুয়েছি। ওরা কিন্তু আমাকে আন্তরিকই ভালবাসত। কোনও দরকার তো ছিলনা আমাকে নিয়ে। আমি যে ওদের ঘেন্না করিনা, এইটুকু বুঝত বলেই বোধহয় সব্বাই এত ভালবাসত।

শরৎদা গল্প কবেছেন—ঐসব পতিতাদের কাছ থেকে তিনি তাদের জীবনের ইতিহাস লিখে নিতেন। কে কেন কী কবে এই পথে এসে পড়ল তিনি একখানি মোটা খাতায় লিখে রাখতেন। বর্মায় গৃহদাহে সে খাতাখানি নষ্ট হয়ে যায়। সেই খাতার জন্যে তাঁর খুব ক্ষোভ ছিল।

শরৎদা বলেছেন—আরে, ওদের কতবার বলেছি, খাটিযাখানা একটা উঁচু চালে টাঙিয়ে রেখে দিও, বিছানাটাও ঐ সঙ্গে বেঁধে তুলে রেখ। তাহলে বারে বারে কিনতে হবেনা। যখন আসব, শমীবৃক্ষ থেকে খাটিয়া বিছানা নামিযে নিয়ে তাইতে লম্বা হয়ে পড়ব। তারা কিন্তু তা শোনেনি। বলত,—না, যতবার আপনি আসবেন, ততবারই আমবা নতুন খাটে নতুন বিছানায় আপনাকে নারাযণ কবে শোয়াব। এটি সেই বুড়ীর ঝোঁকের ব্যাপার ছিল।

শরৎদা পতিতা পল্লীতে ওদের ক্রেতা হয়ে আনাগোনা করেননি, একথা কিন্তু অনেকবারই বলেছেন।

বলতেন—আমি ছোটবেলা থেকে সাপ ধরতে পারতুম। সাপের গর্তে অনেকবার হাত দিয়ে সাপ ধরেছি। ওদেব বিষদাঁত কী করে ভেঙে দিতে হয় শিখেছিলুম। বিষাক্ত সাপে আমি কক্ষনো ভয় পেতুমনা ; কিন্তু বিষকন্যায় আমি বরাবর আতঙ্কিত থেকেছি। বিষাক্ত সাপ যথেষ্ট ঘেঁটেছি, বিষকন্যা কিন্তু কখনও কোনওদিন ছুঁইনি।

আমি শরৎদার একথা বিশ্বাস করি। পতিতাদের তিনি এমনভাবে দেখতে পেতেননা, যদি তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেহেব মোহে জড়িত থাকত।

পতিতারাও বোধহয় এই অদ্ভুত প্রকৃতির পুরুষমানুষটির কাছে এমন মন খুলে তাদেব জীবনের সব কথা বলতে পারতনা বিশ্বাস করে। ওখানকার আরও অনেক গল্প শরৎদার মুখে শুনেছি। এমন সহজ গলায় অতি স্বচ্ছন্দভাবে ওদের গল্প আন্তরিক করুণায় বলতেন, যাতে মনে হত, ওদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অন্য সকলের মত ছিলনা সম্ভবত। সাবিত্রী চরিত্রটি বাঁকুড়ার একটি মেয়ের। তার ভগ্নিপতি তাকে বিয়ে করবে বলে কলকাতায় এনেছিল। অত্যন্ত তেজস্বিনী দৃঢ় প্রকৃতির মেয়ে ছিল সে, গ্রামীণ সম্পন্ন গৃহস্থঘবের মেযে।

পতিতাদের ইতিহাস সংগ্রহ করার 'হবি'তে কাটিয়েছেন এককালে। ওদের প্রতি তাঁর করুণা আর বেদনাবোধের অবধি ছিলনা। বলতেন, প্রকৃতিগত স্বভাবেও অনেকে ঐ জীবন কাটায় এটা ঠিক বটে, বেশির ভাগই কিন্তু অবস্থার ফেরে পড়ে আর পুরুষের প্রবঞ্চনার দরুণ ঐ পথে থাকতে বাধ্য হয়।

অদৃশ্য তর্জনী

৮

মানুষ-শরৎচন্দ্রেব মোটামুটি একটি বেখাচিত্র আপনাদেব সামনে তুলে ধরছি। এর মধ্যে একটি জরুরী তথ্যও জানিযেছি। সে-তথ্যটি এই,—ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রদের ক্ষুদ্র সাহিত্যচক্রের মহিলা সদস্য, বিভূতিভূষণ ভট্টের ছোটবোন, 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দিদি' উপন্যাস লেখিকা নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রকে লিখেছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁব গল্পে উপন্যাসে বালবিধবা চরিত্র না আঁকলে ভাল হয়। এর জবাবে শবৎচন্দ্র জানিয়েছিলেন—কলমে আপনা হতে যা এগিয়ে আসে, তাকে রোধ কবে রাখা উচিত নয়। তবে, এমন বালবিধবা চরিত্র কখনও তিনি আঁকবেননা যাতে অনুবোধকারিণীর মনে কিংবা মর্যাদায আঘাত লাগে।

শবৎ-সাহিত্যেব মূল্যায়নেব জন্য পাঠক ও সমালোচকদের কাছে এই তথ্যটি বিশেষ জরুবী মনে হয়।

শবৎচন্দ্রেব মনের আকাশে সে-সময়ে একটি অদৃশ্য তর্জনী শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ও সাহিত্যকে নিঃশব্দে নিয়ন্ত্রণ করতো। যে-নিয়ন্ত্রণকে শরৎচন্দ্রের হৃদয় কোনও দিন অস্বীকার কবতে পারেনি। যে-নিযন্ত্রণের ফলে, শরৎচন্দ্রের জীবনও যেমন, সাহিত্যও তেমনি দিক বদল করে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। প্রথম জীবনে নিজের শিল্পকে অন্যেব মুখ-চাওয়া করে রাখার মধ্যে শিল্পীব যে অসামান্য আত্মত্যাগ আছে, —বাউণ্ডুলে বেহিসেবি মানুষ বলেই তা সম্ভব হয়ে থাকবে। এই আত্মসমপর্ণের কোনও স্পষ্ট প্রতিদান তিনি সারা জীবনে কখনও পাননি। সে নিয়ে তাঁর যে বেদনা ছিলনা তা নয়। তবু প্রশ্নহীন ভাবে এই বিদ্রোহী যুবক এক অন্তঃপুরিকার বিভ্রান্ত চিত্তের ব্যগিত নির্দেশ মাথা নত করে পালন করে গিয়েছেন। বিন্ধ্যপর্বতেব মত নুইযে বেখেছিলেন নিজের সমুন্নত তেজ আর যৌবনের বিদ্রোহী সত্তাকে, এক অদৃশ্যচারিণীর সম্মানে।

শরৎচন্দ্র ভাগলপুর থেকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন কেন, কেনই বা তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে আকস্মিক কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন?

অবান্তর হলেও আমি এই তথ্যটি জানার পুরো পটভূমিকা বলব। কারণ, এইদিনই প্রথম তিনি নিজ মুখে আমার কাছে নিরুপমা দেবীর বিষয়ে মুখ খুলেছিলেন। এমন একটি পবিবেশ সেদিন ছিল—যেখানে নিসর্গই হয়ত তাঁকে গ্রন্থি উন্মোচনে সহায়তা করেছিল এক বিশেষ নিভৃতির সৃষ্টি করে।

বেয়াল্লিশ বছব আগের কথা। সে ছিল এক বর্ষাব দিন। সকালে বেলা দশটা নাগাদ চন্দননগরে সাহিত্যসভা করতে বেরিয়েছিলাম শরৎদার সঙ্গে আমরা স্বামী-স্ত্রী। সভা-টভা শেষ হলে স্বর্গীয় হরিহর শেঠের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সেরে তাড়াতাড়ি কলকাতার দিকে ফেরা হচ্ছে, আকাশের অবস্থা একটুও সুবিধের নয়। যাত্রার অল্প

সময় পরেই প্রবল জোরে বৃষ্টি নেমে এল,—সঙ্গে ঝোড়ো বাতাসের উদ্দামতা, তীব্র বাজের আওয়াজ, বিদ্যুতের ঝল্‌কানি। শরৎচন্দ্র গাড়ি থামাতে বললেন। তাঁকে উদ্বেগে একটু যেন বেশি উত্তেজিত দেখা গেল। তিনি মোটব থেকে নেমে পড়ার জন্যে বালকের মত অধীর।

আমার স্বামী বললেন—এত ঝড়বৃষ্টিতে কোথায় নামবেন এখানে? তা-হলে বরং ফিরে চলুন হরিহরবাবুর বাড়ি।

শরৎচন্দ্র বললেন—ঝড় জলে দুর্যোগে পথে ঘাটে মানুষ কোথায় আশ্রয় নিয়ে থাকে? সামনে যেখানে যা পায় সেইখানেই। ঐ তো স্ট্যাণ্ডের ওধারে রাস্তার ওপরেই সুন্দর সুন্দর পাকা বাড়ি রয়েচে। চল না—একটার মধ্যে গিয়ে ঢুকি পড়ি।

ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে লাল রঙের একটি একতলা সুদৃশ্য বাংলোর সামনে রাখল। আমরা শরৎদার সঙ্গে ভিজতে ভিজতে নামলুম। মাথার উপরে আকাশ তখন ঘন ঘন বিদ্যুতের চাবুকে ফেটে পড়ছে চৌচির হয়ে,—কানের পর্দা ফাটান বাজের আওযাজ।

বাংলোর বারান্দায় গিয়ে উঠলে সূঁচলো-দাড়ি এক মুসলমান বেয়ারা এসে স্যালিউটের ভঙ্গিতে সেলাম করল।

শরৎদা জিজ্ঞেস করলেন—ভেতরে কারা আছেন? আমরা অল্পক্ষণের জন্যে আশ্রয় চাই।

নিচু নম্র গলায় চোস্ত উর্দুতে বেযারাটি বলল—সাহেব পরশু ট্যুরে বেরিয়েছেন, কাল ফিরবেন। মেমসাহেব বাচ্চারা বোম্বাইতে আছেন। কুঠিতে সে ছাড়া এখন আর কেউ নেই।

শরৎচন্দ্র বিব্রত গলায় বললেন—তাহলে তুমিই না হয ঘর খুলে আমাদের একটু বসতে দাও। বৃষ্টি কমলে আমরা কলকাতা চলে যাব।

বেয়ারাটি সম্ভ্রম ও সৌজন্যের ভঙ্গিতে চওড়া বারান্দার একপাশের একটি শার্সিকাচের বড় দরজা খুলে দিল। আমরা প্রকাণ্ড হলঘরে ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়লুম।

ঘরে ঢুকে শরৎচন্দ্র ছাদ থেকে দেয়াল মেঝে চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করে বললেন—এঘরে এসে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। মনে হচ্চে, এখানে যেন আমি ছিলুম।

আমার স্বামী হেসে বলেছিলেন—ভালো করে একটু মনে করুন না, ঠিক মনে পড়ে যাবে।

শবৎদা প্রকাণ্ড হাতাওয়ালা একটা ইজিচেয়ারে বসে পড়ে চুরুট ধরাতে ধরাতে বলেছিলেন -পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই। এই রকম ঘরে এসে পড়লে পূর্বজন্মের স্মৃতি নড়ে ওঠে। কেমন যেন কী-একটা মনে হতে থাকে। ক্ষুধিত পাষাণের মতন গল্প সহজেই মগজে আসে। তারপরেই তিনি তাঁর সর্বক্ষণের মেজাজে অর্থাৎ ব্যঙ্গ-গূঢ় অথচ সহজ কৌতুকতরল কথাবার্তায় ফিরে এলেন। বললেন—নরেন, ভূতের গল্প লেখার

এটি একটি চমৎকার ঘর, নয়?

স্বামী হেসে বললেন—লিখুন না বসে, কাগজ কলম জোগাড় করে দিচ্ছি।

আমি তখন ধরে বসলুম—বড়দা, বৃষ্টি থামতে সময় নেবে, আপনি একটা ভূতের গল্প বলুন।

বিনা প্রতিবাদে তিনি ভূতের গল্প শুরু করলেন। তাঁর বাবাব মুখে শোনা। শবৎচন্দ্রের গল্প বলার আকর্ষণীয় বাকশিল্পের সঙ্গে যাঁরা বাস্তবে পবিচিত হয়েছেন, তাঁরা জানেন—শরৎদার গল্প বলা কেমন ছিল। অন্যের পক্ষে তা প্রকাশ করা সহজ নয়।—রোমহর্ষক ভূতের গল্প বিস্তার করে করে যথাসময়ে গুটিয়ে এনে শেষকালে অনির্দেশ্যতার মধ্যে মিলিয়ে দিলেন। আমার স্বামী গল্প শেষ হওয়াব আগেই সাবেকী ভারী কৌচে ঘাড় কাৎ করে ঘুমিয়ে পড়লেন। বাতাসের গুমরোনি আর বৃষ্টিব আছড়ানি তখনও দুর্বল হযনি। শবৎদা একটু চঞ্চল হয়ে বললেন—চা খেতে ইচ্ছে কবচে বে। অনেকক্ষণ বকেছি।

ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গিযে আমি বেয়াবাকে খুঁজে নিয়ে তার হাতে একটি টাকা দিয়ে দোকান থেকে এক কাপ বা দুকাপ চা সংগ্রহ করে দিতে পারবে কিনা জানতে চাইলুম। সে একগাল হেসে, ম্যয খুদহি বনা শকতা—বলে সেলাম ঠুকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে তিন পেয়ালা ধূমায়মান গরম চা পাওয়া গেল পরিচ্ছন্ন পেয়ালা-পিরিচে। স্বামী তখন ঘুমের অতলে পৌছচ্চেন। শরৎচন্দ্র তাঁর নাসাধ্বনি নিয়ে আমাকে রাগিয়ে তুলবার চেষ্টায় নানা কৌতুক করছেন।

কথাবার্তা ক্রমশ এমনদিকে মোড ফিরছে, যার ফলে মনে মনে শরৎদাব উপরে আমি বেগে যাচ্ছি। স্বামীকে জাগিয়ে তুলে অপ্রস্তুত করতে চান বুঝে শরৎদার মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় কাপ চা-টা তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, এটা নষ্ট হবে, আপনি সদ্‌গতি করে দিন। আচ্ছা বড়দা,—একটা কথা অনেকদিন থেকে আমার জানতে ভারী ইচ্ছে; আপনাকে বলতেই হবে। ভাগলপুর থেকে একবার হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন আপনি। আবার কলকাতা থেকে বর্মায় আপনি কাউকেই না জানিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়েছিলেন। কিন্তু কেন? আপনাব অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও কেউ জানতে পারেনি—আপনি অকস্মাৎ কোথায় মিলিয়ে গেলেন।

শরৎচন্দ্র চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন—জানতে পারলে ওরা কি পালানো. পণ্ড করে দিতনা? যেতে দিত কি আমাকে? বললুম—সুরেনমামার মুখে শুনেচি, কলকাতায় আপনি ওঁদের কী-একটা জরুরী প্রোগ্রামের ভার নিয়েছিলেন তখন। নাটক টাটক হবে বোধহয়। কাক-পক্ষীও জানতে পারেনি, একদিন সকালে দেখা গেল তোরঙ্গ, বাক্স, বইটই, জামাকাপড়, মায় বাঁশিটা পর্যন্ত নেই। শরৎচন্দ্র উপভোগের ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—সে-সব নামমাত্তর কড়িতে বেচারামবাবুর গলিতে পাঠিয়ে তবেই তো সাগর ডিঙোতে হনুমান-লাফ দিয়েছিলুম। আমি ব্যগ্র হয়ে বলেছিলুম—কিন্তু, কেন? কেন বড়দা? বলুন না সত্যি কথা। আমাকে ধোঁকা দেবেন

না, বানিয়ে বলবেননা। না-বলতে চান বলবেননা, আমি কষ্ট পাবনা। মিথ্যে ধোঁকা দিলে খুব কষ্ট পাব জানবেন।...বলুন না, কেন সব বিক্রি করে দিলেন?

করুণ চাপা হাসিতে জবাব দিয়েছিলেন—এবারে তো আমি পদাতিক সেনা নই, নৌ-সেনা যে! পদযাত্রায় পয়সা-কড়ি লাগেনা। সমুদ্র যাত্রায় তা নয়। তবে, নিজের সব সম্পত্তি বেচে ফেলেও কিছু ধাব করতে হয়েছিল বৈকি!

—কে ধাব দিল বড়দা?

—তোমাদের ভদ্দরলোকেবা নয়। তাঁবা বুদ্ধিমান। আমার.মতন চাল-চুলোহীনকে তখন বিশ্বাস করত চাল-চুলোহীন লোকেবাই। বিপন্নকে বিশ্বাস করে তারা ধার দিতে পারত। টাকা দিয়েছিল একটা মুখ্য ঠিকে-ঝি। তার বাসায় গিয়ে টাকা নিয়েছিলুম। তার টাকাটা মনি-অর্ডারে সেই বছরেই শোধ করে দিয়েছিলুম আমি। যদিও আসল দেনা শোধ হয়না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে নিস্তব্ধ রইলেন। বোধহয় মনটা অতীতে তখন ডুবে গেছে।

আমি আবার মিনতি কবে বলেছিলুম—আমি কোনও দিন কাউকে বলবনা কথা দিচ্চি আপনাকে। বলুন না, কেন ওরকম হঠাৎ দেশ ছেড়ে চলে গেলেন?...

তেমনিই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলেছিলেন—ছোট একটা চিঠি পেয়েছিলুম একজনের। মুদিত চোখ খোলেননি। ঐটুকু বলেই আবার চুপচাপ।

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি থমকে গেছি। কথা কইতে আব ভরসা হচ্ছেনা। এই একটু আগেই আতঙ্কভবা অলৌকিক আবহাওয়া সৃষ্টি কবে ভূতের গল্প জমিয়ে তুলেছিলেন এই মানুষটিই, কে বলবে?

আমি নিস্তব্ধ হয়ে তাঁব মুদিত চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। অনেকক্ষণ পবে চোখ মেলে আমার উদ্বিগ্ন মুখেব দিকে তাকিয়ে একটু বিষণ্ন উদাস হাসলেন।

একটা চিরকুট এসেছিল ডাকে। ছোট্ট কয়েকটি লাইন।

...এখানে যোগাযোগ কখনও আর রাখবেননা। আপনি অনেক দূরে চলে যান। আমাকে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন।—ব্যস! এক লাফে সাগর-পার।... অবিশ্যি আগে থেকেই যাব-যাব ভাবছিলুম। দপ কবে দেশলাই কাঠি জ্বেলে দিল ডাকে-আসা লাইন ক'টা। দু'তিন দিনেব মধ্যেই বিলিবন্দেজ করে ফেললুম। দেরী করিনি।

আমি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে ফেলেছিলুম—কে বড়দা, কে? ঐ ডেথ-সেনটেনসের মতন হুকুম—

আবার তাঁর সেই বরফ-ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর। জানতে চেয়োনা। জানতে চাইতে নেই।

এই চিরকুটের কথা শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা। তাব মর্মার্থ মোটামুটি যা স্মরণে আছে, সাবধানে যথাযথভাবে দিতে চেষ্টা করলুম। 'নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন' কথাটি স্পষ্ট মনে আছে। কারণ বরাবর মনের মধ্যে ঐ ক'টি কথা আমি অনেক নাড়াচাড়া

করেছি। শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি যে কারুর পক্ষে শ্বাসরোধী হতে পাবে, এর অর্থ তখন ঠিক বুঝতে পারতুমনা। এতদিনে বয়স আব অভিজ্ঞতা অর্থ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

সেদিন দুর্যোগ থামলে আমরা বাড়ি ফিবেছিলুম। দীর্ঘ পথে শরৎচন্দ্র গাডিব ভিতরে একটিও কথাবাতা বলেননি। সমস্ত পথ অন্যমনস্ক ছিলেন।

এর কয়েকদিন পরে এক সময়ে আমার কাছে এসে বলেছিলেন—আমি জানি, তুমি পেটে কথা বাখতে পারবেনা। মেযেমানুষের পেটে কথা হজম হয়না, ব্রহ্মশাপ আছে।

আমি সেদিন তাঁর পায়ে হাত রেখে বলেছিলুম—এই আপনাব পা ছুঁয়ে রাখলুম। কোনও দিন কথার নড়চড় করবনা।

করিনি শরৎদার কাছে কথার নড়চড়। মুখে কোথাও উচ্চারণ কবিনি। শরৎদাকে নিয়ে কিছু লিখিওনি আমি। লিখিনা। লিখতে পারিনা। লিখতে বসে কলম আটকে গেছে। মনে হয়েছে—সত্যভঙ্গ করছি।

৯

আপনা থেকেই শরৎচন্দ্রের কাছে যা জানতে পেবেছি এখন বলে যাব। বলা উচিত। সত্য তথ্য হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়। এখন সামাজিক সেইসব বাধা নেই। তাঁরা দুজনে নিন্দা-সুখ্যাতির অনেক উর্ধ্বে। এখন এই তথ্য কোথাও পারিবারিক মর্যাদায় ঘা দেবেনা। এখন মানুষেব সামাজিক মন লোহাব খাঁচায় কঠিন বন্দী নয়। সেদিন পরিবেশ পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল।

দ্বিতীয় তথ্য এই। ভাগলপুরে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হওয়াব কারণ জানতে চেয়ে অনেক লোকই তাঁকে পীড়াপীড়ি করতেন। তিনি এক এক জায়গায় এক একটি কারণ গল্প করতেন। কখনও বলেছেন—বাবাব সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য পাথর বিলিয়ে দিয়েছিলেন বলে বাবা তিরস্কাব কবেছিলেন—সেই অভিমানে নিরুদ্দিষ্ট হন। আবার কাউকে বা বলেছেন—মামার বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপুজোর পঙক্তিভোজে রক্ষণশীলেরা উচ্ছৃঙ্খল শরৎচন্দ্রের (যিনি অব্রাহ্মণের শব দাহ, অব্রাহ্মণের ঘরে বসবাস আহার-বিহার করেন) হাতের পরিবেশন গ্রহণ করতে আপত্তি করায়, সর্বসমক্ষে অপমানিত শবৎচন্দ্র সেই রাত্রেই ভাগলপুর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে সন্ন্যাসীদের দলে মিশে যান। এইরকম আরও দুই একটি গল্প তাঁর নিরুদ্দেশেব কারণ বলে লোকমুখে ছড়ান ছিল। তিনি কোনোটারই কোনও দিন প্রতিবাদ করেননি।

উল্লিখিত একটি গল্প আমরাও তাঁর মুখে শুনেছি আগে। নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ তিনি প্রকাশ করেননি লোকসমাজে। তখন আমরা হিন্দুস্থান পার্কে পাঁচ নম্বর বাসায় সাময়িকভাবে বাস করি। শরৎদা প্রতিদিনই পাঁচ নম্বরে আসতেন। একদিন

তাঁর মেজাজ খুবই বিষণ্ন ছিল। অন্যদিন যে-সময়ে আসতেন, তার প্রায় ঘণ্টা আড়াই আগে, বেলা তখনও তিনটে বাজেনি, শরৎদার পায়ের চটির আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে এলুম। বিষণ্নমূর্তি শরৎদা, সঙ্গে কোনও সঙ্গী নেই, একলা। এখানে যখন আসতেন, সঙ্গে প্রায়ই কেউ না কেউ সঙ্গী নিয়ে। আমাদের পরিচিত বা অপরিচিত কেউ। একলা শরৎচন্দ্রকে অসময়ে আসতে দেখে বলে ফেলেছি—এ কী বড়দা? এমন অসময়ে যে!

ব্যস্‌! চট করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—ভুল হয়েছে। এটা তোমার অসময় বুঝতে পারিনি। যাচ্ছি, পরে যথাসময়ে আসব। আমি ব্যাকুল হয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলুম।—লক্ষ্মীটি বড়দা, আমি খুশিই হয়েচি। মুখ দিয়ে বিস্ময়টা ঐরকম ভাষায় বেরিয়ে গেল। বসুন, গুণনিধিকে তামাক দিতে বলচি।

বড়দা হাসলেননা, কৌতুক করলেননা, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন —সাদাচুল বুড়ো হয়ে গেছি বলে রক্ষে। নইলে, এখুনি তাড়িয়ে দিতে। বলতে, আমার স্বামী এখন বাড়ি নেই, এমন অসময়ে আপনার আসা উচিত হয়নি। চলে যান। আমার সুনাম নষ্ট হবে।

আমি জিভ কেটে বলেছিলুম—বড়দা, যা মুখে আসে, তাই বলতে আপনার বাধে না? আমার কাছে আমার স্বামীর বন্ধুবান্ধবেবা যে-কোন সময়ে যখন খুশি আসেন, বসেন, খাওয়া দাওয়া করেন, তার কোনও সময়-অসময় নেই এটা কি আপনি জানেননা? আমার মনে কক্ষনও কিচ্ছুই হয় না, আমার স্বামীরও না। আসলে কি জানেন, আমাব তো কখনও মনেই থাকেনা আমি মেয়েমানুষ কিংবা পুরুষমানুষ!

এইবার তিনি প্রসন্ন হেসে চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর একটি নির্দিষ্ট ডেকচেয়ার ছিল, সেটি অন্য কাউকে কখনও আমরা ব্যবহার করতে দিতুমনা। গড়গড়া এল। আমি তাঁর চেয়ারের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে লাগলুম।

মাথার চুলে বিলি কাটায় তাঁর মেজাজ প্রফুল্ল হত। অন্য কোনও দিন বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুলে বিলি কাটতে দিতেননা। সামনে এসে বসবার জন্যে তাড়া দিতেন। বলতেন—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছিস, দুর্বল মানুষ, কষ্ট হবে। সামনে এসে বোস্‌, গল্প করি। মুখ দেখতে না পেলে গল্প করতে পারিনা।

দশ পনের মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে যে-মানুষ অস্থির হয়ে বসিয়ে দেন—সেই মানুষ নিঃশব্দে চোখ বুজে তামাক টানতে লাগলেন সমানে। কলকে নিবে আসছে দেখে গুণনিধি নিজে থেকে আগুন বদলে দিয়ে গেল। ওঁর কোনও খেয়ালই যেন নেই। আমার পা বেশ টনটন করছে তখন, কিন্তু মনে মনে জেদ করে আছি, উনি বসতে না বললে বসবনা। অনেক পরে সেদিন চৈতন্য হল তাঁর। তাও ব্যস্ত বা লজ্জিত হলেননা। শান্ত গলায় বললেন—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করছেনা?

আমি বললুম—করলেই বা!

ঘাড় উঁচু করে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—করলেই বা? আমি

ভেবেছিলুম বলবে—না, না, কিছু কষ্ট হচ্চেনা।

আমি বললুম—মিথ্যে কথা বলব কেন?

আবার তিনি একটু অবাক সুরেই বললেন—মিথ্যে কথা বলতে গরজ নেই তোমার? তাই তো!

তারপরে আবার চুপচাপ। আমি তখন বেশ একটু রেগে গেছি। তাঁর সামনে গিয়ে নিচু চৌকির ওপরে দুম করে বসে পড়ে বললুম—না-ই বা কেউ আমাকে বসতে বলেন, তাতে আমার বসা কিচ্ছু আটকায়না।

উদাস হাসলেন। বললেন—কিন্তু বেশ আটকাচ্ছিল সেটা তো দেখা গেল স্পষ্ট। নরেন আসুক, সে কাকে ডিগ্রি দেয় দেখা যাবে।

আমি জবাব দিলুম না। জানি, এই চুপ করে থাকাটা শরৎদা একেবারেই সইতে পারেননা। কথা কওয়াবেনই।

শরৎদা এদিন দারুণ সিরিয়স মুডে। এই মুডের শরৎচন্দ্রকে বেশ ভয় পেতুম। তিনি আস্তে আস্তে বললেন—তোমরা, মেয়েরা, তোমাদের নিজেদের হাত পা মাথার চেয়েও বেশী দাম দাও, অন্য লোকে কে কী বলবে, কে কী ভাববে! সুনাম জিনিসটার জন্যে তোমরা পারনা এমন কাজ নেই। আশ্চর্য!

আমি তো তখন মনে মনে আড়ষ্ট। ওঁর কথার তাৎপর্য যে কী, কিছুই আন্দাজ করতে পারছিনা। অস্বস্তিতে নিশ্বাস রোধ করে নিস্তব্ধ আছি।

উনি আপন মনে বলে চলেছেন—এ আমি এমনিই অদ্ভুতরকম দেখেচি, আর দেখচি জীবনভব—কিছুতেই এব মূল্যটা কোথায় খুঁজে পাইনি। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বকে, নিজের সহজ প্রকৃতিকে, নিজের রক্তমাংসকেও এমন করে অস্বীকার করে একটা বানানো ফানুস হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে—এটা মেয়েমানুষ জাতকে না দেখলে বিশ্বাস করতুমনা।

আমার অস্বস্তি ক্রমশই বাড়ছে। শেষে মুখ খুললুম। কার কথা মনে করে এসব কথা মনে হচ্চে বড়দা?

—যার কথায় তিন ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেছলুম।

—সে কী?

—হ্যাঁ। একটা চিরকুট এসেছিল। 'আপনি এ দেশ ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যান। আর এখানে আসিবেন না। আমাকে এভাবে নষ্ট করিবেন না।'

—আপনি তো চন্দননগরে বলেছিলেন, বার্মা গিয়েছিলেন চিঠি পেয়ে। প্রথমবার তো নিরুদ্দিষ্ট হন বাবার ওপরে অভিমান করে।

না। দ্বিতীয়বারে অপরাধ করেছিলুম ; একটা চিঠি লিখে ফেলেছিলুম। নির্দোষ *নির্মল সে-চিঠি। কিন্তু, সেটা অন্য লোকদের হাতে পড়েছিল। চিঠি লেখাটাই তো* মৌলিক অপরাধ। ভালমন্দের প্রশ্নই ওঠেনা। ফলে—ডাকযোগে নির্বাসনদণ্ড এসে গেল। আর, প্রথমবারে ঠিক তা নয়।

আমি বুঝেছিলুম, যে-কারণেই হোক আজ শরৎদার মনের ভিতরটায় খুবই একটা তোলপাড় চলেছে। আমার মনে যথেষ্ট উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা হলেও, কিছুই যে করার নেই, এটা জানতুম। সম্পূর্ণ নীরব থাকাই এই সময়ে ভাল। কোনও কারণে বিচলিত মানুষটির মন হয়ত এখানে দুটো একটা কথা বলে হালকা হতে চাইছে। এখন কথা না বলে মন দিয়ে শোনাই উচিত। আমার অনুমান ভ্রান্ত হয়নি। সেইদিন শরৎচন্দ্র নিজে থেকেই বলেছিলেন উপরের তথ্যটি। এটি নিয়ে আমি কৌতূহল মেটাবার জন্য কোনও প্রশ্ন কখনও তাঁকে করিনি। জানতুম, ওখানটা তাঁর সবচেয়ে বেশী নরম জায়গা, গোপন জায়গা, পবিত্র জায়গাও বটে।

ভাগলপুর থেকে আর কলকাতা থেকে শরৎচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার প্রকৃত কারণ বিশ্বসংসারে একটিই মাত্র মানুষ তখন জানতেন—তিনি নিরুপমা দেবী।

সেই চিরকুটে লেখা লাইন ক'টি শরৎচন্দ্রের বুকের পাঁজরে আগুন-অক্ষরে উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। তাঁর সাহিত্যে বারবার শুদ্ধচারিণী বালবিধবার মুখে ফুটে উঠেছে—ঐ একই কথা। যা তিনি নিজে পেয়েছিলেন একটি কঠোর নিষ্ঠাশীলা বালবিধবার কাছ থেকে। তাঁর 'মন্দির' গল্পে পড়ি—'কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল—আর তুমি আমার সামনে এসো না।' পড়ি—'কঠিন স্বরে অর্পণা চম্পকাঙ্গুলি দিয়া বহির্দেশ দেখাইয়া বলিল—যাও—'

'বড়দিদি'তে অন্তঃপুবিকা বালবিধবা মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে নিজের হৃদয়ের অন্তঃপুরে অনধিকার প্রবেশ করতে দেখে ভয়ে আতঙ্কে তাঁকে বাইরে থেকে তাড়িয়ে দিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুদ্ধিমতী মাধবী সুরেন্দ্রনাথকে নৈকট্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলাফলের কথা এখানে তুলছিনা।

তারপরে দেখা যায়, শুধু পরিবারের পটভূমিকায় নয়, গোটা 'পল্লীসমাজে'রই পটভূমিকায কঠোর সংযমপরায়ণা হিন্দু বালবিধবা রমা। রমার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, বিচারশক্তিশালিনী মেয়েরও মুখ থেকে সেই একই কথা আগুনের অক্ষরে অবিকল উদ্ধৃতির মত বেরিয়ে আসে—'আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে ক্ষতি। আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট করো না, তুমি যাও—যাও এদেশ থেকে।'

'পথনির্দেশ' বইতে হেম প্রকৃতিগত বিদ্রোহিনী। হিন্দু বালবিধবা তাকেও হতে হয়। সেও প্রার্থী গুণীন্দ্রকে কঠোর প্রত্যাখ্যান করে। তবে, তার প্রত্যাখ্যান সংস্কার-অন্ধতায় বা সমাজভীতিতে নয়, অভিমানে। বালবিধবাদের কঠোর সংযম, হৃদয়ভরা অকৃত্রিম প্রেম, আর নৈকট্য থেকে প্রিয় ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, সকলেরই মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে প্রকাশিত।

ভাগলপুরে একটি ছোট চিরকুট পেয়ে শরৎচন্দ্র উধাও হয়ে গিয়েছিলেন এটি সত্য। শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা এই নারীর জীবনে এই 'নষ্ট করা' বা নষ্ট হওয়া

ভয়টি নিতান্ত অমূলক ছিল। শরৎচন্দ্র কোনও দিনই তাঁর ইচ্ছার উপর নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেননি। করতে চাননি কখনও। অথচ, এই একই ভয়, একই চিন্তা ফিরে এসেছে 'পথনির্দেশে' হেমের মুখেও।

'বুঝেই বলচি। তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যা বলচো, আমি স্পষ্ট কবে তোমার মুখের সামনেই তা বলচি। তুমি আমাকে নষ্ট করতে চাও। বিধবার আবাব বিয়ে কি গুণিদা?'

এই 'নষ্ট করা' শব্দটি শরৎচন্দ্রের মনে তীক্ষ্ণ-বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার অনুমান। যেহেতু, নিরুপমাকে সামাজিক অর্থে নষ্ট করা তাঁর কল্পনারও অনেক সুদূরে ছিল সন্দেহ নেই।

নিরুপমা তাঁর কাছে প্রথম থেকে বরাববই অতি মূল্যবান একটি পবিত্র আধারের মত। তাঁর সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাকে পর্যন্ত অত্যন্ত সাবধানে, সতর্ক যত্নে তিনি মনে মনে নাড়াচাড়া করতেন। যেন ভেঙে না যায়, হাতের দাগে মলিন না হয়, কোনোখানে 'খুঁতে' হয়ে না যায়। প্রিয়জনের এই দুর্লভ দুর্মূল্য অনুভবটির যথাযথ মূল্য নির্ণয বা মান নির্ণয় নিরুপমা করতে পেবেছিলেন কিনা, বুঝতে পারা যায়না। হয়ত বা একে সামান্য মানে দেখে, সাধারণ মনে বুঝে ভুল কবে ছোট আয়তনের মধ্যে নিরুপমা ধরেছিলেন। সেইজন্যই তিনি এত ভয় পেতেন। শরৎচন্দ্রের বাইরেটা মোটামুটি সামান্য ছিল। কলঙ্কও ছিল কিছুটা। নিরুপমা তাঁর জ্যোতির্ময় সত্তাটিকে বাইরের তুচ্ছ আবরণের মধ্যে ঝাপসা দেখেছিলেন কি? যেমন, তাঁর কাছে 'ধর্ম' আব 'ধর্মকর্ম' এক হয়ে গিয়েছিল। শরৎচন্দ্র হাজার চেষ্টা করেও দুটিব মধ্যে যে আশমান-জমিন ফারাক সেটি তাঁকে বোঝাতে পারেননি। তেমনি তাঁর কাছে হযত ভালবাসা অর্থাৎ শুভ-বাসনা (ভাল-শুভ, বাসা-বাসনা) মৌলিক অর্থে প্রকাশিত না হয়ে 'কামনা' রূপেই শঙ্কিত করে তুলেছিল। শরৎচন্দ্রের স্বভাবে তো 'দেওযা'ই ছিল প্রধান, তা কি তাঁর অগোচরে থেকেছে? দিতে পারাটাই ছিল তাঁর আনন্দ, নেওয়ার দিকটায নজর ছিলনা। দিতে পারলেই যেন পাওয়ার তৃপ্তি অনুভব করতেন। চেয়েছেন কি কখনও কিছু? মনে তো হয় না। তাঁকে দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছিল, এইখানেই ছিল তাঁর কষ্ট, আমার যতদূর অনুমান হয়।

পাছে প্রতিদানের অবশ্যকর্তব্যে পড়ে যেতে হয় এই আশঙ্কায় নিরুপমা নিতে পারতেননা কিছুই, কেবলই ঘা দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আঘাত করেছেন বারবার।

তাঁকে চিঠি লেখার অপরাধে (হয়ত সে-চিঠি অন্যের হাতে না পড়লে কিছুই ঝামেলা হতনা) ভাগলপুর থেকে কলকাতাতে চিঠি লিখে ভর্ৎসনা করাটা নিরুপমার পক্ষে অনর্থক ভয়ের প্রকাশ বলে আমার মনে হয়েছে। কিন্তু প্রথম নিরুদ্দেশের সময় ভাগলপুর ছেড়ে দূরে সরে যেতে বলাটা বোধহয় অযৌক্তিক হয়নি। সে-সময়ে শরৎচন্দ্রের লাগাম-ছেঁড়া মন, বাঁধনশূন্য জীবন নিরুপমা দেবীর পক্ষে

পারিবারিক এবং মানসিক নিরাপত্তা নষ্ট করার হয়ত বা অনুকূলেই ছিল। নিরুপমা সদা-সতর্ক থাকতেন, যাতে ভুল করেও কোনও দুর্নাম না রটে।

পরে আমার মনে হয়েছিল, সেদিন তিনি অত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন কেন? সেদিন কি তিনি কোনও চিঠি পেয়েছিলেন, বা কোনও আঘাতকর সংবাদ?—বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়ে অন্যত্র এসে অমন অবসন্ন মুহ্যমান হয়ে রইলেন কেন? —সুস্পষ্ট জানতে পারিনি কিছু।

১০

নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর পরে কোনও একটি অখ্যাত পত্রিকায় বেরিয়েছিল—শরৎচন্দ্র ও নিরুপমা দেবীর মধ্যে ভালবাসা ছিল। নিরুপমা দেবীর সাহিত্য-জীবনে শরৎচন্দ্রের কিছু দানও আছে। তিনি নিরুপমাব রচনা সংশোধন করে দিতেন। এমনকি, 'অন্নপূর্ণার মন্দির' বইখানিতে শরৎচন্দ্রেব হাত আছে।

এই দায়িত্বহীন খবরটি পড়ে উপন্যাসলেখিকা অনুরূপা দেবী অত্যন্ত বিচলিত ও উত্তেজিত হন। 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় অতি কঠোর, অসংযত ভাষায় মৃত শরৎচন্দ্রকে প্রচুর কটূক্তি করেছিলেন। তিনি বলেন, অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের শুদ্ধাচারিণী ব্রাহ্মণ-বিধবা নিরুপমার সঙ্গে—বাড়ি থেকে বিতাড়িত, দুশ্চরিত্র, নেশাখোর মূর্খ বাউণ্ডুলে শরৎচন্দ্রের কখনও কোনওদিন কোনও সম্পর্ক ছিলনা। থাকা সম্ভবও ছিলনা। নিরুপমা কড়া পর্দানসীন অভিজাত পরিবারের মেয়ে ছিলেন। অনুরূপা তাঁর ঘনিষ্ঠ সখী এবং সাহিত্যসৃষ্টির উৎসাহদায়িনী ছিলেন। শরৎচন্দ্রের প্রেরণায় নয়, সুরূপা ও অনুরূপা দেবীর প্রেরণায় আর প্রভাবে নিরুপমা সাহিত্যে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র জীবনে নিরুপমাকে কখনও চাক্ষুষ দেখেনওনি। তাঁর ছোটদা বিভূতি ভট্ট নিরুপমার লেখা তাঁদের সাহিত্যসভায় দেখাতেন, হাতে লেখা 'ছায়া' পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। সেই সূত্রে নিরুপমার পরিচয় শরৎচন্দ্র জেনেছিলেন মাত্র। আসলে শরৎচন্দ্র ভাল লোক ছিলেননা, নিজেকে সম্মানিত করার মতলবে এইসব বাজে আপত্তিজনক গল্প রটনা করেছেন।

অনুরূপা দেবীর সেই তীব্র কটূক্তিপূর্ণ লেখাটির প্রতিবাদ করার জন্য প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র ও নিরুপমার সাহিত্যজীবন শুরুর সময়ে অনুরূপার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব তথ্য তুলে তিনি লিখেছিলেন। অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা তাতে ছিল। সে-লেখার প্রতিবাদ অনেক পরের যুগের মানুষ আমরা, কোন সূত্র নিয়ে করতে পারি? সমকালীন মানুষ উপেনবাবু, সুরেনবাবু, সৌরীনবাবু এঁরা সেই সাহিত্যচক্রে যুক্ত ছিলেন, এঁরা করলেও করতে পারেন, আমরা বলেছিলাম। তারপরে আমি নিরুপমা দেবীরই বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা স্মৃতিচারণা থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গী আর ঘটনাগত তথ্যগুলি উদ্ধৃত করে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রতিবাদের আকারে পাঠাই। প্রকাশক

হরিদাসবাবু ও সম্পাদক জলধর সেন সেই রচনাটির শিরোনাম দিয়েছিলেন "নিরুপমা দেবীর মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ"। এটি নিয়ে সে-সময়ে কিছুটা আলোড়নও হয়েছিল। নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর পরেই এটি ঘটেছিল। প্রতিবাদটিতে ওঁদের দেওয়া নামটি আমার পছন্দ হয়নি।

আমি এখানে ১৩৪৪ সালের 'ভারতবর্ষ'খানি হাতের কাছে পেয়েছি। এখান থেকে নিরুপমা দেবীর শরৎচন্দ্র সম্পর্কে মনোভঙ্গি কি রকম ছিল পাঠকদের জন্য কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে দিই। এতে নিরুপমা দেবীর মনের চেহারাটি কিছুটা আমরা দেখতে পাব।

(নিরুপমা দেবীর লেখা)

'আজ তাঁহার* শ্রাদ্ধ তিথিতে একটা শ্রাদ্ধ তিথির কথা মনে পড়িতেছে। যাহাতে তিনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় অবরোধপ্রথাবিশিষ্ট গৃহান্তঃপুরের মধ্যে আত্মজনের মত প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেদিন আমার স্বামীর সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধদিন। উক্ত যমানিয়া নামক গঙ্গাব ছাড়ের উপরে আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি ঠাকুরবাড়ি ছিল। তাহাতেই উক্ত অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আমার এক মাতৃতুল্যা বিধবা ভ্রাতৃজায়া আমাকে সেইখানে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলে দেখিলাম—দাদারা বা ভগ্নীপতি কেহই সেখানে উপস্থিত হন নাই। (বোধ হয় দুঃখে) মাত্র ছোটদা আর একজন কাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিতেছেন। পরে বুঝিয়াছিলাম, তিনিই শরৎদাদা। উক্ত কার্যের দান আদির মধ্যে তাঁহাদের একটা ভুল হওয়ায় কিছুক্ষণ পরে সসঙ্কোচে আমি পুরোহিতকে তাহা নিবেদন করিলে তাঁহারা সেটি সংশোধনার্থে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং অসঙ্কোচে বড় ভাইয়ের অধিকারে আমাকে উদ্দেশ করিয়া শরৎদাদা বলিলেন—"দ্যাখো দেখি, কতটা হাঙ্গামে পড়তে হল—ভুলটা এতক্ষণ পরে ধরিয়ে না দিয়ে তখনি দিলে না কেন?" আমি খুবই অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম।

সেদিন ঘৃত মধু ইত্যাদির গন্ধে একটা ভীমরুল উক্ত শ্রাদ্ধকার্যের মধ্যেই আমাকে মোক্ষমভাবে কামড়াই ধরিয়াছিল; কিন্তু সেটা এমন সময়, যাহার মধ্যে চঞ্চল হওয়া বা আসন ত্যাগ করা উচিত মনে হয় নাই। যখন সেটা রক্ত বহাইয়া দিয়াছে, তখন তাঁহারা জানিতে পারিয়া বিষম ব্যস্তভাবে তাহার প্রতিষেধার্থে ছুটাছুটি বাধাইয়া দিলেন। ছোটদার সঙ্গেই শরৎচন্দ্র ব্যাকুলভাবে 'একবার দধি, একবার মধু লইয়া বিদ্ধ স্থানে দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।—শ্রাদ্ধান্তে যখন উক্ত ভ্রাতৃজায়ার

*—'আজ তাঁহার শ্রাদ্ধ তিথিতে'—অর্থাৎ শরৎচন্দ্রেব শ্রাদ্ধ তিথিতে। শরৎচন্দ্রের তিরোধানের এক মাস পরে নিরুপমা দেবীর এই লেখাটি ১৩৪৪ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। নিরুপমা দেবীর মৃত্যুর মাসখানেক বাদে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় অনুরূপা দেবীর শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অপ্রিয় রুক্ষ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল।

সঙ্গে বাড়ি ফিরিতেছি—দেখি তখন শরৎদাদা আমাদের বাড়ির দিক হইতে পুঁটুলির মত কি লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ছোটদার হাতে দিলেন। ছোটদা তাহা ভ্রাতৃবধূর হাতে দিলে দেখি একখানা পাড়ওয়ালা কাপড় ও হাতের গহনা—শ্রাদ্ধের পূর্বে যাহা বাড়িতে খুলিয়া রাখা হইয়াছে। মনের উত্তেজনায় বোধ হয় সে সময়ে আবার সেগুলো লইতে অনিচ্ছা প্রকাশই হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সে জিদ সেদিন জয়ী হইতে পারে নাই। মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া তো কাঁদিতেই ছিলেন—ছোটদা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতেছে এবং একজন বাহিরের লোক—তিনিও তাহাদের সঙ্গে কাঁদিতেছেন—এ দৃশ্য সেদিন শোকে মূঢ় ব্যক্তিকেও নিজ কার্যে লজ্জা আনিয়া দিয়াছিল।'

এই ঘটনাটির উল্লেখে এবং আরও অনেকগুলি নিরুপমা লিখিত শরৎচন্দ্র-সম্পর্কিত তথ্যে মাননীয়া অনুরূপা দেবী আর নিজের ভ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেননি।

এই 'দেখা' হবার অনেক আগে থেকেই নিরুপমা ও শরৎচন্দ্র সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে পরিচিত হয়েছিলেন। ভাগলপুরে কয়েকটি অল্পবয়সী বন্ধু মিলে সাহিত্য আলোচনার জন্য যে ক্ষুদ্র সভা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলেছিলেন—এ সম্বন্ধে নিরুপমা দেবীর লেখা উদ্ধৃত করছি।

'শ্রীমান সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, আমার ছোটদা—ইঁহাদের সঙ্গেই আমার প্রতিযোগিতা চলিত। শরৎদাদাই বিষয়-নির্বাচন করিয়া দিতেন এবং ছোটদার মারফত আমি পাইতাম।...সমালোচনা শক্তির বিকাশও শরৎচন্দ্র সাহিত্য-সঙ্গীগুলির মধ্যে আনিবার নানাবিধ পথনির্দেশ করিতেন।...এইরূপে সেই ক্ষুদ্র সাহিত্যসভার আদি গুরুস্থানীয় ছিলেন।'

নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কী রকম মনোভাব পোষণ করতেন, লোকসমক্ষে চিরদিন অপ্রকাশিত থেকে গেছে। শরৎচন্দ্রের কাছে কিন্তু অপ্রকাশিত ছিলনা। শরৎচন্দ্রের ভিতরকার শিল্পী মানুষটিকে এই অন্তঃপুরে অদৃশ্য দূরবর্তিনী যে প্রথম থেকেই চিনেছিলেন, তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটি ছোট গল্প। একদিন নিরুপমার দাদা—"আমাদের সেই ক্ষুদ্রপরিসর সাহিত্যচক্রে (যাহাতে তদানীন্তন বাঙলার বিখ্যাত লেখকদিগের গদ্য, উপন্যাস এবং কাব্য কবিতাদি পঠিত ও আলোচিত হইত, সেইখানে) তাহা হাজির করিলেন। অতি সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত, নাম 'অভিমান'। শুনিলাম, দাদাদের উক্ত বন্ধু শরৎচন্দ্রই ইহার লেখক। গল্পটি পড়িয়া যখন আমরা সকলে অভিভূত, তখন মেজদা সাড়ম্বরে গল্প করিলেন যে,—এই গল্পটি পড়ে একজন ন্যাড়াকে মারতে ছুটে। তাকে তখন এই পাঠকের ভয়ে ক'দিন লুকিয়ে বেড়াতে হয়। ক্রমে বৌদিদি, দাদার নিকটে তাঁহার বন্ধুর সম্বন্ধে আরও কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন। আমরা তখন 'অভিমান'-এর লেখকের উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই উদাসী কবি-স্বভাববিশিষ্ট লেখকটিকে আমাদের বাসার পশ্চিম দিকে যে প্রকাণ্ড

মসজেদ ছিল, (শুনা যাইত তাহা নাকি শাজাহানের আমলের) তাহার বৃক্ষছায়াময় পথে কখনো কখনো দেখা যাইত। কোনো গভীর রাত্রে সেই মসজেদের সুউচ্চ প্রাঙ্গণচত্বর হইতে গানের শব্দ, কখনো 'যমানিয়া' নদীর (গঙ্গার ছাড়) তীর হইতে বাঁশীর আওয়াজ ভাসিয়া আসিলে মেজদা মেজবৌকে শুনাইয়া বলিতেন—'এ ন্যাড়াচন্দ্রের কাণ্ড!'...আমাদের দল একদিন সেই স্মৃতিসমাধি হইতে বায়ুপথে ভাসিয়া আসা গানের একটি লাইন আবিষ্কার করিল—

'আমি দু'-দিন আসিনি—দু'-দিন দেখিনি
অমনি মুদিলি আঁখি—'

এই স্মৃতিচারণায় লেখিকা সব কথাই যদিও বহুবচনে বলে চলেছেন, তবু একটি লক্ষণীয় আছে। ঘটনাটি তিনি প্রায় চল্লিশ বছর আগের তাঁর স্মৃতি থেকে তুলে আনছেন। একদা বাতাসে ভেসে আসা সেই গানের পঙক্তির কথাগুলি, তাঁর বর্ণিত 'দলে'র কারুর স্মৃতিতে এমন স্থির হয়ে থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। এতে অনুমান করা ভুল না হতে পারে, সেই কড়া অবরোধে বন্দিনী তরুণীটির শিল্পীহৃদয়ে ওই উদাসী তরুণটির বাঁশীর সুর, গানের কলি, সাহিত্যশিল্পের অন্তস্পর্শিতা গভীরভাবেই স্পর্শ করেছিল। তিনি চল্লিশ বছরেও সেই ভেসে আসা গানের কলিটি ভুলে যাননি।

নিরুপমা দেবীর মুখেব কথাই আবার শোনাই :

'দাদাদের বৈঠকখানায় তাঁহার কণ্ঠের আরও গান আমরা ভিতর হইতে শুনিয়াছি। কিন্তু বাঁশী কখনও সে সব বৈঠকের মধ্যে তিনি বাজান নাই। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বচিত আরও একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল :

"গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল
আঁধার আজি কুঞ্জবন।"

আমাদের পাড়া খঞ্জপুরেরই তিনি অধিবাসী ছিলেন, সেজন্য উক্ত মসজেদ, নদীতীর প্রভৃতি তাঁর বিচরণ স্থান ছিল এবং দাদাদেব কাছে প্রায়ই আসিতেন। হঠাৎ একদিন জানিতে পারিলাম—তিনি আমাদের ছোটদাদারই বিশিষ্ট বন্ধু। ইহাতে আমাদের দল বিশেষ গর্বই বোধ করিয়াছিল।

আমি সে সময়ে অজস্র কবিতা লিখিতাম। ছোটদা তাঁহার নিজের কবিতার সঙ্গে আমার লেখাও তাঁর সম্মানিত বন্ধুকে দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাঁহার হস্তাক্ষরে ওই সব কবিতা সম্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া তুলিত।...পরে শুনিলাম শরৎদাদা নাকি তাঁহাকে (ছোটদাকে) বলিয়াছেন, ওই একটি ভাব একটি কথা ছাড়া বুড়ি যদি আরও পাঁচ রকম ভেবে লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে।...তাঁহাদের এইরূপ মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়া তাঁহাদের খুশি করি,—তাহার কয়েক ছত্র মনে পড়িতেছে।...

ধরণীর কোমল বুকেতে কত শান্তি ঢাকা আছে ভাই,
নদী তীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি ঘুমায়েছ তাই।

নদী গায় সকরুণ তান, হু হু করে উঠিছে বাতাস,—
এ বুঝি তোমাবি খেদগান,—এ বুঝি তোমারি দীর্ঘশ্বাস। ইত্যাদি

আজও মনে আছে—সেই ক্রম-বর্ধিতাকার খাতাখানার কথা,—যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে তাঁহার তরুণ জীবনের সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল।'

আমি শরৎচন্দ্রের মুখে একাধিক বার শুনেছি—বুড়িকে কবিতা লেখা ছাড়িয়ে গদ্য লেখা উপন্যাস লেখা আমি শিখিয়েছি হাতে ধরে। এই 'হাতেধরে শেখানো' কথাটির মানে, লেখিকা তাঁর রচনাগুলি অন্দরমহল থেকে বাইরে শরৎচন্দ্রের হাতে পাঠাতেন, আর শরৎচন্দ্র সেই রচনা বিশেষ যত্ন করে সংশোধন করে তার সঙ্গে নানা মন্তব্যে (সাহিত্য সম্পর্কিত) নিরুপমাকে লিখে পাঠাতেন। নিরুপমা অনুগতা ছাত্রী হয়ে সেগুলি গ্রহণ করতেন। জনসমাজে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের লেখাতে পরবর্তী কালে যে নিরুপমা দেবী তাঁব মতামত লিখে পাঠাতেন এ-খবরটি উহ্য ছিল। এইটি একটি জরুরী তথ্য।

শরৎচন্দ্র বিদেশ থেকে বিভূতিভূষণ ভট্টকে চিঠি লিখতেন। সেই চিঠিব সঙ্গে নিরুপমাকেও নিরুপমার রচনা সম্বন্ধে মতামত জানিয়ে বা সাধারণ কুশল প্রশ্ন করে সংক্ষিপ্ত চিঠি দিতেন। একবার নিরুপমাকে লেখা শরৎচন্দ্রের কোনও একখানি চিঠি নিয়ে পরিবারের মধ্যে অসহিষ্ণু আপত্তি ওঠে। তার পরেই নিরুপমার হাত থেকে সংক্ষিপ্ত কয়েক লাইন চিঠি আসে কলকাতায়,—যার ফলে শরৎচন্দ্র নিজেকে সকলের সামনে থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা করেন। অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট হন। তিনি সাহিত্যচর্চাও এই সময়টিতে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। কারণ, সাহিত্য নিয়েই নিরুপমার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র। সাহিত্য ছাড়লে নিরুপমার সঙ্গে সম্পর্কও বিলুপ্ত হয়। তাই হয়ত কলম পরিহার করেছিলেন। এর আগের বার ভাগলপুরে এই একই ব্যাপার ঘটেছিল। শরৎদার বর্মা চলে যাওয়ার খবরটি চন্দননগরে তাঁর মুখে শুনেছিলাম, এর কয়েক বছর পরে হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে ভাগলপুরের প্রথম নিরুদ্দেশের কারণটি তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনেছি। এদিন আমি প্রশ্ন করিনি,—তিনি আপনা হতেই বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের লেখা যখন 'যমুনা'য় আর 'ভারতবর্ষে' ছাপা হতে লাগল নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের লেখার উপরে নিজের মতামত তাঁকে মাঝে মাঝে লিখে জানাতেন। এর আগেও, ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের রচনার খাতা নিরুপমার ছোটদা নিরুপমাকে পড়তে দিতেন—শরৎচন্দ্রের সেই লেখা সম্পর্কে নিরুপমার মতামত শরৎচন্দ্রের হাতে পৌঁছুত। এইখান থেকেই নিরুপমার সাহিত্যবোধ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধার উদ্ভব। সকলের দৃষ্টির আড়ালে দুটি তরুণ তরুণীর সাহিত্যকে অবলম্বন করে বন্ধনহীন হৃদয়ের গ্রন্থনা ভাগলপুরেই গ্রথিত হয়েছিল।

নিরুপমা শরৎচন্দ্রকে তাঁর রচনা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বর্মাতে। শরৎচন্দ্রের কোনও উপায় ছিলনা উত্তর দেবার। তিনি তাঁর মন খুলতেন নিজের মুদ্রিত রচনারই মধ্যে। সাহিত্যের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকত তাঁর নিজের মনের ভাবনা চিন্তা সুখ দুঃখ। যথাস্থানে পৌঁছতেও গোলমাল হতনা।

শরৎচন্দ্র বালবিধবা চরিত্র না আঁকলে ভাল হয় এই অনুরোধটি, কবে, কোনখানে নিরুপমার কাছ থেকে এসেছিল আমি জানিনা। অনুরোধটি নিরুপমাদেবীর, এইমাত্র জেনেছি শরৎদার নিজের মুখ থেকে। আমি নিজে ঐ নিয়ে শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করতে সাহসী হইনি কখনও। নিরুপমার কাছে শপথ তিনি ভাঙেননি তাঁর জীবনে। এখানে শরৎচন্দ্রের মন অসহ স্পর্শাতুর ছিল, ভাল করে জানি। প্রশ্ন করার উপায়ই ছিলনা কোনও লোকের। তাঁর উপন্যাসের কথোপকথনে, নায়ক নায়িকাদের আভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণে, শরৎচন্দ্র মেয়েদের সংস্কারান্ধ দৃষ্টিব সামনে নারী-হৃদয়েব যথার্থ রূপটি খুলে ধরতে চেয়েছেন।

১১

দীর্ঘদিন ধবে প্রচুর উপরোধে পড়ে আমি কলম ধরেছি। স্বেচ্ছায নয। সোৎসাহেও নয়। আমার লেখা অনেকের পছন্দ না হতে পারে। কারণ, জীবনের সত্য প্রায়ই অপ্রিয় হয়ে থাকে। আমার লেখা জীবন-নির্ভর। এই লেখা কোনও গবেষণা নয় —কল্পনাব তো প্রশ্নই ওঠেনা। কারুর কোনও থীসিস প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা আমার কাজ নয। যা একান্ত সত্য বলে নিজে জানি, শুধু সেটুকুই লিখছি। যে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সংশয় আছে বা যে-কথা আমার সুস্পষ্ট মনে নেই, সেই বিষয়গুলিতে আমি একেবারেই হাত দিচ্ছিনা।

কোনও গবেষকের সিদ্ধান্ত যদি সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যনির্ভর হয়, তবে আমার 'কাল্পনিক' উক্তিতে তাঁর বিচলিত হওযা যুক্তিযুক্ত নয়। আমার সাধ্য কী, যা সুপ্রতিষ্ঠিত, তাকে 'কাল্পনিকতা ও অসত্যে'র সাহায্যে 'নিজের উদ্দেশ্য সাধনে' ব্যবহাব করি।

শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করেননি। যে যাই নিন্দাবাদ করুন, আমার যা সুনিশ্চিত জানা, আমি তাই জানিয়ে যাব। আমার 'ইষ্ট' একটিই, আমাব 'উদ্দেশ্য' একটিই—মানুষ শরৎচন্দ্রকে বাস্তব সত্যের আলোয় সুস্পষ্ট করা।

যে ভ্রান্ত প্রয়াস ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ছিল, ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তার সমাপ্তি ঘটেনি। আশা করি, ভবিষ্যতের গবেষকরা এটি লক্ষ করবেন। শরৎচন্দ্রের ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য যে ভ্রান্ত উপায় একদিন এখানে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এখনও হযে চলেছে, তার ফলে তাঁর ভাবমূর্তি যে ঝাপসাই হয়ে যাচ্ছে, এটি এঁদের নজরে আসেনা।

সমাজরক্ষকদের অঞ্চলছায়ায় তিনি কোনও দিনই বাস করেননি, বর্তমানেও সেই অঞ্চলছায়া তাঁর যশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন নেই।

আমি মনে করিনা শরৎচন্দ্রের জীবনে কোথাও এমন কোনও কলঙ্ক আছে যা ভবিষ্যতের কাছে প্রকাশ করা যায়না বা গোপন রাখা প্রয়োজন। যতদিন সমকালের প্রয়োজনে, বিশেষ ব্যক্তিদের প্রয়োজনে গোপন রাখা উচিত ছিল, গোপন রাখা হয়েছে। তাঁর জীবন ছিল খোলামেলা—তাতে ঘোমটা টেনেছেন তাঁর আত্মপরিজন আর বন্ধুবান্ধবরাই, নিজেদের সামাজিক আর লৌকিক প্রয়োজনে। তিনি নিজে আপন জীবনের উপর ঘোমটা টানেননি।

এই ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশক্ষণে শরৎচন্দ্রের আত্মীয় পরিবারের মধ্যে যাঁরা এ সম্পর্কে যতটুকু অবহিত, তাঁরা সত্য উচ্চারণ করতে পারলে ভবিষ্যৎকালের কাছে দায়িত্বপালন করে যাবেন। শরৎচন্দ্রের বন্ধুপর্যায়ভুক্ত প্রিয় মাতুল উপেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের পরিবারের লোকেরা এ সম্পর্কে যা জানেন, কুণ্ঠা না করে উচ্চারণ করতে পারলে বাংলাসাহিত্যের কাছে তাঁদের দায়িত্বপালন করে যাবেন। এ-সত্য উচ্চারণে এখন সংসারে বা সমাজে কারও কোনও হানি হবেনা। কেবলমাত্র সংস্কার-দুর্বল মনে কিছুটা অস্বস্তি ঘটবে—উপায় তো তার নেই।

দুঃখেব বিষয় আমাদের দেশে ষাট বছর সময় কেটে গেলেও, সেই একই মনোবৃত্তি সজীব রয়েছে,—যে-মন সংস্কারকে সত্যের আগে স্থান দেয়। সংস্কারের চাপে সত্যকে অস্বীকার এবং অপ্রমাণ করতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সেই মন নিয়েই আমাদের দেশের গবেষকরাও কাজ করেন যদি, এটি একান্তই হতাশার বিষয় হবে নাকি?

যথার্থ সত্যভাষণে শরৎচন্দ্রের চরিত্রহনন হতে পারেনা। বিবাহ না করা সত্ত্বেও তিনি যে তাঁর জীবনসঙ্গিনীর প্রতি নিজের জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নানা বিরুদ্ধতার মধ্যেই যাবতীয় মানবিক কর্তব্য পালন করে গেছেন,—অন্যে অসম্মানের মনোভাব গোপনে পোষণ করলেও নিজে তিনি তাঁকে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন, এইটিই মানুষ-শরৎচন্দ্রের বড় কথা। মানুষ শরৎচন্দ্রের দুটি বিশেষ পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

প্রথম—তিনি বাইরের সামাজিক সংস্কারকে আপন জীবনে তাচ্ছিল্য করেছিলেন। আপন হৃদয়ের বা মানবিক নীতির সংস্কারই তাঁর কাছে প্রধান ছিল।

দ্বিতীয়—তিনি মানবিকতার দায় নিয়ে জীবন পালন করেছেন, সমস্ত জীবন স্বেচ্ছায়। কোনও সামাজিক বা ধর্মীয় আদালতের আইনের আওতায় থাকেননি। ঈশ্বরের একটি অদৃশ্য মহৎ আইনে তাঁর বিশ্বাস আর নির্ভরতা. ছিল।

এই দুটি সত্য হিরণ্ময়ী দেবীকে ঘিরে ফুটে আছে শরৎচন্দ্রের জীবনের পাতায়। যে-জন্যে আজ এ-তথ্য মুখ খুলে বলতে আমার কোনও বাধা আসছেনা ভিতর থেকে। আমি শরৎদাকে এবং বৌদিকে অশ্রদ্ধার চোখে কোনওদিন দেখিনি। দুজনকেই আমি ভালবাসতুম।

নিরুপমা দেবী সম্পর্কে আমি যা লিখেছি, তা শরৎদার কাছে টুকরো কথাবার্তার

মাধ্যমে যা পেয়েছি তা থেকে ধীরে ধীরে আমাব মনে যেমন ধারণা গড়ে উঠেছে, সেইটুকুই জানিয়েছি। শরৎদা বিস্তারিত করে কোনও কথা বলতেননা। নিজে থেকে যতটুকু বলেছেন—সুস্পষ্ট নাম উচ্চারণ সব সময়ে না করলেও সেটি যে নিরুপমারই কথা, তা বুঝতে আমার ভুল হতে তিনিই কখনও দিতেননা। যেমন,—তোমরা মেয়েরা, পুরুষের মন যতখানি সহজেই বুঝে নাও সহজ ইনস্টিংক্টে, নিজেদের মন সম্পর্কে ততখানিই অন্ধ থেকে যাও। কিংবা, কে জানে—হয়ত ইচ্ছে করেই চোখ বুজে থাক, তাকাতে ভয় পাও। যখন একথাগুলি বলেছেন তখন দৃষ্টি দূর শূন্যে, হাতে গড়গড়ার নল, কণ্ঠস্বর উদাস, গাঢ়, মৃদু।

কোনও সময়ে হয়ত তীব্র ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন—নিজের চেয়ে তোমরা কাউকে ভালবাস না, এই মেয়েমানুষ জাত। আমি হয়ত রাগ করে বলেছি—মোটেই নয়। এই জাতটা ছিল বলেই আপনাদের জাতটা পৃথিবীর আলো দেখেচে, এই জাতটা নিজেদের গুঁড়িয়ে ধুলো করে আপনাদের জাতটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উঁচু করে তুলচে ; আপনাদের জাতকে শক্ত মজবুত করতে, নিজেদের রক্ত হাড় পর্যন্ত দিয়ে দিচ্ছে—এটা মিথ্যে প্রমাণ করুন আপনি, বড়দা?

শরৎদা আবার সেই বিবাগীর হাসি হেসেচেন। বলেছেন—ওটা তো বস্তু-জগতের ব্যাপারে এলে। আমি নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া তোমাদের মতন বইপড়া বিদ্যে নিয়ে কথা কইনা। তোমরা তো এখুনি মোটা মোটা বই ছুঁড়ে মেরে আমায় চুপটি কবিযে দেবে! তোমার মতন বইয়ের বিদ্যে নয়, আমার বিদ্যে নিজেরই জীবন থেকে আমি ভাল জেনেই বলছি,—মেয়ে-জাত অতি নির্মম। এরা নিজেদের পুরোপুরি হাতে পায় বলে নিজের ওপরেই নির্মমতা সবচেয়ে বেশী করে।

কখনও বা বলেছেন—দেবী হতে পেলে তোমরা আর কিছু চাও না, আমি ভাল করেই জানি। তুমি নেহাৎ অনভিজ্ঞ, অভিজ্ঞতা কাকে বলে আজও জাননা, নইলে তোমাকে একটা গল্প শোনাতুম। শুনলে থ হয়ে যেতে।

বার বার বলেছি—বলুন বড়দা, বলুন। আমি সব বুঝতে পারি বেশ ভাল করেই। আপনাকে তো আমি কখনও কোনও প্রশ্ন করিনা,—বুঝতে পারি বলেই তো প্রশ্ন করিনা, বড়দা।

শরৎচন্দ্র অকস্মাৎ অত্যধিক গম্ভীর হয়ে গেছেন তখন। সিরিয়স কণ্ঠে বলেছেন—রাধু, দ্যাখ, একটা কথা বলে দিই—তোমার কাছে মাঝে মাঝে যা আমি গল্প করি, এ নিয়ে তুমি দ্বিতীয় লোকের সঙ্গে কখনও কোনও সময়েই আলোচনা কোরনা। করলে অন্যায় করবে।

বলার ভঙ্গীর মধ্যে একটি দৃঢ় আদেশের সুর ফুটে উঠেছে। আমি সংকুচিত হয়ে বলেছি—আপনার কথা আমি মনে রাখব বড়দা। কিন্তু 'সব বুঝি' বললে কী হবে, তখনও শরৎদার প্রত্যেকটি কথা ঠিক সুস্পষ্ট বুঝিনি।

নিরুপমা দেবী সম্পর্কে আমার ধারণা, আমার 'নিজস্ব মনোভঙ্গী' থেকে নয়

—শরৎচন্দ্রেরই মনোভঙ্গী থেকে। শরৎচন্দ্রের হৃদয় সম্পর্কে তাঁরই কাছে নির্ভুল সত্যের সন্ধান না জানলে এ বিষয়ে মুখ খোলা কি কখনও সম্ভবপর হতে পারত আমার নিজের পক্ষে?—নানা দিনে শরৎচন্দ্রের কাছে শোনা সব কথা তো স্পষ্ট করা যায়না, পাঠকের কাছে বিষয়টি বোঝাবার জন্যেই নিরুপায় হয়ে নিরুপমা দেবীর লেখার শরণ নিতে চেষ্টা করেছি। নিজের কল্পনা পূরণের অভিপ্রায়ে নিরুপমা দেবীর লেখার মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে কিনা খোঁজ করিনি। শরৎদার মনোভাব ও হৃদয়ানুভবের আশ্রয় বা সংযোগ ওখানে যদি থাকে, সন্ধান করেছি। আমার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা বা অনুমানের প্রশ্নই এখানে নেই।

নিরুপমা দেবী সম্পর্কে আমার ধারণা যা হয়েছে, সেটি শরৎদার কাছে যা জেনেছি তাই থেকেই হয়েছে। তাঁর যে স্নিগ্ধ কোমল পবিত্র দেবীমূর্তি আমার মনে গড়ে উঠেছে, এটি শরৎদার থেকেই আমার মনে সঞ্চারিত, কল্পনা থেকে নয়। বাস্তবে হয়ত তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিময় রূপের সঙ্গে এর মিল না থাকতেও পারে, এটি অসম্ভব নয়। আমি আগ্রহী গবেষক হলে আমার উদ্যম অন্য ধরনেব হতে পারত। নিরুপমা দেবী সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়ার হয়তো চেষ্টা করতুম। আমার মনেই হয়নি, এ-সম্পর্কে তাঁর পরিবাবের কাছে তাঁর সম্বন্ধে তথ্য জানতে চাওয়া কর্তব্য। শরৎচন্দ্রের মনে তিনি কোথায় এবং কেমন চেহারায় ছিলেন, আমি সেইটিই যতটুকু নিজে জেনেছিলুম তা একটুও পল্লবিত বা রঞ্জিত না করে সংক্ষেপে সাবধানে বলতে চেষ্টা করেছি।

তা ছাড়া আর একটি কথা। আমি তো শরৎচন্দ্র নিয়ে গবেষণা কবছিনা। আমাব নিজের জীবনের একটি সত্যকার অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে যাচ্ছি। এর জন্যে আমার বই-পড়া কাগজ-ঘাঁটার সামান্যই প্রয়োজন হয়েছে স্মৃতিকে সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জন্যে। কোথাও কারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কবে তথ্যসংগ্রহের দরকার হয়নি। নিরুপমা দেবীকে কখনও ঘরোয়া জীবনের মধ্যে আমি দেখিনি। আমি কয়েকবার মাত্র তাঁকে যতটুকু দেখেছি, তখন তাঁকে শান্ত, কোমল, শুচিতাস্নিগ্ধ অথচ বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ বলেই আমার মনে হয়েছে। আমি তাই লিখেছি। আমার মনে হয়নি এ-সম্বন্ধে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ কর্তব্য। যতটা সম্ভব অকৃত্রিমতার মধ্য দিয়েই আমাব জানাটুকু জানিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি।

আমি অনিচ্ছুক কলমধারী। নিজের উৎসাহে কলম ধরলে অনেক আগেই লিখতে পারতুম। বিতর্ক-জটিল ব্যাপারের মধ্যে পাছে পড়তে হয়, এই ভয়েই তো মুখ খুলিনি শরৎদাকে নিয়ে।

কোনও কাউকে ছোট করা বা বড় করার অভিপ্রায় আমার নেই। এমনকি শরৎদাকেও বড় করে তোলা বা ছোট করা আমার মনোগত অভিপ্রায় নয়। তাঁকে যেমন দেখেছি এবং যেমন বুঝেছি তাই লিখে যাবার চেষ্টা করছি। এতে তিনি বড়ও হতে পারেন, ছোটও হতে পারেন, এটি ইচ্ছাধীন নয়।

আমার লেখা কল্পনা-নির্ভর নয়, এটি আমি আবার উচ্চারণ করছি। সচেতন মনে, সত্যের প্রতি দৃঢ়নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়ে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখে গেলুম। একে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া শক্ত হবেনা। আমি নিন্দিত হব মাত্র। তাতে আমার জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি মাত্র বছরে শান্তিভঙ্গও হবেনা।

এই তথ্যগুলির জন্যে আমি কোনও দিন চেষ্টা কখনও করিনি ; কোনও পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিনি। এই তথ্য আমি যার মাধ্যমে পেয়েছি, সংসারে তা অতি দুর্লভ বস্তু। বিধাতা দয়া না করলে সে-সামগ্রী চেষ্টা করেও মানুষ জীবনে পায়না। বিধাতা আপনা হতেই যেখানে দেন—সেখানেই মানুষ সত্যকার বিশ্বাস আর সত্যকার স্নেহ ভালবাসা পায়। এটা দৈবাৎ বললেও বলা চলে হয়ত। আমি শরৎদার স্নেহের আর বিশ্বাসের অমর্যাদা বোধহয় জ্ঞানত কখনও করিনি।

নিজের কৃতিত্বে নয়, তথ্যগুলি আপনা হতে আমার কাছে পৌছেছিল। না পৌঁছুলেই নিশ্চয় আমার পক্ষে ভাল হত। আমি এইসব তথ্য প্রাপ্তির উপযুক্ত মানুষ বলে নিজেকে তখনও মনে করতুমনা, এখনও করিনা। সুযোগ্য ব্যক্তির কাছে এগুলি এলে, তাঁরা প্রতিদানের প্রতি কথা প্রতি ঘটনা সাক্ষীদের নামসহ নিশ্চয় লিখে রাখতেন। আমি তখন জানতুম, এসব কথা কখনওই কোনও দিন আমার মুখ থেকে বেরুবেনা। তাই, অনেক কিছুই হারিযে ফেলেছি। তবু, যা পারলুম, যতটুকু পারলুম পাঁচজন বিদগ্ধ ব্যক্তির পরামর্শে ও অনুরোধে লিখে রেখে গেলুম। একে প্রতিষ্ঠিত করাব জন্যে কোনও ব্যাকুলতা আমার নেই। অতিবঞ্জন দূবে থাক, যথাসম্ভব অল্প সঙ্কেতেই প্রকাশের চেষ্টা কবেছি, কতখানি পেরেছি তা জানিনা।

শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে অদ্ভুত ধরনেব কথাবার্তা বলতেন। কবি গিরিজাকুমার ও তমাললতা বসুর একমাত্র সন্তান বুধুব মৃত্যুতে শরৎচন্দ্রেব অদ্ভুত উক্তির কথা এর আগে লিখেছি।

এই ব্যাপার নিয়ে পরে একটি ঘটনা ঘটেছিল যার উল্লেখ করে যাওয়া ভাল। কারণ, সে-ব্যাপারটি একটি পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হযে রয়েছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে শরৎচন্দ্রের দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে অনেকেই স্মৃতিকথা লিখতে লাগলেন। অনেকেরই লেখায় একটি দুর্বলতা লক্ষ করা যেতে লাগল—স্মৃতিকথা-লেখকের কত বেশি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন শরৎচন্দ্র এটি প্রমাণ করার জন্যে লেখকের ব্যগ্রতা, কেউ অল্প পরিচয়কে গভীর পরিচয়, কেউ সাধারণ মেশামেশিকে ঘনিষ্ঠ মেশামেশি, কেউ সহজ বন্ধুত্বকে গভীর অন্তরঙ্গতার উঁচু ডিগ্রীতে তুলে লিখতে লাগলেন। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের বৈঠকখানায় অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা, ক্ষোভ, বিরক্তি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, হাস্য-পরিহাসের ঝড় বইতে দেখেছি। শরৎদাকে নিয়ে তখনই বেশ কাল্পনিক কথাও কেউ কেউ লিখে ফেললেন। এতে আমরা অনেকেই মনঃক্ষোভে দুঃখ পেয়েছি আর বিচলিতও হয়েছি

সেই সময়ে। সকলেই বলাবলি করতেন—যেরকম হারে যার-যেমন খুশী লিখে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতে সত্যিকথা যে কোনটা, কেউ খুঁজে পাবেনা।

কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন 'দীপালি' সাপ্তাহিকপত্রের স্বত্বাধিকারী সম্পাদক। আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে এখানে আড্ডা দিতে আসতেন দূর মানিকতলা থেকে। আমরা দুজনেও তাঁর মানিকতলার বাড়ীতে অনেকবার গিয়েছি।

একবার আমাদের বাড়ীতে এক রবিবারের সকালে মহা হৈ-চৈ চেঁচামেচি। বৈঠকখানায় অনেকেই এসে জমেছেন। কবি বসন্তকুমারের সঙ্গে কবি গিরিজাকুমারের সেদিন তর্ক প্রায় হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বসন্তকুমারের কণ্ঠস্বর ধৈবতগ্রাম-ঘেঁষা, গিরিজাকুমারেব পঞ্চম-ঘেঁষা। স্বামী বলতেন—বসন্তের কোকিলকণ্ঠ।—সেদিনকার ব্যাপারটি ছিল—গিরিজাকুমারের স্ত্রী তমাললতা বসুর একটি রচনা বসন্তবাবু তাঁর পত্রিকায় ছাপার সময়ে তথ্য বদলেছেন বলে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন গিরিজাবাবু। বসন্তকুমার উচ্চগ্রামে চড়া সুরে বলছেন—তাঁর বদলাবার অধিকার আছে।

গিরিজাকুমার তাঁর চেয়েও অনেক চড়াগ্রামে বলছেন—অধিকার নেই।

তমাললতার কাছে বসন্তবাবু শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে একটি স্মৃতিচারণ নিয়েছেন। যাতে লেখা ছিল—'তুমি তো আঠার-উনিশ বছর পুত্র-সুখ ভোগ করে তারপর পুত্রশোকের দুঃখ পেয়েছ, আমি যে ছ' মাসও পুত্রসুখ পেতে না পেতেই পুত্রশোকের অভিজ্ঞতা পেয়ে গেছি—'

বসন্তবাবু তাঁর কাগজে সদ্যোপরলোকগত শরৎচন্দ্রের পুত্রশোকের খবর ছেপে বিস্ময় সৃষ্টির দায়ে পড়তে চাননা। 'দীপালি' আজগুবি খবর ছাপে, রটে যেতে পারে। লেগে যাবে বাদ-প্রতিবাদের 'কিউ'। শরৎদা যখন জীবিত নেই, তাঁর মুখের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবে কে? গিরিজাবাবু বলেছিলেন—তুমি ঐ অংশটি কেটে বাদ দিতে পার। নতুন কথা নিজের ইচ্ছেমত জুড়ে দিতে পারনা। বসন্তবাবু বলেছিলেন —আলবৎ পারি। আমার সে-রাইট আছে। সকলেই জানে তিনি অপুত্রক ছিলেন। ঐরকম একটা তথ্য এই শোকের মধ্যে আমার কাগজে ছেপে আমি কাগজের বদনাম কিনতে পারিনা। ইত্যাদি।

সেদিন সেখানে চার পাঁচজন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তার মধ্যে আমার স্বামী এবং আমিও ছিলুম। উপস্থিত সকলেই গিরিজাকুমার বসুর অভিমত সমর্থন করেছিলেন। অর্থাৎ পছন্দ না হলে সম্পাদক কোনো অংশ বাদ দিতে নিশ্চয়ই পারেন, লেখকের যদি নিষেধ না থাকে। তিনি নিজের ইচ্ছেমত অন্য কথা বসাতে পারেননা।

আমার স্বামী যে একখানি সংক্ষিপ্ত শরৎজীবনী সে-সময়ে লিখেছিলেন—তার বীজ কিন্তু ঐদিনেই। শরৎচন্দ্রের একটি পুত্র হয়েছিল, এই তথ্যটি প্রতিষ্ঠিত করাব জন্যই বইটি লেখা।

দায়িত্বশীল লোকেরা বলতে লাগলেন, শরৎচন্দ্রের জীবনের যেগুলি সঠিক তথ্য, সেগুলি এই বেলাই মুদ্রিত হওয়া উচিত। পরে আরও বেশি তথ্য সংগ্রহ করে বড় বই হবে। মোটামুটি সত্যকার তথ্যগুলি মিথ্যের ভিড়ে শেষকালে না হারিয়ে যায়। পরে, যাচাইয়ে যা টিকবে তা থাকবে, যা টিকবে না তা আপনিই বাদ যাবে। শরৎচন্দ্রেরই মুখে "এই যে আমার মোটেই ছেলেপুলে হয়নি" কথাটি বসানোয় এবং সেটি তমাললতা বসুর হাতের লেখায় প্রকাশ হওয়ায় এঁরা সকলেই বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। এই ঘটনার পরেই কথা উঠল—শরৎচন্দ্রের যে একটি ছেলে হয়েছিল, এটি সাধারণ্যে প্রকাশ হওয়া উচিত। তখনকার মানুষ অনেকেরই ভাবনা হল, সঠিক তথ্য যা টুকরো টুকরো ছড়িয়ে আছে, সেগুলি এখনই মুদ্রিত হয়ে না থাকলে পরে প্রমাণ করা মুশকিল হতে পারে।

'বাতায়ন' সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আর তখনকার সাহিত্যিকেরা অধ্যাপকেরা অনেকেই এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমাব স্বামীর উপরে ছোট করে সংক্ষিপ্ত জীবনীতে কিছু যথার্থ তথ্য তুলে দেওয়ার ভার পড়ল। হরিদাসবাবু বলেছিলেন—তিনি শরৎচন্দ্রের একটি বিস্তৃত প্রামাণ্য জীবনী প্রকাশ করতে চান। সে-কাজে যথেষ্ট সময়, উপকরণ সংগ্রহ আর সাবধানতার দরকার। সংক্ষিপ্ত জীবনীখানি তাপসী প্রেসের স্বত্বাধিকারী বামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পাঠশালা-প্রকাশনী থেকে প্রকাশের আগ্রহ করেন। এর আগে তিনি অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দিয়ে 'জগদীশচন্দ্র' নামে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেছিলেন। আমার স্বামীর লিখিত 'শরৎচন্দ্র' সংক্ষিপ্ত জীবনীটি তাঁদের দ্বিতীয় বই।

কথাবার্তা আলোচনায় স্থির হয়েছিল, হিরণ্ময়ী দেবী আর নিরুপমা দেবী সংক্রান্ত তথ্য সে-বইতে প্রকাশ করা চলবেনা। কারণ, তাঁরা তখন জীবিত। ব্রহ্মদেশে শান্তি দেবীর ব্যাপারটি এবং ছেলের কথাটি লেখা হল। লেখা হল আবৃত ভাষায়। কারণ, আনুষ্ঠানিক বিয়ের কথা কোনদিনও শরৎচন্দ্রের মুখে শোনা যায়নি। সন্তান হওয়ার কথা আর সন্তান সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল ও বাৎসল্যমিশ্রিত উৎসুক অনুভূতির কথা তিনি নিজের মুখে বলেছেন।—ঘুমন্ত বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হত ঐ কচি ঠোঁট খুলে ও যখন উচ্চারণ করবে 'বা-ব্বা'—সেটা শুনতে আমার কেমন লাগবে? কল্পনা করেই তো শরীরে তখন যেন কাঁটা দিত—

শরৎদার মুখে এতটাই সিরিয়স করে না শুনলে আমার স্বামী ঐ তথ্যটি বাঁচাতে একটা বই লেখায় হাত দিতেননা। বইটি প্রকাশ হওয়ার পরে অনেকেই এটি 'গাঁজাখুরি গল্প' বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমার স্বামী হাসতেন। বলতেন—এটি খুব স্বাভাবিক। নিজে শরৎদার মুখে সিরিয়স করে না শুনলে, আমিও কখনও বিশ্বাস করতুমনা। দুনিয়ার কোথাও চিহ্ন রাখেননি শরৎদা এই খবরটির। অদ্ভুত মানুষ।

প্রমথ ভট্টাচার্য মশায়ও শরৎদার বর্মায় আনুষ্ঠানিকতাশূন্য বিবাহের পত্নী পুত্রের কথা

হরিদাসবাবু, জলধরবাবু ও নরেন্দ্র দেবের কাছে 'ভারতবর্ষ' অফিসে গল্প করেছেন, ওঁদের সবার মুখেই শুনেছি।

শান্তি দেবী শরৎচন্দ্রের সন্তানের জননী। তাঁকে উল্লেখ করতে হলে শরৎচন্দ্রের 'স্ত্রী-পুত্র' ভিন্ন কোন অভিধায় উল্লেখ করা যেত ঐ বইতে? কিন্তু শরৎদার মুখে যে একাধিকবারই শোনা গেছে—বর্মায় ঐ পাড়ায় বাঙালী সমাজটিতে বেশীর ভাগ লোকই আনুষ্ঠানিকতাশূন্য মিলনে মিলিত হয়ে বিবাহিত দম্পতির মর্যাদায় তাঁদের পরিচিতমণ্ডলের মধ্যে বাস করতেন। শরৎদা ঠাট্টার সুরে একে শৈববিবাহ বলতেন। বলতেন—গান্ধর্ববিবাহ রোম্যান্টিক প্রেম-নির্ভর। শৈববিবাহ জীবনের বাস্তব প্রয়োজন-নির্ভর। যাঁরা দেশ থেকে সমাজ অনুমোদিত আনুষ্ঠানিক বিবাহে বিবাহিত হয়ে সেখানে গিয়েছেন, তাঁদের মর্যাদার অহংকার নাকি দারুণ ছিল। ওখানে একটি নিয়ম ছিল, অসবর্ণ নারী-পুরুষে মিলিত জীবন যাপন করলে বিবাহিত দম্পতির পরিপূর্ণ মর্যাদা পেতেননা। শরৎদা বর্মায় স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং তাঁদের স্বামী-স্ত্রী বলেই সকলে মেনে নিয়ে থাকবেন। বিবাহের আনুষ্ঠানিক কোনও ব্যাপারের কথা শরৎচন্দ্রের মুখে কোনও দিন কখনও শুনিনি। হলে তিনি নিশ্চয়ই সে-কাহিনীর উল্লেখ করতেন। কণ্ঠীবদল ফুলের মালা বদল যতটুকুই যাই হোক না কেন, তার উল্লেখ না করে নিঃশব্দ থাকতেননা। ছেলের সূত্রেই তার মায়ের কথা যৎসামান্য উল্লেখ করেছেন। হঠাৎ ফুলটা গাছ সুদ্ধু উপড়ে ছিঁড়ে নিযে চলে গেল—বলেছিলেন। কোনও দিন বলেননি কোনও ধবনের কিছু অনুষ্ঠান সেখানে হযেছিল। হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই কিছুমাত্রও বলতেন মনে হয়।

১২

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সুলেখিকা নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা করে গিয়েছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে লেখিকা নিজের সম্পর্কে প্রত্যেকটি কথাই বহুবচনে উল্লেখ কবেছেন। কোনোখানে একবচনে উল্লেখ করেননি। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দূরত্বের মধ্যে রেখেছেন। তবুও লেখিকার স্মৃতিচারণার প্রত্যেকটি বক্তব্যের মধ্যে এই হতভাগ্য সৎশিল্পীটির প্রতি তাঁর মনোভাব যে সহানুভূতি-কোমল আর শ্রদ্ধাদৃঢ়, এটি পরিষ্কার সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

নিরুপমা দেবী তাঁর নিজের কালে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে জনপ্রিয় সুলেখিকা রূপে সম্মানিত ছিলেন। পরে তিনি ভাগলপুর ত্যাগ করে বহরমপুরে থাকতেন। কলকাতায় কদাচিৎ আসতেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ সামান্যই হত। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা প্রকাশ ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স-এ বই প্রকাশের সূত্রে আমার স্বামীকে কখনও সখনও কিছু খবরাখবর দিতে পোস্টকার্ড লিখতেন; বিজয়ার সময়ে ছাড়া আমি কখনও তাঁকে চিঠি লিখিনি।

শরৎদার লোকান্তরের নয়-দশ বছর বাদে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমরা রাজপুতানা

ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম সকন্যা স্বামী-স্ত্রী, একটি ভৃত্যসহ। সেবারে আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন হরিদাসবাবুর ছেলে সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়। আমরা মথুরায় আগ্রা হোটেলে উঠে সেখান থেকে টঙ্গা নিয়ে বৃন্দাবনে গিয়েছিলুম। নিরুপমা দেবীর বৃন্দাবনের ঠিকানা আমার স্বামীর জানা ছিল। বৃন্দাবনে দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে আমরা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে দেখা করে আসার জন্য তাঁর বাসায় গিয়ে পৌঁছুলুম। একটি পাথুরে গলির মধ্যে একখানি দোতলা বাড়ির উপরতলা থেকে নিচে পাথর বাঁধানো আঙিনায় তিনি নেমে এলেন, খবর পেয়ে। তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়। ছেলেদের মত ছোট ছোট করে মাথার চুল ছাঁটা, একখানি কেটের থান পরা আর কেটেরই সেমিজ গায়ে! নিরাভরণা, শীর্ণ মুখশ্রী।

বালিকা নবনীতা ও শ্রীমান সরোজসহ আমাদের দুজনকে দেখতে পেয়ে চোখে মুখে তাঁর তীব্র বিস্ময় আর আনন্দ দীপ্ত হয়ে উঠল। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করলেন; ব্যাকুল ভাবে দুহাতে জড়িয়ে আমাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। আমরা সকলেই খুব অপ্রতিভ হতভম্ব হয়ে পড়লুম। কল্পনায় ছিলনা, তিনি আমাদের দেখে এতটা বিচলিত হবেন। কিন্তু —কেন? কিছুই তখন কারুর আন্দাজে এলনা। অল্প কিছুক্ষণ আমায় বুকে চেপে ধরে দরদর ধারে চোখের জল ফেলার পরে—অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলতে লাগলেন—তোমরা দুজনে এসেচ? তোমরা আমাকে দেখে যেতে কলকাতা থেকে আমার কাছে এসেচ? ...তোমরা আমার কত আদরের জিনিস। তোমবা শরৎদার রাধু-নরেন। তোমাদেরকে শরৎদা কত ভালোবাসতেন!

তাঁর অশ্রুবাষ্পজড়িত কথা ক'টি শোনার পরে তখন আমাদের মস্তিষ্কে পৌঁছুল তাঁর বিচলিত হওয়ার হেতু।

শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের নয় বছর পরে বৃন্দাবনে নিরুপমা দেবীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ। তখন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশোক উত্তপ্ত নয়, আগুননেভা ছাইয়ের মৃদু উষ্ণতায় পরিণত, কালের নিয়মে। হতচকিত আমার মনে হয়েছিল—ওঁর কি তাহলে আমাদের আকস্মিক দেখে—বিদ্যুৎ চমকের তীব্রতায় শরৎদার কথাই মনে পড়ে গেল? মনে হল কি, আমরা শরৎদারই লোক, তাঁর কাছ থেকেই আসছি?—সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলদেহে আত্মসংবরণে অক্ষম হয়ে পড়েছেন?

তাঁর দুই চোখে সেদিন ঝরনার ধারা বার্ধক্যশীর্ণ মুখখানি প্লাবিত করে নিঃশব্দে ঝরে পড়েছিল। আমাদের মনে কষ্ট হয়েছিল খুবই, নিজেদের বড়ই অপরাধী বলে অনুভব করেছিলুম।

একটু পরেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন নিজেই। আমরা সেদিন বেশিক্ষণ তাঁর কাছে থাকতে পারিনি। টঙ্গাওয়ালা তাড়া দিচ্ছিল। আত্মসংবরণের পরে লজ্জিত হয়ে আমাদের যত্ন করে বসাবার জন্যে, খাওয়াবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। শরৎদার সম্পর্কে কিন্তু আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করেননি।

আমরাও নয়। তাঁর কাছে বসতে আমাদের সেদিন সময় ছিলনা। নিরুপমা তখন বৃন্দাবনে তাঁর অতিবৃদ্ধা মায়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বিদায়ের মুহূর্তে টঙ্গার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বার বার বলতে লাগলেন—কত ভাল যে লাগল রাধু,—তোমরা ঠিক মনে করে গলি খুঁজে বার করে আমাকে দেখতে এসেছ। খুব ভাল লাগল। আমি তো এখন সংসারে মরেই গেছি মনে হয়। কলকাতা থেকে কেউ যে মনে করে আমাকে দেখতে আসতে পারে—ভাবতেই পারিনি।

গাড়িতে বসে হতভম্ব হয়ে সেদিন ভাবনায় তলিয়ে গিয়েছিলুম। কেউ একটিও কথা কইনি। চোখের সামনে ভেসে রইল সমাজ ও সংসারের কাছে উৎসর্গিত একটি বয়োজীর্ণ করুণ নারীমূর্তি। মনে রইল, আমাদের দেখামাত্র তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া সেই আকস্মিক উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি। হঠাৎ দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে দুহাত বাড়িয়ে আমাকে তাঁর উপবাস-শীর্ণ বুকে আগ্রহে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলা। কেন? কেন? কী মর্মন্তুদ বেদনায় তিনি নিঃশব্দে সংগোপনে নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে চলে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালে সারা জীবন ধরে? আমি সেদিন মুখ দিয়ে একটিও কথা উচ্চারণ করতে পারিনি। বাড়ি ফিরে এসেও নয়। আমার স্বামীও না। আমাদের ভ্রমণসঙ্গী শ্রীমান সরোজও সেদিন যথেষ্ট অবাক হয়েছিলেন কিন্তু কোনও মন্তব্য করেননি।

অনেক দিন কেটে গেলে তারপরে আমরা স্বামী-স্ত্রী নিজেরা দুজনের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সংসারের বাইরে বাণপ্রস্থে বাস করছেন যে-মানুষটি,—সংসারী জীব আমরা, ওখানে গিয়ে হানা না দিলেই ভাল হত। আমাদের গায়ে সংসার-গন্ধ, সে-গন্ধে তপস্বিনীজীবনে স্মৃতির আলোড়ন উঠলে, যন্ত্রণা আর ক্ষতি ছাড়া ফল কিছুই নেই। ওঁর অন্যমুখী নিভৃত শান্ত জীবনে আমরা যেন ঢিল ছুঁড়ে তরঙ্গ বিক্ষেপ সৃষ্টি করে এলাম। মনে মনে খুবই লজ্জা ও অনুতাপ হয়েছে এর জন্যে।

নিরুপমা দেবীর জীবনচর্চায় কৃচ্ছ্রসাধনা বরাবর ছিল। আহার-বিহারে অত্যন্ত শুদ্ধাচার পালন করে চলতেন। নিজের দৈহিক আরামের প্রতি লক্ষ তো ছিলই না, বরং বরাবর কঠোরতাই পালন করতেন শুনেছি। কথাবার্তা বেশ কোমল ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। মুখে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির আভা; তার সঙ্গে ছিল নরম বিষণ্নতা। এইটি আমার নিজের দেখা নিরুপমা দেবী। শুনেছি, তাঁর নাকি প্রবল সাহসিকতা ও প্রখর ব্যক্তিত্ব ছিল পারিবারিক ভূমিকায়। আমার দেখার সুযোগ হয়নি।

শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তার প্রতি নিরুপমার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে তিনি সম্ভবত ভয় করতেন। বরাবরই নিজেকে ব্যক্তি শরৎচন্দ্র থেকে অনেক দূরে সাবধানে সরিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

নিরুপমা দেবীর সাহিত্যচর্চায় যোগ ছিল তাঁর ছোটদা বিভূতিবাবু ও শরৎচন্দ্র ছাড়াও আর একজনের। তিনি খ্যাতনাম্নী লেখিকা অনুরূপা দেবী। অনুরূপা দেবী

ও নিরুপমা দেবী পরস্পরকে 'গঙ্গাজল' বলে সম্বোধন করতেন। অনুরূপা দেবী প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি স্ত্রী জাতির সর্বতোভাবে গৃহসংসারের সেবিকা এবং আত্মোৎসর্গপরায়ণা হওয়া ছাড়া অন্য কোনও দিকে মন দেওয়া অনুচিত এই মতবাদ সমর্থন করতেন। নারীজাতির ঐকান্তিকভাবে স্বামীর ইচ্ছানুবর্তিনী সেবাপরায়ণা হওয়া অর্থাৎ পাতিব্রত্য-পরায়ণা হওয়া উচিত এই ছিল তাঁর অভিমত। মেয়েদের সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও নমনীয়তা তাঁর আদর্শ ছিল। নিজের মতামত সম্পর্কে তিনি সর্বদা স্থির থাকা পছন্দ করতেন। এ নিয়ে কেউ অন্য মতের প্রশ্ন তুললে সেটি নাড়াচাড়া করতে দিতেননা বেশী। তাঁর পিতামহ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ হিন্দু নারীর প্রাচীন আদর্শ তাঁর লক্ষ ছিল। তিনি নিজে কিন্তু তৎকালীন আধুনিকতার মধ্যে জীবন যাপন করতেন দেখেছি। মেয়েদের অবগুণ্ঠনের বিরোধিতা তাঁর অপছন্দ ছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা তিনি পছন্দ করতেন, কিন্তু অবগুণ্ঠন ফেলে বাইরে পুরুষদের সঙ্গে চলাফেরা অনুচিত মনে করতেন। তাঁর ধারণা ছিল বহির্জগতে মেয়েদেব কাজকর্ম করা মঙ্গলকর নয়। অন্তঃপুরই মেয়েদের একমাত্র কর্তব্যস্থান। কিন্তু তিনি নিজে পর্দানসীন কখনও থেকেছেন, কখনও থাকেননি।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে আমি পর্দার বাইবে দৃঢ়ব্যক্তিত্বে স্বপ্রতিষ্ঠ মর্যাদাময়ী নারীই দেখেছি। সুস্পষ্ট উচ্চারণে নিজের মতামত উচ্চকণ্ঠে বলার মত শক্তি ছিল তাঁর কলমের। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতুম।

আমার সঙ্গে নারীমুক্তি প্রসঙ্গে দুই একবার তাঁর বাদ-প্রতিবাদ হয়ে গেছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায। আমরা তখন পঞ্চাশ বছর আগে মেয়েদের পর্দাপ্রথা, অবগুণ্ঠন, পণপ্রথা ও বাল্যবিবাহের বিরোধিতা এবং মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ও অর্থকরীবিদ্যার আবশ্যিকতা নিয়ে কাগজে পত্রে লড়াই করি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের গরম তাওয়ায় বরফজল ঢেলে দেন। উঠতি বয়স তো তখন, সইব কেন? সজোরে প্রতিবাদ লিখে ফেলি। প্রবীণায় নবীনায় বাগ্‌যুদ্ধ। পাঠকেরা সকৌতুকে আনন্দ উপভোগ করেন। তখন তো এমন কাগজের দুর্ভিক্ষ ছিলনা। মাসিকপত্র সাপ্তাহিক পত্রওয়ালারা লেখা পাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতেন। ছাপার উপযুক্ত লেখা হাতে পেলে খুশি হয়ে যেতেন। এখনকার সম্পাদকের হাত-পা বাঁধা সীমাযিত পরিসরের মধ্যে। এঁরা ভাল লেখা পেয়েও, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেমত ছাপতে পারেননা, কাবণ, মাপা জায়গা। অনেক লেখা বাদ দিতেই হয়। ফলে, দৃশ্য অদৃশ্য অনেক মানুষের রোষ উষ্মার পাত্র হয়ে থাকতে হয় পত্রিকা-সম্পাদকদের।

প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছি। বয়সের দোষ এটি। অনুরূপা দেবী কড়া রক্ষয়িত্রী ছিলেন স্বভাবগত। বরাবর তিনি তাঁর গঙ্গাজলের সাহিত্যজীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের দিকে সতর্কদৃষ্টির পাহারা রেখেছিলেন। নিরুপমা দেবী সাহিত্য নিয়ে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করার মত কাছাকাছি মানুষ তাঁর গঙ্গাজলকে পেয়েছিলেন জীবনে। শরৎচন্দ্রের লেখা

তাঁকে অভিভূত করলেও, তাঁর কাছাকাছি এসে আলোচনার উপায় ছিলনা। তিনি নিজেই কঠোর সতর্কতায় বহু দূরেই সরে থাকতেন। শরৎদার মুখে শুনেছি, নিরুপমা চিঠি লিখতেন শরৎচন্দ্রকে। মনের সুখ দুঃখ বা জীবনের ভাল মন্দ ঘটনা হয়তবা লিখতেন। শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করে বলেননি সবকিছু। তবে নিরুপমার চিঠি যে তিনি পেতেন এটি তাঁর কথাবার্তায় অনেকবার প্রকাশ হয়েছে। অনুরূপা দেবী নিরুপমাকে ভালবাসতেন। তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায় সমস্ত অশুভ থেকে তাঁকে দূরে রাখতে যত্ন নিতেন সন্দেহ নেই। দুই সখীর মধ্যে অকপট হৃদ্যতা ছিল। শরৎচন্দ্রের প্রতি অনুরূপা দেবীর বরাবরই বদ্ধমূল বিরূপ ধারণা ছিল। এটির কারণ, শরৎচন্দ্রের বেপরোয়া বাউণ্ডুলে জীবন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। গৃহহীন আশ্রয়হীন সংসারকর্মবিমুখ যে-ছোকরাটি তাঁদেরই মজঃফরপুরেব বাড়ির বৈঠকখানায় একসময়ে মলিন কেশবেশে ভবঘুরে মূর্তিতে আশ্রিত হয়ে কাটিয়েছে, গানবাজনা নেশাটেশা করে,—সেই লোকটির কলমের লেখা যত ভালই হোকনা কেন, আদর্শে দৃঢ়চিত্ত অনুরূপা কোনও দিন সে লেখার দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেও চাননি। নিরুপমার মত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বিধবার সাহিত্য-টাহিত্য কোনও কিছুরই সংস্রবে আসার যে সে যোগ্য ব্যক্তি নয়, এইটিই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ কথা। নিরুপমা দেবী তাঁর সতীর্থ বন্ধুর শুভেচ্ছায় প্রতিবাদ করেননি, বরং তাঁর অভিমত মেনেই চলেছেন যতদূর সম্ভব। কিন্তু শবৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য-সংস্রব ছিন্ন হয়নি বহুদিন। হৃদয়ের সংস্রব নিরুপমার ছিল কিনা জানিনা,—শবৎচন্দ্রের যে ছিল, এটি নিঃসন্দেহে জেনেছি।

১৩

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগটি বোঝার জন্য আমি প্রথমদিকের চারটি গল্প নিয়ে আলোচনা করব। চারটিরই নায়িকা বালবিধবা। এই আলোচনাতে লক্ষণীয় বিষয় তিনটি। প্রথমত দেখব, কেমন করে শরৎচন্দ্রের জীবন ও হৃদয়ের কেন্দ্রীয় সমস্যাটিই তাঁর সাহিত্যেরও কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত দেখব, কী করে শরৎচন্দ্রের নিজস্ব উপলব্ধি নায়কদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে এবং নায়িকাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে নিরুপমার অন্তঃপ্রকৃতি প্রতিভাসিত। শরৎচন্দ্র অবশ্য নায়কদের অনেক বেশী আদর্শনায়ক করতে চেয়েছেন; নিজে যা ছিলেননা, নায়করাও তাই হত। কিন্তু নিরুপমার যা ছিলনা লেখক-দত্ত যথেষ্ট বিদ্রোহ-শক্তি সত্ত্বেও নায়িকাদের তা থাকতনা। লেখকের মনের মধ্যে দোষে গুণে নিরুপমার যে-ভাবমূর্তি ছিল, দোষে-গুণে নায়িকারাও তাই হয়েছেন। তাঁদের গুণের সীমা ছিলনা, ত্যাগের সীমা ছিলনা। কিন্তু ত্রুটি ছিল মাত্র একটিই। সেই একটিমাত্র ত্রুটির মধ্যেই নিহিত গভীর ট্র্যাজেডির শিকড়।

তৃতীয়ত দেখব, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমনভাবে শরৎচন্দ্রের গোড়ার দিকের নায়ক-নায়িকারা মনে মনে বয়সে বেড়ে উঠছেন। নায়কদের ক্রমবিকাশের সঙ্গে

সঙ্গে নাযিকাদেবও চাবিত্রিক ক্রমবিকাশ ঘটছে। সেইসঙ্গে জীবনেব কেন্দ্রীয সমস্যাটিব বিষযে শবৎচন্দ্রেব নিজস্ব মানসিকতাব, তাঁব ধ্যান-ধাবণা, বুদ্ধি, বিশ্বাসেবও ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট হযে উঠছে।

প্রথম দিকেব চাবটি নির্বাচিত বচনা থেকে এই পবিণতিব ধাবাটি লক্ষ কবব। সর্বপ্রথমে দেখব, কুন্তলীন পুবস্কাবপ্রাপ্ত তাঁব সর্বপ্রথম মুদ্রিত গল্প 'মন্দিব' (১৯০৩/১৩০৯)।

তাবপবে নেব 'ভাবতী'তে প্রকাশিত আলোডন-তোলা গল্প 'বডদিদি'। তাবপবে 'পল্লীসমাজ' , শেষে নিযেছি 'পথনির্দেশ'।

নামকবণগুলিব মধ্যেই শবৎচন্দ্রেব দৃষ্টিভঙ্গীব প্রাথমিক চেহাবাটা ধবা পডে অনেকখানি।

সমস্যাটি প্রথমে নৈর্ব্যক্তিক 'মন্দিব'। তাবপবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক 'বডদিদি'। তাবপবে সমাজ-নিবদ্ধদৃষ্টি 'পল্লীসমাজ', সমস্যাব মুখোমুখি সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ। শেষটিতে সমস্যাব সমাধান—'পথনির্দেশ'। নামকবণগুলিই যথেষ্ট নির্দেশ দেয লেখকেব মনেব গতিপথেব।

'মন্দিব' গল্পে আমবা দেখেছি, কীভাবে অজ্ঞ, অন্ধ-হৃদযবোধহীন, আচাবমুগ্ধ কিশোবী অর্পণা তাব অজাগ্রত হৃদয নিযে নিজে ঠকছে, অন্যদেবও কষ্টেব কারণ হচ্ছে। অমবনাথ এবং শক্তিনাথেব মৃত্যুকে আধুনিক পাঠকেবা অতিবিক্ত সেন্টিমেন্টাল বলবেন। বলবেন, কাঁচা, অবাস্তব। সবই ঠিক কথা। কিন্তু, ঐ মৃত্যু দুটি না ও যদি ঘটত, তবু অমবনাথেব জীবন্মৃত্যুব কাবণ হত অপর্ণা।

শক্তিনাথেব হাত থেকে দেলখোস ছুঁডে ফেলে দেবাব পবে যদি শক্তিনাথ বেচেও থাকত, সে হত অন্য আবেক শক্তিনাথ।

ঐ মুহূর্তটিতেই প্রথম শক্তিনাথেব মৃত্যু ঘটিযেছে অর্পণাব অবোধ অন্ধতা। কিন্তু, এই গল্পে শুধু মৃত্যু নয, একটি জন্মও আছে। অমবনাথেব মৃত্যুতে যা হযনি, শক্তিনাথেব মৃত্যুতে তা ঘটল। গল্পেব শেষ পংক্তিতে কুডিযে আনা দেলখোস হাতে নিযে জন্ম হল যুবতী অপর্ণাব। শক্তিনাথেব মৃত্যুব আঘাত অপর্ণাব সুপ্ত হৃদয়কে জাগ্রত কবল।

এই অবুঝ অপর্ণা-চবিত্র ক্রমশ উত্তীর্ণ হযেছে 'বডদিদি'ব মাধবী চবিত্রে। যে, নিজেব মনেব সবটা বোঝে না, অথচ আবছা উপলব্ধি কবে। অপর্ণাব ঘুমন্তযৌবন, তাব অজাগ্রত হৃদয়ানুভূতি মাধবীতে জাগ্রত। সুবেন্দ্রেব সাবল্যে মাধবী বিব্রত। মাধবীব মনেব মধ্যে আপন দুর্বলতা বিষযে সচেতনতা আছে বলেই, সুবেন্দ্রেব নিষ্কলুষ অনাবৃত হৃদয মাধবীকে ভীত কবে, সন্ত্রস্ত কবে। মাধবীব মুখেই সুবেন্দ্রনাথেব প্রতি আমবা প্রথম শুনি সেই দণ্ডাদেশ—যে-দণ্ড মাথায় নিযে মাধবীব সান্নিধ্য থেকে দূবে সবে যেতে সুবেন্দ্রেব পাঁজব চূর্ণ হল গাডি চাপা পড়ে। এখানে গাডির তলায় চাপা না পডলেও সুবেন্দ্রেব পাঁজব আস্ত ছিলনা। ঘটনাটি অর্থহীন নয়, ব্যঞ্জনাময়।

সুরেন্দ্র চলে যাবার পরে মনোরমার সখী-সুলভ কৌতুকে মাধবী কেঁদে ফেলে। মনোরমা বলে, 'সামান্য কৌতুক সইতে পারলে না বোন? মাধবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, 'আমি যে বিধবা দিদি।' মনোরমা বলিল, 'কিন্তু গেল কেন?'—'আমিই যেতে বলেছিলাম।'

মাধবীকে শরৎচন্দ্র পিতৃগৃহে সমগ্র পরিবারের প্রয়োজনের ভিত্তিতে মর্যাদায়, সম্মানের আসনে বসিয়েছেন। সুশৃঙ্খল গৃহকর্ত্রীত্বে তার সকলের প্রতি সমান যত্ন, সমান দৃষ্টি। মর্যাদাময়ী নারীত্বে আর আত্মসুখভোগের ইচ্ছারহিত দেবীত্বে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে। এই দেবীত্বময়ী মাধবীরই হৃদয়ে মানুষী প্রেমের বিকাশ শরৎচন্দ্র এমনই কুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন—প্রায় সত্তর বছর আগের বাঙালী পাঠকদের মনে সে-ছবি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি, বরং করুণ বেদনা আর সহানুভূতি উদ্রেক করেছে। নিন্দায় মুখর হতে কুণ্ঠিত হয়েছে তখনকার সংস্কারবদ্ধ মনও। কারণ, মাধবী সংসারধর্মে ত্রুটিশূন্য, মাধবী সংযতপ্রকৃতি। লেখকের শক্তির মান কতদুর, এখানে প্রথমেই প্রমাণ হয়েছে।

এত নিখুঁত নিরঙ্কুশ চরিত্রের মাধবী,—তবুও তার সখী মনোরমা স্বামীকে চিঠি লেখে—'মাধবী পোড়াবমুখী, জীবনে যাহা করিতে নাই, তাই সে করিয়াছে।' উত্তরে শরৎচন্দ্র যেন নিজেরই কথা বলছেন—'পত্র পাইয়া মনোরমার স্বামী মনে মনে হাসিল। মাধবী পোড়ারমুখী, তাহাতে সন্দেহ নাই...তোমাদের রাগ হইবারই কথা। বিধবা হইয়া কেন সে তোমাদের সধবার অধিকারে হাত দিতে গিয়াছে।' তারপর তিনি একটি লতার কথা লেখেন—'আধক্রোশ ধরিয়া লতাইয়া লতাইয়া অবশেষে একটা বৃক্ষে জড়াইয়া উঠিযাছিল। এখন তাহাতে কত পাতা, কত পুষ্পমঞ্জরী।' ('বড়দিদি', পৃ. ৩৯-৪২)

এখানে শবৎচন্দ্র নিজের মনকে ব্যক্ত করেছেন। অফলা, অপুষ্পা-যৌবন-বৈধব্যে তাঁর হৃদয়ে সমর্থন ছিলনা কোনও দিন। এ-রিক্ততা মূল্যহীন। বিশ্বপ্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর প্রত্যক্ষ দেখা হওয়াটিও কতই সন্তর্পণে।—'সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রনাথের জ্ঞান হইল। চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই। কপালের কিয়দংশ অঞ্চলে ঢাকা। ক্রোড়ের উপরে সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া বসিযাছিল। কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?

—আমি মাধবী।

সুরেন্দ্র চক্ষু মুদিয়া মৃদুস্বরে বলিল,—আঃ, তাই।'

এখানে ভাষা সম্পূর্ণ প্রতীকী। গভীরতম। অস্পষ্টচেতন সুরেন্দ্র কোনও দিন নিজের হৃদয়ের ভাযা সুস্পষ্ট বোঝেনি। আমি এই অংশটুকুর প্রত্যেকটি পদের অর্থ যেভাবে বুঝেছি, বলার চেষ্টা করি।

'সন্ধ্যার পরে সুরেন্দ্রের জ্ঞান হইল'—এখানে 'সন্ধ্যার পরে' কথাটি এবং 'জ্ঞান

হইল' কথাটি আমার কাছে গভীরতম অর্থে তাৎপর্যময়। 'চক্ষু মেলিয়া সে মাধবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল'—'চক্ষু মেলিয়া' কথাটিও আমার কাছে গভীর দ্যোতনাপূর্ণ। 'মাধবীর মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই, কপালের কিয়দংশ ঢাকা'—'মুখে এখন অবগুণ্ঠন নাই' কথাটি অত্যন্ত অর্থবহ। মাধবীর হৃদয় ও মনের অবগুণ্ঠন মোচনের প্রকাশ্য ইঙ্গিত এটি। 'ক্রোড়ের উপর সুরেন্দ্রের মাথা লইয়া বসিযাছিল' এই পদটিও মাধবীর অন্তর্জগতের অবস্থা প্রকাশ করছে। সুরেন্দ্রনাথকে নিজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতির অভিব্যক্তি বলা যায়। 'কিছুক্ষণ চাহিয়া সুরেন্দ্র কহিল, তুমি বড়দিদি?'

—'আমি মাধবী।'

এখানে 'তুমি বড়দিদি?' আর 'আমি মাধবী' প্রশ্নোত্তরটির মধ্যে চিবকালের মানব-মানবীর হৃদয়ের ভাষা যেন ব্যক্ত হয়েছে। এই প্রশ্ন আর এই উত্তরের মধ্যে অন্ধ হৃদয়ের ভাষা অক্ষরের রেখায় প্রকাশিত হয়েছে। হৃদয়ের গভীর অনুভব আজও অক্ষরে যৎসামান্যই প্রকাশ হয়। সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ যে ভাষাতীত অনুভবেব পীড়ন বহন করে চলেছে—এখানে শরৎচন্দ্র সেই 'না-বলা বাণীব ঘনযামিনী'র থেকে একটি বাণী আলোয় তুলতে পেরেছেন।

অতি উচ্চস্তরের চিত্রশিল্পী মাত্র দু'চারটি রেখার টানে যেমন অনেকখানি কিছু, —অনেক সুন্দর কিছু বা ভযংকর কিছুকে ফুটিয়ে তোলেন,—সাধারণ সহজ দু'একটি বাক্য ব্যবহারের মধ্যে দুই এক পংক্তিতে সেই ধরনের অভিব্যক্তি শবৎচন্দ্রের লেখায় দেখতে পাই।

এব পরের লাইনটি আরও অতলস্পর্শী। 'সুবেন্দ্রনাথ চক্ষু মুদিয়া মৃদুস্বরে বলিল, —আঃ, তাই।'

এখানে ভাষা একেবারেই অতল অন্তরঙ্গস্পর্শী। যে-উপলব্ধি মুখের ভাষায় আনা সম্ভব নয়, সেই উপলব্ধিকে ভাষায় ফোটাতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র।

এখানে 'চক্ষু মুদিয়া' আর 'মৃদুস্বরে' এরাই প্রধান ভাষা.—'আঃ, তাই' বাক্যটি ব্যঞ্জনা-নিবিড।

সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মাধবীর মুখোমুখি বোঝাপড়া হয়নি। অপরিণতচিত্ত অপর্ণা আর শক্তিনাথের মতই সুরেন্দ্রনাথও মাধবীর প্রতি নিজের মনের গভীর অনুবাগের প্রকৃতি চিনতে পারেনি। 'বড়দিদি' নামটিকেই সে গহন হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গোপন কস্তুরী করে তুলেছিল। তারই নিবিড় সৌরভে সারাজীবন বিভোর থেকেছে। 'বড়দিদি' নামটি বড়ত্বে এবং দিদিত্বে পূর্ণ থেকে গেছে চিরকাল। অদৃশ্য গৃহদেবতার পুণ্য নামের সঙ্গে যাকে তুলনা করেছেন লেখক। সে-পুণ্যনাম মানুষ হয়ে সুরেন্দ্রের চাওয়া পাওয়ার জীবনে নেমে আসেনি। যদিও, বড়দিদির একদা-দেওয়া আঘাত থেকেই রক্তক্ষরণ হয়ে বড়দিদিরই কোলে সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

মাধবীর শেষ পর্যন্ত নিজের হৃদয়কে চিনতে পারাটি লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরম উপভোগ মনে করি। এখানে তাঁর হৃদয়ের নিজস্ব সার্থকতার পরিতৃপ্তি।

শরৎচন্দ্রের সংকেত-কুশলতা 'বড়দিদি' বই থেকেই সার্থক হয়ে শুরু।

আমার মনে হয় 'বড়দিদি' বইখানি পড়ার পরেই সম্ভবত লেখকের কাছে নিরুপমার অনুরোধ এসে থাকতে পারে, 'বালবিধবা চরিত্র আপনি না আঁকলে ভাল হয়'।

শরৎচন্দ্র আমার কাছে চিঠিতে 'গারজেন' বলে নিরুপমা দেবীকেই উল্লেখ করেছিলেন। এই 'গারজেন' শব্দটি কৌতুকচ্ছলে লিখলেও এটি সত্যের ভিত্তিতেই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রকৃতিসুলভ নিয়মে গভীর বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে হালকা কৌতুকের সুরে যেমন প্রকাশ করতেন, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি আপনা থেকেই একজনকে নিজের 'গারজেন'-এর পদে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন। এটি বহির্লোকের ব্যাপার নয়, অন্তর্লোকের ব্যাপাব। বাইরে এর কোথাও কোনও প্রকাশ দেখা যায়নি; সুতরাং, বাইরে খোঁজাখুঁজি বৃথা।

বন্ধনহীনবিদ্রোহী বেপরোয়া যে-মানুষটি উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিলেন কৈশোরকাল থেকে, সেই মানুষটিই স্থির ধৈর্যে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন একটিমাত্র মানুষেব সংযম-সুন্দর স্মরণের সামনে রেখে। সত্যিই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কড়া তাগাদাদার তিনি ছিলেন। এই কড়া তাগাদা মুখে বা লেখায় যতখানি না হোক,—তাঁর হৃদয়ের উৎসুক প্রত্যাশাই ছিল শরৎচন্দ্রের কাছে সবচেয়ে বেশি কড়া তাগাদা। কঠোর সমালোচকও তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন, কারণ শরৎচন্দ্রের প্রত্যেকখানি বই প্রকাশ হলেই পড়ার পরে তাঁর সম্বন্ধে নিজের মতামত খোলা মনে লিখে পাঠাতেন লেখকের কাছে। লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির এইটিই ছিল নিরুপমার প্রধান পুরস্কার। শরৎচন্দ্রের লেখার উৎকৃষ্ট সমঝদার তাঁর চেয়ে আর কেউ ছিল, শরৎচন্দ্র মনে করতেননা। তাঁর সাহিত্যরস গ্রহণশক্তির প্রতি শরৎচন্দ্রের বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা ছিল অসীম।

হতে পারে এটি শরৎচন্দ্রের নিজেরই মনের দুর্বলতা, কিন্তু তাঁর ধারণার নড়চড় দেখিনি।

শরৎচন্দ্রের প্রকৃতিতেই ছিল দেওয়ার জন্যে উন্মুখতা। পাওয়ার জন্যে তত নয়। তিনি নিরুপমাকে কিছু দেওয়ার জন্যে, তাঁর কিছু করার জন্যে চিরদিন ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু নিরুপমার নেওয়ার উপায় ছিলনা। নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল কিনা জানিনা। শরৎচন্দ্রের কোনও দান কোনও উপহার তিনি গ্রহণ করেননি, একমাত্র সাহিত্য সম্পর্কে পরামর্শ ও উপদেশ ছাড়া। তিনি নিজে মুখ ফুটে শরৎচন্দ্রের কাছে চেয়েছেন তাঁর সাহিত্যরচনা। শরৎচন্দ্রের লেখার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের অবধি ছিলনা—এটি শরৎচন্দ্রের উপলব্ধিগোচর ছিল।

সকলেই জানেন, শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশে থাকতে নিরুপমার রচনা পড়ে এতই খুশি হয়েছিলেন, একটি সোনার ফাউন্টেন পেন তিনি নিরুপমাকে পাঠিয়েছিলেন। —দেখতে পাছে খারাপ ঠেকে কারও চোখে, তাই তার সঙ্গে বিভূতিভূষণ ভট্টকেও

একটি কলম একসঙ্গেই পাঠিয়েছিলেন। ছোট পার্সেলটি এসেছিল বিভূতিভূষণেবই নামে, কিন্তু সে-কলম শবৎচন্দ্রকে ফেবৎ দেওয়া হয়েছিল। তাঁব হৃদযেবই নিদর্শন যে সোনাব কলম,—এটি বুঝে সেটি গ্রহণ কবা হয়নি। ঘটনাটি আমাব বইযে পডা তথ্য হলেও শবৎচন্দ্রেব মুখেও শুনেছিলুম,—সোনাব কলম কোনও মানুষকে দেওয়া হযনি, কলমকেই দেওযা,—এটা ওবা বুঝতে পাবেনি।

১৪

'মন্দিব' গল্পে যে-প্রেম দুপক্ষেব কাছেই অস্ফুট, অস্পষ্ট, 'বডদিদি'তে সেই প্রেম একপক্ষেব কাছে সুস্পষ্ট হযে উঠেছে। লক্ষণীয়, সে-হৃদযটি কিন্তু নাবীব হৃদয। মাধবী নিজেই সুবেন্দ্রকে দূবে সবিযে দিযেছে, নিজেকে বক্ষা কবাব জন্য, নিজে দুর্বলতা থেকে বাঁচবাব জন্য। অসামাজিক সুবেন্দ্রব শিশুসুলভ প্রকাশ্য ভালবাসা, সামাজিক নীতি ও আচাববদ্ধ মাধবীব মানসিক নিবাপত্তাব প্রতিকূল ছিল।

ধর্মোন্মাদ আধা-সন্ন্যাসিনী অপর্ণা যেমন পাবিবাবিক মমতাবদ্ধ মাধবীতে উত্তীর্ণা —মাতৃহীন, সামাজিক দাযিত্ববোধশূন্য, সবল কিশোব শক্তিনাথও সুবেন্দ্রনাথে পৌছয। এখন আছে তাব বিশ্ববিদ্যালযেব ডিগ্রী, আছে পৈতৃক সম্পত্তি, মাতামহেব জমিদাবী। তেমনি আছে তাব হৃদযভবা শূন্যতা, মাতৃস্নেহেব প্রবল বুভুক্ষা। নেই তাব যুবোচিত আত্মনির্ভবতা। সুবেন্দ্রেব যা-যা নেই, মাধবীব তা স্বভাবগত মূলধন। প্রভূত স্নেহ আব প্রবল আত্মনির্ভবতায মাধবী পূর্ণযুবতী। কিন্তু সুবেন্দ্রনাথেব মুখোমুখি তাকে দাঁড কবাননি লেখক। তাদেব পবস্পবেব কাছে মন খোলাব সুযোগ দেননি। সুবেন্দ্রনাথ যুবক হযে মাধবীব কাছে এসে দাঁডাযনি—দাঁডিযেছে স্নেহার্থী অঞ্চল-ছাযাকাঙ্ক্ষী শিশু হযে। অথচ, মাধবীব তাকে আশ্রয দেবাব শক্তি নেই, সাহস নেই , সমাজেব কঠিন শিকলে বন্দী সে। সমস্ত হৃদয ছুটে যেতে চায যাব দিকে, তাকেই দূবে ঠেলে সবিযে দিতে হল মাধবীকে।

বালবিধবাব মনেব এই নিরুপায যন্ত্রণা, নিরুচ্চাব আর্তি অদৃশ্য নিঃশব্দ ভিতবে বাজছে আছডে-পডা ঝবনাব জলকল্লোলেব মত উন্মাদ কান্নাব ধ্বনি। এই নিরুপাযতা থেকে পালান ছাডা গতি নেই। মাধবী, অথবা সুবেন্দ্রেব মৃত্যু প্রযোজনীয ছিল সত্যকে ধামাচাপা দেবাব জন্য' তৎকালীন সমাজেব সামনে এই ভয়ংকব প্রশ্নটি খোলাখুলি উপস্থাপনা কবাব মত মনেব জোব তখনও হয়নি শবৎচন্দ্রেব। মজা কিন্তু, প্রাণ ধবে তিনি তাঁব সর্বগুণান্বিতা, জীবনবঞ্চিতা, বালবিধবা নাযিকাদেব মৃত্যু ঘটাতে পাবেননি। যদিও, তখনকাব সাহিত্যে সেটাই ছিল সহজ সমাধান। মবতে হযেছে কুন্দনন্দিনীকে, বোহিনীকে। কিন্তু শবৎদা মেবে ফেলেছেন তাঁব নাযকদেব। যে-নাযকবা জীবন-সমস্যা সমাধানে অক্ষম—তাদেব বাঁচতেও দেননি লেখক। শক্তিনাথকে না, সুবেন্দ্রনাথকেও নয।

'পল্লীসমাজে' ঘটল সেই বিস্ফোবণ। সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ালেন শবৎচন্দ্র বমা

ও রমেশকে নিয়ে। রমা এবং রমেশ উভয়েই পরিণত, পূর্ণবয়স্ক, দায়িত্বশীল সামাজিক মানুষ। আদর্শবাদী উচ্চশিক্ষিত রমেশে এখনও আছে সাবল্য। সহজ বিশ্বাস আছে, আছে পবিত্রতা, কিন্তু সে নিজের হৃদয়ানুভূতির গতিপ্রকৃতি চেনে। নিজের চাওয়া-পাওয়া বিষয়ে তার মনে কোনও অস্পষ্টতা নেই। সুরেন্দ্রনাথে যা হতে পারেনি, রমেশে তা হয়েছে। রমেশ আত্মনির্ভর, বলিষ্ঠ পূর্ণযুবক। শিশু নয়, সে পুরুষমানুষ। রমাও জানে নিজের মনের গতিপ্রকৃতি। সে জানে সবই, বোঝে সবই, কিন্তু মানতে পারে না সত্যকে। সমাজ-দেশাচার, সমকালীন নিয়ম কানুনের দ্বারা রমার মনের বিচারবুদ্ধিতে হাতকড়া আঁটা। রমা সুনাম দুর্নামের ভাবনায় আত্মহারা, স্বার্থপর। সে-স্বার্থপরতা নিজের পারিবারিক মর্যাদা ও ছোট নাবালক ভাইটির মুখ চেয়ে। যা নিজেকে এবং রমেশকেও শেষ করে দেয়। কড়া কর্তব্যবোধ আর সামাজিক কল্যাণবুদ্ধিকে হাতিয়ার করে নিজেরই সঙ্গে নিজের লড়াই তার। রমেশের মুখে শুনি—'সেদিন আমার কেন জানিনে অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল, তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর, —কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না।...ভেবেছিলাম, কোনও কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছাওয়ায় বসে আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে করে যাব।'—পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, এ কয়টি কথা কার বাস্তবজীবন থেকে উদ্ধৃতি? আমি তো দেখি, লেখক নিজের জীবনের আকাঙ্ক্ষাব ব্যর্থতা আর যন্ত্রণা থেকে উদ্ভূত কথাগুলি তাঁর নায়কের মুখে বসিয়ে দিয়ে আবাম চেয়েছেন। সেইজন্যেই হযত কথা ক'টি এত বেশি প্রাণবন্ত। রমার মুখে শুনি—'আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি।' তাবপবেই শরৎচন্দ্র লিখছেন —'রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল—না, তুমি যাও—আমি মিনতি করচি রমেশদা, আমাকে সব দিকে নষ্ট কোরো না, তুমি যাও।—যাও এদেশ থেকে—', কিন্তু এ কার মুখেব নির্মম কথা তিনি তাঁর বইয়ের নায়িকার মুখে তুলে দিয়ে অক্ষয় করে গেছেন!

রমা ও রমেশের ভালবাসা, সমকালীন অনড় কানুন মেনে বিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। শেষ পর্যন্ত রমা, রমেশেরই হাতে তার ছোট ভাইটিকে মানুষ করার ভার দিযে জ্যাঠাইমার সঙ্গে কাশী যাত্রা করে। রমেশকে মেরে না ফেলে, এবার রমাকেই নির্বাসনে পাঠান শরৎচন্দ্র। এখানে কিন্তু একটি বিনিময় লক্ষণীয়। রমেশের জীবনে রমাব জীবনের কর্তব্য ন্যস্ত রইল। রমেশের ভবিষ্যৎ শূন্য নয়, তারই হাতের মুঠিতে ধরা আছে বমার বাৎসল্যকেন্দ্র, যতীন,—রমার পিতৃবংশের ভবিষ্যৎ। রমাও একা নয়, তার সঙ্গে চলেছেন রমেশদার পিতৃবংশের মূর্ত অতীত,—বমেশের জ্যাঠাইমা। জীবনে প্রত্যক্ষ মিলিত না হলেও তারা পরস্পরের বিশ্বাসের বিনিময়ে একে অন্যের কর্তব্য-দাগিত্ব বিনিময় করে নিয়েছে। এই বিনিময়ের তাৎপর্যে পাঠকের সচেতন থাকা উচিত। বইয়ের উপসংহারটি যথেষ্ট তাৎপর্যময়।

শেষ পর্যন্ত 'পল্লীসমাজ'কেও ছাড়িয়ে ওঠেন শরৎচন্দ্র। দেন 'পথনির্দেশ'। এই নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পথের নির্দেশ।

'হেম' একটু আলাদা ধরনের মেয়ে, সে ঘরসংসারের চেয়ে বই পড়তেই বেশী ভালবাসে। তার বাল্যবিবাহ হয়নি, সে শিক্ষিতা, এটি লক্ষণীয়। বমা এখানে হেম হয়ে উঠেছে; যে-রমার মধ্যে পুরুষমানুষের যোগ্য জমিদারী পবিচালনার বুদ্ধি আর ক্ষমতা ছিল,—ছিলনা বাইরের বই-পড়া বিদ্যা। হেমেব বুদ্ধি ও বিদ্যা দুই-ই আছে। আর আছে সাহস। যা রমার একটুও ছিলনা। সে নিজেই উপস্থিত করেছে গুণীন্দ্রের কাছে নিজেব হৃদয়। হেম বিদ্রোহিণী। বিবাহে সে ঘোরতর অনীহা জানায়, গুণীন্দ্রের কাছেই বরাবর থাকতে চায়। ব্রাহ্ম গুণীন্দ্রের এঁটো থালাতে ব্রাহ্মণকন্যা হয়েও জোর করে ভাত খেতে বসে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়না।

হেমের বিঘ্ন হেমের মধ্যে নয়—বাইরে সুলোচনার মধ্যে। মা সুলোচনাই সমাজবদ্ধ জীব,—এখানে তিনিই হেম-গুণীন্দ্রের মিলনে বাধা। হেম যেমন মুক্তমনা, পঠনপ্রিয়, আত্মনির্ভর নবীনা নারী,—গতানুগতিক হিন্দুমনের মেয়ে নয়, গুণীন্দ্রও তেমনি মুক্তমনা, উচ্চশিক্ষিত, হিন্দু সমাজের গণ্ডী 'উত্তীর্ণ' ব্রাহ্ম পুরুষ। তার নিজেব কোনও দিক থেকেই কোনও বাধা নেই। তার নিজেব কোনও দিকে বাধা না-থাকাটাই তার মহৎ বাধা। সে কিছুতেই নিজের ইচ্ছাকে তাব আশ্রিত দুটি দুর্বল মানুষের উপর চাপাতে পারেনি। গুণীন্দ্রের চরিত্র উঁচু, সৎ। এখানেও বিয়ে হলনা। লেখকের যে তাহলে একজনেব কাছে শপথভঙ্গ হয়ে যায়। শবৎচন্দ্রের সামনে বুঝি ভেসে ওঠে সেই দূরবর্তিনীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার অদৃশ্য তর্জনী। যে-তর্জনী তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে সন্ন্যাসী আর ভবঘুরেদের দলে. সাগরপাড়ি দিইযেছে সাহিত্যচর্চা ছাড়িয়ে। সুবেন্দ্র পড়েছে গাড়িচাপা আর রমা পালিয়েছে কাশীতে,—সেই তর্জনীরই কি নিঃশব্দ অস্তিত্বে শবৎচন্দ্র হেমের সুস্পষ্ট করে বিধবাবিয়ে দিতে পারেননা ব্রাহ্ম গুণীন্দ্রের সঙ্গে? যদিও তাদেব মিলনেই বইয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন লেখক।

'পথনির্দেশে' কিন্তু নায়ক বা নায়িকার মৃত্যু ঘটে না, মৃত্যু ঘটেছে তাদের বাধা সুলোচনাব। যে-সুলোচনা হিন্দু সমাজেরই অন্ধ সংস্কাবের নির্মম প্রতীক। শরৎচন্দ্র এবাবে মৃত্যু ঘটালেন সেই সামাজিক বিঘ্নের। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সুলোচনা স্বীকার করে যাচ্ছেন তাঁর ভ্রান্তি, তাঁর ত্রুটি—'আমার অপরাধ যে কত বড় গুণী, সে আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।...লোকে সৎমার গল্প করে, আমি সৎমার চেয়েও তার শত্রু।' হেমকে বুকে নিয়ে সুলোচনা বলেন—'আজ আমি কাঁদতাম না হেম, যদি না তোকে এমন করে নষ্ট করতাম। আমি লজ্জায়, দুঃখে, তোর মুখের পানে চাইতেই পারচি না মা।...আমার হাত ছিল, সে হাত আমি নিজের হাতেই কেটেচি। তুই বলচিস মন্দ কপাল, কিন্তু তোর মত ভাল কপাল এ রাজ্যে একটি মেয়েরও ছিল না—যদি-না আমি মাঝে পড়ে সমস্ত নষ্ট করে দিতাম। অন্যান্য পাপের উপায় আছে, কিন্তু জেনেশুনে পাপ করার কোথায় মোচন পাব মা?'

এখানে এর প্রত্যেকটি বাচ্যার্থের মূলে আছে প্রচলিত কালে অতীত-নির্দিষ্ট

প্রাচীন নিয়মের অচলতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ। সুলোচনাকে দিয়ে সেই অচল নিয়মের পাপ স্বীকারোক্তি।

এর পরে সুলোচনা স্পষ্ট করেই গুণীর বিষয়ে কন্যাকে পথনির্দেশ দেন—'কোনো দিন তার অবাধ্য হোসনে মা, কোনো দিন তাকে দুঃখ দিসনে।...তার যা ধর্ম, তোর ধর্মও তাই। এ আমার আদেশ নয় হেম, এ তাঁর আদেশ। যাঁর আদেশে তোরা এক দিনের দেখাতেই চিরকালের মত এক হয়ে গিয়েছিলি।...যিনি অন্তর্যামী, যিনি বুকের ভিতর লুকিয়ে বসে কথা কন, তাঁকে অস্বীকার কোর না। তাঁকে অমান্য কোর না।..কিন্তু তোদের ওপরে আমার এই শেষ অনুরোধ রইল মা, আমার অন্যায়, আমার পাপকে চিরকাল স্বীকার করে আমার দুষ্কৃতিকে তোরা অক্ষয় করে রাখিসনে।'

প্রাচীন হিন্দু সমাজের নিয়মনিষ্ঠার অনিবার্য বিলুপ্তির মুখে শরৎচন্দ্র সুলোচনাব মুখ দিয়ে শেষ স্বীকারোক্তি করিয়েছেন। এর পরে সোজাসুজি খোলাখুলি হিন্দু বালবিধবা হেমের মুখে ভালবাসার কথা বসান লেখক। যদিও তা হিন্দু সতীত্বের আদর্শের মাপে মাপে। হেমের প্রণয়ের ভাষায় যে-সততা, যে-পবিত্রতা, তাতে বিধবাবিবাহের বিষয়ে হিন্দু কুসংস্কারকে যথেষ্ট কুশলতার সঙ্গে এড়ান হয়েছে, মালিন্য কিছুই নেই।

হেমই বলেছে—'গুণিদা, বিধবার বিয়ে হওয়া কি ভাল? গুণী চোখ বুজিয়াই বলিল, তুমি কি বল?'

গুণীন্দ্রের পরম কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি যখন এল,—গুণীন্দ্র নিজেই তখন প্রস্তুত নয়।

গুণী বলিল—'যারা সতী-লক্ষ্মী তারা নিজেদের স্বামীকে ভালবাসে। বিধবা হলে তার মুখ মনে করে আর বিয়ে করে না। তোমাব মার মত মবণকালে তাঁরা স্বামীর কাছে যাচ্ছি মনে করেন।'

হেম বলিল,—'আমাকে তোমরা জোব করে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়েছিলে। আমি সতীলক্ষ্মী, তাই মরণকালে তোমার কাছে যাচ্ছি এই কথাই মনে করব। আচ্ছা গুণীদা, মরে কি তোমার কাছে যেতে পারব?'

'তাহার কথার মধ্যে জড়তা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জার লেশমাত্র নাই। এ যেন কাহার কথা কে বলিয়া যাইতেছে।...গুণী স্তম্ভিত হইয়া রহিল।'

এইখানে শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্য অতি সূক্ষ্ম ও গভীর। তিনি দুটি চরিত্রেরই মৌলিক চেহারা সুস্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন ঐ কয়েকটি লঘু কৌতুকের পাতলা আবরণে ঢাকা কথাবার্তার মধ্য দিয়ে।

হেমের মন নির্ভীক, সে সমাজকে গ্রাহ্য করেনা। তার কাছে নিজের হৃদয় মন আর আশা আকাঙ্ক্ষা একটুও অস্পষ্ট নয়।

গুণীন্দ্র স্বভাবত মহৎহৃদয়, তার উপরে উচ্চশিক্ষিত। সে নিজের এবং হেমের

কার কোনখানে অবস্থিতি, তা জানে। সে সচ্ছল ধনী, সুশিক্ষিত বিদ্বান এবং অসহায়া হেমের আশ্রয়দাতা। হেম কপর্দকশূন্য, উচ্চশিক্ষিতা নয়, হেম গুণীরই আশ্রিত মানুষ। জ্ঞানের কোটীতে হেম গুণীন্দ্রের সমতুল্য নয়। এই ব্যবধান অভিমানী হেমকে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনখানে আঘাত দিতে পারে এ-সম্পর্কে গুণীন্দ্রের সচেতন সতর্কতা সর্বদা ছিল। তাই, তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা নিজের হৃদয় এবং নিজের মতামত হেমের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলা। হেমের পক্ষে যা সম্ভব ছিল তার আশ্রয়হীন আত্মীয় বন্ধুহীন জীবনের জন্য,—আশ্রয়দাতা হওয়ায় গুণীন্দ্রের পক্ষে তা সম্ভব ছিলনা।

কথাসূত্রে হেমের তোলা পরম মুহূর্তটি পার করে দিয়েই কিন্তু গুণীন্দ্রের মনস্থির হয়ে গেল। পরদিন সকালে গুণী যখন কথাটা পাড়ল,—হেম সংক্ষেপে বলিল, ছিঃ, ও কি আবার একটা বিয়ে?

শরৎচন্দ্র একবার ওড়না তুলে হেমের মনের ভিতরেব নির্মুক্ত সৌন্দর্যটি দেখিয়ে আবাব তা চাপা দিয়ে দিলেন।

গুণীরই উপরে অভিমান কবে গুণীকে প্রত্যাখ্যানের পব হেম নিজেকে তাড়িযে নিয়ে বেড়ায। কাশীবাসী হল ; দীক্ষা নিল ; শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে গেল। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেলনা। শেষ পর্যন্ত গুণীন্দ্রের রোগের সংবাদে হেম ফিবে এল। তারপবে হেম ও গুণীন্দ্রের শেষবার মুখোমুখি হওয়া। শবৎদা তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে মুখোমুখি। হেমকে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে গুণীন্দ্রনাথ স্থিরকণ্ঠে বলেন—'চলো হেম, আমরা কাশী চলে যাই'। হেম ও গুণীন্দ্রের এই কাশীযাত্রা কিন্তু রমাব কাশীযাত্রা নয়। কাশী তখন ছিল হিন্দুসমাজের সমাজবহির্ভূত এমন একটি পবিত্র স্থান,—সমাজে যাদের নিযে গণ্ডগোল হত, তারা কাশীতে যেত আশ্রয় নিতে। বানপ্রস্থীরা শুধু নয়, বিধবাবা, কলঙ্কিনীবা, কুলত্যাগিনীরা যত সমাজ-চৌহদ্দিব বাইবে কাশীতে। গুণীন্দ্র-হেমের কাশীযাত্রা সংসার ত্যাগ বা বানপ্রস্থ নয়, এ যাওয়া মিলনের যাত্রা। সমাজেব নিগড়ের বাইরে নতুন জীবনের পানে যাত্রা। তাই—'হেম মুখ লুকাইয়া কাঁদিযা বলিল, চল, কিন্তু এই তোমার শেষ আদেশ। এ কি আমি সহ্য করতে পারব?' গল্পে এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন শবৎচন্দ্র।

সব দ্বন্দ্ব, দ্বিধা, মান অভিমান, বিচ্ছেদের শেষে এই প্রাপ্তি—একে চোখেব জলের আনন্দে গ্রহণ কবে হেম। মিলন বলেই একে সহ্য করতে পাবা নিযে ভয।

প্রকৃত গল্পটি এইখানেই শেষ হযে গেছে। কিন্তু এর পবেই আবার লেখকের সামনে উত্থিত হয় অদৃশ্য তর্জনী। পাঠক সমালোচকের চোখে ধুলো দিতে হবে—একজনের মনে শান্তি দিতে হবে। তাই শিল্প যাক ধুলোয় গড়াগড়ি—বই শেষ হয়েছে এক প্রক্ষিপ্ত স্তবকে। আগাগোড়া বাস্তবভিত্তিক বাস্তবধর্মী লেখাব সমাপ্তিতে নিচে জুড়ে দিলেন কাঁচি-কাটা কাগজের তালি। নিখাদ আদর্শময় একটি গুরুগম্ভীর বক্তৃতা। যা উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসের বিপরীত।

গল্প যেভাবে শুরু আর যেভাবে তার আকৃতি গড়ে ওঠে,—তাতে গল্পেব ওখানেই

শেষ অতি সুস্পষ্ট। সুলোচনার শেষ ইচ্ছা পালনের মধ্যে, গুণী-হেমের মিলনের মধ্যেই 'পথনির্দেশ' দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। অথচ, মূল ভাবের বিরোধী, বিষয়বস্তু ও কাহিনীব সঙ্গে সংযোগশূন্য, অতিনাটকীয় এক সুদীর্ঘ নৈতিক বক্তৃতা দিয়ে গুণীন্দ্র এখানে সেই অদৃশ্য অনুশাসন পালন করেছে। শিল্পের প্রতি—আর নিজের প্রতি কিছুমাত্রও মায়ামমতা থাকলে এমন অদ্ভুতভাবে নিজের লেখা কেউ নিজহাতে ধ্বংস করতে পারে না—শরৎদা যা করেছেন।

নিরুপমা দেবী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব যখন জানিনা. আমি তখন একদিন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম—বেশ রাগ করে,—'আপনি আমাকে বিয়ের জন্যে এত উপদেশ দিচ্ছেন, অথচ আপনার রমাকে হেমকে আপনি কাশী পাঠান কেন? বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণীকে কেন মেরে ফেললেন বলে আপনি রাগাবাগি করেন—অথচ নিজে তো একটিও বিধবা বিবাহ দেননি কোনও বইতে, কোনও গল্পে।'

শরৎদা খুব বিচলিত হয়ে বলেছিলেন—বমাকে কাশীতে আমি পাঠাইনি রাধু, পাঠাও তোমরাই। এই তোমরাই।

আমার দিকে আঙুল নির্দেশ করে তাঁর সেই ক্ষোভ আর নিরুপায় দুঃখভরা মুখভাবের অর্থ সেদিন আমার কাছে একটুও স্পষ্ট হয়নি। আশ্চর্য হয়েছি তাঁর অদ্ভুত উত্তর শুনে। তখন আমি তাঁর জীবনের অদৃশ্য ট্র্যাজেডির কথা কিছুই জানতুম না। অনেক পরে আমার কাছে তাঁর সেদিনের সেই সংক্ষিপ্ত অসংলগ্ন কথার জটিলতার অর্থ স্পষ্ট হয়েছিল। 'তোমরা' বলে সেই তর্জনী কার উদ্দেশে তুলেছিলেন, বুঝতে পেরেছি।

সাহিত্যের চেয়ে জীবন তাঁর কাছে বেশি জরুরী ছিল। তাই তিনি শিল্পের দাবী অনায়াসে অস্বীকার করেছেন, কোনও একসময়ে ব্যক্তিগত আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে। ফলে, নিজেকে ভবিষ্যৎকালের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও রক্ষণশীল এবং সমাজ মুখাপেক্ষী সংস্কারান্ধ বলে প্রমাণ করে গেছেন, নিজের প্রতি দৃক্পাত না করে।

একটি মাত্র মানুষেব মান রাখতে এবং মন রাখতে, শিল্পের সহজ দাবী, জীবনবিশ্বাসের দাবী অস্বীকার করতে তাঁব বাধেনি। গল্পের শেষরক্ষায় তখন শরৎদা মন দেননি, মন ছিল নিরুপমার মুখ রক্ষায়। তাঁর কাছে নিজেব শপথ রক্ষায়।

তাঁর কথাবার্তা থেকে আমি যা বুঝেছি, তাতে এই ধারণাই আমার দৃঢ়মূল হয়েছে।

নিরুপমা দেবীব যবনিকা-অন্তরালবর্তী অস্তিত্ব শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের পক্ষে প্রেরণাদায়ী ছিল। তাঁর লেখা পড়ে নিরুপমা দেবীর বিস্মিত উল্লাস এবং তাঁর আরও লেখা পড়াব জন্য সাগ্রহ অপেক্ষা—শরৎচন্দ্রকে লেখায় উদ্দীপিত অনুপ্রাণিত করে তুলত। তাঁর উৎসাহে, শ্রদ্ধায, বিশ্বাসে, অনুপ্রাণিত শরৎচন্দ্র নিজেকে নিজের কাছে অনেক

সুন্দর আর বড় করে অনুভব করতেন। নিরুপমার উৎসুক আগ্রহ মনে রেখে শরৎচন্দ্র তখন লিখে যেতেন। সে-লেখায় শিল্প-লক্ষ্যের পাশাপাশি থাকত বিপুল আনন্দানুভূতির সঙ্গে—'নিরুপমা পড়বেন' এই লক্ষ্যটিও।

শরৎচন্দ্রের মাঝে মাঝে স্বগত-কথন থেকে জেনেছি, তিনি জানতেন, নিরুপমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে তাঁকে তাঁর শিল্পশক্তি। তাঁর সাহিত্য পড়ে নিরুপমার বিস্ময় হয়ে ওঠে দীপ্ত, আনন্দ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল। কঠোব পর্দার আড়ালে থেকে পরস্পরের শিল্প বিনিময় ও শিল্প পরিচিতি, হৃদয়ানুভবে পৌঁছেছিল। শরৎচন্দ্র বুঝেছিলেন তাঁর রচনা নিরুপমার হৃদয়কে স্পর্শ করতে পেরেছে। তিনি নিজে যে তাঁর থেকে বহু যোজন দূবের, এটিও তাঁর জানা। সাহিত্যই ছিল ওঁদের দুজনের মনের সংযোগসূত্র।

শরৎচন্দ্র বলেছেন—তিনি চিঠিও লিখতে পেতেননা তাঁকে। তাঁরই নিষেধ ছিল। মাঝে মাঝে তুচ্ছ প্রয়োজনীয় কথা বা অপ্রযোজনীয় কথা চিবকুটে লিখে পাঠিয়েছেন। তাও যেত তাঁর দাদা বিভূতি ভট্টকে লেখা চিঠির সঙ্গে। সরাসরি নিরুপমাকে নয়।

একবার একখানি সরাসরি চিঠি কলকাতা থেকে নিরুপমাবই নামে পাঠানর ফলে—নিরুপমা কলকাতায় শবৎচন্দ্রকে লিখলেন—আপনি আমাব সঙ্গে চিঠিপত্রের যোগাযোগ রাখবেননা। এখানে কখনও আসবেননা, অনেক দূবে চলে যান। আমায় নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে দিন।

শরৎচন্দ্রের প্রতিটি বালবিধবা নায়িকার মুখে নিরুপমার 'দূরে চলে যান' কথাটি শরৎচন্দ্র অক্ষয় করে রেখে দিয়ে গিয়েছেন।

তিনি শুধু দেশ ছেড়েই চলে গেলেননা, সাহিত্য ছেড়েও চলে গেলেন। সমুদ্র-পরপারে বর্মায় গিয়ে তিনি কলম ছেড়ে ছবি আঁকা, গান-বাজনা আর গভীর পড়াশুনোয় ডুবে রইলেন।

আমাব মনে আছে, একবার তাঁকে আমি জিজ্ঞেস কবেছিলুম—আপনি বর্মায় সাহিত্য রচনা ছেড়ে ছবি আঁকায় মাতলেন কেন?

উত্তরে বলেছিলেন—দেশের সঙ্গে সাহিত্য আমার একাত্ম। দেশত্যাগীই যখন হতে হল, সাহিত্যত্যাগীই বা হব না কেন? তবে—বাবদুনিয়ার সাহিত্য পড়াশুনো ছিল বৈকি। বেশী নয়, অল্পস্বল্প। বেশী ছিল, দর্শন আর বিজ্ঞান। তাছাড়া ছবিটবি আঁকতুম, গানবাজনাও ছিল কিছুটা।

আর একবার সাহিত্য আলোচনা করতে করতে বলেছিলেন—সাহিত্যের জন্যেই আমাকে দেশত্যাগী হতে হয়েছিল, পেটের জন্যে নয়। একটাই পেট তো মাত্র।

তারপরে তাঁব সেই রহস্যময় অস্পষ্ট ভাষায় অন্যমনস্ক উদাসস্বরে স্বগতোক্তি করেছেন—সাহিত্যের জন্যে দেশত্যাগী হয়েছি, নিরুদ্দেশ হয়েছি—আমি ছাড়া এ-খবর আর কেউ জানেনা। সাহিত্য আমাকে কম দুঃখ দেয়নি।

পরে দূরমনস্কতা থেকে ফিরে এসে শেষে সহজ গলায় বলেছেন—হ্যাঁ, জীবনে

সবকিছু দুঃখের দামও শেষকালে সাহিত্য থেকেই পেয়ে গেলুম। পাওনার বেশীই পেয়েছি হয়তবা।

আমার মনে হয়েছে, শরৎচন্দ্র তাঁর বইগুলির মধ্য দিয়ে কোনও কোনও জায়গায় নিরুপমার সঙ্গে কথা কইতে চেয়েছেন। নিজের কথা বলা, নিজের বিষয়ে ভাবা তাঁর প্রকৃতি ছিলনা। তিনি হয়ত তাঁর লেখায় নিরুপমারই হৃদয়কে বার বার খুলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন নায়িকার মাধ্যমে। 'শ্রীকান্তে' সুস্পষ্ট ভাবেই অনেক জায়গায় এটি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষ করে তৃতীয় পর্বে তো বটেই।

নিরুপমা দেবী নিজে সাহিত্যশিল্পী ছিলেন। বোহেমিয়ান শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তাটিকে ভাল করে দেখতে পেয়েছিলেন মনে হয়। তাঁর গভীর রাতে বাঁশী বাজানো, গান গাওয়া, অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে বেড়ান--কিছুই তাঁর কাছে অসমঞ্জস ঠেকেনি, সাংসারিক অন্য মানুষদের যেমন অনুচিত ঠেকত। অন্যেরা সকলেই সে-সময়ে এই বখাটে ছেলেটিকে অপছন্দের, উপেক্ষার ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতেন। কেউ কেউ হয়তবা করুণার দৃষ্টিতে। শবৎচন্দ্র সশ্রদ্ধ অভিনন্দন দৃষ্টি বোধহয় জীবনে সর্বপ্রথম পেয়েছেন এই অন্তরালবর্তিনীর কাছ থেকে,—যিনি ছিলেন তাঁরই মত সাহিত্যপ্রেমী, সাহিত্যসাধনারত। অন্তরের যোগ ঘটেছিল এইখানেই, দেহ ছিল ওঁদের বাধা।

নিরুপমা দেবীর বচনাশক্তিকে শরৎচন্দ্র বেশ অভিভূত দৃষ্টিতে বিচার করতেন দেখেছি। তাঁর মুখে একাধিকবাব শুনেছি, সমকালীন উপন্যাস লেখক লেখিকাদের মধ্যে নিরুপমার লেখাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। নিরুপমা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন, তাঁর সমস্ত কিছুই তিনি প্রশংসনীয় মনে করতেন। নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের রচনার গভীর অনুবাগী ছিলেন সন্দেহ নেই—কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি কখনও কোনোখানে দুর্বলতা প্রকাশ করেননি, বরং সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দূরত্বই প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি অতিশয় সাবধানী ছিলেন। বাইরের মানুষদের তো বটেই,—নিজেকেও হয়ত বেশী বিশ্বাস করতেননা,—তাই অসম্পৃক্ত ঔদাসীন্যে অনেকটা তফাতেই থেকেছেন।

শরৎচন্দ্রের লেখায় নর-নারীর হৃদয়সমস্যায় নারীরই হৃদয়-বিশ্লেষণ বেশী দেখা যায়। তাঁর মুখে অনেকেই শুনে থাকবেন--মেয়েরা পুরুষের হৃদয় একনিমেষেই চিনে নিতে পারে, এটি বিধাতার দেওয়া শক্তি ওদেব। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার, ওরা নিজের হৃদয় নিজে চিনতে পারে না। যেমন মানুষ নিজের মুখ নিজে দেখতে পায়না।

একটি কথা আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। বলতে এটি অমানবিক শোনালেও বলেই ফেলি। শিল্পের পক্ষে অনেক সময়ে নিয়তির নিষ্ঠুরতাই আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। আমার মনে হয়, নিরুপমা দেবী যদি শরৎচন্দ্রের অভিজ্ঞতায় উদিত হয়ে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করার অল্প কিছুকাল পরে অস্ত যেতেন, তাহলে শরৎচন্দ্রের শিল্পী-আত্মা মুক্ত থাকত। কোনও দায়, কোনও ভার সেখানে ছুঁয়ে থাকতনা।

রবীন্দ্রনাথের শিল্পজীবনে কাদম্বরী দেবীর মত, নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের শিল্পযাত্রার প্রথম দিকেই যদি অন্তর্হিতা হতেন, তাহলে শরৎসাহিত্য প্রবাহিত হত ভিন্ন খাতে, ভিন্ন ধারায়, স্বচ্ছন্দ মুক্তির মধ্য দিয়ে। কারণ, শরৎচন্দ্রের শিল্পীসত্তায় গৃহবন্ধন, সমাজবন্ধন তখন একেবারেই ছিলনা। অন্তরালবাসিনী নিরুপমার জীবিত অস্তিত্ব শবৎচন্দ্রকে যেমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিল, তেমনই তাঁর শক্তির পূর্ণ বিকাশে করেছিল বাধা সৃষ্টি। লোকনিন্দা, সমাজভীতিতে অনেক বড় শিল্পীই, এদেশে অন্তত, তাঁদের লেখনীর মোড় ঘুরিয়েছেন লক্ষ করা যায়। শরৎচন্দ্রের লেখার যিনি ছিলেন প্রেরণা, তিনিই ছিলেন বাধা। যে-সব সীমাবদ্ধ মানসিকতার দায়ে আজ তাঁকে অভিযুক্ত করি আমরা, শিল্পী শরৎচন্দ্রের সে-মানসিকতা ছিলনা। এখানে ব্যক্তিসত্তাকে শিল্পীসত্তা বলে সমালোচকেবা ভুল কবলে, তাঁদের কিছু বলার নেই।

ভাবলে অবাক লাগে, এমন উত্তাল প্রাণশক্তিপূর্ণ এক শিল্পী তাঁর লেখনীকে চিরদিন সংবৃত করে রাখলেন একটি নারীর অভিমতেব সম্মানে। ছটফটে, বেপরোয়া, নেশাখোব মানুষটি মেতে রইলেন এক আশ্চর্য কোমল গোপন উপলব্ধির নেশায়, —একটি গণ্ডীবদ্ধ মনের কাছে নতচক্ষু আত্মসমর্পিত হয়ে ফাঁসি দিয়ে রাখলেন নিজের শিল্পীসত্তার।

জানিনা, বিশ্বের শিল্প-ইতিহাসে শিল্পের শুরুর পর্বেই এই আত্মত্যাগেব বা আত্মহত্যার নজির মিলবে কিনা।

তাঁব শেষ জীবনের লেখাগুলি লেখনীর পূর্ণমুক্তির মধ্যে লেখা। যাব ফলে 'সবিতা'র মত চরিত্রও সেই কঠিন আবদ্ধ যুগে শরৎচন্দ্র সমাজের সামনে সরাসরি নিয়ে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। তখন তাঁর ভুবনে তাঁর লেখা পড়বার লোক কেউ ছিলনা। এটাই হয়ত লেখনীর যদৃচ্ছা বিচরণের হেতু হতে পারে।

১৫

সেই দুঃখী মানুষটির সবচেয়ে বড় দুঃখ ছিল, তাঁকে সংসারে বেশীর ভাগ মানুষই ভুল বুঝেছে বা উল্টো বুঝেছে। তিনি বলতেন—আঙুলে-গোনা কয়েকজন মাত্র মানুষ তাঁকে সঠিক দেখতে পেয়েছে বা বুঝতে পেরেছে। এটি তাঁর অভিমানী মনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল।

এই আঙুলে গোনা কয়েকজনের সামনের সারিতে যে নিরুপমা দেবী ও অনিলা দেবী ছিলেন এটি আমার ব্যক্তিগত স্থির ধারণা। শরৎচন্দ্রের নিজের ধারণায়, তাঁর সঠিক বিচারক আর কে ছিলেন জানা নেই।

আমার কাছে শরৎদা মাঝে মাঝে নিজের মনের দুঃখ কখনও কখনও প্রকাশ করেছেন বলে—কেউ যেন ভুল করে অনুমান না করেন, শরৎচন্দ্র কথিত এই 'আঙুলে-গোনা' কয়েকজনের অন্যতম একজন আমি। আমি জানি তা নয়। সত্য বলতে কী, তখন আমি তাঁর মুখের ব্যাচ্যার্থ-অতিক্রান্ত ভিন্নার্থস্পর্শী ভাষাও বুঝতে

পারতুমনা সবটা। তাঁর কথার মানে খুঁজে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তুম। মনে হত, অনেক কথাই তাঁর ঝাপসা, অস্পষ্ট রয়ে গেল।

অথচ সেই সময়কার সেই গ্রাম্যভাবাপন্ন, চঞ্চল-প্রকৃতি, লঘুভাষী, অসংযতবাক্ শরৎচন্দ্রকেই জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের তেতালার বৈঠকখানায় দেখেছি একেবারে অন্য একজন মানুষ।

একদিন বেলা চারটে আন্দাজ সময়ে আমরা কয়েকজন গুরুদেবের কাছে রয়েছি—অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যমশায় এসে গুরুদেবের কাছে মৃদুস্বরে কী-যেন নিবেদন করলেন। গুরুদেব বললেন—হ্যাঁ, এখানে নিয়ে এস। চারুবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে গুরুদেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা সকলে একটু অন্য ঘরে গিয়ে বস। আমি খবর পাঠালে এস। আমরা উঠে পাশের ঘরে গেলুম।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যমশায় শরৎচন্দ্রকে নিয়ে ঘরের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, গুরুদেব বললেন—তুমিও বস না হে। তারপর শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—চারু থাকলে আমাদের কথাবার্তার অসুবিধে হবেনা—কী বল তুমি? শরৎদা শান্তভাবে মাথা হেলিয়ে হাসিমুখে ইঙ্গিতে জানালেন—অসুবিধে হবেনা। তারপরে তিনি চারুবাবুর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতেই নিজের পাশে ফরাসের ওপরে বসতে অনুরোধ করলেন। চারুবাবু এগিয়ে এসে শরৎচন্দ্রের কাছে বসলেন।

সেদিন দূর থেকে দেখলুম গুরুদেবের কাছে বসে আছেন একটি শান্ত, বিনীত, সলজ্জ নম্র মানুষ। শরীরে কোথাও তাঁর এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, চাউনিতে নেই অস্থিরতা, অনর্গল কথা তো মুখে নেই-ই—বরং একেবারে নির্বাক। মুখভাব কোমল, সলজ্জ, দৃষ্টি অবনম্র, একটু যেন বিষণ্ণ। প্রগলভতা কোনোখানে দেখলুমনা।

গুরুদেবই সারাক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন। মাঝে মাঝে গুরুদেবের প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিংবা সংক্ষিপ্ত কথায় উত্তর দিচ্ছিলেন শরৎচন্দ্র। প্রায় পনের কুড়ি মিনিট পরে শরৎচন্দ্র ও চারুবাবু উঠে বেরিয়ে গেলে আমরা আবার সে-ঘরে এসে ঢুকতেই গুরুদেব কৃত্রিম কোপে বলে উঠেছিলেন—এ কী, খবর না পাঠাতেই তোমরা ঘরে এসে ঢুকলে যে বড়? আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ায় অন্য মেয়েরা সকলে জোরে হেসে উঠলেন—গুরুদেব তাঁদের দিকে তাকিয়ে চাপা-হাসি-উজ্জ্বল মুখে বললেন—আমি তোমাদের বিরুদ্ধে ট্রেসপাসের চার্জ আনতে পারি, তা জান?

তাঁরা আরও বেশী হেসে বসেছিলেন—আনুনগে, ভয় করিনা।

পরে এই নিয়ে শরৎচন্দ্রকে বলেছি—সুন্দর ব্যবহার, মার্জিত আচরণ সবই আপনার জানা। অথচ পাঁচজন ভদ্রলোকের সামনে এমন অজ্ঞ অনভিজ্ঞ মানুষের মতন নিজেকে খেলো করেন যে কেন, কিছুতেই ভেবে পাইনা।

শরৎদা হেসে জবাব দিয়েছেন—ওটা তোমাদের গেঁয়ো দাদার কৃতিত্ব বলে

ভুল কর না তোমরা। কৃতিত্বটা গুরুদেবেরই। তাঁর পারসন্যালিটিকে শুধু বিরাট বললেই বলা হয়না, দৈবীও বলতে পার। এমন কোন মানুষ নেই—মানুষ কেন, বনের বাঁদরও তাঁর সামনে গিয়ে বসলে ভদ্র আর মার্জিত হয়ে যাবে আপনিই। এটা পারসন্যালিটির স্পেশ্যাল ম্যাগনেট বলতে পার।

শিবপুরে থাকতে শরৎদা যেমন ধরনের ছিলেন, বালিগঞ্জে যখন বাস কবেছেন তখন অনেকটাই বদলেছেন ধরনধাবণে। তবে, ভিতরের মানুষটি বরাবর একই ছিল।

তাঁর প্রথম জীবনে এবং যৌবনকালে আমি তাঁকে দেখিনি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। মাত্র যোল বছর তাঁর সঙ্গে জানাশোনা। তার মধ্যে শেষের দিকে আট নয় বৎসর বিশেষ ঘনিষ্ঠতায় নিকট আত্মীয়ের মত ছিলেন। এ-ঘনিষ্ঠতাও বাইরে যে খুব মেশামেশি বা আচরণনির্ভর ছিল তা নয়। ছিল মনেব দিক দিয়ে, স্নেহের দিক দিয়ে। বালিগঞ্জে আমাদের নতুন বাড়ি কাছাকাছি হওয়ায় উনি প্রায় প্রতিদিনই আমাদেব বাড়ি আসতেন শেষ জীবনে।

আমি শরৎদাকে তাঁর পবিণত বয়সেই দেখেছি। তখন তাঁকে যে-বকম দেখেছি, তার সঙ্গে যৌবনকালের বর্ণনা যা পড়েছি বা শুনেছি, একটুও মিল ছিলনা। তাঁকে গান গাইতে আমি শুনিনি। ছবি আঁকতেও দেখিনি। তবে গান শুনতে খুব ভালবাসতেন। মডার্ন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট আর্ট পছন্দ করতেননা। বলতেন—বিধাতা যা আমাদের চৈতন্যের কাছে স্পষ্ট কবে ধবেননি, অস্পষ্টতায় রেখেছেন, তাকে স্পষ্টতায় ধরবার চেষ্টা করা প্রকৃতির বিরুদ্ধতা। এতে বিকৃতি সৃষ্টি হয়। লিভাব, পিলে, স্টম্যাক, কিডনি, ব্লাড, আর্টাবি, ভেইনস, আমাদের শরীরে আছে—কিন্তু দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্যে আছে। তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করতে সামনে টেনে এনে সর্বসমক্ষে সর্বদা সাজিয়ে রাখা দবকার আছে কি? অস্তিত্বটা জানার মধ্যে থাকলেই হল, দৃশ্যমান কবার প্রয়োজন শুধু শারীরবিদ্যা চিকিৎসাবিদ্যার ঘরে, অন্যত্র নয়।

আমাদের দেশে আর-কোনও সাহিত্যিক একটি বিশেষ দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের ধরনের সাহিত্যসাফল্য লাভ করতে পারেননি, এটি লক্ষ করাব বিষয়। এইদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথও এ-ধরনের সফলতা অর্জন করেননি। সম্পূর্ণ নিঃস্ব একটি নতুন লেখককে মাত্র দুই একটি লেখা ছাপা হতে-না-হতেই প্রকাশকদের উৎসুক টানাটানি আর সম্পাদকদের বিপুল ব্যগ্রতার মধ্যে এমনভাবে পড়তে আর কাউকে তো দেখতে পাইনা। প্রথম লেখা ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে এত খুশির ঢেউ, আর বিস্ময়ের বিদ্যুৎও দেখা যায়নি।

অগ্রিম মোটা টাকার (সেকালের হিসেবে বেশ মোটাই) কনট্রাক্ট সই করে পুস্তক-প্রকাশক কর্তৃক দূর বিদেশ থেকে লেখককে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনার এ-সম্মান ইয়োরোপে সম্ভব হলেও এদেশে সে-যুগে একেবারেই অভাবিত ছিল নিঃসন্দেহে। তবুও তা সেদিন সম্ভবপর হয়েছিল। যা আজও পর্যন্ত আর হয়নি।

মধুসূদন বিদেশে মরণাপন্ন হয়েও দেশ থেকে কোনও প্রকাশকের সাহায্য পাননি; অবশ্য তখন প্রকাশক সংস্থা তেমন গড়েও ওঠেনি। তবে, বিদ্যাসাগরের মত গুণগ্রাহী এবং মহাপ্রাণ মানুষ সে-যুগে ছিলেন এ-যুগে যা নিশ্চিহ্ন। রবীন্দ্রনাথের মত মহামহীরূহ, বিদেশে নোবেল প্রাইজ পাওয়া লেখককে নিজের দেশে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বার্ধক্য-দুর্বল দেহে পাঁচজনের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে।

শরৎচন্দ্রই বোধহয় আমাদের দেশে প্রথম লেখক, যিনি তাঁর কলমের নিব থেকেই কলকাতা শহরে অট্টালিকা, পল্লীগ্রামে সুন্দর সুদৃশ্য আবাস, ফুলের বাগান, শস্যের জমি করেছেন। মোটবগাড়ী, ড্রাইভার, রাঁধুনী, দাস, দাসী ছাড়াও গৃহে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে প্রতিপাল্য যথেষ্ট সংখ্যায় রেখেছেন। অথচ এই মানুষটি সম্পূর্ণই স্বাধীন লেখক ছিলেন। সাহিত্যকে তিনি নিজের জন্য, সচেতন মনে, বাণিজ্যিক পণ্য করে তোলেননি। কোনও সম্পাদক বা প্রকাশকের সাধ্য ছিলনা, তাঁদের ইচ্ছা বা সুবিধা অনুযায়ী তাঁকে দিযে কিছু লিখিয়ে নেবার বা লেখার অদলবদল করিয়ে নেবার। সাধ্য ছিলনা তাঁকে দিয়ে আরও আধ ফর্মা বাড়িয়ে নিতে কিংবা ছাপার সুবিধের জন্যে আধ পাতা কমিয়ে নিতে। ধাবাবাহিক লেখার ব্যাপারে সম্পাদকের অবস্থা তিনি বিপন্ন করুণ করে তুলতেন। বই ছাপার প্রয়োজনে প্রকাশকের জরুরী প্রয়োজনও তিনি মানতেননা। মৌলিক নাটক তো লিখলেনই না—পাছে তা স্টেজওয়ালারা অদলবদল করতে বলে তাঁকে দিয়ে তাদের হুকুম তামিল করায়।

সেই অদ্ভুত খেয়ালী, জেদী মানুষটিকে টাকা দিয়ে কিনে নেওয়ার সাধ্য কারও ছিলনা। প্রকাশক আর সম্পাদক সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর মন জুগিয়ে চলতেন। 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিক লেখা অসমাপ্ত পড়ে আছে—অথচ 'বিচিত্রা'য় 'বসুমতী'তে নতুন উপন্যাস ধরেছেন। অভিযোগ করলে জবাব দেন—আমার কলম 'কল' নয়। কলের মতন দম দিলেই তরতর করে চলতে পারেনা। যখন যেটা কলমে আসে—সেটা লিখি—যেটা আসতে চায়না—জোর করে লিখিনে। লিখতে পারিনে। একটি অলিখিত নিয়ম ছিল তাঁর,—তাঁরই মর্জির উপর নির্ভর করে চলতে হবে সম্পাদককে আর প্রকাশককে;—না যদি পোষায়, কারবার তুলে দিতে পারেন,—তাতে আপত্তি নেই।

ফণীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কারবার বন্ধ হওয়ার কারণ, শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছি—তাঁর উপরে ফণীবাবুর অভিযোগের চাপ সৃষ্টি। তিনি নিজের উপরে অন্যের চাপ সহ্য কবতে পারতেননা। অথচ চরিত্রের একটি জায়গায় তাঁর দুর্বলতার অবধি ছিলনা। সেটি হচ্ছে মানুষের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা। যেখানেই তিনি একটু অকপট স্নেহের স্পর্শ পেয়েছেন তার প্রয়োজনে সেখানেই তিনি সব কিছু দিতে, সব কিছু অসীম সহিষ্ণুতায় সহ্য করতে প্রস্তুত। সেখানে কোনও অহংকার নেই, কোনও চাহিদা নেই, কোন হিসেবেরও প্রশ্ন নেই। এত নরম, এত বিনীত, এত অহংশূন্য মানুষ তখন তিনি—যেন দিতে পেরেই, সহ্য করেই তিনি মহাধন্য। তাঁকে সরল ভালবাসা দিয়ে কিনে নিয়েছিল দেশের অশিক্ষিত মানুষেরা। বঞ্চিত

উৎপীড়িতদের প্রতি তাঁর দুর্বলতার সীমা ছিলনা। পতিতাদের জন্য, বালবিধবাদের জন্য তাঁর লেখনী যে সরব হয়েছে—এটির কারণ, এদের কোনওখানে কেউ সহায় ছিলনা সেদিন। সমাজ এদেরকে সুখী সার্থক মানুষদের প্রয়োজনে আর সেবায় নিয়োজিত রেখেছিল। তাদের সহজ স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার দিকে, সুস্থ জীবন যাপনের দিকে দৃক্‌পাত কবেনি। সমাজের একপাশে এই অবহেলিত নিপীড়িত মানুষগুলির নিরুপায় অবস্থা শরৎচন্দ্রের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। তিনি তাদেব জন্য স্বতঃপ্রেরণায় কলম ধরেছিলেন।

দেশের পরাধীনতা দেশের মানুষকে যে মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করেছে—এদেশের মানুষ একান্ত আত্মনিবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে জৈবিক নিয়মে কেবলমাত্র বেঁচে থাকতে পেলেই সন্তুষ্ট—এটিতে তাঁর মর্মান্তিক ক্ষোভের যন্ত্রণা ছিল। মনুষ্যত্বহীন বিকৃতবুদ্ধি মানুষে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ, এই অনুভব তাঁকে অধীর অস্থির করে তুলত। 'পথের দাবী'তে তাঁর এই মানসিক যন্ত্রণার ছবি অক্ষয় হযে ফুটে আছে।—'রাজত্ব করবার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি, তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিসনে।' মনুষ্যচেতনাসম্পন্ন একটি মৃত্যুমুখী মানুষের মুখে এই ক'টি কথা বসিয়ে তারই ফলস্বরূপ এঁকেছেন সব্যসাচী চরিত্র। সব্যসাচী চরিত্রে বৈপ্লবিকগুণ কতখানি, তাঁর একাগ্র বিপ্লবসাধনা কোন্ মানদণ্ডের এই নিয়েই হয়ত আমরা বেশী লক্ষ করি ; কিন্তু শবৎচন্দ্র বিপ্লবী সব্যসাচীকে প্রধানত মানবিক গুণের ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছেন। মূলত তিনি মহৎ, মানবিক, তার পরে একনিষ্ঠ বিপ্লবী।

ইয়োরোপীয় সভ্যতাব অমানবিক সর্বগ্রাসী ও লোভেব মূর্তি শরৎচন্দ্র সব্যসাচীব দৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুটিয়েছেন পাশাপাশি সামান্য কয়েকটি উদাহরণে। অনেক বেশী কথায় নয়, বইতে লেখকের নিজের বক্তৃতা নেই, সামান্য সামান্য দু'চারটি উত্তর প্রত্যুত্তরে কথায়বার্তায় নিজের দেশের মানুষের মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, সূক্ষ্ম অথচ গভীর খোদাই রেখায় আর কোনও বইয়ে সেদিন—আমাদের দেশে এমন করে লেখা হয়নি।

অতি সাধারণ সাদামাটা কথায় সহজ গলায় শরৎচন্দ্রের নায়ক বলেন—'হা আমার পোড়া কপাল। দেশ মানে কি বুঝে রেখেচ খানিকটা মস্ত বড় মাটি, নদনদী আর পাহাড়? একটিমাত্র অপূর্বকে নিয়েই জীবনে ধিক্কার জন্মে গেল,- বৈরাগী হতে চাও—আর সেখানে কেবল শত সহস্র অপূর্বই নয়, তার দাদারাও বিচরণ করেন। আরে,—পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হলো কৃতঘ্নতা। যাদের সেবা করবে, তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রি করে দিতে চাইবে। মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই—কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না—।'

সব্যসাচী নির্ভেজাল ষোল আনাব বিপ্লবী। কিন্তু তিনি মানবিকতায় উজ্জ্বল। বিপ্লববাদিতায় সুস্থ মানবিক দৃষ্টি তিনি হারাননি। তাই ভারতীর হৃদয়ের সহজ অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতার প্রতি তাঁর স্নেহ ও মমতা প্রচুর। ভারতীর এই মানবিক গুণকে সব্যসাচী সুদৃঢ় স্বীকৃতির সম্মান দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি, কঠোর বিপ্লবী হয়েও।

মানুষের বহির্জীবনের চাহিদা আর অন্তর্জীবনের চাহিদা, দুটি দিকেই সমান নিরপেক্ষতায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে গূঢ়ার্থব্যঞ্জক রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে।

যৎসামান্য পরিধির মধ্যে ভারতী আর সুমিত্রা, অপূর্ব আর তলওয়ারকর চরিত্রে তিনি অনেক কিছুই বলে গিয়েছেন ও খুলে দেখার ইশারা করেছেন ;—যা সুস্পষ্ট ব্যাখায় বুঝিয়ে বলতেন যদি, কয়েক খণ্ড বই হয়ে যেত।

'দেশ' বলতে তিনি বুঝেছিলেন, 'মানুষ', 'ধর্ম' বলতে বুঝেছিলেন 'মানুষ', 'সমাজ' বলতে বুঝেছিলেন 'মানুষ'। তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন মানুষের মনুষ্যত্ব সন্ধান করে—স্পর্শ করে, লক্ষ করে, কেন্দ্র করে। তাঁর বাস্তব জীবনেও মানুষই ছিল মূল লক্ষ্য—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি একান্ত বিশ্বাস করি।

দুর্বল অপূর্ব্ব অন্তর্নিহিত ব্যাপার অনেকেরই চোখে স্পষ্ট হয়না। এমনকি ভারতীরও না। অথচ দেখতে পাই, নির্মম বিপ্লবী সব্যসাচীর সুতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে অপূর্বর দুর্বলতার মূল কারণ কোথায় তা অস্পষ্ট নয়।

অপূর্ব খারাপ লোক নয়। সে আত্মসুখী আত্মসর্বস্ব কোনও দিন ছিলনা। সেও আত্ম-উৎসর্গিত একটি মানুষ। যেখানে সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে—সেখানে সে নির্ভীক, দুঃখসহিষ্ণু, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়চেতা। সে নিজের উৎসর্গকেন্দ্রে একনিষ্ঠ, একাগ্র, —তাই বিশ্বসংসারে অন্য অনেক কিছুরই খোঁজ রাখেনা। তারই ফলে, বাইরের অপরিচিত দুনিয়ায় সে অকেজো, দুর্বল, ভীরু। অপূর্বর মত একটি অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, সব্যসাচীর মত মানুষেব কাছে যে অশ্রদ্ধেয় হয়না—এই পরমাশ্চর্য ঘটনাটি লক্ষণীয় বিষয়। শুধুমাত্র ভারতীর প্রেমাস্পদ বলেই সব্যসাচী তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন মনে করলে ভুল হবে। অপূর্ব সব্যসাচীরই মতন আত্ম-উৎসর্গিত মানব। সুমিত্রার প্রেম যে-কারণে ব্যর্থ, ভারতীর প্রেমও সেই একই কারণে লাঞ্ছিত, এটি সব্যসাচীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঝাপসা থাকেনি। স্থান কাল পাত্রের প্রকারভেদে অপূর্বর জীবনে প্রশংসনীয় গুণটি অশ্রদ্ধেয় দোষে পবিণত হয়েছে। জাতির পরাধীনতাকে আর লাঞ্ছনাকে কেন্দ্র করে সব্যসাচীর সত্তা কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে নিজেকে বিরাট বিস্তৃত করেছে আর জন্মদাত্রী মাতার নিরুপায় দুঃখ লাঞ্ছনাকে কেন্দ্র করে অপূর্বর সত্তা কেন্দ্রাভিগ শক্তিতে নিজেকে সংকুচিত করে গুটিয়ে ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে। মূলত দুজনেই কিন্তু উৎসর্গিত মানুষ। স্থান কাল পাত্রের প্রকারভেদে মঙ্গলই অমঙ্গল হয়ে ওঠে।

নতুন কাল আর পুরনো কালের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। নতুন কালের প্রয়োজনের সঙ্গে আগের কালের সুগঠিত সুদৃঢ় বিশ্বাস আর সুদীর্ঘ অভ্যস্ততার দ্বন্দ্ব। নতুনকে পথ

ছেড়ে দিয়ে পুরনোকে চিরদিন সরে যেতে হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে মানবিক মহৎ বৃত্তিগুলি বা গুণগুলির প্রকাশ কোথায় কেমনতরভাবে ফুটে ওঠে—অন্তর্দৃষ্টিশালী শিল্পীর নজরে তা এড়ায়না। অতি সামান্য কয়েকটি মাত্র আঁচড়ে অপূর্বদের পারিবারিক বর্ণনায় অপূর্বর মা বাবা ও দাদাদেব উল্লেখ পাওয়া যায় 'পথের দাবী' বইতে। সেই যৎসামান্য উল্লেখ্য রেখাগুলিব মধ্যে বহুবিস্তীর্ণ এক করুণ দ্বন্দ্ব নির্বাক ভাষায় নিঃশব্দে কথিত। এই বর্ণনাহীন অবর্ণনীয় কথন কিংবা অবর্ণিত বর্ণনাব জুড়ি আমি কোথাও আজও পড়িনি।

অঙ্কনে—চিত্রকর ও দর্শক দুইয়ে মিলে ছবি হয়ে ওঠে; লেখক ও পাঠক দুইয়ে মিলে লিখিত বিষয়—সাহিত্যে পবিণত করেন। অভিনেতা অভিনেত্রী ও দর্শকে মিলে নাটক গড়ে তোলেন।

পাঠক সমাজেব প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধা থাকলে লেখক, মাত্র দু-চারটি কথা কযেই চুপ কবে যান, বাকি কথাটুকুর ভাব দিয়ে বাখেন পাঠকেব উপরে। যেটুকু বলেছেন, তার মধ্যে যা রযেছে—পাঠক নিজের খুশী মত তাকে সাজিয়ে নিতে অপারগ হবেননা তিনি জানেন। পাঠকেরা ভুল কবতে পারেন কিংবা বিকৃত করতে পারেন সে-ভাবনা একটুও ছিলনা।

লেখক শরৎচন্দ্রেব মানুষের উপব সুগভীব আস্থার এটিই একটি মহৎ প্রমাণ আমি মনে করি।

১৬

শবৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাকে অনেকে অনেক প্রশ্ন করেন। এঁদের বিবিধ প্রশ্নেব মধ্যে একটি প্রশ্ন—শরৎচন্দ্র সনাতন হিন্দুধর্মের আনুষ্ঠানিক আচরণে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা। জিজ্ঞাসুদের মধ্যে কেউ কেউ আনুষ্ঠানিক ধর্মাচবণে শরৎচন্দ্র যে গোঁড়া বিশ্বাসী ছিলেন এর সপক্ষে কিছু কিছু প্রমাণও জানিয়েছেন।

আমার ধারণা, শরৎচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগী ছিলেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন শেষ জীবনে। প্রথম জীবনে এর বিরুদ্ধবাদী বরাবর ছিলেন। তাঁর নিজের মুখে এবং কৈশোর যৌবনেব সমস্ত ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধবাদিতা শোনা ও দেখা গেছে। বর্ণভেদ তখন একটুও মানেননি। কিন্তু বিশ্বাসেব কথা তুললে বলতে হয় তিনি আনুষ্ঠানিকতায় বিশ্বাসী ছিলেনও এবং ছিলেননা-ও। যদিও ঈশ্বরবিশ্বাস তাঁর দৃঢ়মূল ছিল এতে কোনও প্রশ্ন নেই। আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে তাঁকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে আমি কোনও দিন দেখিনি। কিন্তু আলোচনার সময়ে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সপক্ষে আর বিপক্ষে দুই তবফেই তাঁকে ব্রীফ নিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। এই বিষয়টি আমি যেরকম বুঝেছি বলতে চেষ্টা করব। বৈষ্ণব ধর্মে তাঁর বেশ আকর্ষণ ছিল। তাঁর স্বাভাবিক মনঃপ্রকৃতির অনুকূল ছিল বৈষ্ণব ধর্মের রস সাধনা। বৈষ্ণব সাহিত্য ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে একটি নিরপেক্ষ

নির্মম যুক্তিবাদীকেও বেশ দেখা যেত। এই যুক্তিবাদের তীক্ষ্ণশরে তিনি অনেক কিছুই টুকরো টুকরো করে ফেলতেন দেখেছি। তাঁর সত্তার মধ্যে দ্বৈতের বৈপরীত্য ছিল সুস্পষ্ট। এই দ্বৈতের অস্তিত্ব নিখিল সংসারে এবং মানুষেরও মধ্যে সর্বত্র বর্তমান। একাধিক বিভিন্ন অস্তিত্বের সমষ্টি নিয়েই তো সমগ্রতা বা পূর্ণতা।

তাঁর প্রথম জীবনে যে বিশ্বাস আর বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, শেষ জীবনে তা শান্ত সংহত হয়ে এসেছিল।—শেষ জীবনে তিনি প্রথম জীবনের অনেক অভিমতকে বদলে অন্য কথা বলেছেন। এটিও জীবনেরই একটি নিয়ম।

ঈশ্বরবিশ্বাস নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক সময়েই আমাদের আলোচনা হয়েছে। বলতেন—ঈশ্বরবিশ্বাস নেই এমন মানুষ দুনিয়ায়ই নেই জানবে। যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু বস্তুবাদে বিশ্বাসী—তাদের কাছে ঈশ্বর বস্তু বা বিজ্ঞান রূপেই প্রকাশিত হয়েছেন। আসলে—বিশ্বাসই ঈশ্বর। সে বিশ্বাস যাকে বা যা-কিছুকে অবলম্বন করে দৃঢ় হয়ে উঠুকনা কেন। সর্বং খল্বিদং যখন মানছ, তখন বিশ্বাসকেই ছুঁয়ে ঈশ্বর চিনে নিতে হবে। সংসারে বিশ্বাসহীন মানুষ নেই। মনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ঈশ্বর বানিয়ে নিলে উপভোগটা জমে ওঠে। যেমন রবিবাবু। রবীন্দ্রনাথ নিজের রুচি মর্জি মনের সঙ্গে মিলিয়ে ঈশ্বর তৈরি করে নিয়েছেন। ঈশ্বরকে উনি বন্ধু বানিয়ে নিয়ে প্রাণ মন খুলে সুখদুঃখের কথা কইছেন, প্রভু বানিয়ে নিয়ে নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, প্রেমিক বানিয়ে নিজে প্রেমিকার ভূমিকায় সোহাগে আদরে ডুবে আছেন।

কখনও এমন কথাও বলতেন শরৎচন্দ্র, নাস্তিকবাই ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ কাছাকাছি জেনে রেখ।

হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা করতেন গ্রামের দরিদ্র মানুষদের, নিজের পরিবারের মানুষদের, বন্ধুবান্ধবদের। হোমিওপ্যাথির বই আর ওষুধের বাক্স ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ দিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই পড়তে দেখেছি। রাত্রিবেলায় নাকি তাঁর চিকিৎসার বই পড়ার সময়। তখন গোলমাল কানে আসেনা, মন একাগ্র হয়, এ-কথা মাঝে মাঝে বলতে শুনেছি। রোগের লক্ষণ আর উপসর্গের পাশে ওষুধের নাম লেখা ছোট একখানি ডায়েরী বুক ছিল। ছোট ছোট কাগজের স্লিপেও রোগের লক্ষণ রোগীর নাম ও বিভিন্ন ওষুধের নাম লেখা দেখেছি। আমার একবার খুব জ্বর হয়েছিল, সে-সময়ে তিনি মহেশ ভট্টাচার্যের দোকানে নিজে গিয়ে একটি ছোট ওষুধের বাক্স কিনে এনে আমার ঘরে রেখেছিলেন। তার সঙ্গে একখানি গৃহচিকিৎসা বই। বইখানি হারিয়ে গেছে, ওষুধের বাক্সটি এখনও আমার কাছে রয়েছে। হারানো গৃহচিকিৎসা বইখানির পিছনের পাতায় তাঁর হাতে লেখা অনেকগুলি ওষুধের নাম ও চিকিৎসার নির্দেশ ভায়লেট রংয়ের কালিতে লেখা ছিল। তাতে লিখে দিয়েছিলেন—ভোরে দাঁত মাজার পূর্বে পরিষ্কার জলে কুলকুচি করে ওষুধ খাবে, —তার বেশ কিছুক্ষণ পরে দাঁত মাজবে। টুথপেস্টে বা টুথ পাউডারে দাঁত মেজে ওষুধ খাবেনা।

গাছ-গাছড়ার টোটকা ওষুধও অনেক জানতেন। কারও কিছু টোটকা ওষুধ জানা থাকলে তার কাছ থেকে আগ্রহ করে জেনে নিয়ে লিখে রাখতেন। গ্রামের লোকের টোটকা ওষুধেই অসুখবিসুখ সেরে যায় কিন্তু শহুরে লোকের সবসময়ে ফল হয়না। শরৎদা বলতেন—শহুরে মানুষ নানা কেমিক্যাল ওষুধে শরীরের স্বাভাবিকতা নষ্ট করে ফেলে, তাই জন্যে টোটকার ফল পায় না। তাছাড়া, এদের মনে টোটকায় বিশ্বাস নেই। মনে বিশ্বাস না থাকলে ওষুধের ফল হয়না। শরীরকে মনই তো চালায়।

বালিতে না উত্তরপাড়ায় একবার কোন এক বিশিষ্ট ধনী মানুষের বাড়িতে গিয়ে 'রুফ-গার্ডেন' দেখে এসেছিলেন। তিন চার দিন ধরে শরৎদার মুখে তখন আর কোনও আলোচনাই নেই, শুধু সেই ছাদের বাগানের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা। সেই বাগানে লবঙ্গলতা ফুলে আব সাদা নীল অপরাজিতা ফুলে আচ্ছন্ন একটি চমৎকার লতাকুঞ্জ ঘর দেখেছেন। তার ভিতরে দুটি ধবধবে সাদা শ্বেতপাথরের শিলাবেদী।

শরৎদা কয়েকদিন ধরে সেই বাগানের নানা বঙের চমৎকার সুগন্ধ গোলাপের আর অল্প দূবে নৌকোভাসা গঙ্গাস্রোতের বর্ণনা যেন প্রাত্যহিক পাঁচালীপাঠ করে তুললেন আমাদেব কানে। বলতে বাধ্য করলেন শেষে, আর শুনতে পারিনা। আপনার বাড়ির ছাদেও ঐরকম একটা লতাকুঞ্জ আর গোলাপবাগান তৈরি কবান, আমরা সবাই গিয়ে মালীর কাজ করব!

আমাদেব ধৈর্যচ্যুতির সময়ে খুব হেসেছিলেন অনেকক্ষণ। বলেছিলেন—দেখলে তো? যত সুন্দর কথাই হোক, আর অতিসুন্দর বর্ণনা হোক না কেন, মানুষ পুনরাবৃত্তি সইতে পাবেনা। কারণ, মানুষেব জীবনে পুনরাবৃত্তি নেই। তার দেহে পুনরাবৃত্তি নেই, মনে আব চিন্তায়ও পুনরাবৃত্তি হয়না। মানুষ জোর করে পুনরাবৃত্তি অভ্যাসে আয়ত্ত করে। নামতা মুখস্থ করে অঙ্ক কষে,—জপ করে করে মনকে এক জায়গায় বেঁধে রাখতে চায়। প্রতিদিন একই গীতা কোরাণ বাইবেল আবৃত্তি করে। প্রকৃতিকে শাসন করার জন্যে ঐ ব্যবস্থা। বিশ্বপ্রকৃতিতে দৃশ্যত পুনরাবৃত্তি থাকলেও আসলে ঠিক পুনরাবৃত্তি কোথাও নেই।

মেজাজ ভাল থাকলে, এক এক সময়ে চমৎকার কথা কইতেন। নিজের মনেই স্বগতোক্তিব মতন করে, অন্য একদিকে তাকিয়ে বলে যেতেন দূরমনস্ক হয়ে।

সদাসর্বদা ব্যক্তিত্বে কিন্তু তিনি রীতিমত একটি গ্রামীণ মানুষ। ঝগড়াঝাঁটি বিবোধ বিসংবাদের খবরে একটুও নিরুৎসাহ নন। বরং বেশ আগ্রহে এগিয়ে প্রশ্ন করে করে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা শুরু করে দেন। আমরা অস্বস্তি বোধ করে তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলে আরও বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ করে বলতেন—রোস না, ব্যাপাবটা ভাল করে জেনে নিতে দাও সবটা। যদি বলেছি, অন্যের ব্যাপার জেনে আপনার কী হবে বড়দা? ওসব না শোনাই তো ভাল।

অদ্ভুত একরকম চাপা হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে জবাব দিয়েছেন—আমি গেঁয়ো লোক, ঝগড়াঝাঁটি দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে বালক থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম, —তোমাদের মতন বাছাবাছির মধ্যে তো মানুষ হইনি,—এসব আমার খারাপ লাগেনা বরং ঝিমোন মনটাকে বেশ খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দেয়। তোমরা মেয়েরা, একঘেয়ে ঘরকরনা নিয়ে থাক, অন্য লোকের কুলুজি কানে শুনলে টক ঝাল আচারের মতন তখুনি জিভে না তুলে পারনা। বাদবিসংবাদ নিয়েই তো সারা দুনিয়া ঘুরপাক খাচ্চে। পৃথিবীর মহা মহাকাব্যগুলো কী নিয়ে বচনা হয়েছে খুলে দেখ। পৃথিবীর সব দেশের মীথ পড়ে দেখ—গীতা, পুরাণ, কোরাণ, বামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল যেখানে যত পুঁথি দেখবে—ঝগড়া কলহ মারামারি, বাদবিসংবাদ নেই এমন বই পাবেনা। মেয়েমানুষ হয়ে পরের ঘরের বাদবিসংবাদে কান দিতে চাওনা—এটা কি স্বাভাবিক? এ তো স্বধর্মচ্যুতি। আত্মপ্রতারণাও বলতে পার।

কখনও বা বলতেন—তোমাদের মতন তো ব্রাহ্মপাড়ায় মানুষ হইনি। গাঁয়ের ঘোঁট পাকানোর আস্বাদ তুমি পাওনি ছোটবেলা থেকে। তোমাদের মতন ব্রাহ্মসমাজের আওতায় ছোট বয়েস কাটলে আমিও তোমার মতন পিউরিটান হতে পারতাম।

'ব্রাহ্ম' শব্দটি কিন্তু শরৎদা বিশেষ কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে লক্ষ করে বলতেননা আমি জানি। ওটি বলতেন নব্য পাশ্চাত্যরুচিসম্পন্ন শহুরে শিক্ষিতদের। এঁরা সেকালে তখন গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামীণ রুচি ও রীতির দিকে বেশ অবজ্ঞার কটাক্ষেই চলতেন। গ্রামীণ অনেক কিছুই এঁদের কাছে তাচ্ছিল্যের বিষয় ছিল। যেসব উচ্চশিক্ষিত যুবা গ্রামীণ সভ্যতাপুষ্ট ছিলেন, শহরের পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্নরা তাঁদের করুণা ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখতেন। এটি শরৎদাব কাছে বিশেষ আঘাতকর ছিল। এরই ফলে তিনি সে-সময়ে 'ব্রাহ্ম' শব্দ ব্যবহারে শহুরে এলিটদের প্রতি অনেক সময়ে শরনিক্ষেপ করেছেন। অনেকের ভুল ধারণা, তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পছন্দ করতেননা। তা কিন্তু ঠিক নয়। শহুরে উন্নাসিকদেরই তিনি বিদ্রূপ করতেন আমি জানি। 'পরিণীতা'য় তিনি হিন্দুসমাজ-পীড়িত সৎ ও সরলমানুষ গুরুচবণবাবুকে হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিয়েছেন। হিন্দুসমাজভুক্ত শেখরনাথের মানসিকতার দুর্বলতা বিশেষ স্পষ্ট করে তুলে ধবেছেন। 'পথনির্দেশে'র ব্রাহ্ম যুবক গুণীন্দ্রনাথেব মহৎ মনের ছবি তাঁর আঁকা কোনও হিন্দুসমাজভুক্ত যুবায় কোথাও দেখা যায়না। 'দত্তা'য় রাসবিহারী চরিত্র হিন্দুসমাজেও যথেষ্ট আছে। 'বামুনেব মেয়ে'র গোলক চাটুয্যে ফোঁটা তিলক হবিনামের আড়ালে বাসবিহাবীর চেয়েও নিশ্চয় অনেক বেশি নিচু স্তরের। ধর্মের বর্মে মানুষ অনেক কুটিলতা অনেক হীন কাজ ঢেকে রেখে চলে। এর কোনও নির্দিষ্টতা নেই। ব্রাহ্ম দয়াল ধাড়ার চরিত্র মানবিকতায় উজ্জ্বল। অচলার পিতা কেদারবাবু ভণ্ড নন। তিনি অকপট এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী, তিনি নীতিবাদে নিষ্ঠাবান। সুরেশ এবং মহিম তাঁব কন্যার পাণিপ্রার্থীর আসনে দাঁড়ালে তিনি সুরেশের প্রতিই ঝুঁকেছিলেন তার আর্থিক সংগতির দিকে লক্ষ করে, এটি একটুও অস্বাভাবিক

নয়। হিন্দু হলেও তার ব্যতিক্রম হতনা। শেষ জীবনে তাঁর নীতিবাদে ও সন্তানস্নেহে অন্তর্দ্বন্দ্বটি অতি করুণ। পাঠকের মন দুর্বল বৃদ্ধের প্রতি সহানুভূতিতে দ্রব .কবে।

হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান কোনও সমাজই তাঁর মনের মধ্যে উঁচু নিচু ছিল না। তিনি শুধু বিচার করতেন মানুষের মনুষ্যত্ব। খুঁজে বেড়াতেন মনুষ্যত্ব। হিন্দুসমাজেরই দোষ, ত্রুটি, ভণ্ডামি, কুটিলতা তিনি সব থেকে বেশী করে খুলে এঁকে গিয়েছেন। হিন্দুয়ানির মুখোশ সরিয়ে তার কুশ্রী মুখ প্রকাশ কবে দিয়েছেন।

শবৎচন্দ্র তাঁব কাহিনীরচনায় শেষ সিদ্ধান্ত নিতেননা। ওটি থাকত পাঠকদেব জন্য খোলা। ভীরুতার জন্যই সিদ্ধান্ত নিতে কুণ্ঠিত হযেছেন এই সিদ্ধান্ত যারা আমরা করছি—ভুল করছি আমরাই। সিদ্ধান্ত প্রকাশ কবে তিনি তাঁর দর্শনকে সীমায়িত কবেননি, ফুরিয়ে দেননি। যে-পর্যন্ত তাকে এনে পৌছে দিযেছেন যেদিক দিয়ে, সেই দিকটিতেই তো বিধৃত বয়েছে তাঁর অকথিত সিদ্ধান্ত। কী সিদ্ধান্তে পৌছন উচিত মানবিক দিক দিয়ে, সেটি পাঠকেব মুখ থেকেই তিনি বলিয়ে নিতে চান।

এই নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমরা অনেকদিন অনেক তর্ক করেছি। তিনি বলতেন, লেখকেব কাজ, সমস্ত বিষয়গুলি নিরপেক্ষতায় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলা। সেটির পরিণতি কী হলে ভাল হয় সেটি থাকবে পাঠকের আওতায। পাঠক নিজেই বলবেন কোনটি উচিত বা কোনটি হওয়া ভাল। শেষ সিদ্ধান্তটি যদি লেখক নিজে দিয়ে 'আমার কথাটি ফুরাল নটেগাছটি মুড়ুল' বলে গল্পটির ছিপি বন্ধ করেন—তাহলে শিশুরা যতই খুশী হয়ে নিশ্চিন্ত হোকনা—গল্পটিকে কিন্তু নটেগাছটির মতই মুড়িয়ে ফেলা হয়, সন্দেহ নেই।

গল্পকে শরৎচন্দ্র এমন জায়গায় এনে পৌছে দিতেন—যেখান থেকে পাঠক তার নিজের রুচি বিশ্বাস আর ইচ্ছা অনুযায়ী পরিণতি কল্পনা করে নিতে পাবেন। তিনি বলতেন সাহিত্যশিল্পের সমস্তটাই লেখকেব কল্পনার এলাকাবন্দী করে রাখলে পাঠকের কল্পনা কোথায় ঠাঁই পাবে? লেখকে পাঠকে মিলেই তো সাহিত্য। কেউ লেখে কেউ পড়ে এই সহযোগিতাই সাহিত্য। একা একা লেখক সাহিত্য গড়তে পারেনা পাঠকের জন্য জায়গা খুলে না রাখলে। সমালোচনা-সাহিত্য কী? সে তো পাঠকেরই মনের যুক্তির সৃষ্টি, আস্বাদনের সৃষ্টি। সমালোচনা-সাহিত্য না থাকলে পৃথিবীর বড় বড় লেখকেরা বড় হয়ে উঠতেন কেমন করে? পাঠকের চিন্তাযই তো সাহিত্যের উন্মোচন।

'অরক্ষণীয়া' বইটিতে কাহিনী শেষ করেছিলেন এই শিল্পনীতিতেই। জ্ঞানদা ভাঙা চুড়ি ছড়ান ঘাটে গঙ্গাস্রোতে স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বসে। অতুল পিছনে নিস্পন্দ মূর্তি দাঁড়িয়ে। অতুলের মনের অবস্থা সামান্য এক দুই লাইনে মাত্র লিখিত ছিল। পরে বদলেছিলেন, লেখকের মনের দর্শন ও সিদ্ধান্ত এখানে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে।

শরৎচন্দ্র প্রধানত অন্তর্জগতেরই শিল্পী ছিলেন।

মধ্যবিত্ত মানুষ ও নিম্নবিত্ত দরিদ্র তাঁর রচনায় যেমন সার্থক প্রকাশিত হয়েছে এমনটি তাঁর আগে ভারতীয় সাহিত্যে দেখা যায়নি, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র ছোটগল্পগুলি ছাড়া। 'চোখের বালি'র বিনোদিনী চরিত্র শরৎসাহিত্যের পথপ্রদর্শক। শরৎচন্দ্র নিজেও বার বার স্বীকার করেছেন। শরৎচন্দ্রের রচনা ঘটনার স্রোতে আপনিই এগিয়ে চলে, আপনিই নিজস্ব আকৃতি নিয়ে বেড়ে ওঠে বা গড়ে ওঠে।

নিজের জীবনে নানাধরনের আঘাত-খাওয়া এই আবাল্যদুঃখী মানুষটি চিরদিন সকলের কাছে নিন্দা উপহার পেয়েছেন। সংসারে নিন্দিত মানুষদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল। বঞ্চিত ও নির্যাতিতের প্রতি সহানুভূতি ছিল অকপট আন্তরিক।

সুন্দরের প্রতি, পরিচ্ছন্নতার প্রতি, সুরুচির প্রতি আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট। নিজে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতেন। জামা কাপড় জুতো সবসময়েই সুপরিচ্ছন্ন থাকত। প্রতিদিনই সাবান দিয়ে মাথা ধুয়ে মাথা সর্বদা সুপরিচ্ছন্ন রাখতেন। বাবুগিরির প্রতি বিরাগ ছিলনা একটুও। কিন্তু প্রদর্শনীর রুচির প্রতি ব্যঙ্গ পোষণ করতেন। বাবুগিরি যথেষ্ট করলেও তা চোখে পড়ার মত না হলে তবেই সেটি সার্থক, এই ছিল তাঁর অভিমত। নিজে থান ধুতি লংক্লথের বেনিয়ান, সাদা কোট বা মটকা কাপড়ের কোট আব মটকার চাদর ব্যবহাব করতেন। প্রত্যেকটি ব্যবহার্য জিনিস উৎকৃষ্ট কোয়ালিটির সামগ্রী ছিল। বিছানা বালিশ মশারি সর্বদা সুপরিচ্ছন্ন ধবধবে থাকা চাই। তামাকের গড়গড়া এবং তার সরঞ্জাম ছিল প্রচুব। গড়গড়া সবসময়ে ঝকঝকে পরিষ্কার থাকত। খদ্দর কোট খদ্দর ধুতি ব্যবহার কবেছেন উৎকৃষ্ট কোয়ালিটির। লেখাপড়ার সাজসরঞ্জামও ছিল বিশেষ রুচিপূর্ণ আর দামী উৎকৃষ্ট কোয়ালিটিব। দামী কাগজ ব্যবহাব করা তাঁর একটি বিশেষ শৌখিনতা ছিল, সকলেই জানেন। চিঠিব কাগজই নয়, পাণ্ডুলিপিও তিনি দামী কাগজে লিখতে ভালবাসতেন। ফাউন্টেনপেন কেউ উপহার দিলে ভারী খুশী হযে উঠতেন। প্রচুর ফাউন্টেনপেন জমিয়েছিলেন। স্কুলের বালকের মতন সেগুলি একত্রে জড় করে সগর্বে দেখাতেন মাঝে মাঝে। কার কেমন গুণ, কার নিব কত বেশী সরু বা মোটা, কার নরম নিব, কার শক্ত নিব এই নিযে অভিজ্ঞ কলমওয়ালার মতন কথাবার্তা কইতেন। দুটি কলম ছিল প্ল্যাটিনামের নিবের। বলতেন—জান, এ-কলম দিয়ে কিন্তু পাথরের উপরে শিলালিপিও লিখে ফেলা যেতে পারে। কত বকমের উৎকৃষ্ট কোয়ালিটির কাগজের প্যাড, বিভিন্ন রঙের কালির সংগ্রহ। ভায়লেট রঙের কালি তাঁর বেশ পছন্দ ছিল। বেশী সময় ব্যবহার কবতেন কিন্তু কাল আর গাঢ় নীল। সবুজ কালিরও কলম ছিল। লাল কালির কলমটি গাঢ় মেরুন রঙের ছিল।

চশমা, জুতো, লাঠি প্রতিটি জিনিস সম্বন্ধে রুচি নিজস্ব এবং পছন্দ সুতীক্ষ্ণ ছিল। যা হোক হলেই হবেনা—ঠিক সেই জিনিসটিই চাই, নইলে নয়।

লেখার সরঞ্জাম ব্যাপারে যেমন উঁচু নজর আর পরিচ্ছন্ন রুচির সুস্পষ্টতা ছিল,

তামাক গড়গড়া আর কলকে নল নিয়েও তেমনি সমান মেজাজ ছিল। ঠিক-ঠিক মতন সবটি হওয়া চাই। শরৎদার উঁচু নজর আর উঁচু ধরনের মর্জি মেজাজ দেখে এক এক সময়ে আমরা একটু অবাকও হয়েছি। ফুলগাছ আব বাগান সম্বন্ধে খুব শখ ছিল। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে সামতাবেড়েতে নিশ্চয়ই মনের মতন ফুলের বাগান নিজেব বিশেষ রুচিমাফিক গড়ে তুলতেন নিঃসন্দেহে। কলকাতার বাড়িতেও।

আড়ম্বর ভালবাসতেননা একটুও, অথচ সুরুচি ও উৎকর্ষের দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। যে-কোন কিছুই তিনি নিজের ইচ্ছায় তুলে নিতে চাইতেন বা তৈরি করতে চাইতেন, তার মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম নজরটি বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠত।

শেষের পরিচয়

১৭

ব্যক্তি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে লিখতে বসে নিজেব প্রকাশশক্তিব দৈন্য অনুভব করছি। মানুষটিকে ঠিক বুঝি স্পষ্ট কবে তুলতে পারছিনা কলমে।

তাঁর গুণ ছিল অনেক, কিন্তু দোষও তো বড কম ছিলনা। এমন চডা গুণেব আর বেপরোয়া দোষেব মানুষ ক'টা দেখেছি এই জীবনে? বলতে হলে সবটাই বলে যাওয়া উচিত। কিন্তু ঠিক তা পাবব কি?

আমার মুশকিলেব কাবণ খুলেই বলি। প্রথম কাবণ, ঠিক এই ধবনের মানুষ আমি বেশী দেখিনি। ভাল করে চিন্তা কবে দেখেছি—প্রখব বুদ্ধিতে, সূক্ষ্ম চিন্তায, আর প্রগাঢ় অনুভবে শরৎদা এতই উঁচুতলাব একটি মানুষ—অথচ প্রত্যক্ষ আচরণে ব্যবহারে অনেক সমযে তাঁকে এতই রুক্ষ অমার্জিত মনে হযেছে, যাতে বাব বার মন ধাক্কা খেয়ে বেশ গুটিয়ে এসেছে। বলতে সংকোচ কববনা, বার বার রুচিতে তীব্র আঘাত লেগেছে। মন খারাপ হয়ে বিস্বাদ ঠেকেছে। কে কী মনে করবে, কিংবা এটা এখানে ভাল শোনাবেনা বা ভাল দেখাবেনা—এটি যেন তাঁর হিসেবেব খাতায় কখনও লেখা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সামনে তাঁকে বাব তিনেক দেখেছি অবশ্য। সে যেন একেবারেই অন্য মানুষ। এ শরৎচন্দ্রই নন। একটি গূঢ়বিষণ্ণতায ম্লান, অকৃত্রিম বিনয়ে নম্র, একটি মুগ্ধ ভক্তেব মৌন মূর্তি। তাঁর সামনে শরৎদা খুব সামান্যই কথা বলতেন, গুরুদেবের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত বিনীত উত্তর। গুরুদেবই কথা বলেছেন প্রায় সবটাই, এই সাক্ষাৎকারে।

পরে যখন শরৎদাকে এই নিয়ে আমরা পবিহাস করে বলেছি—গুরুদেবের সামনে তো আপনার অন্য মূর্তি, মোটে চেনাই যায়না।

তিনি লজ্জিত হাসি হাসতেন। কিছুটা উদাস হয়ে যেতেন যেন। একবার আমাকে

পরিহাস থেকে থামাবার জন্য বলেছিলেন—আমি তো মেয়েমানুষ নই, ঐ মানুষটির সামনে গিয়েও কথার ফুলঝুরি ছড়াব! তোমরা তো শুনেছি ওখানে গিয়ে মুখে খৈ ফোটাও দল বেঁধে।...মেয়েমানুষ বলেই পার, জ্ঞানগম্যি থাকলে কখনই পারতেনা।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব তাঁকে যে গভীরভাবে স্পর্শ করত, এ আমি ভাল করেই জানি। স্বচক্ষে দেখেছি।

সদাসর্বদার আটপৌরে শরৎচন্দ্রেব নিয়মনীতির অদৃশ্য খাতাটিতে কিন্তু 'কে কী মনে করবে' এই কথাটির কোনও অস্তিত্বই ছিলনা। যা তাঁর ইচ্ছে হবে, তাই বলে বসবেন বা করে বসবেন। আমার ধারণা, তাঁর মত অসামান্য এবং তাঁর মত সামান্য মানুষ কদাচিৎ মেলে। বিদগ্ধ নাগরিকেরা অনেক সময়েই বিভ্রান্ত হয়েছেন তাঁর অমার্জিততায়।

আমি যতটুকু বুঝেছি, আসলে তিনি সমাজের ফ্রেমে-আঁটা মানুষ ছিলেন না। যে-সকল আচরণ, নিয়ম, আমাদের অভ্যস্ত আব প্রত্যাশিত, তিনি তার মধ্যে নিজেকে খুশিমত কখনও বেঁধে বেখেছেন, কখনও বেঁধে রাখেননি। তিনি যথার্থ স্বাধীন আর মুক্ত ছিলেন। 'স্বাধীন' 'মুক্ত' কথাগুলি আমাদের খুবই প্রিয় আর আকাঙ্ক্ষিত, —কিন্তু সত্যিকারের একজন স্বাধীন মানুষকে নিয়ে সামাজিক মানুষদের যে কত মুশকিল হয়—সেটি শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠজনেরা বেশ ভাল করেই জানেন। সত্যিকারের স্বাধীন মানুষকে সামাজিক মানুষদের ভাল লাগতে পারেনা। আমাদের অভ্যস্ত দৃষ্টি অভ্যস্ত প্রত্যাশায় তাঁরা বেজায় আঘাত দিতে থাকেন।

মানবহৃদয সম্পর্কে শরৎচন্দ্রেব বাছবিচার ছিলনা। ছিলনা শ্রেণীবিচার, বয়সবিচার, জ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধির বিচার।

তিনি নিরক্ষর অপবিশীলিত মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে পারতেন। ওরা তাঁকে বিশ্বাস করত। অর্থাৎ, ওদের নিজেদের গণ্ডির ভিতরকাব মানুষেরই মতন আপনার জন জ্ঞানে প্রাণমন খুলে সুখদুঃখ প্রকাশ করত। 'ভদ্দরলোক'দের ওরা ওদের গণ্ডীব বাইরেব লোক বলেই জানে। তাই ওদের মনের ভিতরে ভদ্দরলোকেরা বেশ দূরেব মানুষ। ভদ্রেরা যেটুকু ওদের কাছাকাছি আসেন, তা কোনও-না-কোনও নিজেদেরই প্রযোজনে। কদাচিৎ কেউ হয়তবা একটু কাছে আসেন করুণায়, তাও ওরা ভালই জানে। শরৎচন্দ্র ওদের কাছে দাদাঠাকুর বা বাবাঠাকুর হয়ে নিজেদের লোকের মতই ওদের বিশ্বাসের কেন্দ্রে পৌছে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করতে দ্বিধা বা সংকোচের বেড়া ওদের একটুও ছিলনা। এটি একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল তাঁর। একটি ঘটনা বলি।

তাঁর কলকাতার বাড়িতে তখন রাজমিস্ত্রীরা কিছু মেরামতির কাজ করছে। শবৎচন্দ্র দু-তিনজন রাজমিস্ত্রীকে নিয়ে বৈঠকখানার বিপরীত দিকের ছোট ঘরটিতে এমনিই জমাট গল্পে মেতেছেন—মজুরেরা বাইরে খৈনি টিপছে। একজন লম্বা হয়ে রকে শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করছে দেখা গেল।

মিস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর জরুরী কথাবার্তার বিষয়বস্তু ছিল—ঠিকেদারের সঙ্গে তাদের কেমন লেনদেন, নিয়মকানুন, রীতিনীতি। বিশেষ আগ্রহে তিনি ওদের কাছ থেকে সেই সব তথ্য জেনে নিচ্ছেন। তারাও প্রাণ খুলে তাদের সুবিধে-অসুবিধে, অভাব-অভিযোগ সমস্ত কিছু তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে বলছে। শরৎদা, ওদেব অভিযোগ আর অসহাযতার ব্যাপার জেনে খুব কাতর মনে হল। তিনি উত্তেজিত আব ক্রুদ্ধও বেশ। আমরা সেই ঘরে ঢুকে পড়তে মিস্ত্রীরা একটু সংকুচিত হয়ে পড়ল।

আমার স্বামী শরৎদাকে লক্ষ কবে বললেন—মিস্ত্রীদের হাত-কামাই করিয়ে কাজ বন্ধ রেখে আপনি নাকি দু' ঘণ্টা ধরে ওদেব সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন? এ কী কাণ্ড বলুন তো! মজুররা বাইরে লম্বা হয়ে ঘুমুচ্ছে দেখলুম—

মিস্ত্রীবা লজ্জিত হয়ে ব্যস্তভাবে কাজে চলে গেল।

শরৎদাব ছোট ভাই প্রকাশবাবু আমার স্বামীকে দেখে চুপি চুপি আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—দেখুন না দাদাব কাণ্ড! মিস্ত্রীদের নিযে এমন গল্প জমিয়েছেন, ঘন্টাখানেক হতে চলল কাজকর্ম ওদেব বন্ধ। হোঁদলা বলতে গিয়েছিল, দাদা তার উপরে মারমুখী হয়ে ওঠায় আমরা কেউ আর এগুইনি।

সামতাবেড়েতেও এইরকম একবাব দেখেছিলুম। বাঁশের বাখারি চিরে বেড়া তৈরি করছে কামলারা। উনি সেখানে একটা কাঠেব গুড়িব উপর খালি গায়ে গাছেব ছায়ায় বসে তাদের সঙ্গে খুব জমিয়ে গল্প করছেন আর কাস্তের মতন একটা সরু কাটারি নিয়ে মনোযোগ দিয়ে বাখারি চাঁচছেন।

কামলাদের সঙ্গে মাছ-ধরার কৌশল নিয়ে গল্প চলছে। খাড়ুই, টেঁটা, খ্যাপলা, কেঁচা, বুঁঝকিবেলা, চাওড়, ঝাঁকাব, জাওযাল, গড়ুই, ঘাটাল, চাকুন্দা—এইরকম সব নানা অশ্রুত শব্দ কথাবার্তাব মধ্যে শোনা যাচ্ছে। অনেক শব্দই আমাদের কাছে অজানা বিদেশী শব্দের মতই দুর্ভেদ্য। আমি পরে শরৎদার কাছে ঐসব গ্রাম্য শব্দেব একটা তালিকা একবার লিখে নিয়েছিলুম একটি ছোট খাতায়, মজা করবার জন্যে। সে-খাতাটির পাতায় শরৎদার বলে দেওয়া শব্দ আর তার মানে লেখা ছিল।

আমরা দুজনে শরৎদার পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁডিযে আছি তখন। কামলা দুটি আর শবৎদা কারুরই হুঁশ নেই সেদিকে, তারা মগ্ন হযে গেছে শরৎচন্দ্রেব মতন এমন একজন সমঝদার অভিজ্ঞ মানুষকে নিজেদের ভাযাপরিধির মধ্যে বন্ধু-ব্যবহারে পেয়ে।

আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িযে তাঁর বাংলা ভাষাজ্ঞানের বিস্তৃতি লক্ষ করে বিস্ময় অনুভব করছিলাম। গল্পে তন্ময় শরৎচন্দ্রেব কাছে গিয়ে আমাব স্বামী খুব নিচু স্বরে তাঁর কানের কাছে বললেন—শরৎদা, ওরা কাজ করতে করতে বিড়ি খায়, আপনি ওদের ধোঁয়া বন্ধ করে পেট ফুলিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু।

ব্যস্ত হয়ে শরৎদা বলে উঠলেন—আহা, তাই তো! ও রহিম, তোমবা বিড়িটিড়ি

স্বচ্ছন্দে খেতে পার। আমার কোন অসুবিধে হয়না ওতে। এই দেখ না আমার মোটা বিলিতি বিড়ি।

পাশে খুলে রাখা ফতুয়াটা কাঠের গুঁড়ির উপর থেকে টেনে নিয়ে তার পকেট থেকে চামড়ার চুরুটকেস বার করলেন।

স্বামী তখন হতাশ হয়ে বলে ফেললেন—আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব বলেই ঐ কথা বলেছিলুম। ওদের সঙ্গে বিড়িতে পাল্লা দিয়ে চুরুট বার করতে বলিনি। উঠে চলুন, আমরা পাঁচটার ট্রেনে ফিরে যাব। আপনাকে পড়ার ঘরে না বসালে আমাদের সঙ্গে আপনার মৌতাত জমবেনা।

এক মুখ হেসে উঠে দাঁড়ালেন।—যা বলেচ! মা সরস্বতী সব জায়গায় ছোঁয়াধবা দেননা। পড়াব ঘরে বসলে সাহিত্য ছাড়া মনে অন্য ভাবনা ঢোকেনা। চল যাই, ওখানেই বসি গিয়ে।

শরৎদাব চরিত্রেব সঙ্গে মিল আছে এমন মানুষের দেখা আমি আজও পাইনি। গড়পডতা মানুষেব সঙ্গে মিল তো তাঁব ছিলইনা, মহৎ মানুষদের সঙ্গেও দৃশ্যত কোন সাদৃশ্য পাইনি।

মহৎ মানুষ একাধিক দেখার সৌভাগ্য জীবনে হয়েছে। যাঁদেব মধ্যে উজ্জ্বল মানবিকতার আলো মনকে শ্রদ্ধাভিভূত করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে কাছে থেকে দেখার, তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহ ও করুণা পাওয়াব সৌভাগ্য হয়েছে। দেখেছি একাধিকবার কাছে গিয়ে গান্ধীজীকে, পণ্ডিচেরিতে তফাতে দাঁড়িয়ে দর্শন কবেছি শ্রীঅরবিন্দকে। এছাড়া, সেকালের অনেক সৎ ও মহৎ-হৃদয় মানুষ। অনেক শিক্ষক, অনেক সাধারণ ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথকে মনে পডলে মনে হয, রবীন্দ্র-জীবনকালে জন্মেছি আমরা,—আমবা কত সৌভাগ্যবান। রবীন্দ্রসংগীত রবীন্দ্রসাহিত্যেব মধ্যে তাঁকে উত্তরকালের মানুষেবা অনেকদিন অনেকখানিই পাবেন নিশ্চয; কিন্তু মানবব্যক্তিত্বেব এমন আশ্চর্য সুন্দর মহান প্রকাশ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্য কালের মানুষেরা তো পাবেননা। সে তো কেবল খণ্ডকালের সীমাতেই ফুরিয়ে গেল।

রামায়ণ-মহাভারতে এক-একজন মানুষের এমন বর্ণনা আছে, যার সঙ্গে আজকের পৃথিবীর মানুষেব কোনওখানে কোনই মিল নেই; তাই ঐ বর্ণনা আমাদের কাছে অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত, এমন কি অবাস্তব বলেও মনে হযেছে। তেমনই জীবন্ত মানুষ রবীন্দ্রনাথেব ব্যক্তিরূপের নিখাদ বাস্তব বর্ণনা হয়ত ভবিষ্যৎকালের মানুষেরাও সত্য বলে বিশ্বাস করবেননা—মানুষের মধ্যে এমন মানুষও যে হতে পারে, যাঁর ব্যক্তিত্বে স্বাভাবিকভাবেই এমন দিব্য দ্যুতি থাকে, যা সব মানুষকেই শ্রদ্ধানত শুধু নয়, পরিশীলিতও করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এমনই একটি সহজ অপার্থিবতা ছিল। যার জন্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গান্ধীজী উচ্চারণ করেন 'গুরুদেব'

বা দেশবাসী উচ্চারণ করে 'কবিগুরু'। ভাবি, আমাদের উত্তরপুরুষেরা এমন সব মানুষের দেখা পাবেন কি—যাঁদের ব্যক্তিত্ব অন্যের মনকে পবিত্র করে তোলে বিশ্বাসে।

মহৎ মানুষে কতগুলি গুণ আর লক্ষণ সুস্পষ্ট থাকে দেখেছি। কিন্তু শরৎচন্দ্র? এই অতি সাধারণ, অতি সামান্যতার লক্ষণাক্রান্ত মানুষটি? যাঁর চেহারা, আচবণ, বিদ্যাবুদ্ধি সবই সামান্য। মানুষটিকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন সকলেই বলবেন, তিনি কত সাধারণ মানুষ ছিলেন। কোনওখানে কোনও উজ্জ্বলতা নেই—নেই কোনও মহিমা, বরং খানিকটা যেন অজ্ঞতার পোঁচ মাখান মানুষ,—তাঁকে ভুলেও কারুর গুরুদেব বলে ডাকতে ইচ্ছে হবেনা। গ্রাম্যতায় ম্লান, শীর্ণ লোকটির কথাবার্তা, চলাফেরা, ভাবভঙ্গী দেখে মনে হবে মা-সবস্বতীব সম্পর্কশূন্য অজস্র ভারতীয় জনতারই একজন মাত্র। অথচ—সরস্বতীই তাঁর অস্তিত্বের মূল কেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা ছিলেন চিরদিন। একটু ঘনিষ্ঠ হলে তবে টেব পাওয়া যেত সেই মৌলিক অস্তিত্ব। আশ্চর্য ছিল তাঁর বাইরেব দৃশ্যমান আধারটির সামান্যতা। এ-আধাব কিন্তু নকল ছিলনা, সত্য ছিল। ভিতরটা ছিল অসাধাবণ বুদ্ধিদীপ্ত, চিন্তা-উজ্জ্বল, প্রখব অনুভূতিময়। সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল তাঁর হৃদযটি। অত্যন্ত স্পর্শসচেতন, অতিরিক্ত কোমল আর পরদুঃখকাতব।

মানবিকতার দিক থেকে শরৎচন্দ্রের মত মহৎ ব্যক্তি কদাচ দেখা যাবে। কিন্তু, তাঁব মত সামান্যতায় আচ্ছন্ন বিচিত্র চরিত্র ভদ্রশ্রেণীতে দুটি মিলবে কিনা জানিনা। অদ্ভুত বৈপরীত্যে পূর্ণ বিধাতার সৃষ্ট এই মানুষটি। আমি যে কোনও দিন তাঁকে নিয়ে প্রকাশ্যে আমাব অভিজ্ঞতাব কথা লিখব এটি আমাব কল্পনায় ছিলনা। আমার অভিজ্ঞতা আমারই মধ্যে বরাবর চাবি বন্ধ থাকবে, এমনিই ইচ্ছে ছিল। শরৎদার কাছে বাকদান ভাঙতে চাইনি।

অনেকে এখন বলছেন, কী দরকাব ছিল আমাব জানা বিষয়গুলি বাইরের দুনিয়াকে জানাবার? যেহেতু, তাঁদের ধারণা, আমি শরৎচন্দ্রকে কলঙ্কিত করে প্রকাশ করছি। আমার নিজের সে-ধারণা তা নয়। শরৎদার জীবনে মন্দ কাজ বা কলঙ্ক আমি কোথাও দেখতে পাইনি। তাঁর জীবন যথার্থ স্বাধীন ছিল। সমাজের নিয়মরীতি, বিশেষ করে নীতি তিনি মানতে পারেননি। পারেননি, তিনি প্রকৃত শিল্পীমেজাজের মানুষ ছিলেন বলে। সমাজের পাতা রেললাইনে তাঁর জীবনের চাকা চলমান হয়নি।

সেই নির্ভেজাল শিল্পীস্বভাবের মানুষটিকে অনেকেই আমরা আমাদের রীতিনীতিতে মাপসই করে লিখে রেখে যাচ্ছি দূরকালের জন্য। এটি ভাল কাজ হচ্ছেনা, আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, শরৎচন্দ্র অন্যসব মানুষের মতন মানুষ ছিলেননা। যদিও আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তখন তিনি কিন্তু সমাজ-অনুগত পুরোপুরি সামাজিক ভদ্রব্যক্তি। তবু, তারই মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যেত অসামাজিক একটি অন্যরকম ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আমি মোটামুটি যা বুঝেছি তাই বলব।

শরৎচন্দ্র বাল্যকাল থেকে সমাজের কাছে আদর পাননি। পেয়েছেন উপদেশ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা কিংবা করুণা। তিনি এটি সহ্য করতে পারেননি। সমাজের বিরুদ্ধে

বরাবরই বিদ্রোহ প্রকাশ কবেছেন বাল্য, কৈশোর আর যৌবনকাল ভরে। তখন বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ দেখা গেছে। শূদ্রের ঘরে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা শুধু নয়, শূদ্রের শববহন, মৃতদেহ দাহ করেছেন সমাজের সামনে। সমাজে যারা ঘৃণিত, সেইসব শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ মেলামেশা করেছেন। নিন্দিত ব্যক্তিদের বন্ধু হয়ে তাদের নিন্দার সিংহভাগ নিজে গ্রহণ করেছেন। নির্ভীক মনে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদেব সঙ্গে কখনও যাত্রার দলে, কখনও সাপুড়েদের দলে, কখনও সন্ন্যাসীদের দলে ভর্তি হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শবৎদার মুখে শুনেছি—তিনি বাগদিপল্লীতে বসন্ত-মহামারীতে দিনের পর দিন তাদের দেখাশুনো, মুখে জল দেওয়া, মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার কাজ করেছেন। তারা তাঁকে নাকি ব্যাকুল আগ্রহে তখন কাছে চাইত,—মনে করত, ভগবান তাঁকে তাদেরই জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁব নিজেবও তখন নাকি তাই-ই মনে হত। বাউবীদেব ঘবে একবাব ম্যালেরিযা জ্ববে অচৈতন্য হয়ে ছয সাত দিন কাটিয়ে বাসি আমানি পথ্য করে দুর্বলদেহে অতিকষ্টে বাড়ী ফিরেছেন। বাড়ীর লোকে তাঁব চেহাবা দেখে চমকে গিযেছিল, প্রথমে চিনতে পারেনি।

কৈশোর যৌবনের দুরন্তপনার অনেক গল্প বলেছেন। বলতেননা সহজে—নিজের মনের সুখদুঃখ। কদাচিত অল্পস্বল্প এ-বিষয়ে বলেছেন। বাল্য কৈশোর যৌবন সমাজবিদ্রোহিতায় কাটালেও শেষজীবনে তিনি সম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ হযে কাটিয়ে গেছেন দেখেছি। সাহিত্যের সূত্রে সমাজ যখন সম্মান যশ ও অর্থে তাঁকে শ্বেতহস্তীব পিঠে চাপিযে সুদূর বিদেশ থেকে তুলে নিয়ে এসে দেশবাসীর হৃদয়-সিংহাসনে বসিয়ে দিল, তখন থেকে তিনি সম্পূর্ণ সামাজিক মানুষ হযে গিয়েছিলেন। কোনওখানে কোনও ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু ভিতরকাব বাঁধনহীন বে-নিয়মী লোকটিকে কাছেব মানুষেবা অনেকেই মাঝে মাঝে দেখেছেন বলতে পাবি। আমি তাঁকে শেষজীবনে তাঁব কিছুটা রক্ষণশীল মূর্তিতেই দেখেছি মনে হয়। প্রাযই নানা তর্কবিতর্ক হত। তিনি বেশি সময়ে রক্ষণশীল দিকেই দাঁড়িয়ে বিতর্ক করতেন। কিন্তু এটিকে আমরা পুরোপুরি আমল দিতুমনা কেউ। কারণ, শরৎদার প্রকৃতি ছিল দুই পক্ষেই সমান তীব্র যুক্তিতে তর্ক করা।

আমার জীবনে আমি এই মানুষটির কাছে অশেষ ঋণী। আমার সামান্যতাই সম্ভবত তাঁর দুর্লভ স্নেহমমতা আকর্ষণ করে থাকতে পারে। আমার সত্যই এমন কিছু গুণ তাঁর কাছে অন্তত ছিলনা, যার বিনিময়ে এতখানি অহেতুক স্নেহ পেতে পারি। এই 'অহেতুক' কথাটি নিয়ে একদিন তিনি কতগুলি কথা বলেছিলেন মনে আছে। বিকেলবেলায় আসবে গড়গড়া টানতে টানতে বলেছিলেন—বৈষ্ণবসাহিত্য পড়েছ? উত্তর দিয়েছিলুম—অল্প-স্বল্প একটু।

—'অহৈতুকী প্রেম' কথাটা পড়েছ নিশ্চয়। কিন্তু 'অহৈতুক বিদ্বেষ' কথাটা কোথাও লক্ষ করেছ কি?

আমি হেসে ফেলেছিলুম।—এমন অদ্ভুত কথা বৈষ্ণবসাহিত্যে কোথাও তো পড়িনি বড়দা।

—তাহলেই বোঝ। সাহিত্যে সত্যিকারের ‘সত্যি কথা’ মানুষ কতটুকু লেখে। ‘অহৈতুক প্রেম’ নিয়ে কতই মাতামাতি নাচানাচি দেখবে বৈষ্ণবসাহিত্যে, কিন্তু ‘অহৈতুক বিদ্বেষ’ কোনোখানে উল্লেখই করেনি। অথচ সংসারে ‘অহেতুক প্রেম’-এর দর্শন ক’জন লোকে পায় জানিনে, ‘অহেতুক বিদ্বেষ’-এর দেখা পায়নি এমন লোক অল্পই পাবে—খোঁজ করে দেখ। বিশেষ করে, জীবনে যদি কারুর সাফল্য আর উন্নতি দেখতে পাও, তাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস কোর, সে ‘অহেতুক বিদ্বেষ’ কাকে বলে জেনেছ কিনা।

আমি বলেছিলুম—দৃশ্যত ‘অহেতুক’ হলেও, হেতু নিশ্চয় অদৃশ্যে থাকেই। অন্তত, অবদমনে বা অদৃশ্য চেতনে।

তিনি বিরক্ত সুরে বলেছিলেন—এটা তো অনেক ঘোরালো ব্যাপারে চলে যাচ্ছ। সোজাসুজি আমরা যা দেখতে পাই, কানে শুনি, ছুঁয়ে পাই—তাই দিয়ে হেতু নির্ণয় করি। স্বার্থে আঘাত লাগলে কিংবা স্বার্থ পুষ্টি হলেও হেতু খুঁজে পাই —কিন্তু এসব কোন নাড়ীতেই টিপটিপ না পাওয়া গেলে তখন বলে থাকি অহেতুক।

বৈষ্ণবসাহিত্যে ‘অহৈতুকী প্রেম’ নিয়ে হইচই থাকলে কী হবে, কোনও ভালবাসাই অহেতুক হয়না। ভালবাসতে পারাটাই তো তার প্রধান হেতু। মা সন্তানকে ভালবেসেই ভালবাসার দাম নিজের তৃপ্তির মধ্যে পেয়ে যান হাতে-হাতে। নইলে, দীর্ঘ দিন ধরে তাকে বড় করে তুলতে অত কষ্ট করতে পারতেননা। আসল কথা, যথার্থ প্রেম স্ব-নির্ভর হয়, অন্য-নির্ভর হয়না। অপর পক্ষ কতটা প্রতিদান দিল কিংবা দিলইনা, সেটা ভালবাসাকে দুর্বল করেনা।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—কিন্তু বড়দা, হঠাৎ আপনার ‘অহৈতুক বিদ্বেষ’ কথাটা মনে পড়ল কেন?

হেসে জবাব দিয়েছিলেন-ভুগছি যে ভাই। গ্রামে বাস করছি তো, বনেদী সমাজপতিরা নতুন লোকের প্রতিপত্তি পছন্দ করেননা। আমি যদিও সাতে-পাঁচে থাকতে চাইনে, তবুও দেখ না আমাকে মামলায় জড়িয়ে ভোগাচ্ছে।

১৮

কিছুকাল আগেও যে-মানুষটি ছিলেন আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে অচেনা,—যে নিঃসম্পর্ক মানুষটির শিল্পকেই শুধু আবাল্য চিনি, সেই সূত্রে নামটি অতিশ্রদ্ধেয়, এহেন ব্যক্তির হৃদ্য মমতায় স্নাত হয়ে আমি একটু অভিভূত বোধ করতুম প্রথম দিকে। অনেক সময়ে তাঁর কথাবার্তার গ্রাম্যতাও আমার কানে ঠেকত। মনে ভাল লাগতনা। মানুষটিকে ভাল কিংবা খারাপ কোনটি যে মনে করব, তার যেন হদিশ পেতুমনা। ক্রমে ক্রমে দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যে, তাঁর ভিতরকার চেহারাটি ক্রমশ স্পষ্ট

হয়ে উঠেছিল। তাঁর মধ্যে একটি স্নেহপিপাসু বালক ছিল, সে দারুণ অভিমানী। সে সামান্যেই মহা খুশী হয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, সামান্যেই খুব বেশি মর্মাহত হয়। কিন্তু এইটিই তাঁর সব নয়। তাঁর মধ্যে একটি উদাসীন দার্শনিক বাস করেন। তিনি অনেকটা দূরে, নিজস্ব আড়ালের পিছনে সরে থাকেন আমাদের থেকে,—কিন্তু মাঝে মাঝে তিনিই যখন কাছে এসে দাঁড়ান, আমরা সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ি, মুখে কথা কইতে বাধে।

তাঁর মধ্যে অতিচঞ্চল, লক্ষশূন্য একটি যুবাকে অনেকেই দেখেছেন। যাঁর কৌতুকের আর বিদ্রূপের সীমা ছিলনা। সারা দুনিয়াটাই যেন তাঁর কাছে একটা মস্ত কৌতুকেরই ব্যাপাব। এই যুবাটিই আবার যখন আকুল হয়ে নিজের দেশের কথা, জাতির কথা ভাবতেন—তখন তাঁর সেই অধীব মূর্তির অস্থিরতাও অনেকেই লক্ষ করেছেন। আমি তাই বলি,—শরৎচন্দ্রকে যে যেমন দেখেছেন, তার মধ্যে সত্য আছে নিশ্চয়ই। কারুর দেখাতেই ভুল নেই,—যদিও একজনের দেখার সঙ্গে অন্যজনেব দেখা মিলবেনা জানি।

শরৎচন্দ্রকে অনেকেই দায়িত্বহীনতাব অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন তাঁর জীবৎকালে। এর কারণ, তিনি কথা বাখতে পাবতেননা। ধারাবাহিক লেখা শুরু করে সেটি যথাসময়ে শেষ করতে পারতেননা। সভায় যাব বলে কথা দিয়ে নিজের ইচ্ছেয় কথা দিয়ে নয, অন্যের পীড়াপীড়িতে, অপরের ইচ্ছা মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যেতে পারতেননা। এর কারণ, আমি যতদূর বুঝেছি—তিনি তাঁর শিল্পীসত্তাকে ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনেব অধীনে আনতে পারেননি। চেষ্টা করেছেন অনেক—কিন্তু কিছুতেই পারেননি। লিখতে অনিচ্ছা হলে তাঁর নিজের বুঝি সাধ্য ছিলনা কলম দিয়ে একটি লাইন বার করার। একবার এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাও হয়েছিল। 'শেষের পরিচয়' আরম্ভ করেছেন ১৩৩৯ সালের আষাঢ়ে, তিন বছর একমাসে বইয়ের আধখানাও শেষ হয়নি। এর আগে 'শেষ প্রশ্ন'র বেলাতেও ঐ ব্যাপার। ১৩৩৪ শ্রাবণ থেকে ১৩৩৮ বৈশাখ পর্যন্ত তিন বছর দশমাস, অর্থাৎ প্রায় চার বছর সময়ে মোট সতের কিস্তীতে বই শেষ করেছেন। আমি এটা একটু আন্দাজেই বললুম, খুব সম্ভব ঠিক বলছি। আমরা তাঁকে প্রায়ই শোনাতুম আপনার লেখা বেরয় —মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দিয়ে, আবার উধাও হয়ে যায়। আপনার কলম বুঝি মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশে চলে যায় বড়দা? তিনি হাসতেন। বলতেন—মন্দ বলিসনি। সত্যিই মাঝে মাঝে কলম কোথায় উধাও হয়ে যায়, ধরে আনতে পারিনে। আসল কথা কী জানিস? আমি আমার কলমের ওপরে জুলুম করিনে। সে খুশি হয়ে এলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি। জোর কবে ধরেবেঁধে আনতে পারিনা। অথচ দ্যাখ না, ও-ই তো আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এখন।

অথচ তাঁর মাথায় লেখার কল্পনা অনেক কিছুই ঘুরত। মাঝে মাঝে তা বলতেনও। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মনে আছে কেবল নাটক লেখার কথা বলতেন। মৌলিক

নাটক লেখার ঝোঁক হয়েছিল সেই সময়ে। তখন তাঁর শবীর খুবই খারাপ চলছে ভিতরে-ভিতরে। সর্বদাই শরীরে নানা অস্বস্তি আর কষ্টের কথা বলেন। মাঝে মাঝে দিনকতক বেশ সহজ থাকেন, আবার মুষড়ে পড়েন। মেজাজও তখন প্রায়ই খারাপ থাকত। কোনও কথাবার্তাই বেশীক্ষণ তাঁর ভাল লাগেনা। লক্ষ করেছি সেই সময়ে,—নাটকের কথা উঠলে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠতেন।

এব আগে কিন্তু শরৎদা মৌলিক নাটক লেখায় কিছুতেই রাজী হননি, অনেকের অনেক অনুরোধেও। তাঁর প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আর শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে অনেক চেষ্টা করতে দেখেছি তাঁকে দিয়ে মৌলিক নাটক লেখাবার জন্য। অটল অনিচ্ছায় তিনি মৌলিক নাটক লেখা থেকে বিরত থেকেছেন।

এদিকে উপন্যাসকে নাটকায়িত করে তাঁর মনের খুঁৎখুতুনি কাটতনা। কিছুতেই আব নাটক পছন্দ হত না। বলতেন—মৌলিক নাটক লেখায় হাত দিলে তখন তোমরাই আমার গল্প উপন্যাসগুলোকে বাতিল করে দিতে কোমর বাঁধবে। ওদের নীচে নামিয়ে দেবে।

আবার কখনও বলতেন—আমি যা নিজে মনে বুঝি, তা মনের ভেতরে স্পষ্ট করে দেখি;—আমার সেই স্পষ্ট দেখা ছবিটাই আমি লেখায় আঁকি। নাটক লিখলে, আমাব লেখা দশজনে কাটাকুটি করে অদল-বদল করবে—বলবে, এটা স্টেজে চলবেনা, ঐটা না ঢোকালে স্টেজ-সাকসেস হবেনা। আসল বইখানা নিযে কাটা-ছেঁড়া কবে অন্য একটা জিনিস দাঁড করাবে—এটা ভাবলে আমার নার্ভে বড় স্ট্রেইন হয়। বই লিখে—শবীরে মনে যন্ত্রণা পেতে চাইনে।

আমার স্বামী বলতেন—বেশ তো, সেই কণ্ডিশনে শিশিরের সঙ্গে কথা কয়ে নেওয়া যেতে পারে। সে যদি আপনার লেখা নাটক পুরোপুরি আপনার ইচ্ছে মতন স্টেজে তুলবে বলে কথা দেয়—অবশ্য, আপনি একবার তাব অভিনয় স্টেজে দেখে—নিজেই যদি কিছু কিছু জায়গা অদল-বদল করে দিতে চান পাঁচজন বন্ধুবান্ধবেব পরামর্শ মতন,—সেটা সম্পূর্ণ আপনারই খুশীব উপর থাকবে। অন্য কারুর এতে কথা বলা চলবেনা। তাতে নাটক সাকসেস হয় হবে, না যদি হয় না হবে।

শরৎচন্দ্র এ-প্রস্তাবে আপত্তি করেননি।

আমার স্বামী শিশিরকুমারের সঙ্গে এ নিয়ে কথাও বলেছিলেন। শিশিরবাবু হেসে বলেছিলেন—তোমরা আগে লেখাও তো ওঁকে দিয়ে নাটক। তারপরে তাকে কাটা হবে কি আস্ত রাখা হবে, সে পরের কথা। তবে তুমি শরৎদাকে বোল, শিশির বলেছে—তিনি যা লিখে দেবেন অবিকল সেইটিই স্টেজে তুলবে বলেছে সে। বইতে কোনওখানে হাত দেবার পরামর্শও সে তাঁকে দেবেনা। স্টেজে চাক্ষুস করে তিনি নিজেই যদি কিছু বদলান, সে অবশ্য অন্য কথা। একটি কথা বলে দিও ভাই, 'অদৃষ্টপূর্ব নারী' বা 'অনন্যা' নারী যেন একটিও সাপ্লাই না করেন তাঁর নতুন নাটকে। ইউনিক কিরণময়ী বাংলাদেশে মিলবেনা। ঐ রকম আশ্চর্য চরিত্র বইতে টেঁকতে

পারে—স্টেজে ওকে খাড়া করতে আমি খুঁজে পাবনা ঐ চরিত্র করবার মতন মেয়ে।

শরৎদা খুশী হয়েছিলেন শিশিরবাবুর অভয়বাক্যে। হরিদাসবাবু অন্তরালে বলেছিলেন—নাটক হয়ে গেল, তখন দেখ শরৎদাই ঠিক বলবেন—না না শিশির, যেখানটা বাদ দিলে বা বদলালে ভাল হবে তুমি বলে দাও, আমি করে দিচ্ছি। স্টেজে কী হলে ঠিক হয় সেটা তো তোমারই অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে বেশি। আসল কথা, অন্য কেউ এসে এখানটা ঠিক চলবে না, বদলাতে হবে এই কথা পাছে ওঁকে বলে, সেই ভয়ে উনি হাত গুটিয়ে শক্ত করে 'না' বলে বসে আছেন। লেখা হয়ে গেলে নিজেই তখন অন্যরকম বলবেন দেখ।

এইসব কথাবার্তা চলছিল। শরৎচন্দ্রের উৎসাহও কিছুটা উদ্দীপিত হয়েছিল। প্রায়ই নাটক নিয়ে কথা কইতেন। আমার দিকে তাকিয়ে আঙুল উঁচু করে হেসে বলতেন—নাটকে কিন্তু তোমাদের পাত্তা দেবনা জেনে রাখ, গল্প উপন্যাসে যেমন দিয়েছি, এখানে তা হবেনা। ছেলেদেরই জয়জয়কার হবে। আমি হেসে জবাব দিয়েছি—সে আর নতুন কথা কী? বিশ্বসংসার জুড়েই তো 'জোর যার মুল্লুক তার'দের জয়জয়কার চলেছে। ববাবরের পাত্তাহীনরা পাত্তা পাবেনা, এ তো নতুন কিছু নয়। গভীর গাঢ়স্বরে শরৎদা বলেছেন—ভুল বলচ। এই পাত্তাহীনেরাই বিশ্বদুনিয়ার কান ধরে ওঠাচ্চে, বসাচ্চে। অদ্ভুত প্রাকৃতিক নিয়ম। খেটে মরচে, ছুটে বেড়াচ্চে, মারামারি করচে, প্রাণ দিচ্চে একদল মানুষ—আরেক দল শুধু ছায়ার তলায় বসে বসে খালি হাসচে আর কাঁদচে—ঠোঁট কাঁপাচ্চে আর ভ্রূ নাচাচ্চে। হাসি কান্নার তূণ নিয়ে বড় বড় মহা মহাবীরকে পলকে ধরাশায়ী করে শেকলে-বাঁধা ক্রীতদাস করে রাখচে। ...ভাল করে দেখলে, দেখতে পাবে—'মা'ই বিশ্ব দুনিয়ার মালিক, 'বাবা' নয়। সে ভারবাহী মাত্র। সে নকল মালিক সেজে দায়ভার কাঁধে নিয়ে খাড়া থাকে। মালিকের মালিক গা-ঢাকা দিয়ে আসল মালিকানা চালায়।

শরৎচন্দ্র বলতেন—নারীর মূল্য লিখেছিলুম অভিজ্ঞতা কাঁচা থাকতে। একপেশে নজর নিয়ে। ওর পালটা দিকটাও আছে। সেটা বাইরের ব্যাপার নয়, ভেতরের ব্যাপার। পালটা দিকটাও যে আছে, সেটা বলতে হবে। আমি 'পুরুষের মূল্য'ও লিখে যাব। লিখে না গেলে, নিরপেক্ষতার ব্যালান্স থাকবেনা।

তিনি বলতেন—মেয়েরা নিপীড়িত হয় বাইরে থেকে। বাইরের ব্যবস্থায় তাদের মারের ধাক্কা সইতে হয়। পুরুষ নিপীড়িত হয় মেয়েদের কাছে ভেতর থেকে। সেটা অনেক বেশি নিষ্ঠুর। সেটা চোখে দেখা যায়না, অদৃশ্য। এখানে ওদের নির্মমতা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। প্রকৃতি ওদের হাতে এমন অনেক অস্ত্র দিয়েছে যা ব্যবহার করে ওরা পুরুষকে নিবীর্য নির্জীব করে দেয় অনায়াসে।...মেয়েরা যখন স্বার্থপর হয়, তখন অপরের প্রতি ওদের নির্মমতার সীমা থাকেনা। পুরুষ সোজাসুজি রোষ, হিংসে, বিদ্বেষ করে, প্রভুত্বের নেশায় মাতাল হয়ে থাকে, নিষ্ঠুর হয়ে অত্যাচার করে স্বাভাবিক প্রবলতায়। মেয়েদের ব্যাপার অন্য।

১৯

শরৎচন্দ্র বলতেন—আমার মনে মৌলিক নাটক এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দু' ধরনের দুটো নাটক পুরোপুরি ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এখন লিখতে বসলেই হয়। নাটক প্রকাশ হলে, তখন তোমরা নতুন করে হৈ হল্লা শুরু করে দেবে। বইয়ের পাতার চরিত্রগুলো প্রথম থেকেই জ্যান্ত হয়ে স্টেজে চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে তার একটা অন্যরকম এফেক্ট আছে তো।

আমরা সকলেই তখন সমস্বরে বলেছি—আমরা তা খুবই বিশ্বাস করি। আপনার গল্পে উপন্যাসে নাটকীয়তা যথেষ্ট। ঝকঝকে ডায়ালগ ব্যঞ্জনাময়—গভীর অর্থবহ। নাটকীয় উপাদান আপনার লেখায় প্রচুর। লিখুন না নাটক আপনি। বাজাব সরগরম হয়ে যাবে।

কেউ বা প্রশ্ন তুলেছেন—আপনি তো এতদিন বলেছেন—নাটক লেখা আপনার দ্বারা হবেনা। উত্তরে তিনি বলেছেন—এখন আমার ভেতরে নাট্যকার এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্চে। আমরা কৌতুক করে কেউ বা বলেছি—দরজার খিলটা চট করে খুলে দিন না, বন্ধ বেখেছেন কেন?

শরৎদা হাসতেন। উদাসীন অন্যমনস্ক হাসি। বলতেন—ঐ খিল কি কেউ হাত দিয়ে কখনও নিজে খুলতে পারে? ও যখন আপনা হতে খুলে যায়, তখনই খোলে। যারা টানাটানি করে খুলতে চেষ্টা করে, তাদের হাতে নাটক 'না-টক', 'না-মিষ্টি', 'না-ঝাল' কিছুই আসেনা। শুধু খিল টানাটানির দাগগুলো থেকে যায়।

শরৎদা সেই সময়ে বলেছিলেন—মানবচরিত্রে কতগুলো অহেতুক প্রবণতা আছে। এই নিয়ে বিপরীতধর্মী দুখানি নাটক লেখার ইচ্ছে আমার। যা চোখে দেখা যায়না, হাতে ছোঁওয়া যায়না,—প্রমাণ করাও শক্ত—অথচ, যাদেব অস্তিত্বে বিশ্বসংসার অমৃতে আর বিষে উপচে উঠছে।...খুব ভাল নাটক হবে এই দুখানা। তৃতীয় নাটক লিখব আমাদের দেশের রাজনীতি নিয়ে।

রাজনীতি নিয়ে নাটক লেখার কথাবার্তার দিনে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কথাবার্তায় যোগ দিচ্ছিলেন অনেকখানি। তিনি বলেছিলেন উৎসুক হয়ে—কংগ্রেসকে নাটকে ঠুকবেন বুঝি দাদা?

তখন শরৎচন্দ্র নিজে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি আর ক্ষমতার লড়াইয়ে তিনি বেশ বিব্রত, বিচলিত, চিন্তিত থাকতেন।

সাবিত্রীবাবুব প্রশ্নের জবাবে শরৎচন্দ্র হেসে বলেছেন—না। যেটা মর্মান্তিক করুণ, তা নিয়ে ঠোকা যায়না। কমজোরী-পায়ের দুর্বল শিশুদের দ্যাখোনি? সরু সরু বাঁকা বাঁকা অপুষ্ট পা তাদের। শরীরের তুলনায় মস্তবড় মাথা আর পেটজোড়া পিলেতে প্রকাণ্ড উদরের ভার বয়ে টলমল করে হাঁটে। অন্য সব সুস্থ ছেলেরা জোরে দৌড়োয়, ঝাঁপ খায়, লাফায় দেখে সে-ও ছুটতে চায়, লাফ-ঝাঁপ দিতে চায়, কিন্তু শক্তিতে কুলোয়না। করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয় খালি। ভারি মাথা আর মোটা পেট, সরু সরু পায়ের ব্যালান্স মেরে রাখে। আমাদের রাজনীতির ধুমধাড়াক্কা আব গরম গরম বুলি

আর হই-চই—ঠিক ঐ ভারী মাথা আর মোটা পেটের মতন। ডিসিপ্লিন আর টেনাসিটির পা দুটো রিকেটি,—সরু সরু বাঁকা বাঁকা।

দেশের জন্য বেদনা ছিল তাঁর গভীর শুধু নয়, অধীরও। পরাধীনতার বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন। বলতেন—ওরা চলে গেলেও যা ক্ষতি করে দিয়েচে তার পূরণ কত দিনে হবে, কিংবা কখনও হবেই কিনা, কে বলতে পারে? সমস্ত 'মানুষগুলো' মনুষ্যত্বহীন হয়ে গেছে। এই সব জীব স্বাধীন যদি হয় কখনও, তার পরে সেই স্বাধীনতা নিয়ে কোনখানে কোন কাজে লাগাবে কে বলতে পারে? অন্য আরেকটা প্রবল জাতকে ডেকে নিয়ে এসে বসাবে হয়ত। মীরজাফরদের উন্নতিলোভ আর জগৎশেঠদের অর্থলোভ সারা দেশের শস্য হয়ে গেছে মনের জমিতে।

নাটক-আলোচনার প্রসঙ্গে আসি। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—'আমার মনে মনে দুটো নাটক পুরোপুরি ঠিকঠাক হয়ে গেছে। সবই 'ছকে' ফেলেচি। লিখতে শুরু করলে শেষ হতে দেরি হবেনা। মালমশলা রেডি।

প্রথম নাটকটির বিপরীত হবে দ্বিতীয় নাটকটি। বিপরীত মতের বিপরীত আদর্শেরও বটে। দুটোই স্টেজে উঠে পড়লে বোঝা যাবে কোনটা বেশী তেজী হয়ে জমে ওঠে। দর্শকদের মনের খবর আর তাদের নাড়ীজ্ঞান ধরা যাবে।'

এই কথাগুলো যখন তিনি বলেছেন—তাঁর মুখ চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে মনেব দীপ্তিতে—যেন তিনি অনেকটা দূরে কোনও একটা কিছু সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন এই রকম নিরীক্ষার দৃষ্টি ফুটে উঠেছে চোখে। শরীর যদিও তখন একেবারেই দ্রুত ভেঙে পড়ছে দিন দিন। ক্রমশই শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে পড়ছে শরীর।

তাঁর মনের ভিতরে তৈরী হয়ে যাওয়া নাটক পৃথিবীর আলোয় আর আসেনি, রোগের যন্ত্রণায়, মনের নিদারুণ অস্থিরতায়। বলেছিলেন—আমি নোট করে রেখেচি আমার দুটো নাটকেরই থীম।

আমরা অনেকদিন—অনেক সময়েই ভেবেছি—কোথায় গেল সেই নাটক দুটির তাঁর নিজ হাতে লেখা নোট আর থীম? কোথায় কোন কাগজে,—কোন খাতায় লিখে রেখেছিলেন তিনি? আগে আগে ভাবতাম, নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আছেই কোথাও। তাঁর তিরোধানের পরই কিন্তু খোঁজ করা হয়েছিল মনে পড়ছে' হরিদাসবাবুই তাঁর বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে যখন 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপি নেন, তখন প্রকাশবাবুর কাছে খোঁজ করেছিলেন—শুরু করা নাটক কোনও খাতায় কিংবা প্যাডে লেখা আছে কিনা।—কিন্তু, খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মনে আপশোস হয়, নাটক দুখানা কিংবা একখানাও যদি ফেঁদে শুরু করেও যেতেন—তাহলেও হয়ত কিছুটা আন্দাজ করা যেত। 'আগামীকাল' উপন্যাসটি যেমন সামান্য কিছুটা শুরু করে গেলেও লেখকের মনের গতি আর লেখার প্রণালী-বদল, ভাষা-বদল লক্ষ করা যায়। তাঁর নতুন দিক দিয়ে চিন্তা আর অভিজ্ঞতার ফসল তিনি দিয়ে যেতে সময় পাননি।

মানুষের কত আশাই না অপূর্ণ থেকে যায়। একবার বাইরের পৃথিবীটা ভাল করে ঘুরে দেখে আসবেন, এও তাঁর স্বপ্ন ছিল। এ নিয়ে অনেক পরিকল্পনা করতেন আমাদের সঙ্গে। আমরা বলতুম, এ যুগে জন্মে, উন্নত সভ্য দুনিয়া চাক্ষুষ না দেখে মরতে চাইনা। শরৎদা প্রবল সমর্থন করতেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা। তাঁরও একান্ত বাসনা ছিল আধুনিক সভ্যজগতের সঙ্গে একবার প্রত্যক্ষ দেখাসাক্ষাৎ করে যাওয়ার।

সময়-সময় কৌতুক করে বলতেন—কিন্তু রাধু, আমি তো পেণ্টুলুন পরতে পারবনা। কী হবে তাহলে? তোমাদের গুরুদেবের মতন আলখাল্লা পরলে আমাকে কিন্তু মানিক-পীর দেখাবে, সেও বাপু আমি পারবনা। এইটেই তো মহাসমিস্যের ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে দেখছি।

এই বিষয় নিয়ে কখনও কৌতুকের সঙ্গে কখনও বা অকৃত্রিম গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতেন। বলতেন—এটা কিন্তু তোমরা এখন থেকেই চাউর করে ফেল না যেন,—তাহলে দেখ কখনোই সফল হবেনা। ভেস্তে যাবেই।

আমরা দুজনে যদি ও-দেশে যাই, তিনিও ঐসঙ্গে যাবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছে। আমার স্বামী ভয় পেতেন মনে। বলতেন,—যা খেয়ালী মানুষ আপনি, তার উপরে এখন আবার ভাঙা শরীর, খানিক দূর গিয়ে ভাল না লাগলে মাঝপথে কোনও একটা বন্দরে নেমে পড়ে বাড়ি ফিরতে অস্থির হয়ে উঠবেন। তখন আমাদেরও ফিরে আসতে হবে গুটি গুটি করে।

হাসতেন। বলতেন—ঐ জন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে জুটে, দলে-ভর্তি হয়ে যেতে চাই। যাতে নিজের হাতে না থাকি। আমার সঙ্গে একটা ইয়ং ছেলে আর গুড়গুড়িটা নেব। গুড়গুড়ি টানব ঘরের ভেতরে বসে। গন্ধে আর আওয়াজে দরজায় মানুষের মৌমাছি জমে যাবে। তোমরা সামলাতে পারবেনা। তোমরা সঙ্গে থাকলে, —তোমাদের যাত্রা পণ্ড করা চলবে না বলে আমারও মেজাজ-বদল চলবেনা। ঠিক বাঁধা থাকব, দেখে নিও।

কত টাকা খরচ লাগতে পারে, কোন কোন দেশ নিশ্চয়ই দেখে আসা চাই-ই, এই সব নিয়ে জল্পনা করতেন বসে বসে তামাকের ধোঁয়ায়। বাড়ি ফেরার মুখে প্রতিবারই সতর্ক করে দিতেন—দেখ, যেন ফাঁস করে ফেল না প্ল্যান। তাহলে কিন্তু ভেস্তে যাবেই।

আমাদের যাওয়া হয়েছিল বেশ কিছুকাল পরে। শরৎদার যাওয়া হয়নি।

মৌখিক চলতি ভাষা আর লিখিত সাধুভাষায় বই লেখা নিয়ে শরৎচন্দ্র অনেক তর্কবিতর্ক করেছেন দিনের পরে দিন। শেষ পর্যন্ত আগেকাব অমত বদল করে মৌখিক ভাষা সাহিত্যেরও ভাষা হওয়া উচিত মেনে নিয়েছিলেন। নিজে লেখাও শুরু করেছিলেন মৌখিক ভাষায়। ঐ শুরুটুকুও যদি না করে যেতেন, প্রমাণ করা যেতনা, দুরকম ভাষা-রীতির পার্থক্য সরিয়ে নিলে সাহিত্যের ভাষা আরও স্রোতোশালী

জীবন্ত হয়ে ওঠে—এ-ব্যাপারে তিনি বিশ্বাসী হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর রচনা সরল সাধু-ভাষার মাধ্যমেই ছিল।

আমার বরাবরই মনে হয়, তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে, সুস্থ থাকলে —অনেক নতুন জিনিস লিখে যেতে পারতেন। তাই ইচ্ছেও ছিল তাঁর। শক্তিও ছিল সন্দেহ নেই।

যে মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি আর দূরবিস্তার চিন্তা থাকলে, অতীত বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎও শিল্পীর তৃতীয় নেত্রে সুস্পষ্ট ভেসে ওঠে,—সে দৃষ্টি তিনি পেয়েছিলেন। একেই বোধহয় আমরা প্রতিভা বলে থাকি। অবশ্য এই সহজশক্তিকে রক্ষা করার শক্তি চাই, যত্ন চাই, নিষ্ঠা চাই। বিদ্যাচর্চা জ্ঞানচর্চার রৌদ্র জল না পেলে প্রতিভাও নষ্ট হয়ে যায়, বিকৃত বা ব্যর্থ হয়ে যায় এমন দেখা গেছে যথেষ্ট। বিদ্যাচর্চা জ্ঞানচর্চা আর শ্রমনিষ্ঠা এই শক্তিটিকে সার্থকভাবে বাড়িয়ে তোলে।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভা যেটুকু বিদ্যা আর জ্ঞানানুশীলনের সার জল রৌদ্র পেয়েছিল, আমার মনে হয় তা পর্যাপ্ত ছিল। প্রয়োজনের বেশি সারে, সেচে, রোদে ফসলের নিজস্ব বৃদ্ধির সহায়তার চেয়ে হয়ত হানিই ঘটায়। আধুনিক উপন্যাসে বহুধা বিষয় সমাবেশ দেখে অনেক সময়ে আমার মনে হয় বৈদগ্ধ্যের অন্তঃশীলতা না থেকে —প্রবল প্রকাশে লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি সতেজ হয়ে বাড়তে বাধাগ্রস্ত হয়।

শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যকর্ম সারা করে যেতে পারেননি। সময় পেলেননা মহাকালের কাছে। তাঁর শেষের দিকের উপলব্ধিগুলি চিন্তাগুলি শিল্পে রূপ দিয়ে যেতে সময় হলনা। তাঁর মুখে যে সকল মত আমরা শুনেছি, অভিজ্ঞতা তাঁকে যে সব উপলব্ধি দিয়েছিল, তিনি তা শিল্পায়িত করে যেতে আয়ুর অবকাশ পাননি।

কিন্তু তিনি যা নিজমুখে বলে যেতে পারেননি, তা অন্যের মুখে প্রকাশ হওয়া কখনোই উচিত নয়। প্রমাণবিহীন তথ্য মুদ্রিত করা দায়িত্বহীনতার চরম। অজস্র মানুষই মৃতব্যক্তি সম্পর্কে নানা কাল্পনিক কাহিনী রটিয়ে থাকে জানি। দায়িত্বহীনদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, বিশেষ দায়িত্ববান অভিজ্ঞ লোককেও কাল্পনিক তথ্য লিখতে দেখে হতভম্ব হয়েছি। আমি সেজন্য অত্যন্ত অস্থির অস্বস্তিতে ভুগি নিজের মনের মধ্যে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর নাটক লেখার ঝোঁকের চিহ্ন তাঁর কাগজপত্র খাতাটাতার মধ্যে নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাওয়া যায়নি। যায়নি বলেই ওটা নিয়ে নাড়াচাড়াও হলনা মোটে। শিশিরবাবু যদিও মাঝে মাঝে উল্লেখ করতেন সেকথা। কেউ যদি শিশিরবাবুর মুখে ১৯৩৭-এ শরৎচন্দ্রের নাটক লেখার কথাবার্তা সম্পর্কে আলোচনা শুনে থাকেন, জানালে বিশেষ উপকৃত হব। যেহেতু, এই ব্যাপারটির লিখিত প্রমাণ কাগজপত্র বা জীবিত সাক্ষী কাউকে এখন দেখতে পাচ্ছিনা। কারুর জানা থাকা সম্ভব হতে পারে,—তিনি জানালে আমার পক্ষে স্বস্তির হবে।

২০

আমরা শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে তিনটি যোগাযোগ লক্ষ করেছি। প্রধানত দেখেছি যে শরৎচন্দ্রের জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যাটি তাঁর সাহিত্যেও কেন্দ্রীয় সমস্যা হয়ে কীভাবে প্রতিফলিত। দ্বিতীয়ত দেখেছি, তাঁর নায়কদের মধ্যে কীভাবে কিয়ৎ পরিমাণে শরৎচন্দ্র ও বালবিধবা নায়িকাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে নিরুপমা দেবীর মানসিক আদর্শগুলি প্রতিভাসিত। তৃতীয়ত দেখেছি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নায়ক নায়িকারাও বিভিন্ন উপন্যাসে কেমন করে পরিণততর হয়ে উঠছেন, তাঁদের চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটছে—এবং স্বীয় জীবনের কেন্দ্রীয় সমস্যাটি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের নিজেরও চিন্তা, বুদ্ধির কী ধরনের পরিণতি ঘটছে।

এখন আলোচ্য বিষয়, শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের শেষের পরিচয় কী।

নারীর সম্পর্কে যতটা স্পষ্টত শরৎচন্দ্র খোলাখুলি মত প্রকাশ করে গেছেন সাহিত্যের মাধ্যমে, চিঠিপত্র আর মৌখিক আলোচনায়, পুরুষ বিষয়ে ততটা স্পষ্টতা নেই। এটি খুবই স্বাভাবিক, মানুষ জীবনে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চযই কবে সহজে বলতে পারেনা। শরৎচন্দ্র তো নয়ই। তবে—একটা দিক স্পষ্ট জানা গেলে অন্য দিকটা বুঝে নেওয়া কঠিন হয়না। যেহেতু, দুটিই হল পরস্পরনির্ভর, একে অন্যের পরিপূরক।

শরৎসাহিত্যে নারীর শেষের পরিচয়টি যদি আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে —তাহলে পুরুষের পরিচয়টিও রহস্যাবৃত থাকেনা।

প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায কেন যে উপেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ ভট্ট, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবীদের মতন সে-যুগের সাহিত্যক্ষেত্রের নামী উপন্যাস-লিখিয়েরা থাকতেও—বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের এককালের ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিকেরা থাকতেও—আমার মতন সামান্য ব্যক্তির উপরে এ-ভার চাপিয়েছিলেন, তার কারণ বলি।

সাল ঠিক মনে নেই। শরৎদার লোকান্তরের বছর খানেক আগে হবে। শরৎচন্দ্র প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি এসে রাত দশটা অবধি গল্প গুজব করতেন। তাঁকে ঘিরে প্রতিদিন একটি সুন্দর সাহিত্য আড্ডা জমে উঠত।

সেদিন ছিলেন প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ডঃ কানাই গাঙ্গুলী, শিল্পী সতীশ সিংহ এবং আরও দুই একজন। হালকা হাসি কৌতুক আর গল্প চলছে—এমন সময়ে এলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিছুক্ষণ গল্প গুজবে যোগ দেওয়ার পরে সতীশবাবু উঠে দাঁড়ালেন বিদায় চেয়ে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শরৎদার দিকে তাকিয়ে বললেন—দাদা, আপনার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

শরৎচন্দ্র গড়গড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সতীশবাবুর সঙ্গে রাস্তায় নেমে গেলেন।

মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যে ফিরে এসে আবার গড়গড়া নিয়ে বসলেন। সতীশবাবুর মোটর হর্ন দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হরিদাসবাবু আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—রাধা, নরেন,—আমার একটা কাজ তোমাদের করে দিতে হবে। তোমরা তো শরৎদার অন্দরমহলে যাতায়াত কর। (শরৎচন্দ্রের অন্দরে সকলে যেতে পেতেননা।) ওঁর শোবার ঘরের আর পড়ার ঘরের জিনিসপত্রগুলো নীচে বাইরের উঠোনে ফেলে দিতে হবে দোতালা থেকে। পড়ার ঘরের সমস্ত বইগুলো আর বইয়ের র‍্যাক ক'টা টেনে নীচে একতলায় ফেলবে। ইজিচেয়ারখানাও দুজনে ধরাধরি করে তুলে উঠোনে ফেলে দিও। যে ক'খানা ধুতি কোট উড়ুনি আর মটকার চাদর আছে সমস্ত টেনে বার করে নীচে ফেলতে হবে। জলখাওয়ার একটা রূপোর গেলাস আছে, না? সেটাও কিন্তু ফেলতে ভুলোনা। আমি একটা গাড়ী নিয়ে হাজির থাকব, ওঁর যা কিছু সম্পত্তি তুলে নিয়ে যাব। সম্পত্তি ক্রোক করা ছাড়া তো আমার এখন আর অন্য কিছু উপায় নেই।

আমার স্বামী আর সতীশবাবু, কানাইবাবু এঁরা হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন—কিন্তু জামা কাপড় বই ইজিচেয়ার ক্রোক করে আপনার সমস্ত টাকা কি উঠবে মনে করেন?

হরিদাসবাবু মাথা নেড়ে বলবেন—রামোঃ। সিকিও উঠবেনা। কিন্তু ওঁর তো ঐ ছাড়া আর কিছু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। যা পাই, যথা লাভ। আমি ব্যবসা করি, টাকা মারা গেলে যা কবা নিয়ম, তা-ই করতে হবে, উপায় নেই। উনি ভারতবর্ষের লেখাটা কিছুতে শেষ করছেননা, ফেলে রেখে দিয়েছেন,—অথচ অন্য অন্য কাগজে নতুন নতুন বই ধরছেন। আর কত দিন আমি অপেক্ষা কবব বল? এখন ওঁর ঘটি-বাটি বিক্রী করে টাকা তুলে নেওয়া ছাড়া তো আমার আর অন্য উপায় দেখছিনা।

সবাই হৈ-হৈ করে হেসে উঠলেন। শরৎচন্দ্র চেয়ারে আধশুয়ে গড়গড়া টানতে টানতে খুবই উপভোগ করছেন কথাবার্তা, উজ্জ্বল চাপা হাসি ফুটে উঠেছে মুখে।

আমি শরৎদার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে হঠাৎ বলে বসলুম—আসল কথা, হালে পানি পাচ্ছেননা এখন বড়দা। সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে তো বই শুরু করচেন,—এখন টেনে তুলবেন কী করে ভেবে পাচ্ছেননা।

যেই-না এই কথা বলা,—দপ করে জ্বলে উঠলেন শরৎচন্দ্র। হাত থেকে গড়গড়ার নল জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাড়া হয়ে উঠে বসলেন চেয়ারে। আমার দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললেন—মেয়েমানুষের শেষের পরিচয় কী—উত্তর দাও।

তাঁর সেই জ্বলন্ত মূর্তির সামনে আমরা প্রত্যেকেই তখন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি। এইমাত্র যে মুখ চাপা কৌতুক হাসিতে উজ্জ্বল ছিল—সেখানে হঠাৎ একেবারে বজ্র বিদ্যুৎ!

শরৎদার রোষের সামনে আমি ভয়ে ও লজ্জায় কুঁকড়ে গেছি। আমার স্বামী

স্থির ধীর মানুষ,—তিনি শান্ত নরম গলায় বললেন—আপনিই বলে দিননা শরৎদা! আমরাই যদি বলতে পারব, তাহলে আপনি আমাদের দাদা কী জন্যে? ওঁর তখন চেষ্টা ক্ষিপ্ত শরৎচন্দ্রের প্রসন্ন মেজাজ ফিরিয়ে আনা।

শরৎচন্দ্র নিশ্চুপ। দুই চোখে অগ্নিবর্ষণ। হরিদাসবাবু আর শিল্পী সতীশ সিংহ অনুনয়ের স্বরে বলতে লাগলেন—বলুন না দাদা, মেয়েদের শেষের পরিচয় কী, শুনি। আমরা তো ভেবে আন্দাজ করতে পারছিনা।

শরৎচন্দ্র ঠাণ্ডা পাথরেব মতন গলায় বললেন—মা। মাতৃত্বের বাৎসল্য মেয়েজাতের শেষের পরিচয়। আমার দিকে তখনও তাঁর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিঁধে রয়েছে। এতগুলি বাইবের লোকের সামনে লজ্জায় অপ্রতিভ আমি তখন আধমরা।

আমার স্বামী আর হবিদাসবাবু নানা স্তুতিবাক্যে, হালকা হাসি তামাশায় তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডার চেষ্টা করতে লাগলেন। কানাইবাবু সতীশবাবুও যোগ দিলেন।

সেদিন শরৎচন্দ্র প্রবল উত্তেজনার মুখে তাঁর 'শেষের পরিচয' বইয়ের মর্মার্থ খুলে বলেছিলেন। এবং বলেছিলেন তাঁব প্রকাশকের সামনেই।

শরৎচন্দ্র সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন—ব্রজবিহারীবাবু—সবিতার স্বামী যিনি, তাঁকে কেমন মানুষ দেখচ তোমরা?

সকলেই চুপচাপ।

—কই, জবাব দাও, জবাব দিচ্চনা কেন?

এখনও আমারই দিকে তাঁর জ্বলন্ত দৃষ্টি আটকে আছে। আমার স্বামী আব শিল্পী সতীশ সিংহ তাড়াতাড়ি এগিয়ে উত্তর দিলেন—চমৎকার! অপূর্ব চবিত্র। সব বকম গুণের পবিত্র একটি আধার। এমন দেবচরিত্র স্বামীর কিন্তু ঐ রকম—

স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতেও বোধ হয় মনে লজ্জা পেলেন। শবৎদা মুখ ফিরিয়ে অনেক দূরের দিকে শূন্যে তাকিয়ে স্বগত উক্তির মত করে বলতে লাগলেন—সমস্ত দুর্গতি দুর্ঘটনার হেতু ঐ লোকটি। ও কি একটা মানুষ? আত্মসর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক, দুর্বল, ভীরু জীব।

এবারে আড়ষ্টতা কেটে সবাইকার বিস্ময়ের পালা।—সে কী! সকলেই আমরা হতভম্ব।

শরৎচন্দ্র স্থির গলায় আত্মগতভাবে বিশ্লেষণ করে বলতে লাগলেন—সবিতা আর ব্রজবিহারীবাবু দুটি চরিত্র নিয়ে বই। রমণীবাবু, রাজু, তারক, বিমলবাবু, সারদা, রেণু এঁরা বইয়ের মূল চরিত্র দুটি ফুটিয়ে তোলার জন্যে রয়েছেন আশে পাশে আপন আপন জায়গায় তাদের নিজস্ব বিশেষত্ব নিজস্ব চরিত্র নিয়ে। বইটির মূল লক্ষ, সবিতার জীবনের কঠিনতম সমস্যা।

শরৎদা সেদিন এই বিষয়টি বোঝাতে বোঝাতে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন। সকলের তখন শুনতে শুনতে সম্মোহিত অবস্থা।

আমার যত দূর মনে আছে, লিখছি। তাঁর সে-রাত্রের সেই কথাগুলি 'শেষের

পরিচয়' সমাপ্ত করার জন্যে আমাকে অনেক বারই মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে ; স্মরণ করতে হয়েছে অনেক বার—অনেক—অনেকক্ষণ ধরে। কারণ, সেই রাত্রির স্মৃতিকেই অবলম্বন করে তাঁর অসমাপ্ত শিল্পকর্ম সমাপ্ত করার কঠিন কাজে আমায় নামতে হয়েছিল।

তিনি যা বলে যাচ্ছিলেন আপন উচ্ছ্বাসে—তার সারমর্ম—মেয়েমানুষও যে মানুষ, একথা পুরুষ-শাসিত সমাজে কোনো দেশেই আর মনে থাকেনি। মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে তার মনের আর চরিত্রের আদিম জৈব চেহারা বদলিয়েছে। বিধাতার নির্দিষ্ট জৈবিক নিয়মকে বশ মানিয়ে, মানুষের নির্দিষ্ট মানবিক নিয়মকে সফল করে সবল করে তুলতে পেরেছে বলেই মানুষ আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু মানবিক নিয়মে যে দেহ মন গড়ে তুলে আমরা সভ্যতা সংস্কৃতির দুনিয়া গড়েচি,—গড়চি—সেখানে জৈবিক নিয়ম মাঝে মাঝে তার অন্ধ শক্তি নিয়ে এক একবার ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে যায়না কি?

সবিতা একটি উৎকৃষ্ট মানুষ। মহৎমনা, সৎ প্রকৃতির নারী। তার দৈহিক সৌন্দর্যের সীমা হয়না। তার বুদ্ধি, হৃদয়, সাহস, কর্তব্যজ্ঞান, নির্ভীকতা—সকলের চেয়ে তার মাতৃ হৃদয়ের সংবেদনশীলতা প্রশ্নাতীত ঐশ্বর্যময়। তার সত্যের প্রতি আনুগত্য, আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ, স্বামী ও গৃহদেবতার প্রতি ভক্তি ভালবাসা—একটিও মিথ্যে নয়, মেকী বা ফাঁকি নয়। যে অন্ধ শক্তিতে হঠাৎ স্থিরধরিত্রীর মাটি কেঁপে উঠে মুহূর্তে ফেটে চৌচির হয়ে যায়, সমুদ্রের শান্ত বুকে বিরাট জলস্তম্ভ ফুঁসে ওঠে, সুন্দব বিকেলের নিশ্চিন্ত পৃথিবীতে কালবৈশাখীর বিধ্বংসীশক্তি কয়েক দণ্ডের জন্য নেমে এসে ধ্বংসচিহ্ন এঁকে রেখে অন্তর্হিত হয়ে যায়—এও তেমনিই একটি ব্যাপাব। কিন্তু অন্ধ শক্তির সেই সাময়িক কয়েক মুহূর্তের বিজয় মানুষ মেনে নেয়নি। তাকে অস্বীকার করেছে বলেই মানুষের প্রকৃতি-বিজয় সম্ভবপর হয়েছে। স্ত্রী-মানবের জীবনে এই অন্ধ শক্তির সাময়িক ছোঁয়াকে অস্বীকার করে মানবিক শক্তির সম্মান স্বীকার করা হয়না পুরুষশাসিত সমাজে। পুরুষ-মানব তার স্খলন পতন ত্রুটি-বিচ্যুতির স্বচ্ছন্দ মার্জনা পায় অনেক, কিন্তু মেয়েরা সামান্যতম বিচ্যুতির ক্ষমা পায়না। বহু গুণ মহত্ত্ব-কৃতিত্ব দিয়েও সে জীবনের কোনও একটি মাত্র আকস্মিকতাকে মুছে ফেলতে পারেনা। এর কারণ কী? কারণ—পুরুষেরাই। একদিকে ব্রজবাবুরা, আর অন্যদিকে রমণীবাবুরা সবিতাদের ঘিরে থাকেন। মূল অপরাধ এঁদের মত মানুষদেরই। সারা জীবনব্যাপী শাস্তির বোঝা বহন করতে হয় সবিতাদের—সব দেশেই।

আমি অবিকল তাঁর মুখের ভাষা দিতে পারলুমনা, তবে তিনি সেদিন এই মর্মার্থের কথাই অনর্গল আবেগে বলেছিলেন। তিনি তখন কেমন একরকম উত্তেজিত অথচ আচ্ছন্নভাবে বলে যাচ্ছিলেন সোশিওলজির তথ্য দিয়ে দিয়ে নিজের চিন্তা। তিনি বলেছিলেন—যে-পুরুষমানুষের পৌরুষ নেই, নারীর কাছে সে সবচেয়ে ব্যর্থ। যে-পুরুষের উপর নারী নির্ভর করতে পারেনা,—এ-নির্ভরতা বাইরের দিকেই শুধু

নয়, তার মনের, তার বিশ্বাসের, তার আশা-আকাঙ্ক্ষাব নির্ভরতা,—নারীর জীবনে সে-পুরুষ অভিশাপ।

ব্রজবাবু মেরুদণ্ডহীন আত্মকেন্দ্রিক দুর্বল মানুষ। যদিও তাঁব মধ্যে শুচিতা, কোমলতা, কারুণ্য আছে। সবিতার মত ঐশ্বর্যময়ী মানবীর পাশে তিনি উপযুক্ত পুরুষ মানুষ নন। রমণীবাবু তো মানুষই নয়, ক্লেদাক্ত মলিন জীবমাত্র।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, বিমলবাবুকে এনেছি, এই দুটি 'সুপবিত্র' আর 'অপবিত্র' পুরুষের মাঝখানে সত্যিকারের পুরুষ মানুষ। যার জীবনে ময়লা কাদা যখন লাগে, তখনই লাগে, পরে আর লেগে থাকেনা। সেটা বরাবরের জন্য দাগ ফেলেনা। যে-মানুষ এক অভিজ্ঞতা থেকে বিপরীত অভিজ্ঞতার তীরে আপনিই উত্তীর্ণ হতে পাবে। যার ব্যক্তিত্ব, জীবনের কাছে কুণ্ঠিত নয়, সহজ। বুদ্ধি আব অনুভব যার নিজেকেই কেন্দ্র করে ঘানি ঘোরায়না, অন্যের সম্পর্কেও নিরপেক্ষভাবে সক্রিয় হতে পাবে। এই তিনটি পুরুষ বিভিন্নধর্মী। এদেরই মধ্যে সবিতাব নারীজীবন। তাকে বারো বছর ধরে যে-শাস্তি পেতে হয়েচে—তা সঠিক অনুমান করতে পারলে অতি কঠিন মানুষেরও বুক কেঁপে ওঠার কথা।

শরৎচন্দ্রের অনর্গল কথা আমরা কয়েকজন সেদিন স্তম্ভিত স্থির হয়ে শুনেছিলুম। পরে হরিদাসবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—রাত অনেক হয়ে গেল। আমাকে তো উত্তরমেরুতে পৌঁছুতে হবে,—শরৎদা উঠুন, আপনাকে আর কানাইবাবুকে নামিয়ে দিয়ে যাই। কিন্তু—শেষের পরিচয়টা কী হল তা তো বললেন না!

শরৎদা শুকনো হেসে বললেন—সবিতা বিমলবাবুর কাছে তার মনের আশ্রয় আর অবলম্বন পাবে। শরীরকে ওরা নিজেরাই উপেক্ষা করবে। আনবেনা। কিন্তু, বিমলবাবুর সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে সমুদ্রের ওপারে যাত্রার মুহূর্তে সবিতা ফিরবে তার বৃদ্ধ বৈষ্ণব গোবিন্দসর্বস্ব স্বামী ব্রজবিহারীর কাছে। কারণ ব্রজবিহারীবাবুর কাছে তখন কেউই থাকবেনা, রেণুও না।...

রেণু তার জীবনে সবিতাকে গ্রাহ্য করতে পারেইনা, তাই করবেনা। সে সবিতারই স্মল এডিশন। তার জীবনকাল অল্প পরিধিতে খুব সংক্ষিপ্ত রাখব। সে তো বইয়ের লক্ষ নয়, উপলক্ষ মাত্র। যতটুকু তার থাকা দরকার ততটুকুই থাকবে, তার চেয়ে বেশী নয়। থাকবে ব্রজবিহারীর 'মা' হয়ে সবিতাই, বৃদ্ধের শেষ ভার নিয়ে। শোকার্ত 'রেণুর মা' যাবে রেণুর বাপেব ভার নিতে মাতৃহৃদয় নিয়ে। এইটেই তার 'শেষের পরিচয়'। দুঃখের দিনে, সর্বনাশের দিনে যে-হৃদয় নিঃস্বের পাশে এসে তার সব ভার তুলে নেয়।

এই মর্মার্থ শরৎচন্দ্র এক উত্তেজনার মুহূর্তে বলেছিলেন নিজের মুখে। সেখানে যাঁরা ছিলেন বলেছি ; তাঁর বইয়ের প্রকাশক হরিদাসবাবু নিজে উপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনাটিই আমাকে 'শেষের পরিচয়' শেষ করার ভার দেওয়ার একান্ত কারণ। শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের সপ্তাহ দুই পরে হরিদাসবাবু আমাদের এই বাড়ীতে

এসে বলেছিলেন—রাধা, শরৎদার 'শেষের পরিচয়' শেষ করার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি চমকে উঠেছিলুম। বলে ফেলেছিলুম—অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব।

আমি কিছুতেই মনে ভরসা পাইনি, রাজীও হইনি। হরিদাসবাবু অবিচলিত অনড় ছিলেন তাঁর ইচ্ছায়।

তিনি বলেছিলেন—অত নার্ভাস হোয়োনা। তুমি পারবে। শরৎদা সে-রাত্রে রেগে গিয়ে গল্পের চরিত্রগুলোর মানে খুলে খুলে বলেছিলেন। তুমি শুনতে পেয়েচ তাঁর মুখে। সেই কথাগুলো আগে মনে করে করে নোট লিখে ফেল—এইটেই সবচেয়ে জরুরী। আমার যে যে পয়েন্টগুলো মনে আছে বলে দিচ্ছি, নোট করে রাখ। নরেনও তোমায় পয়েন্ট মনে করে দেবেন। দ্যাখ, অন্য লেখকদের লিখতে দিলে তাঁরা নিজেদের খুশিমত সিদ্ধান্ত চাপাবেন। সেটা ঠিক হবেনা।

আমি তবুও অনিচ্ছুক। আতঙ্কিত হয়ে কেবলই বলেছি--পারবনা, শরৎদার বই শেষ করা? অসম্ভব কথা।

হরিদাসবাবু সেদিন চলে গেলেন। আবার এলেন পরের দিন সন্ধ্যায়। তাঁর বাড়ী আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি। আবার তিনি বোঝাতে আর সাহস দিতে শুরু করলেন। আমার স্বামী প্রথমে চুপচাপ ছিলেন, এবারে তিনিও ওঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। —'চেষ্টা করেই দ্যাখ না, ভাল না হয়, ছেড়ে দিও তখন। ভাল না হলে তো ছাপা হবেনা! লিখলেই যে ছাপা হয়ে যাবে ভাবছ কেন? উপযুক্ত না হলে তখন অন্য কাউকে দেখতে হবে। হরিদাসবাবু বলতে লাগলেন—তোমার গল্পের হাত দেখেছি আমি। আমি না বুঝে বলব কেন?

হরিদাসবাবু আমার আপত্তি কানেই তোলেননি। যাবার সময় বলে চলে গেলেন, —তাহলে ঐ কথা রইল কিন্তু। তুমি একমাসের মধ্যে আমাকে পুরো কপি দিয়ে দেবে। শুধু লক্ষ রেখ, শরৎদাব যত ফর্মা লেখা আছে, তার চেয়ে তোমার ফর্মা যেন বেশী না হয়ে যায়। সমান সমান হলে চলবে। কম হলে আরও ভাল।

২১

আমি অকূলপাথারে পড়ে গেলুম। শরৎচন্দ্রের সেই সন্ধ্যার 'শেষের পরিচয়' সম্পর্কে কথাবার্তা ভাবতে লাগলুম। আমার স্বামীও আমাকে মনে করিয়ে দিতে লাগলেন কিছু কিছু। সেই সন্ধ্যায় কিন্তু কথা হয়েছিল অনেকক্ষণ। তর্কবিতর্কও প্রথম দিকটাতে হয়েছিল বেশ কিছুটা। আমি যতটুকু এখানে লিখলুম, সেইটুকুই সব নয়। এটা তাঁর সব শেষের কথা। প্রথম দিকে অন্যরকমও বলেছিলেন। আমার মনে হয়, তিনি যা যা বলেছিলেন—সমস্তটাই বোধ হয় আমার লিখে যাওয়া উচিত। শেষের দিকে যেটি বলে আসর ভঙ্গ করে উঠে দাঁড়ালেন, শুধু মাত্র সেই সারকথাটুকুই বললে হয়ত বলার ত্রুটি থেকে যাবে।

সেদিন হরিদাসবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন—শরৎদা, এমন দেবতার মতন

স্বামী আর ভরা-সংসার ছেড়ে—কোলের শিশু সন্তানকে পর্যন্ত ফেলে—আপনার বর্ণনায় যাঁর স্বভাবে আর আচরণে মর্যাদার সীমা নেই, মহিমময়ী নারীটি—চট করে একটি বাইরের লোকের হাত ধরে সকলের চোখের সামনে—স্বামীর সামনে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে চলে গেলেন—এটা তাঁর কোন মর্যাদা আর কোন মহিমা—আমরা তো মাথা খুঁড়েও বুঝতে পারিনি। পাঠকরাও যে শতকরায় একশজনই বুঝতে পারেনি, আমি তার খবর রাখি। আপনি নিজে ওটা বুঝিয়ে না দিলেই তো নয়। কিরণময়ীকে তবু কিছুটা যদিও বোঝার আমলে আনা যায়—যদিও আমরা কিরণময়ীকে আজও বুঝতে পারিনি—কিন্তু এই 'সবিতা'টি তো কিরণময়ীকেও হার মানিয়ে উদিত হয়েছেন। কিরণময়ীর স্বামী হারাণের যথেষ্ট ত্রুটি ছিল, আর ছিল দারিদ্র্য। কিন্তু সবিতার স্বামী তো দেবতুল্য মানুষ, ধনসম্পদেরও কমতি নেই।

শরৎচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে জবাব দিয়েছিলেন—দেবতার মত স্বামী?—কে? ঐ পৌরুষহীন দুর্বল ভীরু বুড়ো বোষ্টমটি? ব্রজবাবুকে কেউই তোমরা দেখতে পাওনি। ওর ভিতরের মানুষটা পুরুষই নয়। ও নারীও নয়, পুরুষও নয়। অক্ষম ক্লীব।

সবিতার মত সবদিকে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যশালিনী নারীর পাশে ঐ পুরুষটিকে তোমাদের কি একটুও বেখাপ ঠেকছেনা? ওর গোবিন্দভক্তি আর রূপবতী যুবতী স্ত্রীর একান্ত আনুগত্য—এইতেই তোমরা উপযুক্ত স্বামীর পাসমার্ক দিয়ে দিলে? ওর মধ্যে কোনোটাই উপযুক্ত স্বামী হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে পড়েনা।

তোমরা জাননা, সেকালে মানুষ যুবতী মেয়েদের পুরুষের কাছাকাছি দেখলে—কাছাকাছি কেন, চোখে চোখে তাকাতে দেখলেও—একটাই মাত্র অর্থ করত। যুবতী মাত্রেই যেন পুরুষের খাদ্যসামগ্রী। পুরুষেরা যেন পশুমাত্র। খাদ্য সামনে রেখেও সে না খেয়ে সরে থাকবে —এ যেন অসম্ভব। সেজন্যে সেকালে যুবতীরা নিকট-সম্পর্কেরও যুবাদের থেকে অনেকটা দূরত্ব রেখে তফাৎ হয়ে চলত।

সবিতা একটি দূরসম্পর্কীয় পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, হাসি তামাশা করে—এটা পরিবারের সবাইকার চোখেই কটু ঠেকেছে। দূরসম্পর্কের পিসতুতো বোন এ ব্যাপারে মন্তব্য করায় তাকে শ্বশুরবাড়ী বিদায় হতে হয়েছে। সেই ননদের মা পিসশাশুড়ি এর জ্বালা ভোলেননি। তিনি তক্কে তক্কে ছিলেন। সেকালে কোনও নারী পুরুষ একটি ঘরে থাকলে সে ঘরে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়ে শোরগোল উঠিয়ে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করা হয়েছে, কলঙ্কিনী প্রমাণ করা হয়েছে, আমি জানি।

কে যেন একজন বললেন—কিন্তু গভীররাত্রে ঐ লোকটির ঘরে সবিতা—

শরৎদা হেসে বলেছিলেন—এমনও তো হতে পাবে লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অসুস্থ মানুষের তদারকে যে-কোনও মানুষ যে-কোনও লোকের ঘরে ঢুকতে পারে—সবিতার মত নির্ভীক মেয়ে রমণীবাবুর কোনও তদারকের জন্যে বেশি রাত্রেও ঘরে ঢুকতে ভয় না পেতে পারে—

কানাইবাবু সতীশবাবু ও আমার স্বামী বিভিন্ন প্রশ্ন তুলতে লাগলেন। —তাহলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চড়া গলায় সেইটে বললেই তো চুকে যেত। লোকটার হাত ধরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল কী?

শরৎচন্দ্র জবাব দিয়েছিলেন—সবিতার অভিমানী স্বভাব আর আত্মবিশ্বাস হয়ত দরজা খুলে বেরিয়ে নিজের নির্দোষিতার কৈফিয়ৎ ওদের কাছে দিতে রাজী হয়নি কতগুলো নির্বোধ আর হিংস্র জন্তুজানোয়ারের কাছে। হয়তবা তার নিজেব স্বামীর প্রতি নির্ভরতা এতই ছিল, যাতে সে ভেবেছিল অতিথির প্রাণ মান বাঁচাতে গিয়ে তার প্রবল অভিমানী স্ত্রী নিজেকে বিসর্জন দিতে যাচ্ছে—এটা স্বামী কখনোই ঘটতে দিতে পারেননা নিজে উপস্থিত থেকে। হয়তবা ভেবে থাকতে পারেন তিনি কখনোই স্ত্রীকে যেতে দিতে পারেননা, হাত ধরে আটকে বলবেন—তুমি কোথায় যাবে?

অতিথি রমণীবাবুকে সে-রাত্রে ক্ষ্যাপা-কুকুরদের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে বাড়ীর বাইরে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল ব্রজবাবুর। সবিতার স্বামীর। তাঁর জ্ঞাতিভাই নবীন কেন তাঁর পরিবারের মর্যাদাব, তাঁর স্ত্রীর আব অতিথিব ভবিষ্যতের ভার নিল? তিনি নিশ্চেষ্ট নির্জীব হয়ে বসে রইলেন কেন? কেন নবীনকে সবিয়ে দিয়ে বললেননা —তুমি সরে যাও —আমি দেখছি।

হরিদাসবাবু প্রতিবাদ করে প্রতিপ্রশ্ন তুলেছিলেন অনেক। নিরীহ ব্রজবাবু কিছুমাত্র দোষী নন, এইটেই বলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু খুব ভয়ে ভয়ে সাবধানে আর কুণ্ঠিত গলায় এক আধটা করে প্রশ্ন তুলছিলেন।

তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তর্ক করার মত সাহস বা প্রেবণা কারুর মধ্যেই ছিলনা। তখন যেন উনি অন্য একজন মানুষ। আমাদের সদা সর্বদাব চেনা বড়দা মোটেই নন। চোখের চাউনি তীব্র, কণ্ঠস্বর পর্যন্ত অন্য এক রকম। রাগ নয়, উত্তেজনাও নয়, স্থিব অবিচল ঠাণ্ডা গলার স্বর। মুখের ভাব-ব্যঞ্জনায় কেমন যেন ক্ষোভ—না —বিদ্রূপ? এরকম গলার স্বর, মুখের ভাবব্যঞ্জনা, চোখের অদ্ভুত চাউনি—এমনকি, গলার স্বর পর্যন্ত অন্যরকম হতে সত্যিই আগে কখনও দেখিনি।

হরিদাসবাবুর কথার জবাবে তিনি বলেছিলেন—ঐ রকম সিচুয়েশনে মানুষ হঠাৎ কী যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে—সে নিজেই তা কি জানে? স্বামীব উপরে নির্ভর করেই যে সে বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে ভরসা করেছিল—এমন তো আশ্চর্য নয়। ব্রজবাবু কেঁদে উঠে বললেন—'নতুন বৌ—তোমার রেণু রইলো যে,—কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাব?' এই কি পুরুষমানুষ? এই কি স্বামী? এই কি পরিবারের কর্তা?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি বলেছিলেন—ঐ ব্যাপারটা আমি যে ঐ অর্থেই লিখেছি তা নয়। ইচ্ছে করলে কেউ এদিক দিয়েও ভাবতে পারে। ভাববার আছে।

এমনও হতে পারে—অশেষ গুণবতী, বুদ্ধিমতী ভরাযুবতী নারীটির কাছে হয়ত

ভগবদ্‌ভক্ত নিরীহ বৃদ্ধটি উপযুক্ত পুরুষ ছিলনা। জৈবিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা এমন ব্যাপার একে বুদ্ধি আর নীতিজ্ঞান সব সময়ে রোধ করতে পারেনা। মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠও এর কাছে পরাজয় মেনেছেন। স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্যন্ত। ঋষি মুনিরা তো জ্ঞানের খনি শুধু নয়, সংযম নিয়ম নিষ্ঠার প্রত্যক্ষ আদর্শ ছিলেন তাঁরা—তাঁদেরও জীবনে প্রকৃতির মারের খবর ভূরি ভূরি শাস্ত্রে পুরাণে লেখা আছে। কিন্তু, তার জন্যে কি তাঁরা 'বাতিল' মানুষ হয়ে গেছেন? মোটেই না। কোন পুরুষই প্রকৃতির ঝড় ঝাপটায় বাতিল হয়ে যায়না। হয় শুধু মেয়েরাই।

হরিদাসবাবু আমাকে বলেছিলেন—বইতে শরৎদার অভিমত আর পরিকল্পনা—যতটা পার, রাখবার চেষ্টা কোর। ওঁর অনেক জিনিস হয়ত আমাদেব মনে ঠিক খাপ খায়না, আমাদের ভাল না লাগুক,—তাঁর বইতে আমাদের অভিমত বা ধারণা না ঢোকানই ভাল। হরিদাসবাবু হাসতে হাসতে কৌতুক কবে বলেছিলেন—তোমাকে তিনি স্নেহ কবতেন রাধা, তুমি মনে মনে তাঁকে স্মরণ কবে লিখতে শুরু কবে দাও,—দেখো, প্ল্যান্‌চেটে নামার মতন তোমার কলমের নিবে শরৎদা নেমে এসে ঠিক নিজের লেখা নিজে শেষ করে যাবেন। তুমি ভয় পেওনা।

হরিদাসবাবু খুব কৌতুকপ্রিয় মজলিশী মেজাজের মানুষ ছিলেন। আমার মনে সাহস দিতে এই কথাগুলি তিনি সম্পূর্ণ কৌতুক করেই বলে গেলেন আমি বুঝলুম। কিন্তু—আমার মাথায় সেটা গভীরভাবে ঢুকে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল।

কলম ধরলুম। শরৎদার মুখে-শোনা পয়েন্টগুলি, চরিত্রের ব্যাখ্যাগুলি, মনে করে করে লিখে ফেললুম খাতায়। সে-খাতা এখনও আছে। আমার স্বামীও সেই মনে করে কথা তোলার কাজে সহায়তা করেছিলেন। হরিদাসবাবুও মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

তার পরের সাধনা হল আমার—কী করে রাধারাণী নামটা অদৃশ্য রেখে, তার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র না রেখে, শরৎদার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। কোনোখানেই যেন অন্যের হাতের ছাপ না থাকে।

যত্ন করে সাধনা করলে মানুষ নাকি ভগবানকেও লাভ করতে পারে,—এ তো একটি শিল্পনৈপুণ্য মাত্র। আমি শেষের পরিচয় বইখানির সমাপ্তিকরণে নিজেকে নিশ্চিহ্ন রাখার সাধনায় যে কিছুটা সিদ্ধিলাভ করেছিলুম তার খবর হরিদাসবাবুর মুখেই পরে পেয়েছি। হরিদাসবাবু খুশী হয়ে বলেছেন,—রাধা, আমি সবাইকেই বলচি, 'শেষের পরিচয়' কোন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের লেখা আর কোথা থেকে রাধারাণীর লেখা এর ভেদ দেখিয়ে দিতে হবে। কিন্তু, কেউই পারে না। অনেকেই আমার কাছে খবর নিতে আসছে, শরৎচন্দ্র কত চ্যাপটার পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' শেষ লিখে গেছেন। ঐখানে তোমার লেখা সার্থক হয়েছে। কোথায় তালি পড়ল কেউ ধরতে পারেনা।

স্বামী পরিহাস করে বলতেন—মেয়েমানুষ কিনা, তাই রীপুকর্মটা বেশ ভালই করেছ।

আজ অনেক বছর বাদে বইখানা বার করে খুলে দেখতে হল বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্যে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম—এই লেখা কি আমারই? এইরকম লেখা এখন কি আমি লিখতে পারব? না। কখনই পারবনা। এইরকম ভাষা ভঙ্গী তো নয়ই, এর ভিতরকার বস্তুও যা আছে, এখানেও তো আমার নিজের কোনও অস্তিত্ব নেই। এর মতামত আমার নিজের মতামত নয়, উচ্চারণও আমার নয়। কী করে এমন হল? আমি কোনও অলৌকিকত্বে বিশ্বাস রাখিনা, একমাত্র বিশ্বের মূল কারণ যিনি, —সেই ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া। প্ল্যানচেট আমার কাছে ছেলেভুলোন খেলনা মনে হয়। তাহলে এটা সম্ভব হল কেমন করে?

মনে ভেবে দেখলুম, সে-সময়ে শরৎদার মৃত্যুর আকস্মিকতা আমাকে খুবই অভিভূত করেছিল। আমি একটুও প্রস্তুত ছিলুমনা তিনি সত্যিই এত শীঘ্র পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন। সে-সময়ে আমি আমার কন্যার জন্মের সূত্রে সূতিকাগারে বন্দী ছিলুম। শরৎদাকে শেষ দেখা দেখতে পাইনি। তাঁর নার্সিংহোমে যাওয়া পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আমার স্বামী সর্বদা নার্সিংহোমে ছুটোছুটি করতেন। শরৎদার অন্তিমমূর্তিও আমি চোখে দেখতে পাইনি। ধাক্কাটা তাই মনে দারুণ লেগেছিল। সেই অভিভূত মন নিয়ে একান্তভাবে তাঁরই মনের চিন্তাগুলি ভাবতে ভাবতে লেখার কাজে হাত দিয়েছিলুম। অত্যন্ত সাবধানতা ছিল নিজের কথা, নিজস্ব কণ্ঠস্বর কোনোখানে যেন ঢুকে না পড়ে। তদ্‌গত চিত্তে, তন্নিষ্ঠ মনে 'শেষের পরিচয়ে' হাত দিয়েছিলুম বলেই হয়ত এমন ব্যাপার সম্ভব হয়ে থাকবে। যা আজকে লিখতে হাজার চেষ্টা করলেও কখনও সম্ভবপর হবেনা। তাই আমি বলতে চাই, 'শেষের পরিচয়' বইখানির ভিতরে বাইরে কোথাও রাধারাণী দেবীর অস্তিত্ব নেই। বই প্রকাশের সময় আমি বলেছিলুম আমার নাম না দিয়ে এটি ছাপলে ভাল হয়। হরিদাসবাবু বলেছিলেন—তা হয়না। তিনি যে লেখা শেষ করে যেতে পারেননি সবাই জানে। তবে, বইয়ের মলাটে তোমাব নাম দেবনা, ভয় নেই। ভিতরে আমাদের তরফ থেকে লিখে দেব একটু ভূমিকা মতন।

সেই ভূমিকায় তিনি সংক্ষেপে লিখেছিলেন—"রাধারাণী দেবীকে 'শেষের পরিচয়' শেষ করিয়া দিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি। কারণ, শবৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার এই অসমাপ্ত রচনা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবার সুযোগ ইনি লাভ করিয়াছিলেন।"

বইটি লেখার অন্তরালপটের বৃত্তান্ত এখানে শেষ হল।

২২

'শেষের পরিচয়' নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। শুধুমাত্র ঐ উপন্যাসটিকে বোঝবার জন্যে নয়, সমগ্র শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রের মূল্যায়ন করতে হলে এই চাবিকাঠিটি হাতে নিয়ে এগুনো দরকার। নারীর শেষের পরিচয় একটিই,—সে-পরিচয় তার অন্তর্গূঢ় মাতৃত্বের।

শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনা—যা সবিতাচরিত্রের পিছনে রয়েছে, সেই দিকে একবার তাকাতে হবে। দেখতে হবে, এদের সঙ্গে সবিতাচরিত্রের যোগ কোথায়? এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমে যাব শরৎচন্দ্রের এপিক উপন্যাসে। 'শ্রীকান্ত' অসংশয়ে শরৎচন্দ্রের সমগ্র শিল্পকর্মের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। তাঁর শক্তির বৈশিষ্ট্য 'শ্রীকান্ত'র বিভিন্ন পর্বে বিধৃত আছে। তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত আমি দেখতে পাই, টুকরো টুকরো চকিত দৃশ্যে তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার নানান ছবি। তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে আছেন লেখক তাঁর হৃদয়ানুভূতি নিয়ে। জীবনে থেকেও, জীবন থেকে অসম্পৃক্ত হয়েই কিন্তু তাঁর এই বাস্তবজীবনানুভূতির লীলা। তাই একে মোটা আঁচড় দিয়ে জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্থূলতায় মিলিয়ে যাঁরা দেখতে চাইবেন তাঁরা ঠকবেন, ভুল করবেন।

আমার ধারণা, 'শ্রীকান্ত' প্রথম থেকে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত তাঁর ঘটনাগত জীবনের প্রতিবিম্ব,—চতুর্থ পর্বটি ঘটনাগত জীবন থেকে দূরে—কেবলমাত্র তাঁর মানসজগতের —তাঁর আদর্শের বা ইচ্ছা-জগতের প্রতিবিম্ব। 'শ্রীকান্ত' শেষ পর্বটি আমাদের সামনে লেখা। তখন তাঁর মনের অবস্থাটি নিস্পৃহ ঔদাসীন্যে ভরা। সংসারে কোনও কিছুরই স্থায়িত্ব নেই, মানুষ একমাত্র নিজেরই মনের মধ্যে আশ্রয় পেতে পারে, বাইরে কোথাও নয়, এই কথাই বেশি সময় বলতেন। বলতেন—আমার বিশ্বাসের মোড় ঘুরে গেছে। এবারে যা যা বলে যাব, তা আগের সঙ্গে মিলবেনা। অভিজ্ঞতাই তাঁকে মোড় ফিরিয়েছিল। তৃতীয় পর্ব 'শ্রীকান্ত'য় রাজলক্ষ্মীর একটা মোড় ফেরা দেখতে পাই। মোড়টা ফিরে যাওয়ার পরে এসেছে 'শেষের পরিচয়ে'র সবিতাচরিত্র। কিন্তু নারীর শেষের পরিচয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন 'শ্রীকান্ত'রই মধ্যে শরৎচন্দ্র।

'সমস্ত রমণীর অন্তরে নারী বাস করে কিনা, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্ব এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।' (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব, ১৪ অধ্যায়)

এই মাতৃত্বের চেহারাই শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্রের মৌল রূপ। কি প্রেমে, কি স্নেহে, পুরুষের সঙ্গে নারীর সম্বন্ধ একটিই। পুরুষ খোঁজে আশ্রয়, নারীর আছে কোল। শেষদিকে শরৎসাহিত্যের নারী পরিণতমনা, পূর্ণ—আত্মনির্ভর, স্বাধীনচিত্ত। অবশ্য, প্রথমদিকেও শরৎসাহিত্যের নারী পুরুষশাসিত নয়। তারা বহিরঙ্গে বৃহৎ সমাজের কাছে বাহ্য অর্থে বন্দী বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কোনও পুরুষেরই ইচ্ছার কাছে তাদের নিজেদের ইচ্ছা পদানত নয়। পুরুষের কাছে শরৎচন্দ্রের নারী বাইরের অবলম্বন প্রার্থনা করে, নেয় বহিরঙ্গের আশ্রয়, কিন্তু তারপরে সে পুরুষকেই নিজের হৃদয়ের অন্তরঙ্গ গভীর আশ্রয়ে তুলে নেয়।

নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে শরৎসাহিত্যে নারীরাই নায়ক, অর্থাৎ মূল চরিত্র। তারা সহচরিত্র নয়, নায়িকামাত্র নয়। শরৎসাহিত্যের নারী ভিতরে ভিতরে স্বাধীন। শক্তিতে ও তেজে, দোষে-গুণে, পাপে-পুণ্যে মানবিকতার দিক দিয়ে বেশি সম্পূর্ণতা পেয়েছে নারীচরিত্রগুলিই।

এককালে সিনেমায় 'দেবদাস' বইয়ের তুমুল জনপ্রিয়তার ফলেই কিনা জানিনা, —বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি চলতি-ধারণা আছে—শরৎচন্দ্রের নায়ক এবং নায়িকারা সকলেই সেন্টিমেন্টাল মেয়েলীপনায় আর কান্নায় ভরা। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু শরৎসাহিত্যে খুব বেশী এমন মেয়েলী মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়না। সেন্টিমেন্টালিটির দুর্বলতাটা যেন পুরুষেরই চরিত্রে বরং কিছুটা ফুটেছে।

. মেয়েরা পাখা হাতে পুরুষকে খেতে বসায়, মাথার দিব্যি দিয়ে আরও দুটো লুচি বেশি খাওয়ায় এটা ঠিকই ; কিন্তু তারা অন্যের কথা শোনেনা। অন্যের নির্দেশ বহন করেনা। মেয়েরা শুধু যে নিজেরাই নিজেদের ইচ্ছাশক্তিতে চলে তা নয়, তারা পুরুষদেরও তাদেব মনের নেপথ্য থেকে অবলীলায় পরিচালনা করে। নারীসুলভ কোমল মাধুর্যের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের নায়িকারা কঠিন, জেদী আর অঘোষিত বিদ্রোহী। মোটামুটি বেশ কতগুলি চরিত্রের নাম করা যায় সহজেই। মাধবী ও অপর্ণা থেকেই শুরু করা যেতে পারে। বিন্দু, বিরাজ, কুসুম, হেমাঙ্গিনী, বাজলক্ষ্মী, অভয়া, সুনন্দা, অচলা, অলকা, কিরণময়ী, সাবিত্রী এরা একজনও অন্যের ইচ্ছায় চালিত হওয়ার মত ধাতুতে তৈরী নয়। এদের ধাতুই স্বাধীন ; স্বতঃসুদৃঢ়। যদিও নারীসুলভ মাধুর্য ও মমতা এদের একটুও কমতি নেই, বরং অনেকক্ষেত্রে বাড়তিও দেখা যায়।

শ্রীকান্ত বলছে—'এই ধরনের কথা বলায় রাজলক্ষ্মীর জোড়া কোথাও দেখি নাই। নিজের ইচ্ছাকেই জোর করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবার কটুতাটুকু সে স্নেহের মাধুর্যে এমনিই ভরিয়া নিতে পারিত যে, সে-জিদের বিরুদ্ধে কাহারও কোন সংকল্পই মাথা তুলিতে পারিত না।...বহুবার দেখিয়াছি, তাহার ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলিবার শক্তি শুধু আমিই পাই নাই তাহা নয়,—কাহাকেও কোনদিনই খুঁজিয়া পাইতে দেখি নাই।' (৩য় পর্ব, ১৪ অধ্যায়)

সবিতার বিষয়েও ব্রজবাবুকে বলতে শুনি এই একই কথা। 'রেণু, তোমার নতুন মার মেয়ে। সংসারে একমাত্র আমি আর ভগবান ছাড়া কেউ জানে না ওর মায়ের জেদ কেমন ছিল। তাকে নিজের সমস্ত জীবনটাই তছনছ্ করে বলি দিতে হয়েচে শুধু জেদেরই পায়ে। জেদ যদি তার চড়ত, তা' ভাঙার শক্তি অন্য লোকের ত ছিলই না, তার নিজেরও ছিল না।' অথচ, ব্রজবাবুরই মুখে শুনি,—'নতুন বৌয়ের মত তেজস্বিনী সৎপ্রকৃতির ও সচ্চরিত্রের মেয়ে সংসারে অতি অল্পই হয়।'

সুনন্দার সম্পর্কেও শ্রীকান্তর মুখে শুনি--'একটির অধিক সুনন্দা এদেশে আমার চোখে পড়ে নাই', আমরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখি—সেই মেয়েটি—'শুধু একটা কঠোর অন্যায়ের ততোধিক কঠোর প্রতিবাদ করিতে, সমস্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে, একখণ্ড জীর্ণ-বস্ত্র ত্যাগ করিবার মত। মনস্থির করিতে একটা বেলাও লাগে নাই। অথচ কোথাও কোন অঙ্গে ইহার কঠোরতার চিহ্ন নাই।' (৩য় পর্ব, ৮ম অধ্যায়) —আমাদের সন্দেহ হয়, 'শেষের পরিচয়ে' সবিতার গৃহত্যাগের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কথাগুলি বলা চলত।

এই সুনন্দা সম্পূর্ণ স্বাধীন নারী। সে উচ্চশিক্ষিতা অথচ নম্র। সে সত্যবাদী এবং বিনয়ী। কিন্তু, সে-ই তার শ্বশুরকুল কুশারী-পরিবারের সকল সুখ আনন্দ ধ্বংস করে দিয়েছে জেদের বশে। এই বিদ্রোহী সুনন্দার অনম্য ইচ্ছার কাছে মাথা নত করতে হয়েছে তার শ্বশুরকুলের সকলকে। শ্রীকান্তর মুখে শুনি—'স্বামী পুত্র নিয়ে সে দিনের পর দিন শুকিয়ে মরবে, তবু এর কড়াক্রান্তি ছোঁবে না।' যেহেতু, তা পাপের সম্পদ।

সুনন্দার পরিচিতি দিতে গিয়ে আমরা ঠিক ফিরে আসছি শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের কেন্দ্রমূলে—'সুনন্দা তাহাকে দেখাইয়া বলিল, "ছেলেমানুষ কিরকম! ওই অত বড় ছেলে যার,—তার বয়স বুঝি কম!"...উনিশ-কুড়ি বছরের শ্যামবর্ণ এই মেয়েটি নির্জন গৃহের মধ্যে একটা সতেরো আঠারো বছরের ছেলের এতই সহজে ও অবলীলাক্রমে মা হইয়া গিয়াছে যে শাসন ও সংশয়ের দড়িদড়া দিয়া তাহাকে বাঁধিবার কল্পনাই জাগে না।' (৩য় পর্ব, ৮ম অধ্যায়)

এই সহজে অবলীলায় মা হয়ে যাওয়াব সঙ্গে ওই দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তির একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। নারীর 'শেষের পরিচয়' এইখানেই।

সর্ব অবস্থাতেই সে মা হয়ে উঠতে পাবে। যেখানেই যাক, যত নীচেই নামুক, তার মাতৃহৃদয় ঠিক উপরে ভেসে উঠবে। শরৎচন্দ্রের প্রিয় নায়িকাদের মধ্যে প্রধান গুণ—আত্মিক মুক্তি, স্বাধীন চেতনা, নিজের মধ্যে শুভাশুভ জ্ঞানের স্থিরতা,—যা সমাজ সংসারের নিয়মকানুনেব উপর নির্ভর কবে এবং করেওনা। ইচ্ছার দৃঢ়তা, —নারীসুলভ কোমলতায় ঢাকা থাকে। রবীন্দ্রনাথেব রাজার পতাকাতে যে-চিহ্নটি ছিল —'পদ্মের মাঝখানে বজ্র', শরৎচন্দ্রের প্রিয় নায়িকারা আমার চোখে ঠিক তাই। এই সকল শক্তিগুলির মাঝখানে গ্রন্থিস্বরূপ আছে তার মাতৃহৃদয়। নারীব যাবতীয় শুভ শক্তির উৎসই হল নারীর মাতৃত্বপ্রবণতা,—তার সব জোর সেইখানে। সেইখানে সে জীবধাত্রী, জীবপালিকা। যে নাবী জগদ্ধাত্রী, তাকে শক্ত না হলে চলবে কেন।

সহজ পথে, শুদ্ধাচারে, সমাজের আশ্রয়ের মধ্যে থেকে নিয়মমাফিক মা হওয়া এক। আর কঠিন বাধাবিঘ্ন, নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে গিয়েও যে-নারী তাব অন্তরীণ মাতৃমূর্তিটি খুইয়ে ফেলেনা, সেই শরৎচন্দ্রের নায়িকা হবার যোগ্য। পিয়ারী বাইজীর সেই যোগ্যতা ছিল ; সে রাজলক্ষ্মীই শুধু নয়, সে সবার প্রথমে ও সবার শেষে 'বঙ্কুর মা'। এই মাতৃত্ব অর্জন করতে হয়েছে তাকে—এটা সে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হতে পায়নি। তাই এর মূল্যের মান আলাদা।

শ্রীকান্তের কাছে রাজলক্ষ্মী সবচেয়ে বড় হয়ে উঠছে যে-মুহূর্তে, সেই মুহূর্তটিতে সে শ্রীকান্তের প্রাণদায়িনী, বাল্যসঙ্গিনী 'লক্ষ্মী' নয়, সেই মুহূর্তে সে 'বঙ্কুর মা'।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে পাটনায় থাকতে দিচ্ছেনা—কেননা, তার সতীনপুত্র বঙ্কু কিছু ভাবতে পারে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তর মুখে বলছেন—

'মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায়, যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম।...সংসারে সব দিক দিয়া সর্বপ্রকারেই স্বাধীন...তবুও সে যে-মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শতপাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।...সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সামনে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না।...মনে মনে কহিলাম রাজলক্ষ্মীকে আর তো আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না।...উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবার বেগে ধাবিত হইতেছিল তাহাতে তো সংশয় নাই। কিন্তু, আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ 'বঙ্কুর-মা' অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথরুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।' (২য় পর্ব, ১২ অধ্যায়)

'শেষের পরিচয়ে' একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে ঠিক একইভাবেই সবিতাকে কথা বলতে শুনি। যেখানে সবিতা 'নতুন বৌ' সম্বোধন করতে মানা করে দিচ্ছেন বিমলবাবুকে।

"—বিপুল সংকোচ সবিতা প্রাণপণে ঠেলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—আমাকে 'রেণুর মা' বলে ডেকো। বিমলবাবু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'সত্যি, ভারী সুন্দর। আমি অবাক হয়ে যাচ্চি এই ভেবে, তোমার এত বড় পরিচয়টা এতদিন আমার মনে হয়নি কেন বল তো?' এই বড় পরিচয়টিই হল কুলত্যাগী মা সবিতার শেষের পরিচয়।

ব্রজবাবুর দ্বিতীয়পক্ষের নতুন বৌ, রমণীবাবুর উপপত্নী, বিমলবাবুর মানসপ্রতিমা, রাখাল-তারক-সারদার নতুন মা,--সবার শেষে রয়েই গেলেন রেণুর মা। শেষেব পরিচয় গ্রন্থের সমাপ্তি রেণুর মৃত্যুতে। বিমলবাবু এবং সবিতার মিলনের মধ্যেও সেই একই 'অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথরুদ্ধ করিয়া' রেণুর মা এসে দাঁড়িয়েছে। রেণুর মৃত্যুতে বৃদ্ধ অসহায় ব্রজবাবু নিঃসঙ্গ হয়ে গেলেন। রেণুর জায়গায় রেণুর বদলে সেই অশক্ত রুগ্ন বৃদ্ধকেই বুকে তুলে নিলেন, কোলে আশ্রয় দিলেন রেণুর মা,—সবিতা। বিমলবাবুর সেখানে স্থান নেই, প্রয়োজনও নেই।

আমরা দেখছি, শরৎচন্দ্রের নারীর এই মাতৃরূপ বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধা, সুদৃঢ় মূল্যবোধ ছিল। নারীত্বকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় মণ্ডিত করার জন্য তিনি নারী-ব্যক্তিত্বের এই দিকটি উন্মোচন করেছেন বার বার। মমতা ছিল পুরুষ-ব্যক্তিত্বের অসহায়তা, শিশুসুলভ আশ্রয়মুখীনতা সম্পর্কে। কিন্তু যেখানে পুরুষের মধ্যে আশ্রয়লোভী শিশুর চেয়ে আসঙ্গলোভী জীবটি বেশী বড় হয়ে উঠছে—সেইখানেই যেন আসছে বাধা। মায়ের অস্তিত্বই মস্ত বড় হয়ে উঠে প্রিয়ার কণ্ঠরোধ করছে। কণ্ঠরোধ করছে নারী-পুরুষের সহজ কামনার, মিলনের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—অন্তর্নিহিত 'মা'।

শরৎসাহিত্যে প্রথম থেকেই এই মাতৃহীন নায়ক আর স্নেহপ্রবণা মাতৃস্বরূপা নায়িকাকে দেখতে পাই। রাজলক্ষ্মী চালচুলোহীন শ্রীকান্তকে নিজের ইচ্ছেয় চালনা করে বটে, কিন্তু তাকে যত্ন করে মায়ের মত করেই। সেবা করে, ভার গ্রহণ করে

দু' দুবার প্রাণ ফিরিয়ে এনেছে তার। নবজন্মদাত্রী—মায়ের মতই সে হয়েছে শ্রীকান্তের প্রাণদায়িনী।

অভয়াও নিজের ইচ্ছায় দৃঢ় অটল। জাহাজে প্রথম থেকেই সে শ্রীকান্তের উপর নিজের ইচ্ছে সোজাসুজি চাপায়। অভয়ারই ইচ্ছেয় শ্রীকান্তকে কোয়ারেণ্টিনে ঢুকতে হয়। সেই অভয়াই দেশজোড়া প্লেগের সময় রুগ্ন শ্রীকান্তকে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ঘরে তুলে নিয়ে সেবা করে বাঁচায়। এও এক নবজন্মদান। এই যে দৃঢ়তা আর মমতার সম্মিলন, এই কঠোরতা ও কোমলতার ভারসাম্যই শরৎচন্দ্রের নারীর শেষ পরিচয়। চূড়ান্ত পরিচয়। এই বিশ্ব-মানবসমাজ যদি মাতৃতন্ত্রে চলত, শরৎচন্দ্র হয়ত তৃপ্ত হতেন। মেয়েরা প্রকৃতির কাছাকাছি, তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শুভবুদ্ধি, সততা এবং হৃদয়বুদ্ধির ভারসাম্যটা বেশী থাকে,—এমনটি হয়ত তিনি বিশ্বাস করতেন। জন্ম যারা দেয়, রক্ষাও তারাই করে। শরৎচন্দ্রে পুরুষরা প্রায়ই দায়িত্বহীন, উড়নচণ্ডে, অসামাজিক এবং অপরিণত। অথচ তারা 'বিদ্রোহী' নয়। তারা জেনেশুনে মন ঠিক করে সমাজের বিরোধিতা করেনা। সেটা করে মেয়েরা। সে-সাহস রাখে মেয়েরাই। শরৎচন্দ্রের নারীরাই পরিণত মনুষ্যত্বের উদাহরণ।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বহুদিন গঙ্গামাটিতে বাস করার পরে বলে, তার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী আছে, কেবল সম্ভ্রম ছাড়া। রাজলক্ষ্মীকে সামাজিকভাবে পত্নীর পরিচয় দিতে, সন্তানের মাতৃত্ব দিতে শ্রীকান্তের বুকে বল নেই। রাজলক্ষ্মীকে হারাতে হবে বুঝেও সে-সাহস তার হচ্ছেনা। অথচ, রাজলক্ষ্মীর খরচেই বহুকাল জীবনধারণ করে আছে সে,—তাতে তার সম্ভ্রমের অসুবিধে হয়নি।

'তোমাকে কিছুই ত্যাগ করতে হবে না—রাজলক্ষ্মী কেবল বলে—তোমাকে এত দিন যা ভাবতুম, এখন দেখচি তুমি তা নও।'

নিয়তির কৌতুকে শ্রীকান্তের বোধোদয় ঘটে ;—রোগে পড়ে অবস্থার চাপে পড়ে। রাজলক্ষ্মীই এসে লোকবলে, অর্থবলে তাকে পুনরায় জীবন দেয়। জীবনের এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পরে শ্রীকান্ত মনে মনে বলে—'আমার সত্যে কাজ নাই। আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব।'—এখানে শ্রীকান্তর মনের মধ্যে 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' শব্দ দুটি কেবলমাত্র সামাজিক ব্যাকরণের অধীন। মনুষ্যত্বের ব্যাকরণে শ্রীকান্তর চেয়ে কিন্তু রাজলক্ষ্মীর দক্ষতা ঢের বেশী। তার 'সত্য' এবং 'মিথ্যা' একেবারে অন্য নিয়ম মেনে চলে। সেটা হৃদয় এবং ভিতরের বিবেকের নিয়ম। বাইরের সমাজের মুখস্থ-করান নিয়ম নয়।

এর পরে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে নিজের স্ত্রী পরিচয় দেয়। এ-পরিচয় যদিও শ্রীকান্তর কাছে মিথ্যা,—কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কাছে তা নয়। রাজলক্ষ্মীর কাছে তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

তাই, যখন শ্রীকান্ত বেঁচে থাকতেও রাজলক্ষ্মী কেশ-বেশ ফেলে দিয়ে বিধবার রিক্ত সাজে সর্বত্যাগিনী চিহ্নিত হয়ে কাশীবাসিনী হল,—তখন রাজলক্ষ্মীরই পক্ষে

এটা যে কত বড় অভিমানের ভাষা,—এ যে তার নিজেরই অন্তরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নিজের সত্যকে অস্বীকার করা,—এটা কিন্তু পুরুষ শ্রীকান্ত বুঝতে পারেনি। রাজলক্ষ্মীকে বাইরে থেকেই সে বরাবর বিচার করেছে, তার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি কোনও দিন। আবারও বাইরে থেকেই ধাক্কা খেয়ে তাই ফিরে গেল অভয়ার উদ্দেশে।

জীবনের বাইরের স্তর আর ভিতরকার স্তর, এই দুটো স্তরের জীবন নিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে খেলা করে গেছেন। পুরুষেরা প্রায়ই নারীর অন্তরের গভীরতম গোপন স্তরটির পরিচয় পায় না। তারা বাইরের আচরণ, মুখের বাক্য নিয়েই ভুল বিচার করে বসে। নারীর অন্তর্নিহিত অভিমান পুরুষেরা প্রায়ই ছুঁতে পারে না, ফলে বোঝার ভুল হয় তাদের। 'শেষের পরিচয়' বইতে সবিতার চরিত্রেও একটি নিঃশব্দ অথচ প্রবল অভিমান অদৃশ্যভাবে সক্রিয় রয়েছে।

২৩

শক্তিমান ঔপন্যাসিক জগদীশ গুপ্ত 'শেষের পরিচয়' বইয়ের ঘটনাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে গেছেন একান্ত ঘটনাগত ভাবে। সমালোচনাটির দৃষ্টি সম্পূর্ণ বহির্নিবদ্ধ।

তাঁর বিচারে—

'বইখানা পড়িতে পড়িতে যে একটা ক্লেদাক্ত, অর্থাৎ অসাধু অনুভূতি, প্রায় শেষ পর্যন্তই নিরবচ্ছিন্ন এবং নিবিড়ভাবে চলিতে থাকে, 'শেষের পরিচয়'-এব প্রথম পরিচয় সেইটাই।' সমালোচক পাকা কাঁঠালের খোসার উপর দাঁত বসিয়ে আহত হয়ে—তাঁর দুঃখকর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জনসমাজকে সাবধান করেছেন, তাঁরা যেন ভুল করে পাকা কাঁঠাল আস্বাদ করতে গিয়ে ঠকে না যান। অনেক শিল্প আছে, নারকেল, কাঁঠাল, বেদানা, আনারস, বাদামের মত। এদের বাইরের বর্ম ভেদ করতে না জানলে, ভিতরের স্বাদের খবর পাওয়া সম্ভব নয়। শিল্পেও এই একই ব্যাপার লক্ষ করা যায়। সব শিল্পই আঙুর, আপেল, কলার মত সহজে আস্বাদন করা যায়না। কতক শিল্পের স্বাদ গ্রহণ করতে হলে একটু খাটতে হয়; খোলা ভাঙতে, খোসা ছাড়াতে হবে। ভুল জায়গায় দাঁত বসালে আহত হওয়া স্বাভাবিক।

জগদীশ গুপ্ত মশায়ের সমালোচনাটি শিল্পের মলাটের সমালোচনা মাত্র, ভিতরের পাতা তিনি খুলে দেখেননি। তাঁর নিজের লেখা উপন্যাসে বোঝা যায়, মানবচরিত্রের অলিগলি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল। শ্রদ্ধা নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলে তিনি এমন বিভ্রান্ত সমালোচনা করে যেতেননা। অশ্রদ্ধাশীল উদ্ভ্রান্ত পাঠক হয়ত খুব বেশী নেই, তবুও আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্রের নতুন সমালোচনা হওয়া উচিত। তাঁর লেখার নতুন মূল্যায়ন হওয়া বাংলার সাহিত্যের পক্ষে একান্ত জরুরী।

'শ্রীকান্ত' তৃতীয় পর্বের দশম অধ্যায়ে অভয়ার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য এখানে স্মরণীয়;—'দেহের ক্ষুধা, যৌবনের পিপাসা এইসব মামুলি ও প্রাচীন বুলি দিয়া সেই

অভয়ার জবাব হয় না। পৃথিবীতে কেবলমাত্র বাহিরের ঘটনাই পাশাপাশি লম্বা করিয়া সাজাইয়া সকল হৃদয়ের জল মাপা যায় না।'

শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনেও বাইরের ঘটনাগুলি পাশাপাশি সাজিয়ে দেখলে মূল মানুষটিকে যে খুব সহজে মাপতে পারা যায়, তা নয়। তাঁর হৃদয় তিনি উহ্য রাখতেন। সাধারণত কথাবার্তায় বা আচরণে তাঁর ছোঁয়া পাওয়া যেতনা। 'শেষের পরিচয়ে' সবিতার চরিত্রও তাই। তাঁরও জীবনের বাইরের ঘটনাগুলির মামুলি হিসেব দিয়ে মেপে দেখলে বিভ্রান্ত সিদ্ধান্তে আসার সম্ভাবনা খুব বেশী।

শরৎচন্দ্রের অন্য সব বইয়েব তুলনায অসমাপ্ত রচনা বলে 'শেষের পরিচয়' নিয়ে আলোচনা বিশেষ কিছুই হয়নি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের ধাবা'তে একটি বিস্তৃত আলোচনা আছে। আলোচনাটি গভীর এবং মূল্যবান। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের 'শরৎচন্দ্র' বইতেও এই উপন্যাসটির আলোচনা আছে—কেবলমাত্র যে-অংশটুকু 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হযেছিল সেই প্রথমাংশটুকুর। আমাব মনে হয় তাঁর এই আলোচনাটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও খাটে। তাঁর বিশ্লেষণটিতে শরৎচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ধরা পড়েছিল বলেই আমি মনে করি। একটা ব্যাপার কিন্তু জগদীশ গুপ্ত মশায় ঠিকই ধরেছিলেন, যৌন সমস্যা লুকিয়ে আছে উপন্যাসটির কেন্দ্রে, কিন্তু 'ক্লেদাক্ত' এবং 'অসাধু' লাগার মত মামুলি করে শরৎচন্দ্র যৌনতাকে উপস্থিত করেননি। যে-কারণে সবিতা বারবার চেষ্টা করেও গৃহত্যাগ করার কারণ কিছুতে মুখে আনতে পারেনা। ব্রজবাবুকে সে বলে—'মুখেও বলব না, চিঠিও লিখব না, তুমি আপনিই বুঝতে পারবে।' যৌনতা মানুষের জীবনে এমনই একটি অস্পষ্ট, বহস্যময় আবৃত দিক—যা মানুষের নিজের কাছেও হয়ত সব সময়ে স্পষ্ট নয়। যাব জন্যে আপাদমস্তক মর্যাদায় মোড়া এই অভিজাত, সৎ, শুদ্ধ অন্তঃকরণের মহিলাটি স্বেচ্ছায় অসতী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। জীবনের প্রার্থিত ও প্রিয়তম সমস্ত কিছু ত্যাগ করে তের বৎসর এক ঘৃণিত ব্যক্তির শয্যাসঙ্গিনী হয়ে কাটান সবিতার মত মানুষেব পক্ষে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে? সবিতারই মুখে শোনা যায়—'আমারই বা এত বড় দুর্গতি ঘটল কেন? এর উত্তর অনেকদিন অনেকরকম ভেবে দেখেছি, কিন্তু আমার গত জীবনের কর্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব খুঁজে পাইনি...আর এক জন্মের অজানা কর্মফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ জন্মের ভাঙা-বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি, এমন অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলকধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার কবেছে বলো তো? যে লোকটাকে কাল আমি বিদায় করে দিলুম. আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড় মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালবাসিনি, তবু তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি করে?'

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর প্রেম ও কামনা ছিল পরস্পর-নির্ভর, সংযুক্ত। কিন্তু 'শেষের পরিচয়ে' শরৎচন্দ্র এগিয়ে গেলেন অনেকটা। রমণীবাবু ও সবিতার মধ্যে সম্পর্ক

কেবলমাত্রই শরীরের। সেখানে হৃদয় নেই, প্রেম নেই।

সবিতাচরিত্রের মধ্যে মানুষের সেই রহস্যময় জীবনকেন্দ্রে হাত রাখতে চেষ্টা করেছেন লেখক, যেখানে প্রেম, কাম আর স্নেহ ভিন্ন ভিন্ন খাতে বইছে।

বৃদ্ধ বৈষ্ণব ব্রজবাবুর প্রতি সবিতার মমতা আছে, যথোচিত ভক্তিও আছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। যে-রমণীবাবুর সবই সবিতার কাছে হেয়, অরুচিকর, তবুও একটি অদৃশ্য অস্ফুট মিলনডোরে তাঁরই সঙ্গে বাঁধা রইলেন বার তের বছর। এই মিলন-সূত্র স্পষ্টতই প্রেম নয়। সন্দেহ হয়, কেবলই তা একদার যৌনতার শাস্তির জন্যই নয়, ভুল সংশোধনের উপায়হীনতার জন্যও।

বিমলবাবুর মাধ্যমে সবিতার জীবনে এল প্রেম। মনুষ্যত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন পরিণত ব্যক্তিত্ব। বিমলবাবু সবিতার সমরুচির, সমমানের ব্যক্তি। তাঁরই মধ্যে সবিতার প্রকৃত অন্তরসঙ্গী মিললো।

সবিতার জীবনে তিনটি পুরুষের মধ্যে শরৎচন্দ্র নারীর তিনটি দিক ভাগ করে দিয়েছেন, ব্রজবাবুর মধ্যে তার দায়িত্বশীলতা, রেণু ও ব্রজবাবুতে মিলে একটাই মোট দিক—স্নেহপরায়ণতা, মাতৃত্বের দিক, হৃদয়ের বড় দায়িত্ব বহনের দিক। রমণীবাবুতে সেই অস্থির দিকটা—যা দুনিয়ার সমস্ত কিছুই মুহূর্তের জন্য অন্ধকার, তরল করে দেয়। আর বিমলবাবুর মধ্যে এল নারীমনেব পূর্ণতার, নির্ভরতাব, প্রেমের দিকটি। বিমল, রমণী, ও ব্রজ—নাম তিনটি বেছে নেওয়ার মধ্যেও দিকগুলির হদিস দেওয়া আছে।

সবিতার শেষের পরিচয়ে কোন দিকটির জিৎ হল? দেহের তো নয়ই, এমনকি মনের বা প্রেমেরও নয়। জিতল হৃদয়, স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয।

বিমলবাবুর সঙ্গে সবিতার জীবন বিপুল সার্থকতার পথে এগিয়ে যেত, পূর্ণতা লাভ করত। এতদিনের তৃষিত হৃদয় মন দেহ পেত শান্তি, কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তাঁর মিলত সিঙ্গাপুরে চলে গিয়ে। কিন্তু সবিতা অবলীলায সেই পরম প্রাপ্তির দিকটা মুহূর্তের মধ্যেই ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ব্রজবাবুর কাছে এখন তাঁর পাওয়ার নেই কিছুই। এখানে তাঁর ভূমিকা শুধু দেওয়ার। বৃদ্ধ, অশক্ত, দুর্বল ব্রজবাবুর যে এখন কেউ নেই। বিমলবাবুর প্রেমে আশ্রয় পেয়েও নিলেননা সবিতা। নিজেই আশ্রয়দাতার কঠিনতর ভূমিকাটা বেছে নিলেন তিনি। নিঃসহায় ব্রজবাবুকে আপন অঞ্চলছায়ায় আশ্রয় না দিলে সবিতার মনুষ্যত্ব পবাজিত হয়। এই মনুষ্যত্বই হল মায়ের শেষ পরিচয়। এ-মাতৃত্ব জৈবিক দাবীতে নয। রেণুর প্রতি সবিতার মমতার আকর্ষণ জৈবিক, ব্রজবাবুর প্রতি উদ্বেল হয় যে মমতা, তা জৈবিক নয়, এটি মানবিক। এই আত্মস্বার্থ ত্যাগ সম্পূর্ণই পরার্থে। নিজের রক্তের টানে নয়। জৈবিকতা উত্তীর্ণ মনুষ্যত্ব এখানে সুস্পষ্ট।

শরৎচন্দ্র তাঁর সৃষ্ট মাতৃচরিত্রগুলির মধ্যে সর্বদাই এই তফাৎটি বরাবর দেখিয়েছেন।

সকল জননীই 'মা' নয়। গর্ভধারিণীর জৈবিক মাতৃত্বের রূপটি তাঁর বহু স্কেচে ফুটেছে। 'বিপ্রদাসে' মহিমাময়ী মাতৃমূর্তির আড়াল থেকে জৈবিক জননীর স্বার্থপর কুশ্রী মূর্তির প্রকাশ দেখা যায় দয়াময়ী চরিত্রে। জৈবিকতার কাছে মনুষ্যত্বের পরাজয়ের নির্লজ্জ ছবি এখানে স্পষ্টতায় আঁকা। 'বিন্দুর ছেলে'-তে এলোকেশী, 'নিষ্কৃতি'-তে নয়নতারা, 'মেজদিদি'-তে কাদম্বিনী—এরা সকলেই আত্মসর্বস্ব, নীচুমানের, জান্তব মাতৃমূর্তি। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যথার্থ মহৎ মাতৃত্ব ফুটেছে পরের সন্তানকে ঘিরে। মাতৃত্বেব বৃত্তিকে তিনি জৈবিক স্তর থেকে উপরে টেনে তুলে মানবিকতায় আলোকিত করে দিয়েছেন। নারীর মধ্যে যে 'মা' আছে, তার বিকাশের জন্য জরায়ুতে সন্তান ধারণেব প্রয়োজন হয়না।

রাজলক্ষ্মী সতীনপুত্রের মা হয়ে যতটা সত্য, তরুণ সন্ন্যাসী ব্রজানন্দের প্রতি তার আকুল মাতৃস্নেহও ততটাই সত্য, বরং নিঃস্বার্থ বলেই দ্বিপাক্ষিক বন্ধন যেন সেখানে আরও গভীর। দুটি সম্পর্কই সম্পূর্ণ মানবিক মাতৃত্বের—এ-স্নেহের মধ্যে রক্তেব জাদু নেই। আছে নারীহৃদয়েব জাদু।

আমার মনে হয়, 'বিন্দু' যদিও ঠিক জৈবিক অর্থে মা নয়, তবু তাঁর ব্যাকুল মাতৃত্বের ধরনটা জৈবিকতা-ধর্মী। আত্মতৃপ্তি-কেন্দ্রিক। সন্তান-স্বার্থপর বন্ধ্যা বিন্দুর অন্ধ, উদ্দাম স্নেহের রকমটায় কিন্তু জৈবিক স্নেহেরই উচ্ছ্বাস। তার অমূল্য-বাতিক, যুক্তি বুদ্ধির ধার ধারেনা মোটেও। বরং অমূল্যেব গর্ভধারিণী মা অন্নপূর্ণার মধ্যেই দেখতে পাই, অনেক বেশী মহৎ মানবিক স্নেহ। সেই স্নেহ ধাবিত হযেছে অভিমানী অবুঝ বিন্দুর প্রতি। এই স্নেহেই একদা পালিত হযে বড় হযে উঠেছে বিন্দুব স্বামী মাধব। মাধব সে-বন্ধন থেকে আজও মুক্ত নয়। জেদী পাগলী বিন্দুর প্রতি অন্নপূর্ণার স্নেহের আকর্ষণ মানবিক—কাজেই মহৎ। যে-স্নেহে সে নিজের পেটের ছেলেকে, তার একমাত্র সন্তানকে সহজেই তুলে দিতে পেবেছে ছোট জায়ের কোলে চিরদিনের মত। এই ত্যাগের মহত্ত্বেই তার স্বাভাবিক অন্তর্গূঢ় নিরপেক্ষমাতৃত্বেব বিকাশ। 'মেজদিদি' বইযের হেমাঙ্গিনী, 'রামের সুমতি'ব নারায়ণী, 'পণ্ডিত মশাই'য়ের কুসুম, 'শ্রীকান্ত'র রাজলক্ষ্মীর মধ্যে এই জগদ্ধাত্রী মাতৃত্বের দিব্যরূপ দেখে আমবা মুগ্ধ হই।

শরৎচন্দ্র নব-নারী নির্বিশেষে মানুষের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রথম। জীব জগতে 'মানব' নামে জীবটির বিশেষত্ব কোথায় অন্য জীব থেকে—সেদিকে স্থির পর্যবেক্ষণ প্রসারিত করেছেন। সাধারণ জীবত্ব থেকে 'মনুষ্যত্ব' কী কী লক্ষণে ও গুণে বিধৃত, সেটি তাঁর নজরে এসেছে। তার পরে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন—পুরুষত্ব এবং নারীত্বের। মানুষের মধ্যে যে-সকল মানুষে নারীত্ব আছে, তিনি তাদের বেছে নিতে পেরেছেন। দৈহিক দেহযন্ত্রে নারী ও পুরুষ চিহ্নিত মনুষ্য মাত্রেই যথার্থ নারী বা যথার্থ পুরুষ নয়। অনেক নারীদেহধারী মানুষ আছে—যারা কেবলমাত্র শারীরযন্ত্রেই নারী। এই নারীত্ব-বিরহিত স্ত্রী-চরিত্র শরৎসাহিত্যে অনেক আছে। আমাদের

বাস্তবজীবনের আশেপাশেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সকলেরই জানা আছে, সব স্ত্রীলোকের মধ্যে নারীত্ব গুণটি থাকেনা। যেমন সব মানুষেই মনুষ্যত্ব নেই। নারীত্বের মূল ডুবে থাকে মমতায়, মাতৃত্বের রসে। এ-নারীত্ব, এ-মাতৃত্ব জৈবিক এবং মানবিক দুই ধরনেরই হতে পারে।

জৈবিক নারীত্বে উপযোগিতা আছে, প্রয়োজনীয়তা আছে, মহত্ত্ব নেই। বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেনি তাতে, বরং মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করে এই সর্বগ্রাসী জান্তব প্রকৃতি। যেমন দেখা যায় 'বিপ্রদাসে' 'দয়াময়ী'র ক্ষেত্রে।

নারীর মহৎ পরিচয় জৈবিক মাতৃত্বে তত নয়, যত তার মানবিকমাতৃত্বে। এই মাতৃত্বেই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ ঘটে। আর্ত, অসহায় মানুষের প্রতি মমতার প্রাবল্যে আত্মসুখের, আত্মস্বার্থের কঠিন শিকলগুলি আলগা হয়ে খুলে পড়ে। নারী এইখানেই যথার্থ মানুষ। পুরুষের মধ্যেও যখন মানবিক মমতায় আত্মত্যাগের বিকাশ ঘটে তাকেই 'মনুষ্যত্ব' আখ্যা দেওয়া হয়।

জৈব ও মানবিক মাতৃভাবের মধ্যে বিরোধও কোথাও কোথাও এঁকেছেন শরৎচন্দ্র। বিভিন্ন বই থেকে উদাহরণ তুলে এনে এগুলি স্পষ্ট করা বেশ সহজ। এখানে আমি তা থেকে বিবত রইলুম। এই দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে বিশেষ লক্ষণীয়।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নায়করা প্রায়ই হয়েছে সমাজে অপ্রতিষ্ঠিত, আর নায়িকারা জনকতক সমাজে পতিতা। যদিও তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী-উদ্ভূত, কিন্তু তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীব প্রতিনিধিত্ব করেননা। তাঁরা 'স্টিরিওটাইপ' তো নয়ই, আদর্শায়িত চরিত্রও নন। তাঁরা সৃষ্টিছাড়া, খাপছাড়া অথচ খাঁটি রক্ত মাংসের নির্ভেজাল জ্যান্ত মানুষ।

সমাজসিদ্ধ চালচুলো, শিকড় বাকড় না থাকলেও, শরৎদার নায়ক নায়িকাদের ভেতরটায অসামান্য মানবিক জ্যোতি প্রভাসিত হয়। তাঁদের হৃদয উষ্ণ, মগজ নিরলস, চিন্তা বুদ্ধি প্রখর-শাণিত। অথচ, এঁদের মধ্যে একটা গভীর স্ববিরোধ দেখা যায়।

এঁদেব আচরণ কর্ম যদিও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের দ্বারা আর আবদ্ধ নয়, কিন্তু তা থেকে মুক্তিও পায়নি এঁদের মন। ফলে,—মনের সঙ্গে কর্মের একটা দ্বন্দ্ব প্রায়ই লেগে থাকতে দেখা যায়।

'পিয়ারী' ও 'সবিতা' এঁরা দুজনেই ব্যক্তি ও পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত বিক্ষত আধুনিক দ্বৈতবোধের খণ্ডিত চেতনার শিকার। অন্নদাদিদি আর অভয়ার মধ্যেও আশ্চর্যভাবে একাধারে আমরা তথাকথিত মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের প্রতি আক্রোশ, অবহেলা দেখি—অথচ, ক্ষেত্রান্তরে এঁরা দুজনেই চরম মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রমাণ দেখিয়েছেন। অন্নদাদিদির স্বামীভক্তি হিন্দুয়ানির চরম ; খুনী স্বামীর জন্য কুলত্যাগিনীর কলঙ্ক কিনতে তাঁর বাধেনি। মুসলমানী পোশাকে বাস করতেও না। তেমনি অভয়ার স্বামী-সন্ধান

এই একই রকম হিন্দু সতীত্বের পরাকাষ্ঠা। অভয়া শেষ পর্যন্ত হিন্দু সতীর আদর্শে জীবন প্রতিষ্ঠাব সবরকম চেষ্টা করে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে, তার পরে নিরাবলম্ব অবস্থায় বাধ্য হয়ে রোহিণীবাবুর আশ্রয় নিয়েছে। কিংবা, আশ্রয় দিতে পেরেছে বোহিণীবাবুকে। শেষতক অভয়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধেব অচল দু-আনিটা, নেহাৎ বাধ্য হয়েই। অভয়ার মধ্যে ছিল যুক্তি, বুদ্ধি, মুক্তচিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অথচ প্রথমেই তো রোহিণীবাবুকে নিয়ে ঘর পাতেনি। অভয়া খুঁজে বেড়িয়েছে হিন্দু পত্নীর নিয়মমাফিক ধর্মসংগত, আইনসংগত অমানুষ স্বামীটিকে।

শরৎচন্দ্রেব চরিত্রগুলির মধ্যে এই স্ববিরোধ—এই অবোধ দ্বন্দ্বটা খুবই স্পষ্ট। অবশ্য এর জন্য সময়টার দিকেও একটু ভালো করে তাকাতে হবে। সময়টা কেমন ছিল? সমস্ত সমাজের মন তখন কোন বিশ্বাসের লোহাব বর্মে মোড়া ছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে? লেখকও তো তার বাইরের মানুষ নন! কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা ঠিকই ছিল স্থান কালেব ঊর্ধ্বে নিজের জায়গাটিতে, এর প্রমাণ তো সর্বত্রই ছড়িয়ে রযেছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। এই দ্বন্দ্বই সুস্থ, এই দ্বন্দ্বই তো স্বাভাবিক। সামাজিক মূল্যবোধ ও শিল্পীর ব্যক্তিগত মূল্যবোধের বিরোধ শুধু সাহিত্যকর্মে নয়, শবৎচন্দ্রের নিজের জীবনের জরুরী সিদ্ধান্তগুলির মধ্যেও নিহিত ছিল আমি বেশ ভাল করেই জানি।

শ্রীকান্ত বাইজীব বাড়িতে বাস করতে ভয় পায়না, অথচ বিধবাবিবাহে তার আপত্তি। অভয়ার অবৈধ সংসারে আশ্রয় নিতে তার বাধেনা, কিন্তু তার অবৈধ সন্তানের কথা ভাবতে বুকের ভেতর সংস্কারের গহনে 'তীরবিদ্ধ' হয়।

সংস্কার ও যুক্তির মধ্যে এই দ্বৈত বোধ, এই দ্বন্দ্ব তাঁব বইয়ের চরিত্রগুলিকে সরলতায় দুর্বলতায় জ্যান্ত মানুষই কবেছে। এই জন্যেই তারা বাস্তব, তারা কেউ কোনও দিকের ফাঁকা আদর্শের পুতুল নয়। একমাত্র 'বিপ্রদাস' চরিত্রটি তিনি যেন ইচ্ছে করেই এই স্ববিরোধমুক্ত চরিত্র করে দেখিয়ে দিয়েছেন—কেবলমাত্র আদর্শে কলম ডুবিয়ে চরিত্র আঁকলে সে-চরিত্র কেমন হতে পারে। যত বড় ক্যানভাস-জোড়া বিরাট আর উজ্জ্বল রঙের হোক না সে-ছবি—তা পটের ছবিই হবে, দুর্বলতা না থাকলে জ্যান্ত মানুষ হয়ে উঠবেনা কখনও ;—হেসে, কেঁদে, হেঁটে, চলে বেড়াবেনা পাঠকের মনের উঠোনে।

শরৎচন্দ্রেব সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাদের মনের ভিতরে ভাবে একরকম, কিন্তু কাজ করে ফেলে আর একরকম। সে যা চায়, আর যা সে যেচে তুলে নেয়—তাতে প্রায়ই মিল থাকেনা।

শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনেও ছিল পরস্পরবিরোধী বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনেক পুঁজি। তাঁর নিজস্ব ব্যক্তি চরিত্রেও ছিল স্ববিরোধী লক্ষণ। সাহিত্য রচনাতে তিনি মনুষ্যচরিত্রের স্ববিরোধকে বরাবরই স্বীকার করেছেন এবং করেছেন বলেই আমার মনে হয়, শরৎসাহিত্য জীবনধর্মী।

২৪

শরৎচন্দ্রের জীবনের আর একটি তথ্য সম্পর্কে তাঁর জীবিতকাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু কৌতূহলী প্রশ্ন শোনা যায়—শরৎচন্দ্র বিবাহিত কিনা?

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন —"সত্যই শরৎচন্দ্রের বিবাহটা একটা বড় ধোঁয়াটে ব্যাপার। কেউ কেউ বলেন তিনি বিয়ে করেছিলেন ; আবার অনেকে বলেন, তিনি বিয়ে করেননি, কেবল জীবনসঙ্গিনী জুটিয়েছিলেন।" (পৃষ্ঠা—গ)

"ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেব তাঁদের গ্রন্থে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী না বলে 'জীবন-সঙ্গিনী' ও 'সঙ্গিনী' বলেছেন। এঁদের মতে আমরা যাকে সামাজিক বিয়ে বলি, শরৎচন্দ্র নাকি হিরণ্ময়ী দেবীকে সেরূপভাবে বিয়ে করেননি। অবশ্য এঁরা এ-কথা যে কিভাবে জেনেছেন তারও কোনও প্রমাণ দেননি।"—(১০৪ পৃষ্ঠা)

এ বিষয়ে গোপালবাবু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ; যে-আলোচনার মূল বক্তব্য, শরৎচন্দ্র আনুষ্ঠানিক বিবাহিতই ছিলেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত, সৎ, হিন্দু ভদ্রসমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্তটিই সম্মানজনক, একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। কিন্তু, সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত নয়। কেন নয়, আমি এখানে সেটি সবিনয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে আমি গোপালবাবুর 'গ' পৃষ্ঠায় 'জীবন-সঙ্গিনী জুটিয়েছিলেন' বাক্যটিব প্রতিবাদ করি। 'জুটিয়েছিলেন' নয়, 'গ্রহণ করেছিলেন' লিখলে যথোচিত হত। 'জোটানো' বাক্যটি ব্যবহারের মধ্যে যে তাচ্ছিল্যমিশ্রিত অসম্মান নিহিত আছে—যাঁরা শরৎচন্দ্রকে অবিবাহিত বলেন, এবং হিরণ্ময়ীকে তাঁব জীবনসঙ্গিনী লেখেন, তাঁদের মনে এবং আচরণে শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ী দেবী সম্পর্কটির প্রতি এ-ধরনের অসম্ভ্রমবোধ ছিলনা। সত্যেব খাতিরে তাঁরা জেনে-শুনে হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহিত-পত্নী বলে লিখে যেতে পারেননি। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা পত্নীর প্রাপ্য সম্মানই বরাবর দিয়েছেন।

১০৪ পৃষ্ঠায় গোপালবাবু ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও নরেন্দ্র দেবের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলেই উল্লেখ করা স্থির করেছেন।

যতদূর বোঝা যায়, গোপালবাবুর এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথম কাবণ,—"ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবু একথা যে কিভাবে জেনেছেন, তারও কোনও প্রমাণ দেননি।"

দ্বিতীয় কারণ,—"হিরণ্ময়ী দেবী নিজে কথাপ্রসঙ্গে 'আমাদের বিয়ে' ইত্যাদি উল্লেখ করতেন, এবং শরৎচন্দ্রের উইলে হিরণ্ময়ী দেবীকে 'স্ত্রী' বলে উল্লেখ আছে।" (পৃঃ ১০৪)

আমি জানি, এই বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কঠিন এবং গুরুতর। সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানসিকতায় বিভিন্ন জাতের জটিল প্রতিক্রিয়া তুলবে। আমার বক্তব্যের

জনপ্রিয়তা থাকবে না জেনেও আমি সত্যভাষণ প্রয়োজন মনে করি।

এবার আমি একে একে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি মোচনের চেষ্টা করব। প্রথমত, নরেন্দ্র দেব এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তখন প্রমাণ দাখিল করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় ছিল তৎকালীন বাঙালী হিন্দুসমাজ। দ্বিতীয় অন্তরায় ছিল আইনগত। হিরণ্ময়ী দেবী তখনও জীবিত। এই অসামাজিক সম্পর্কেব কথা প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে প্রমাণ জাহির করে লিখে ফেলাটা শরৎচন্দ্রেব শেষ-উইলের পক্ষে এবং হিরণ্ময়ী দেবীর সামাজিক অবস্থিতির পক্ষে যথেষ্ট হানিকর হতে পারত। তাই তাঁদের প্রমাণসহ লেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরিবারের প্রায় সকলেই জানতেন—ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদেরও অজ্ঞাত ছিল না শবৎচন্দ্র বিধিমতে হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হননি। যে-অনিলা দেবীর কথা গোপালবাবু এ-প্রসঙ্গে প্রমাণ হিসেবে এনেছেন সেই অনিলা দেবী যে কোনোদিন হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্নগ্রহণ করতেননা সে কথা গোপালবাবু নিশ্চযই জানেননা ; কিন্তু তার সাক্ষী এখনও অনেকেই জীবিত আছেন। অবশ্য তাঁরা এখন সত্য অস্বীকার কবলে আমার কোনও উপায় নেই।

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুবিধার ভযেই ব্রজেনবাবু ও নরেন্দ্র দেব তখন প্রমাণসহ স্পষ্ট ভাষায় শরৎচন্দ্রের অপরিণীতা পত্নী বলে তাঁদের বইতে হিরণ্ময়ী দেবীকে উল্লেখ করে যেতে পারেননি। সম্পত্তির বৈধ অধিকাব ইত্যাদি নিয়ে পাছে প্রশ্ন ওঠে,—এইসব অসুবিধা এড়াতে তাঁরা অস্বচ্ছ ভাষা ব্যবহার করে গিযেছেন। সাময়িককালের বাধা অগ্রাহ্য করে হিরণ্ময়ী দেবীর অকল্যাণ সৃষ্টি কবতে চাননি। কিন্তু ভবিষ্যৎকালের কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যা দলিল তাঁরা লিখে বেখে যাননি। জানতেন, যথাসময়ে এ তথ্য প্রকাশিত হবেই যখন কোনও ব্যক্তির বা পরিবারেব কোন অসুবিধার কারণ ঘটবেনা।

যে তথ্যগুলি আমার জানা আছে, আমি সেই তথ্য এখানে আজ রাখছি। এতে কারো অনিষ্টের আশঙ্কা নেই।

হিরণ্ময়ী দেবীর নিজের কথাপ্রসঙ্গে 'বিয়ে' শব্দটিকে আনুষ্ঠানিকতার প্রমাণ হিসেবে নেওয়া ঠিক হবেনা; তিনি সাধারণ অর্থেই ওটি ব্যবহার করেছেন,—শরৎচন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী হওয়াই তাঁর 'বিযে' হওয়া। শরৎচন্দ্র তাঁকে স্ত্রীর পূর্ণমর্যাদায় সংসাবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আইনগত এই সম্পর্কটিকে সামাজিক আইনে বৈধ করে নেননি। তাঁর উইলে 'ওয়াইফ' শব্দটি আছে। শরৎচন্দ্র আইনের ঘোরপ্যাঁচ কাটানোর সুবিধার জন্য এটর্নীর পরামর্শ মাফিক ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে নিজের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়তা করে গিয়েছেন তখন সকলেই তা জানতাম। কিন্তু তাঁর কোনও ব্যক্তিগত লেখায় বা চিঠিপত্রে কুত্রাপি কি হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়? 'বড়োবৌ' বলে তিনি স্ত্রীরই সম্মানে তাঁকে ডাকতেন এবং সবার কাছে ঐ নামেই উল্লেখ করতেন। নিজের

মৃত্যুর পরে পাছে তাঁকে কেউ অযত্ন বা অসম্মান করে, সেইজন্য তাঁকেই সমস্ত সম্পত্তির জীবন-শর্তে উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীমান গোপালচন্দ্র রায়ের অনলস প্রচেষ্টার ফলে শরৎচন্দ্র বিষয়ে বাঙালী পাঠকের অনেক তথ্য জানা হয়েছে। এ জন্য তিনি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু এই একটি ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে অন্যমত হতে বাধ্য হয়েছি। শরৎচন্দ্রকে বিবাহিত বলা সহজ, তাতে কোনো গোলমালের সম্ভাবনা নেই, কিন্তু অবিবাহিত বললে অনেক গোলমালের সম্ভাবনা; অনেক শুভার্থীর রাগ হয়ে যাবে। কারণ, আমাদের মনে মনে শরৎচন্দ্রের একটি মানসমূর্তি নিজেদের কালানুযায়ী আমবা গড়ে নিতে চাই। 'সামাজিক' শরৎচন্দ্রের মূর্তিতে যাতে আঘাত লাগে এমন তথ্য সত্য হলেও আমরা শুনতে চাইনা। শুনতে পেলে বিরক্ত হই, মনে মনেও মানতে চাইনা।

শেষজীবন তিনি অপরিণীতা একজনের সাহচর্যে কাটিয়ে গেলেন, এটা মনে করতেই অনেকের ঘৃণাবোধ হবে; তাই হয়তো কল্যাণীয় গোপালচন্দ্র ওদিকটায় যেতে চাননি। তাঁর পরিশ্রমের উদ্দেশ্য শরৎচন্দ্রকে সমাজে শ্রদ্ধেয় করে রাখা।

আমাবও উদ্দেশ্য তাই। কিন্তু সত্যের মাধ্যমে না এলে এ শ্রদ্ধা স্থায়ী হবেনা। আমার মনে হয়, সত্য-তথ্য নিজেদের অমনোমত হলেও, অপরিবর্তিত রেখেই বলে যাওয়া ভাল। এ-তথ্যের স্বাদ আজ আমাদের যতই তিক্ত লাগুক, এর মধ্যে ব্যক্তিমানুষটির অস্তিত্বের যে সত্যপরিচয় আছে, তার পরিবর্তন না ঘটানো সঙ্গত। শরৎচন্দ্র যদি কেবলমাত্র একটি সামাজিক ব্যক্তি হতেন, তা হলে আমি কখনই এই তথ্য প্রকাশ কবতুমনা, বরং এ তথ্য প্রকাশের বিরোধীই হতুম। যা চাপা পড়ে গেছে, তাকে খুঁড়ে তোলা কুরুচি বলেই গণ্য করতুম। শরৎচন্দ্র প্রধানত একজন প্রতিভাবান লেখক। তিনি 'শিল্পী', সেইজন্যই তাঁর জন্মোৎসব শতবার্ষিকী সারা দেশের পর্বানুষ্ঠান। তিনি সামাজিকব্যক্তি পরের কথা। এই শিল্পীর জীবনের সত্যকে মিথ্যা দিয়ে মাটি চাপা দিলে তাঁর ক্ষতিই করা হয়। এ সম্পর্কে যতদূর যা জানি, সব কথা খুলে বলা আমার পক্ষেও সম্ভবপর নয়। কারণ আমিও তো অনেক সেকালেই জন্মেছি, সেকালের মধ্যেই মন ও রুচি পুষ্ট হয়ে উঠেছে। কালের সঙ্গে এগিয়ে চলার মানসিক শিক্ষা আজীবন রবীন্দ্র-আওতায় লাভ করলেও,—একালের মত আবরুহীন হয়ে ওঠার শক্তি অর্জন করতে পারিনি। যতটুকু লিখছি তা অবিকৃত সত্য-তথ্য, তার বাইরের খবরটুকু আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতের গবেষকরা নিজেরা খুঁজে নেবেন, যা অনুক্ত রইল।

শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি কখনও শুনেছেন—তিনি আনুষ্ঠানিক বিবাহ করেছেন? শরৎচন্দ্র কখনও কারো কাছে এ কথা উচ্চারণ করেননি আমি জানি। এ বিষয়ে তিনি একান্ত কঠোর ও সতর্ক ছিলেন। বার্মায় তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল বলে যা প্রচারিত এবং স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' বইতে যে-বিষয় তিনি লিখে গিয়েছেন, সে তথ্যটি শরৎচন্দ্রের নিজের মুখ থেকেই

আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে একত্রেই শুনেছি। গোপালবাবু তাঁর বইতে কেন যে লিখেছেন —"নরেনবাবু বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বিবাহকাহিনী ও তাব পুত্রের কাহিনীটিও আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম।" (*শরৎচন্দ্র*, ১ম খণ্ড, ৯৭ পৃঃ)

এখানে আমার বিস্ময় ঠেকেছে। এই তথ্যটি তো শবৎদারই নিজের মুখে নরেন্দ্র দেব ও আমার একত্রেই শোনা। তথ্যটি শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পরে লিখতে বসেও উনি কুণ্ঠিত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন আমি জানি। জলধরবাবুর সঙ্গে হরিদাসবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। তারপবে এই তথ্যটি বইতে দেবেন কিনা এই নিয়ে শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশবাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করেছেন। প্রকাশবাবুও এ তথ্যটি জানতেন। সন্তান ও শান্তি দেবী প্লেগে মারা যান এ তথ্য প্রকাশবাবু, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, এঁরা সকলেই জানতেন। প্রকাশবাবু বলেছিলেন, "এগুলি পরে হারিয়ে যাবে, আপনি লিখুন। আমি এ তথ্য জানি; আপনার বইতে লিখে দেবো।" তিনি নরেন্দ্র দেবের শরৎচন্দ্র বইতে লিখে দিয়েওছিলেন—"নবেনবাবু আমাদের পরিবারের বহুদিনের বন্ধু। দাদার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী তিনি লিখেচেন আমরা তা দেখেছি। এর মধ্যে অসত্য বা অতিরঞ্জন নেই।" (স্বাক্ষর . প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।)

হিরণ্ময়ী দেবী ও শান্তি দেবী কাউকেই বিবাহিতা পত্নী বলে বইতে লেখা নরেন্দ্র দেব ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কেন যে সম্ভব হয়নি, গোপালবাবুকে আমার স্বামী বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। কেন যে তবুও একটি ভ্রান্ত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এত পরিশ্রম করেছেন, আমরা তা অনুমান করতে পারি। বর্তমানকালের সংস্কারের সীমায়িত পবিসরের মধ্যে থেকে তিনি এর দ্বারা সমকালীন পাঠকসমাজের মনের তৃপ্তি ও স্বস্তি বিধানের চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়।

শান্তি দেবী সম্পর্কে নরেন্দ্র দেবের বইতে এইরকম উল্লেখ আছে :—"শেষে চক্রবর্তী ধরে বসলো, এতই যদি তোমাব প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন বামুনেব মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত-কুল রক্ষা করো না।

অগত্যা শরৎচন্দ্রকে সেই মেয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তাকে নিয়ে সুখীই হয়েছিলেন এবং তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তখন তাঁর পাছে পাছে ফিরছিল। রেঙ্গুনে আবার দারুন প্লেগের মহামারি দেখা দিলে —শরৎচন্দ্রের স্ত্রী পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেল।" (*শরৎচন্দ্র*—লেখক নরেন্দ্র দেব, ১ম সংস্করণ, ৭২-৭৩ পৃঃ)

এই লেখাটি লেখার সময়ে সুরেনবাবু এবং প্রকাশবাবু বলেছিলেন—"উনি যে কখনও কাউকে বিবাহ করেননি, উনি ব্যাচেলার এ তো আপনারা ভালোই জানেন। লিখিতভাবে ওঁকে বিবাহিত বলে প্রচার করা মিথ্যাচার, অথচ উনি বিবাহিত নন একথা কোনও মতেই আমরা বলতে পারবো না। বলা চলবে না। কেন যে পারবো না, বুঝতে পারছেন। এ সম্পর্কে বিবাহিত প্রচার হওয়াটাই আমাদের পক্ষে ভাল।

কারণ, আমাকে তো ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হবে। তবে—বার্মায় যে তাঁর বিয়ে হয়নি, সেটা প্রকাশ হলে ক্ষতি হবে না।" এই কথাবার্তা প্রকাশবাবুর সঙ্গে আমার স্বামীর হয়েছিল শরৎচন্দ্রের তিরোধানের কয়েক মাস পরে তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ীতে দোতলার পড়ার ঘরে বসে আমার সামনে। আমি স্বকর্ণে এই কথাবার্তাগুলি শুনেছি। এ-সকল কথা বাজারে ঢাক পিটে বলার মত নয়। যথেষ্ট সংযম ও ধীর বিবেচনার সঙ্গে ব্যাপারটি তখন সাবধানে নাড়াচাড়া করা হত।—এটি ত আমরা সকলেই জানি। তাঁর পরিবারের লোকেরা নিশ্চয় এ কথাগুলির সত্যতা মানবেন আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, আজ সমাজ-মন পরিবর্তিত এবং পারিবারিক সংকোচের বা ক্ষতির প্রশ্ন নেই। গোপালবাবুর বোধহয় ভুল হয়ে থাকবে—আমার স্বামী যে-তথ্য শরৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন তা গিরীন সবকারেব কাছে তিনি পেয়েছেন বলবেন কেন?

শরৎচন্দ্র বার্মায় যে শ্রমিক পল্লীতে বাস করতেন, তখন সেখানে একটি অলিখিত আইনবিধি প্রচলিত ছিল। স্বামী-স্ত্রীরূপে নরনারী প্রকাশ্য বসবাস কিছুদিন করলে তারা তাদের পবিচিত সকলকার কাছেই স্বামী-স্ত্রীরূপে গণ্য হত এবং সেইরকম যথোচিত সহজ ব্যবহারও পেতো। যে বাঙালী মেয়েটিকে শরৎচন্দ্র অত্যাচারী দুশ্চরিত্র বাপের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন সেই মেয়েটি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র যেতে রাজী হয়নি। সে মৃত্যু পর্যন্ত শরৎচন্দ্রেরই আশ্রয়ে সুখেই ছিল। এ কথা শরৎচন্দ্রেরই মুখে শোনা। তিনি অন্যত্রও এ গল্প করেছেন। তার গর্ভে শরৎচন্দ্রের একটি পুত্রসন্তান হয়ে কয়েক মাস মাত্র বেঁচেছিল। প্লেগে মাতাপুত্র দুজনেরই মৃত্যু হয়।

নিজের পুত্রসন্তান সম্পর্কে তাঁর মুখে একজায়গায় একবার উল্লেখ শোনা গিয়েছিল। জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ সম্পর্কে পণ্ডিচেরীপ্রবাসী নলিনীকান্ত সরকার মশায় হয়তো তাঁর জানা থাকলে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। অন্যেরা তো ইহলোকে নেই।

ভারতী-গোষ্ঠীর অন্যতম কবি গিরিজাকুমার বসুর একমাত্র সন্তান অমিয় আঠারো বছরে (বুধু) টাইফয়েড রোগে মারা গেলে সমগ্র ভারতী গ্রুপের সাহিত্যিকরা সেই পুত্রশোকে সমষ্টিগতভাবে বন্ধুর এই বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। গিরিজাবাবু ও তাঁর স্ত্রী তমাললতা বসুর সঙ্গে শরৎচন্দ্র দেখা করতে গিয়ে অদ্ভুতভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—"তোমরা তো ভাগ্যবান পিতামাতা, আঠারো বছর ধরে পুত্রসুখ উপভোগ করে—তার পরে তাকে হারাবার যন্ত্রণা অনুভব কোরছো—আমি তো পুত্রসুখ উপলব্ধি করতে না করতেই পুত্রশোক কাকে বলে টের পেয়ে গেলুম। ছেলেকে পেতে না পেতেই ছ' মাসের মধ্যেই আচমকা মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে গাছ-সমেত ফুলটা উপড়ে নিয়ে উড়ে গেল। তখন আমি কল্পনায় ওর কচিমুখে 'বাবা' ডাক প্রথম যেদিন শুনবো—সেদিন কেমন লাগবে ভেবে আনন্দে অধীর হচ্ছিলুম। তোমরা তো জীবনের কাছে অনেকখানিই পেয়েছো। ছেলেকে শৈশব থেকে বাল্যে—বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে তারুণ্যে হাতে করে নেড়েচেড়ে এসেছো। এই

অভিজ্ঞতার উপলব্ধির দাম তো বড়ো করেই ধরে নেবে প্রকৃতি বা মহাকাল। দুঃখ আজ যা পেলে—এত দিন ধরে পেয়েছোও তো তেমনি দামী আনন্দের উপলব্ধি।"

সেদিন গিরিজাবাবুর বাড়ীতে আমার স্বামী এবং ভারতী গ্রুপের আরও বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক উপস্থিতি ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ঐ অদ্ভুতরকম সান্ত্বনার ভাষা আর যুক্তির নতুনত্বে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা ঐদিনের ঐ কথাগুলি নিয়ে অনেক সময়েই আলোচনা করতেন। প্রেমাঙ্কুরবাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রসিয়ে গল্প করতেন। আমার স্বামী বলতেন—"শরৎদার সেদিনের জলভরা চোখে সেই কথাগুলো কিন্তু তখন আমাদের একটুও অযৌক্তিক ঠেকেনি, এমন গাঢ় গলায় তিনি কথাগুলো বলেছিলেন।"

'দেশ' পত্রিকায় গোপালবাবু এবং আরও কেউ কেউ প্রামাণিক তথ্যের দাবীতে সোচ্চার হওয়ায়, আমি আমার জানা আরও কিছু বিষয় লিখতে বাধ্য হলুম।

হিরণ্ময়ী দেবীব পিতা কৃষ্ণদাস অধিকারী মাধুকরী বৃত্তিজীবি বোষ্টম ছিলেন। ঝুলি ও খঞ্জনী নিয়ে তিনি মাধুকরীতে বেরুতেন। তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজন ছিল না। হিরণ্ময়ী চৌদ্দ পনেরো বৎসর বয়সে গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে কলকাতায় তাঁর বাবা পৌছে দিয়েছিলেন কিনা, অথবা অন্য কারুর সঙ্গে এসেছিলেন, জানা যায়নি। তাঁর মার খবর ছিল না, তিনি মারা গিয়েছিলেন কিংবা অন্যত্র কোথাও চলে গিয়েছিলেন কিনা শুনিনি। কৃষ্ণদাসের বোষ্টমী ছিল না। এ সকল তথ্য স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ইভনিং ক্লাবে এবং গুরুদাস এণ্ড সন্সের দোকানে হরিদাসবাবু, নরেন্দ্র দেব প্রভৃতির সামনে একাধিকবার গল্প করেছেন। আমার তাঁদের মুখে শোনা।

২৫

হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আনুষ্ঠানিক কিংবা আইনগত বিবাহ যে কোনওদিন হয়নি এটি আমি জেনেছি আরও এই সূত্রে,—দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রকে তাঁর প্রকাশক হরিদাসবাবু ও ভারতবর্ষ সম্পাদক জলধর সেনকে বোঝাতে দেখেছি—একটি ম্যারেজ-রেজিস্ট্রেশনে সহি করে কাগজটি হরিদাসবাবুর কাছে গচ্ছিত রাখার জন্য। এই প্রয়োজনে অনুনয় বিনয় করতে দেখেছি এঁদেরকে, নিরুত্তর নির্বিকাব শরৎচন্দ্রকে। শরৎচন্দ্রের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ছোটভাই সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় তাঁকে বলতেন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে শরৎচন্দ্রের বৈঠকখানায় তাঁরা একদিন রাত্রে নিরালায় একটি সই করিয়ে সেই কাগজখানি তাঁদের কাস্টডিতে তুলে রেখে দিতে চান। তাহলে ভবিষ্যতে শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের পরে কেউ কোনও আপত্তি তুলে হিরণ্ময়ী দেবীকে অসুবিধায় ফেলতে পারবেননা। প্রকাশকরা শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা সফল রাখতে পারবেন আইনের পথে। তাঁর লোকান্তরের পরে হিরণ্ময়ী দেবী যতদিন জীবিত থাকবেন, শরৎচন্দ্রের বইয়ের আয়ে তিনি উত্তরাধিকারিণী থাকলে

তাঁকে কেউ অস্বীকার বা অযত্ন করতে পারবেনা এই শরৎচন্দ্রের অনুমান ছিল।

এ সম্পর্কে আমার স্বামী নরেন্দ্র দেবেব সঙ্গে জলধর সেন মশায় মাঝে মাঝে আলোচনা করেছেন, একাধিকবার শুনেছি। বিষয়টি কখনও কারুর সামনে আলোচিত হতনা এবং বেশি নাড়াচাড়াও হতনা। শরৎচন্দ্রের জেদের অনমনীয়তা উল্লেখ করতে হলে ঐ বিষয়টি ইঙ্গিত ইশারায় উল্লেখ করে এঁরা বলতেন—অদ্ভুত একরোখা মানুষ। একটা কাগজে সই করিয়ে রাখতে কিছুতেই পারা গেলনা। এ সম্পর্কে জীবিত সাক্ষীদের মধ্যে আমি প্রকাশক জি ডি চ্যাটার্জি এণ্ড সন্স-এর বর্তমান মালিকদের অন্যতম স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে পারি।

শরৎচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হিতার্থী বন্ধুরা এটি জানতেন। তৎকালীন জীবিত আত্মীয়দেরও অজানা থাকার কথা নয়। তবে সকলেই অজানিতের ভান করে থেকেছেন, যেহেতু—এ ছাড়া তখন অন্য উপায় ছিলনা। আমরাও না-জানার ভানে থাকিনি তা নয়। কারণ হিরণ্ময়ী দেবীকে কেউ অসম্মানেব দৃষ্টিতে দেখুক বা শরৎচন্দ্রের সাবলীল পারিবারিক-জীবনে কোনও ইঁট পাটকেল এসে পড়ুক, এটি আমাদের কারুরই প্রার্থিত ছিলনা। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হিরণ্ময়ী দেবীকে বৌদি বলে সম্মান করেছি, ভালও বেসেছি। তিনিও আমাদের দুজনকে অকৃত্রিম স্নেহ করতেন। প্রকাশবাবু, সুরেনমামা, অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী এটি ভালই জানতেন আমি জানি।

হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র পবিণত বযসে তাঁর আহারাদি ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, রান্না করা, সংসারের পরিচর্যার জন্য ১৯১২ খৃঃ-তে কলকাতা থেকে বর্মায় নিয়ে যান। যখন তাঁকে নিয়ে যান, তিনি একান্ত নিরাশ্রয় ও অসহায় অবস্থায় ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকন্যা ছিলেন সত্য। মেদিনীপুরে তাঁর বাপের বাড়ি ছিল এও সত্য। শরৎচন্দ্র যখন শিবপুরে থাকতেন, তখন হিরণ্ময়ী দেবীর বাবাকে মেদিনীপুরে মাসিক পাঁচ টাকা করে মনিঅর্ডার করা হত গুরুদাস চ্যাটার্জি পুস্তক সংস্থার বইয়ের হিসাব থেকে। এই মনিঅর্ডার যেত মেদিনীপুরে পাঁচ টাকা, আর কাশীতে দু টাকা, শরৎচন্দ্রের সইমা ('বুড়ীমা' নামে যাঁকে গোপালচন্দ্র রায়ের বইতে পাওয়া যায়), তাঁর নামে।

নিরীহ প্রকৃতি হিরণ্ময়ী দেবীর ব্যবহার ও আচরণ দেখে কারুর সন্দেহ হওয়ার উপায় ছিলনা, তিনি বিবাহিতা নন। কলকাতায় শরৎচন্দ্র তাঁকে কারো বাড়িতে কখনো পাঠাতেননা। নিমন্ত্রণ এলে এড়িয়ে যেতেন—বলতেন, গাঁয়ের মানুষ, বড় ভীতুপ্রকৃতি —শহরে কারো বাড়ী যেতে চায়না। আমিও সেটা জোর করিনে। ওকে নিয়ে যেতে জোর করে তোমরা আর ওকে মুশকিলে ফেলোনা।

শরৎচন্দ্রকে নার্সিংহোমে ভর্তি করার আগের দিন সন্ধ্যায় হরিদাসবাবু ও এটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র আমাদের বাড়ীতে এসে একটি গোপন জরুরী পরামর্শে বসেছিলেন।

সেখানে আমার স্বামীও উপস্থিত ছিলেন। শরৎচন্দ্রের অপারেশনের আগে তাঁকে দিয়ে একটি উইল করিয়ে রাখা জরুরী, এই নিয়ে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় প্রভৃতি দায়িত্বশীল-হিতার্থীরা উদ্বিগ্ন ছিলেন। সে উইল শেষ পর্যন্ত নার্সিংহোমেই প্রস্তুত ও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। নার্সিংহোমে যাত্রার আগের দিন বিকেলে শরৎদার বাড়িতে অনেক লোক সমাগমের জন্যে পরামর্শে বসার অসুবিধা বোধ করায় হরিদাসবাবু ও নির্মলচন্দ্র চন্দ্র হিন্দুস্থান পার্কে আমাদের বাড়ি নিরিবিলি হবে বলে চলে এসেছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলামনা, অন্দরে অসুস্থ শরীরে শয্যাশায়ী ছিলাম। দোতালার ঘরে পরামর্শ হয়েছিল। বোধ হয় সেখানে ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়ের অগ্রজ কিরণশঙ্কর রায়ও ছিলেন। আমি তখন খুবই অসুস্থ, তাই উপস্থিত ছিলামনা, স্বামী ছিলেন। তাঁর মুখে সেইদিনই এই কথা শুনেছি —শরৎদা তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও বইয়ের ইনকাম মোটামুটি সবটাই বৌদির নামে জীবনকাল-শর্তে দিয়ে যেতে চান—যাতে তাঁর অবর্তমানে বৌদিকে কেউ তাচ্ছিল্য না কবে। অন্যান্য আত্মীয় অনাত্মীয় গরীব দুঃখী অল্পবিত্তব অনেকের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থার কথাও বলেছেন। কিন্তু কিছুতেই ম্যারেজ-বেজেস্ট্রীর কাগজে সই করাতে রাজী করানো যায়নি। শক্ত গলায় বলেছেন—বড় বউকে কেউ যদি কোন ঘা দিতে আসে—সেটা ব্যুমেরাং হয়ে তাকেই উল্টো আঘাতে ফেলবে। তোমাদের কোনো ভয় নেই। রেজিস্ট্রি ফেজেস্ট্রি করতে চাইনা। সারা জীবনে যা করলুমনা —মববাব আগে সেটার ভণ্ডামি কবতে পাববোনা।

এই তথ্যটি প্রকাশের উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎকালের মানুষদেব জন্য। যাঁরা ব্যক্তি শরৎচন্দ্র বাস্তবে যথাযথ কেমন ছিলেন, জীবনে কি কবেছিলেন, কি পেয়েছিলেন, আর পাননি জানতে আগ্রহী হবেন, তাঁদের জন্য। সত্য-তথ্য সঠিকভাবে থাকলে মানুষটিকে চেনা সেদিন সহজ হবে। তিনি প্রধানত শিল্পীমেজাজেব মানুষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্র ভালবাসা, বিবাহ, নরনাবীব মিলন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কতগুলি নিজস্ব অভিমত পোষণ করতেন। তিনি ব্যবহারিক জীবনের অনিবার্য প্রয়োজনের সঙ্গে প্রেম এবং বিবাহকে একাকার করে গ্রহণ করেননি। সাহিত্যেও নয়, জীবনেও নয়।

তাঁর নিঃসঙ্গ একক জীবনে একজন সঙ্গিনী বা শুশ্রূষাকাবিণীর প্রয়োজন ছিল সেবাযত্ন দেখাশোনা তদারকের জন্য। হিরণ্ময়ী দেবী তাঁকে শুশ্রূষায় আরাম দিয়েছিলেন ; ঘরগৃহস্থালির দায়িত্ব বহন থেকে অব্যাহতি দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগতের সঙ্গিনী বা মননজগতের শুশ্রূষাকারিণী ছিলেননা কোনোদিন। গৃহস্থালির ভার নিয়ে যত্নে সেবায় আর শ্রদ্ধাভক্তিতে তাঁকে সন্তোষে রেখেছিলেন বরাবর। প্রতিদিন সকালে তাঁর পাদোদক বা চরণামৃত মুখে ঠেকিয়ে তারপরে হিরণ্ময়ী দেবী উপবাস ভঙ্গ করতেন। আমরা সে দৃশ্য অনেক দিন অনেকবারই দেখেছি এবং শরৎদার তাই নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ পরিহাস শুনেছি। একদিনের বর্ণনা রাখি।

রবিবারের সকাল। তখন বেলা বারোটা প্রায় বাজে। বালিগঞ্জে দোতলায় পড়ার

ঘরে শরৎদা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আমাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে আছেন অনেকক্ষণ। দরজার সামনে বউদি এসে দাঁড়ালেন। চওড়া লালপাড় তসরের শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, শাদা শাঁখা আর একগোছা ঝকঝকে সোনার চুড়ি। হাতের পাতায় ছোট্ট একটি পাথরের বাটি কিংবা কাঁসার বাটি, জলভরা। একটু লজ্জা-লজ্জা অপ্রস্তুত মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। শরৎদা ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—ও-ও-ও-ও—এইবারে 'পা-দোক' নেবে বুঝি তুমি? এরা রয়েছে বলে লজ্জা হচ্চে?...লজ্জার কী আছে? তুমি কতো ভক্তিমতী আদর্শ হিন্দুনারী—একটু দেখেশুনে শিখে নিক না রাধু। ওরা তো সব একেলে বিবি-মেয়ে! তোমার ভক্তির ফিচেলি বুদ্ধিটা ওকে একটু চুপি-চুপি শিখিয়ে দিও বরং। দরকার পড়লে কাজে লাগতেও পারে। নাও, নিয়ে এসো তোমার জল। তা বেলা বারোটা বাজতে চললো—এত বেলায় তোমার পুজো আহ্নিক সারা হলো? তুমি রোগে ভুগবে না তো কে আর ভুগবে? কই? আনো না তোমার বাটি।—অপ্রতিভ মুখে হিরণ্ময়ী দেবী এগিয়ে এসে নিচু হয়ে জলের ছোট্ট বাটিটা শরৎচন্দ্রেব পায়ের কাছে ধরলেন—শরৎদা চটির ভেতব থেকে একটি পা বাব করে বাটির জলে বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে পা-টি আবার চটিতে ভরে রাখলেন। বউদি শরৎদাকে প্রণাম করে বাটি হাতে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শরৎদা হাসতে হাসতে আমাদেব দুজনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ-তির্যক কণ্ঠে বললেন —ওটি পতিভক্তি মোটেই নয়,—গরু বেঁধে রাখার খুঁটি। পাদোদক পান করে তারপরে উনি দৈনন্দিন জলগ্রহণ করেন। এই ওঁর দীর্ঘকালের ব্রত। যতক্ষণ না সতী পতির চরণামৃত পান করেন, ততক্ষণ তিনি শক্তি পান না সারাদিন সংসার ঠেঙাবার। ভূদেব মুখুজ্জের বই চোখেও দেখেনি তোমার বউদি, পড়া দূরে থাক —অথচ সেই বইয়ের পাতা ফুঁড়েই মানুষটা বেরিয়ে এসেচে—তোমরা মিলিয়ে দেখে নিতে পারো।

—বলো কেন যন্ত্রণাভোগের কথা,—বার্মায় যখন ছিলুম, ওর উৎপাতে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে হত।...দু-চার দিন যে বাড়ির একঘেয়েমি কাটাতে কোথাও ডুব মেরে থাকবো—তার উপায় ছিল না।...ওর পতিভক্তি নিয়ে সেখানে সব্বাই হাসি-মস্করা করতো। ওর কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দু-একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে কোথাও নেশা করে পড়ে থাকার উপায় ছিল না। চট্‌কা ভাঙলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে—একটা মানুষ উপোস করে ঘরের মেঝেয় লম্বা হয়ে পড়ে আছে।...সদর দরজার কড়া নাড়লেই দরজা খুলে যাবে—সামনে থাকবে বোকা-বোকা ভীতু চোখে একটা উপোসী শুকনো মুখ।...রাগারাগি বকাঝকা অনেক করেচি।...কোনো ফল হয়নি। কৈফিয়তও চায় না—রাগও করে না—শুধু ভাবনাভয়ে ভরা ভীতু চোখে তাকিয়ে থাকে।...এমনি করে ওই নির্বোধ মুখ্যু মানুষটি চালাক মানুষটাকে জব্দ করে ছেড়েচে। যতোটা বোকা দেখায় ওকে, আসলে তা কিন্তু নয়।

২৬

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথে সম্পর্ক কেমন ছিল এই প্রশ্নটি আমাকে অনেকে অনেকবার করেছেন। এ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ধারণা বোধ হয় লিখে যাওয়া উচিত।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এবং তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কখনও কোনও দিন বিরুদ্ধতা আমি দেখিনি। ওঁর সাহিত্যে সম্পর্কে বরং কবিকে উজ্জ্বল আশা আর আনন্দই প্রকাশ করতে দেখেছি। ব্যক্তি মানুষটি সম্পর্কে জানবাব উৎসুক আগ্রহ তাঁর ছিল বেশ বোঝা যেত। যদিও কবি শরৎচন্দ্রের কাছে আঘাত পেয়েছিলেন যথেষ্ট। তাঁর মুখে কিন্তু শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কথা শুনিনি।

শরৎচন্দ্রের জীবন যে গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে দেশে বিদেশে বিচরণ কবে ঐ সব জায়গাব সাধারণ মানুষদের ঘনিষ্ঠসংস্রবে বেড়ে উঠেছে, এটি গুরুদেব শরৎচন্দ্রের সৌভাগ্য বলেই মনে কবতেন। শরৎচন্দ্রের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা বা অনুকম্পার ভাব কখনও দেখিনি।

পথের দাবী উপন্যাসটি প্রিচিং অব সিডিশন-এব কোপে ব্রিটিশ সবকার বন্ধ কবে দিলে শরৎচন্দ্রকে তাঁর কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ দেন, রবীন্দ্রনাথকে বইখানি পড়তে দিয়ে শবৎচন্দ্র নিজে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে আসেন, কবি যেন বই বাজেয়াপ্ত করাব একটি প্রতিবাদ সংবাদপত্রে লিখে পাঠান। শরৎচন্দ্র সেইমত কাজ করেন। পথের দাবী পড়ে কবি শবৎচন্দ্রকে তাঁব অনুরোধের জবাবে যে চিঠি লেখেন —সে চিঠি এখন ভারতবর্ষে বহুবিদিত ঐতিহাসিক চিঠি। ১৩৩৩ সালেব কথা, অর্ধশতাব্দী আগের ঘটনা।

শবৎচন্দ্রেব রবীন্দ্র-বিমুখতার প্রথম সূত্রপাত এইখানে। উনিশশো সাতাশ দশই অক্টোবর তারিখে শবৎদা আমাকে লিখেছিলেন—

"একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। পথের দাবী যখন বাজেযাপ্ত হয়ে গেল, তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয, পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে, গভর্নমেন্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংবাজ সে পাত্রই নয়। তবু, সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম, ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গর্ভনমেণ্টেব প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গর্ভনমেন্টকে যা তা নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।

ভাবতে পারো, বিনা অপবাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে

যে, কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংবাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে।"

চিঠি ছাপাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেননি। এটি সঠিক কথা নয়।

শরৎচন্দ্রের এই চিঠি তখন আমার মনকে খুবই বিস্ময়ে আব গভীর দুঃখে সংকুচিত করে ফেলেছিল। কাবণ কবির মন ও চিন্তা সম্পর্কে আমাদের মনে ধারণা ছিল সীমাহীন নির্ভরশীল। স্বদেশের সম্বন্ধে তিনি যে দেশপ্রেমী—ভারতীয়দের মধ্যে কারো চেয়ে পিছনের সারির মানুষ নন, বরং দূরগামী চিন্তায়, স্থির শুভবুদ্ধিতে এবং নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারে তিনি দেশবাসী স্বদেশীওলাদের অনেকের চেয়ে অগ্রগামী মানুষ, এটি আমার বাবার স্থির ধারণা থেকে আমারও মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। আমার দৃঢ়মূল বিশ্বাসে শরৎদার চিঠি ধাক্কা দেওয়ায় আমি বিভ্রান্ত হয়ে চিঠিখানি নিয়ে আমার বাবাকে দেখিয়েছিলুম।

বাবা শরৎদার চিঠিখানি পড়ে বলেছিলেন—কবি এখানে নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারকের চেয়ারে বসে কথা বলেছেন। তিনি নিরপেক্ষ জজের মন নিযে মতামত লিখেছেন। এখানে তিনি ভারতীয় বা ইংরেজ কারুর সপক্ষে বা বিপক্ষে দাঁড়িয়ে কৌসুলির যুক্তিতে কথা ক'ননি। শরৎবাবু কবিকে নিজের কৌসুলি করে পেতে চেয়েছিলেন, কবি এসেছেন জজ হয়ে।

বাবা শরৎদার চিঠিখানি বার বার পড়েছিলেন। পড়ে আমার মত বিচলিত হননি, তিনি নিজে বিচারক ছিলেন। চিঠির এই দু' তিন পংক্তি তিনি কণ্ঠে উচ্চারণ করে একাধিক বার পড়লেন—"তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমাব বই চাপা দিযে তোমাকে কিছু না বলা তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্নমেন্টকে যা তা নিন্দাবাদ করা সাহসেব বিড়ম্বনা।"

বাবা সেদিন বলেছিলেন—দেশ কালের সীমায় বদ্ধ থেকে কবি তাঁর নিজের দেশ, নিজেদের স্বার্থের ভিত্তিতে উকীল হয়ে পক্ষ-সমর্থন কবেননি। ওঁর মনঃপ্রকৃতি তো দেশ কালে সীমায়িত নয়, এ চিঠিতে তাই তিনি এসে পড়েছেন এজলাসের উঁচুতে, জজের চেয়ারে। তাঁর দৃষ্টি দেশে কালে নেই, সত্যে আর ন্যায়ে নিবদ্ধ। এর ফলে নিজেদেরই শত্রুপক্ষের জিৎ আর নিজেদের হার হয়ে যায়—তাঁর খেয়ালে আসেনি।

বাবা সেদিন যা বলেছিলেন, তার মূল তাৎপর্য যা মনে আছে, লিখলুম। তাঁর মুখের ভাষা সেদিন বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত ছিল। সেই সুগৌরবর্ণ সৌম্য শান্ত মুখশ্রী উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠেছে, কপাল আয়নার মত চকচক করছে—কবির প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাসের অভিব্যক্তি—আমার স্মৃতিতে একটি দামী ছবি হয়ে আছে।

বাবা দুঃখ করে এ-ও বলেছিলেন—কিন্তু ভুল সময়ে, পরাধীন দেশে এ ধরনের সত্য উচ্চারণ দেশের লোক সইবে না। স্বার্থে ঘা লাগলে এরা সত্যকে দেখতে রাজী হবে কেন? এরা কবিকে ক্ষমা করবে না। এই কথাগুলির অন্য অর্থ করে কবিকে ইংরেজ-ভীত, ইংরেজ-তোষক, স্বার্থপর অপবাদ দেবে। একেই উনি দেশবাসীর চৈতন্যে অস্পষ্ট—এখন আরও বেশি ওঁকে ঝাপসা করে তুলবে অনেকে মিলে।

বাবার উজ্জ্বল মুখ চিন্তা-বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। বলেছিলেন—শরৎবাবুর চিঠিতেই তো বোঝা যাচ্ছে উনি কবির প্রতি খুবই বিরূপ হয়ে উঠেছেন। তুমি বিচলিত হোয়ো না। রবিবাবু যে-লেভেলের মানুষ, তুমি যেন তাঁকে দেশপ্রেমী নন মনে কোরো না। অপরাধ হবে।

আমি শরৎদাব সঙ্গে পথের দাবী সম্পর্কে গুরুদেবের চিঠির বিষয় নিয়ে বহুদিন পবে অনেক দিন অনেক আলোচনা করেছি। আমার বাবার মতামতের কথা প্রথম যেদিন তাঁকে বলি, সেদিন তাঁর মন মেজাজ ভাল ছিল। তিনি যে গুরুদেবের বিরোধী নন সেই কথা সেদিন নিজেই বলেছিলেন গুরুদেবের একটি নতুন নিবন্ধ পড়ে। সেই সময়ে আমি বাবার মতামতের কথা তাঁকে বিশদভাবে বলি। তিনি স্তব্ধ হয়ে শুনলেন। একটিও কথা কইলেন না—অসহিষ্ণু প্রতিবাদ করে উঠলেন না। যা তাঁর বরাবরের অপছন্দ, সে সম্বন্ধে কথা উঠলে গোড়াতেই অসহিষ্ণু প্রতিবাদ করে সেটি থামিয়ে দিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন তিনি শান্ত নীরব হয়ে সব কথা শুনলেন। একটিই মাত্র প্রশ্ন কবেছিলেন—তোমার বাবা তো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তাই না? আমি ভয়ে ভয়ে সম্মতি ইঙ্গিত করে তাঁর বিরূপ মন্তব্য আর ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অপেক্ষা করেছিলুম। শরৎদা সেদিন কোনও মন্তব্য করেননি, নির্বাক ছিলেন।

পথের দাবীর প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রকে লেখা চিঠি নিয়ে আজও রবীন্দ্রনাথকে ভীরুতা, স্বার্থপরতা ও ইংরেজতোষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে শুনি। আমার মনে হয়, ববীন্দ্রনাথের বিভ্রান্তি ঘটেছিল একটি জায়গায়। তিনি ইংরেজ-রাজশক্তির সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন—শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজ রাজশক্তি হয়তো পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের চেয়ে সত্যই সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল—কিন্তু আমাদের দেশে যে-রাজশক্তি ঔপনিবেশিক ভিত্তিতে শাসনদণ্ড গায়ের জোরে তুলে নিয়েছে—তাদের সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যের প্রশ্নই ওঠেনা। এখানে কবি খেয়াল করেননি গোড়াতেই ঔপনিবেশিক শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে—যেটিতে মূলতই তাঁর প্রবল আপত্তি। শরৎচন্দ্রের ক্ষোভ এখানে অমূলক নয়। রবীন্দ্রনাথের নিরপেক্ষ সত্য উচ্চারণ স্থান কাল ও পাত্রে সেদিন অপ-প্রয়োগই হয়ে গিয়েছিল।

তাঁর মত মহৎ মনীষার প্রতি এই নিয়ে অন্য ধরনের দোষারোপ আমাদের নিজেদেরই ব্রণসন্ধানী মক্ষিকাবৃত্তির প্রমাণ মাত্র। পূর্বে মুনিদেরও যেমন মতিভ্রম হয়েছে, আজও ঋষি-মানুষেরও কখনও অঙ্কে ভুল দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের

অনবধানতা ঘটেছিল একটি মূল বিন্দুতে। তাঁর বিচারের সেটিই হয়ত ত্রুটি।

শরৎচন্দ্র দেশবাসীর কাছে যতখানি নিন্দায় লাঞ্ছিত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। চিরদিন তিনি সমকাল থেকে অনেক বেশি অগ্রবর্তীকালের উপযোগী নানাবিধ সৃষ্টিকর্ম করেছেন। তাঁর মতামত ছিল দূরবর্তী আগামী কালের আর চিরকালের। তাঁর দৃষ্টি, মন ও চিন্তা, সাধারণত কোনও একটি বিশেষ কালকে না ছুঁয়ে সর্বকালকে ছুঁয়ে থাকত। এজন্য দেশবাসীর কাছে তিনি বিপরীত তাৎপর্যে গৃহীত হয়ে সর্বদা সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বিদ্ধ হয়েছেন। সমকালের কাছে তাঁকে অনেক অপযশ সইতে হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীতে পঞ্চদশ শতাব্দী ষোড়শ শতাব্দীর দূরদর্শী মনীষীদের ভাগ্যের মত ছিল এদেশে সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগ্য।

আমি শরৎবাবুর ঘনিষ্ঠ, এটি গুরুদেব জানতেন। আমাকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন—কি গো আধুনিকা, তোমাদের শরৎদাদার খবর কি বলো, শুনি। কী লিখছেন তিনি আজকাল?

কখনো বা বলেছেন—তোমাদের শরৎবাবু লোকালয় ছেড়ে বনবাসে অজ্ঞাতবাস নিলেন কেন বলো দেখি! শুনেছি, সেখানে পৌঁছতে হলে কঠিন দুর্গমপথ অতিক্রম করে যেতে হয়। তোমরা যাও কী করে?

বলেছি—পাল্কি চড়ে কনে-বৌয়েব মতন যাই। দশাসই মহাবীররাও কেউ কেউ কনে-বৌ হয়ে বেয়ারাদের—'হুঁ—ক্কী—ভারী'—'হুঁ—ক্কী—ভাবী'—সুরেলা গালাগালি শুনতে শুনতে—পাল্কীর নিচু ছাদের তলায় হেঁটমুণ্ডে শরৎদার বাড়ি সামতাবেড়ে যান।

কবি হেসে উঠেছেন। সব্বাইকে মুণ্ডু-হেঁট করিয়ে তিনি তাঁর কাছে নিয়ে যান—এই কথা বলতে চাইছো তুমি?—বেশ তো মজা!

জবাব দিয়েছি—তা বলতে পারেন বই কি! বেশ কষ্ট করেই ভক্তবা যান তাঁর কাছে। অনেকে পাল্কি চড়েন না। মানুষ হয়ে মনুষ্যবাহিত হতে চান না। এঁদের বর্ষাকালে দুর্গতির পরিসীমা থাকে না। জানেন তো, রাঁচি হাজারিবাগে এঁরা অনেকে পুশপুশে চড়েন না!

গুরুদেব কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছেন—তারা নিশ্চয়ই 'ব্রাহ্ম'।

আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিই—শরৎদা কিন্তু ব্রাহ্ম বলতে কোনও সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে 'ব্রাহ্ম' কথাটি লেখেননা। অনেকে কিন্তু বোঝেননা একথা।

গুরুদেব প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলেছেন—আমি কিন্তু তা বুঝি।

গুরুদেবের এই 'আমি কিন্তু তা বুঝি' কথাটি আমার মনের উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতা জুড়িয়ে শান্ত করে দিয়েছে।

গুরুদেব শরৎদার অনেক আঘাত অপরিসীম ক্ষমায় সহ্য করে গিয়েছেন। এ ক্ষমা এসেছে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থেকে। ঐ মানুষটি যে তাঁকে কোন্ চোখে দেখে, কতো বেশি শ্রদ্ধা আর ভক্তি করে, তাঁর অজানা ছিল না বলে কবির সহনধৈর্য কোনও দিন টলেনি।

সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঁপড়ের কামড়ে জর্জরিত হয়ে জ্বালাভোগ করতে হয়েছে তাঁকে। সজনীকান্ত কুশ্রী আঘাতে তাঁর শুভ্রতা কলঙ্কিত করে চলেছেন যখন, তখন কিন্তু সজনীকান্ত রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েননি। লেখার সম্যক পরিচয় দূরে থাক, আংশিক পরিচয়ও না জেনে লেখকের প্রতি 'অস্ত্রাঘাতে' মেতেছেন। পরে যখন তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের অমরাবতীতে প্রবেশ করেছেন, তখন সেই অস্ত্রধারী হাত দুখানিই পুজোর পুষ্পাঞ্জলিতে ভরে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের সাহিত্য-ঋণ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকাব করে গেছেন। রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগদান করে এসে অকপট উচ্ছ্বসিত আনন্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট সম্পাদক অমল হোমকে লিখেছিলেন—"সত্যি অমল, আমি যে কত খুশি হয়ে এসেছি...যে-ভাবে এই বিরাট ব্যাপারটি সম্পন্ন হল, এ অনুষ্ঠানটিকে যে নিষ্ঠায়, শ্রমে ও শ্রদ্ধায় সার্থক করে তুললে—তাতেই আমার আনন্দ, অকপট আনন্দ। কবির সম্বন্ধে আমি এখানে ওখানে মন্দ কথা বলেছি রাগেব মাথায়, এ যেমন সত্যি—এও তেমনি সত্যি যে, আমাব চাইতে তাঁব বড় ভক্ত কেউ নেই। আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশি মানেনি গুরু বলে—আমাব চাইতে কেউ বেশি মক্‌সো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমার চাইতে বেশি বার কেউ পড়েনি তাঁর উপন্যাস—তাঁব চোখেব বালি, তাঁর গোরা, তাঁব গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোক আমাব লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁবই জন্য।"

শরৎচন্দ্র এই চিঠিতে তাঁর সত্যকার হৃদয় উন্মুক্ত করে সঠিক বাক্য উচ্চাবণ কবেছেন। এমন করে খোলা গলায় ঋণ স্বীকারই বা আর কোন শিল্পীকে করতে দেখা গেছে বাংলা সাহিত্যে? অহংশূন্য শবৎচন্দ্র এখানেও দেখা যায় অনন্য।

শরৎচন্দ্রের শিল্প যে সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে গিযে পৌঁছেচে, এটি কবির কাছে অস্পষ্ট থাকেনি কোনওদিন। তিনি বার বারই শরৎ-সাহিত্যকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রকে সুপরামর্শ দিয়েছেন, বিভ্রান্তি থেকে সতর্ক করতে চেয়েছেন।

শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানি কেউ কেউ পড়েছেন, অনেকেই হয়তো পড়েননি। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল, এই চিঠি থেকে বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে লিখছেন—"...আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেননা, নাটক সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয, —আমার বিশ্বাস, তোমার কলম ঠিক ভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেননা, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এদেশের লোকযাত্রার সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত

কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তা হলে তোমার শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পেকটিভ সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিকে যায় —কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ, সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবেব ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এ কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তা রূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জকের আধুনিক কালের চলতি সেন্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি—৪ ফাল্গুন ১৩৩৪।

তোমার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরৎচন্দ্র এ চিঠির জবাবে সামতাবেড় থেকে ২৬শে ফাল্গুন ১৩৩৪ তারিখে যে জবাব লেখেন তাতে লিখেছেন—"এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি, এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সংকীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেচি—এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয়, তখন ঠিক কিভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি, উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে। এক দিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভাল কি না এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জম্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয়, এই বইখানাই তার

একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেইজন্যই হল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। এই উপায়ে সাধারণেব কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হলো না। এ আমার বাইরে পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এক সময়ে আমি ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ডু, ওর ধড়, তার পা এক করে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরেব বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চবিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়াতাড়া দিয়ে উপস্থিত মতে লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়, এবং উত্তবকালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে।...সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এত কাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হযে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।...আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু' একটা লেখার ইচ্ছা হয়, কিন্তু বাধা বিস্তব। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠক সমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকেব পবীক্ষক কে বোঝা কঠিন। থিয়েটার-বালাবা না বোকা-দর্শকরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়। ...আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সে-ও যে শাস্তি দেয়।''

শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথে সম্পর্ক কেমন ছিল, দেশের সাধারণ মানুষদের জানার ঔৎসুক্য লক্ষ্য করে আমি এই পুরানো চিঠি একটু বিশদ করে উদ্ধৃত করলুম। পণ্ডিতেরা সকলেই অবশ্য এ চিঠির সঙ্গে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের এ চিঠির জবাবে যা লিখেছিলেন তা সর্বকালেব সব সাহিত্যিকদেরই জন্য। সকল কালের নতুন সাহিত্যিকদের এ নির্দেশ গ্রহণীয়। এ নির্দেশ পুরোনো বলে পরিহার করার মত নয়। শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির মনের সংবেদন যেমন ছিল 'দেশে'র পাঠক সাধারণের গোচরে আনার জন্য কবির চিঠিখানির আরম্ভটুকুও তুলে দিচ্ছি।

''কল্যাণীয়েষু—আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম।

ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্তমানের ভোগ বর্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়—রাজ্য সাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে, বর্তমানের কোন প্রলোভন এসে তপোভঙ্গ না করে, এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি।

বর্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্তলোকে এসেছে, তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে, সাপ্তাহিকে, সভা-সমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর বাঁশে বাখারিতে তৈরি ; তোমরা সেখানে যদি পা দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ 'উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার'। সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত, যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্তমান কালেব একটা বৃহৎ অংশ আছে যেটা ক্ষণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক ডিমক্রাসিব যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এ ফরমাস এড়িয়ে চলা এখনকার কালে একটা বিষম সমস্যা। এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশেব মুখে মুখে কেবল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্বত্র পুনরাবৃত্তিব জন্য উন্মত্ত। তোমাদের মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়—তোমাদের খাঁচাব পাখী না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে, কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎকালে বৃহৎদেশে।

দাশুরায়ের আমলে উপস্থিতকাল দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে-চেক সই করেছিল, আধুনিক কালের অঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ ময়মনসিংহের গাথা-কাব্য লোকসাহিত্য আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা, কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশুরায়েব শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। ময়মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েছে, এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মত সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে।

আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি, তাতে তুমি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্তি দিয়েচ—দশের বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগা দেগে দিতে পারেনি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিল। তোমার এখনকার

লেখা পড়তে ভয় হয়, পাছে চোখে পড়ে যে তোমার কলমেব উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেচে। সে এত বড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।...একটা কথা মনে রেখো; আমি তোমার নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম, যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত, তা হলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে। যদি সেটাকে রক্ষা কবে থাকো তা হলে বলবার কথা কিছু নেই—যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোন দিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে।"

এই চিঠিতে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথের ঋষিদৃষ্টিতে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার মান কোন্ অঙ্কের সেটি বুঝে নিতে গোলমাল হয়নি। তাঁর দাশুরায় আর মযমনসিংহ গীতির তুলনাটিও অনবদ্য।

শরৎচন্দ্রের মুখে আমি কোনও দিন ববীন্দ্র-বিদ্‌ষণ শুনিনি, যদিও তখন তিনি কাগজে পত্রে লেখায় যথেষ্টই বিরুদ্ধতা করছিলেন। আমাকে রাগিয়ে তুলতে 'তোমার গুরুদেব' বলে অনেক সময় হাল্কা ঠাট্টা তামাশা প্রায়ই করতেন। যেমন রামানন্দবাবু ও রবীন্দ্রনাথেব দাড়ি নিযে অনেক রকম হাসির গল্প বানিয়েছিলেন। তাঁর একদল স্তাবকও ছিল যারা ঐ ধরনের গল্পে সর্বদাই মালমশলা জোগাত। আমি কবি সম্পর্কে সামান্য পরিহাসও সইতে পারতুম না বলে শরৎদা পাঁচজনের সামনে কবিকে নিয়ে পরিহাস শুরু করে আমাকে বিচলিত করতে চাইতেন। এটি তাঁর স্কুলবালকসুলভ কৌতুককর খেলার মত ছিল। আমাদের কাছে যদিও এটি খেলা ঠেকত না, অপরাধ ঠেকত।

২৭

শবৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছি মানসিক প্রবল অস্থিরতা নিয়ে তিনি শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব লিখেছিলেন। লেখার সময়ে নাকি তাঁর মনে, তাঁর বিশ্বাসের গভীরে একটি প্রচণ্ড ধাক্কার চাপ চলছিল। কিসের সে ধাক্কা?—স্পষ্ট করে তো কিছু খুলে বলেননি কখনো। বলা হয়তো সম্ভবও ছিলনা।

আমার নিজেব ধারণা, শ্রীকান্ত ৩য় পর্বের আগে পর্যন্ত তিনি নিরুপমা দেবীর মতামত পত্রযোগে পেয়েছেন। 'শেষ প্রশ্ন' থেকে নিরুপমার মতামত আর তিনি পাননি।

নিরুপমা দেবীর রচনার প্রতি শরৎদার কিছুটা অন্ধতা ছিল, আমাদের তখন মনে হত। তখনকার দিনে বাংলায় অনেক খ্যাতনামা উপন্যাস লেখক লেখিকা ছিলেন। এঁদের সকলের মধ্যে শরৎচন্দ্র নিরুপমা দেবীর লেখা সর্বোৎকৃষ্ট বলতেন। আমার

মনে আছে, ১৯৩২ কিংবা ১৯৩৩ হবে, শরৎদা লিলুয়ার বাগানে উপস্থিত হয়ে গল্প করেছিলেন, অনুরূপা দেবীর চেয়েও নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের সেল অনেক বেশী। এই সূত্রে তিনি নিরুপমার লেখার গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টির উচ্ছ্বল প্রশংসা করেছিলেন। শরৎদার সেই গৌরব উদ্ভাসিত উজ্জ্বল মুখ আমার স্পষ্ট মনে আছে। শৈলবালা ঘোষজায়ার বিদ্রোহী সুরের লেখা আর অনুরূপা দেবীর লেখা তখন সাহিত্যবাজারে সামনের সারিতে। এঁদের লেখা শরৎচন্দ্রের পছন্দ ছিল না তেমন। অনুরূপা দেবী সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিরাগ তাঁর রচনার প্রতি বিমুখতার কারণ হলেও হতে পারে হয়ত।

নিরুপমা দেবীর শরৎদার প্রতি কিরকম মনোভাব ছিল, অনেকদিন অনেক বার তখন ভেবেছি। তাঁর মনের খবর পাইনি। শ্রীকান্ত ৩য় পর্বে শ্রীকান্তর প্রতি আনন্দর একটি কথা মনে পড়ে,—"না দাদা, আপনাকে ভোলাও শক্ত, বোঝাও শক্ত, মায়া কাটানো আরও শক্ত।" এইটিই হয়ত বা নিরুপমার জীবনে সত্য হয়ে উঠে থাকতে পারে। জানিনা।

'শেষ প্রশ্ন' লেখার সময়ে তাঁর মনে নাকি একটি বড় পরিবর্তন এসেছিল তিনি বলতেন। তিনি গ্রন্থ সমালোচনায় 'শেষ প্রশ্নে'র বিরুদ্ধ-সমালোচনা পড়ে বিচলিত হয়ে একদিন উত্তেজিত সুরে বলেছিলেন, আমার আগেকার লেখা বইগুলোর সঙ্গে এই লেখার যে কোনই যোগ নেই, এটি তো স্পষ্টই খোলা। আমার আগেকার বইগুলোতে যে-কথা বলতে চেযেছি, এখানে তার চিহ্ন থাকবে কেন? যুগে যুগে মানুষ বদলে যাচ্ছে,—চিন্তাধারারও দিক্ বদল হচ্চে। এটা পুরোই ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার কথা। কমলকে তাইজন্যেই ইংরেজ রক্তের মানুষ করে গড়তে হয়েচে। ঐ চিন্তাভাবনা, যুক্তি, ঐ আত্মনির্ভরতা, আত্মশ্রদ্ধা বাঙালীরক্তে সম্ভব নয়। কমলের মুখের কথা একটিও অবাস্তব নয়, অসত্য তো নযই। অস্বচ্ছও নয় বলতো পারো। ...কিন্তু, তোমরা মেয়েমানুষবা এমনই এক আশ্চর্য জীব, পাছে নিজস্ব বিশ্বাসে ঘা লাগে, তাই বইখানা খুলে পড়তেই তোমরা নারাজ। অদ্ভুত বটে।

আমি তখন তাঁব এই ধরনের কথাবার্তার মানে একেবারেই বুঝতে পারতুমনা। কাকে লক্ষ্য করে যে কী বলছেন—অর্থ বুঝতে না পেরে অস্বস্তিতে ছটফট করেছি। 'তোমরা' 'তোমাদের' বাক্যগুলো বা 'মেয়েমানুষ' বলতে পাঠিকাসমাজ বলেই তখন অনুমান করেছি। তাঁর ধারণা যে ঠিক নয় এটি বোঝাবার জন্য প্রতিবাদ করে কিছু বলতে চেষ্টা করেছি—তিনি তখন অসহায় হাসি হেসে আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন—ভাল করে ভেবে দেখো—পরে আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবে। এখন তর্ক কোরনা। এ-সব জিনিস তর্কের বস্তু নয়, মানুষের নিজের অভিজ্ঞতাগত জীবনসত্য।

অনেকদিন পরে তাঁর 'তোমরা' 'তোমাদের' শব্দগুলোর অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি নিজের স্থূলবুদ্ধির অহংকারে তাঁর সঙ্গে

তর্ক করতে গেছি বলে। সব সময়েই যে তাঁর ইঙ্গিতময় ভাষার সব অর্থ বুঝতে পেরেছি, তা নয়, এখন মৃত্যুর আগে কুণ্ঠিত চিত্তে সেকথা নতমাথায় স্বীকার করে যাচ্ছি। তখন নিজের অজ্ঞতা ঢাকা দেবার প্রবল সতর্কতা সর্বদা খাড়া সেপাই হয়ে আমার মনকে পাহারা দিতো। শরৎদার কথা বুঝতে না পেরেও, বুঝতে পারার ভঙ্গি করেছি নিঃশব্দে। এখন সে সব কথা মনে পড়লে খুবই কষ্ট হয়, লজ্জা হয়। কত দুর্বল এবং নির্বোধ ছিলুম তখন আমি। শরৎদা নিশ্চয়ই বোধ হয় বুঝতে পারতেন—আমি না বুঝেও বুঝতে পারার, বিজ্ঞতার ভান করছি।

আমি জানি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশমান শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব পর্যন্ত তিনি নিরুপমার নিজস্ব মতামত পেয়েছেন পত্রযোগে। শেষপ্রশ্ন থেকে তাঁর কোনও মতামত শরৎদা আর পাননি। চিঠিপত্রের যোগাযোগ বোধহয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকবে। এইটি বন্ধ হবার পরে শরৎচন্দ্রের লেখার উৎসাহ আর বেশি ছিলনা। শরীরও তখন তাঁর দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। নিরুপমার চিঠিপত্র বন্ধ (সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছিল কিনা সঠিক জানি না) হওয়ার পরে শরৎচন্দ্রের কলমের আর 'মুখচাওয়া'র কিছু ছিলনা মনে হয়। তাঁর বিভিন্ন সত্যোপলব্ধি উচ্চারণে বাধাবন্ধনহীন মুক্তিও বোধ হয় এই সময়ে কিছুটা অনুভব করে থাকতে পারেন। সবটাই তাঁর নিজস্ব মনেরই ব্যাপার। নিজেরই স্বতঃপ্রবৃত্ত বন্ধন আর তা থেকে মুক্তি।

শরৎচন্দ্রের রচনায় মানুষের অন্তর্জীবনের রূপ আর নিরুদ্ধ হৃদয়ের ভাষা প্রকাশিত হয়েছে। এ ভাষা তো অক্ষরের শব্দে ঠিক ফোটেনা,—সেজন্য তিনি ইঙ্গিতের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর নায়ক-নায়িকারা আচরণের মধ্যে তাদের অন্তরের ভাষাকে পাঠকের অনুভববেদ্য করে তোলে।

শরৎদা একদিন বলেছিলেন—একবার ওর উপন্যাসের একটা অংশ পড়ে এতই ভালো লেগেছিল—সে লেখাটিকে সোনার কলম দিতে ইচ্ছে হোলো। পাঠিয়েছিলুম ওর জন্যে একটা কলম ; ঐ সঙ্গে ওর দাদাকেও দিয়েছিলুম অন্য আর-একটা কলম। কলম ওরা ফেরৎ পাঠিয়েছিল আমাকে। বুড়ি রাগ করে চিঠিও লিখেছিল।...মজা এই, আমি পাঠালুম একটি সুন্দর লেখাকে অন্য এক লেখকের স্বীকৃতি সম্মান, মনের খুশির প্রতীক। সেটা গৃহীত হল সম্পূর্ণ বিপরীত আর-এক-কোনো অর্থে। ...কী আর হবে! সংসারে এমনিই হয়।

শরৎচন্দ্র বেশি কিছু বলতেন না। মনের বিশেষ মুডে থাকলে—নিঃসঙ্গ থাকলে, আপনা হতেই কখনো একটু আধটু বলতেন। ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাস এসেছিল মনে, আমি এই বিষয়ে কারো কাছে মুখ খুলিনা। খুলিওনি আমি তাঁর কাছে বাগ্‌দান ভঙ্গ করে। শরৎদারই প্রয়োজনে আর সাহিত্য ইতিহাসের প্রয়োজনে মুখ খুলতে হোলো আমার নিজের জীবনের অন্তিম পর্বে এসে। এসব কথা লিখতে কিন্তু আমার খুবই কষ্ট হয়। স্নায়ুর উপরে প্রবল চাপ অনুভব করি।

শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্বে শরৎদা রাজলক্ষ্মীর দীক্ষাগ্রহণ, মস্তকমুণ্ডন ও কাশীবাসের মধ্যে তাঁর মনের গভীর ক্ষোভ ও বেদনা কিছুটা ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর সুদীর্ঘকাল কাটলো। শরৎচন্দ্র এবার 'শেষ প্রশ্নে' চড়া পর্দায় নতুন সুর তুললেন। কিন্তু ওধারের নিঃশব্দতা ভঙ্গ হল না। চতুর্থ পর্বে তাঁর কল্পনার নায়িকা কমললতাকে গড়ে তুললেন। এবারে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বোঝাপড়াটি তিনি পাকাপাকি করে ব্যবধানটি সম্পূর্ণভাবে তুলে নিলেন। কিন্তু—শরৎচন্দ্রের কাছে নিরুপমার মতামত আর কোনওদিন আসেনি।

এইটিই তাঁর শেষজীবনের গভীর বেদনা ছিল। নিজের মুখে বলেছেন—মেয়েরা নিজের সুখদুঃখ নিজের স্বার্থের চেয়ে আর কিছু বড়ো অনুভব করে না। বুড়ি সাহিত্যচর্চা একেবারেই ছেড়ে দিলে। বেঁচে থেকেও সে আত্মহত্যা করলে। লেখা বন্ধ না করলে সে বাংলা সাহিত্যকে কিছু দেবার মতন জিনিস দিয়ে যেতে পারতো। কলম ফেলে দিয়ে গীতা উপনিষৎ জপের মালা নিয়ে মোক্ষলাভ করতে ছুটলো। শেষতক কী পাবে, তার গুরুই তা ভাল করে জানে।

হিরণ্ময়ী দেবী এবং নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের জীবনে একেবারে বিপরীত কোণের দুটি নারী। একজন অন্যজনের সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে কেবলমাত্র সেবিকার ভূমিকায় ছিলেন। শরৎচন্দ্রের চিন্তাজগতের বা শিল্পভাবনার সঙ্গী হওয়ার তাঁর কোনই উপায় ছিল না। শিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখক-অস্তিত্ব হিরণ্ময়ীর কাছে গভীর অন্ধকারের অদৃশ্য সামগ্রী ছিল। তিনি বই লেখেন, সেজন্য সকলেই তাঁকে সম্মান করে, অনেক টাকা দেয়, এইটুকুই মাত্র তাঁর বোধে পৌঁছুতে পেরেছিল, এর বেশি আর কিছু নয়।

হিরণ্ময়ীর আত্মসমর্পিত সেবাপরায়ণতা শরৎচন্দ্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। অবোলা প্রাণীর প্রতি তাঁর যে বহুপ্রসিদ্ধ মমতা ছিল, হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতি সেই করুণাঘন মমতারই রূপ যেন উৎসারিত দেখেছি। এই বিদ্যাবুদ্ধিহীন সরল সহজ মানুষটির বিশ্বস্ত আত্মনিবেদনের প্রতিদানে তাঁর প্রতি স্নেহের কর্তব্যে তাঁর ত্রুটি দেখিনি।

নিরুপমার কাছে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পীসত্তার স্বীকৃতি, সম্মাননা, অভিনন্দন। নিরুপমা তাঁকে আত্মবিশ্বাস আত্মশ্রদ্ধা এনে দিয়েছিলেন তাঁর শিল্পলোক যাত্রার প্রথম প্রভাতে। তাঁর শ্রদ্ধা, তাঁর বিশ্বাস শরৎচন্দ্রকে নিজের সম্পর্কে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। নিরুপমা শরৎচন্দ্রের মনোজগতেই আরাধ্য হয়ে কাটিয়ে গেছেন, বাস্তবে থেকেছেন বহু দূরে। চিঠিপত্র ছাড়া তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলনা। কাছাকাছি হওয়া যে কল্যাণপ্রসূ নয় এটি নিরুপমা শুধু নয়, শরৎচন্দ্র নিজেও ভাল করেই জানতেন। তিনি নিজেও তাঁর সান্নিধ্য থেকে তফাতে থাকাটাই মঙ্গলকর মেনে নিয়েছিলেন জীবনে। এর জন্য হয়তো মানসিক আকর্ষণ গাঢ়তরই হয়ে উঠেছে উভয় পক্ষেই। ফলে, একজন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে, সাত্ত্বিক নিয়মবিধি

পালনে নিজেকে স্বনির্দিষ্ট আদর্শকারায় বন্দী রাখতে চেয়েছেন—অন্যজন নিজের প্রতি বীতরাগ হয়ে, দেশ ছেড়ে, সাহিত্য-সাধনা ছেড়ে সুদূর প্রবাসে ছন্নছাড়া হয়ে জীবনের নতুন পথ খুঁজে বেড়িয়েছেন।

কখনো বসে বসে মহাশ্বেতার ছবি এঁকেছেন, কখনো সঙ্গীত নিয়ে সুরচর্চায় মেতে থাকতে চেয়েছেন, নিবিষ্ট মনে জগতের নানা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গভীর পড়াশুনোয় ডুবে থাকতে চেয়েছেন। মৌলিক সাহিত্য-আসক্তি তাঁর ভিতরে পুঞ্জিত হতে থাকলেও, কলম তিনি সে সময়ে আর স্পর্শ করেননি।

প্রথম জীবনে তাঁর প্রধান এবং মূল আনন্দ আর আকর্ষণ ছিল সাহিত্য সাধনায় মগ্ন থাকা,—সেটি তিনি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন দেশত্যাগের পরে। মনে হয় তখন তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সামগ্রী কলমটিকে ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন স্বদেশে অন্য একজনের হাতে। নিজে তুলে নিয়েছিলেন রং, তুলি, গানবাজনা আর পড়া।

সাহিত্যলক্ষ্মী নিজেই এবার এগিয়ে এলেন সর্বত্যাগী ছন্নছাড়া ছেলেটির কাছে। বন্ধুদের কাছে ছড়িয়ে ফেলে রেখে আসা প্রথম যৌবনের সেই লেখাগুলিরই সামান্য কিছু-কিছু তাঁর সাহিত্যসঙ্গীরা ছাপিয়ে দিলেন বিভিন্ন পত্রিকায়, লেখকের বিনা অনুমতিতে, লেখকের অজ্ঞাতসারে।

শরৎচন্দ্র নিজের লেখা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাগজে পাঠাননি। অন্যে পাঠিয়েছেন নিজেদের আগ্রহে। 'বড়দিদি' ভারতীতে ছাপার পরেই লেখার তাগাদার বন্যা এলো। বন্ধুদের কাছ থেকে, সম্পাদকদের কাছ থেকে, প্রকাশকের কাছ থেকে। তিনি নিজে এগিয়ে এসে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হননি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাবাজীবন একজন লেখক কোনওদিনই নিজের লেখা ছাপার জন্য কারো দ্বারস্থ কখনো হলেননা, এমন ব্যাপার আর কোথাও কখনও ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই সেই ব্যতিক্রমী লেখক, যাঁকে ছাপাবার বা বই ছাপাবার জন্য নিজেকে কখনো উদ্যোগী হতে হয়নি।

আমি এর আগেই উল্লেখ করেছি, শরৎচন্দ্রের নিজের প্রতি একটি অদ্ভুত বিরাগ ছিল। নিজেকে এমন তাচ্ছিল্য করতে, বিদ্রূপ করতে অন্য কোনও মানুষকে আমি দেখিনি আমার জীবনে। এই প্রবল আত্মবিমুখতা কেন? এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরী মশায় একদিন আমাকে একটি কথা বলেছিলেন, সেটিই আমার মনে বিদ্ধ হয়ে আছে।

প্রমথ চৌধুরী মশায় তাঁর শেষজীবনে প্রায় প্রত্যেক দিনই তাঁর বৈকালিক বেড়ানোর শেষে আমাদের বাড়ি ঘণ্টা দুই সময় কাটিয়ে যেতেন। শেষে যখন দোতালায় উঠতে বেশ কষ্ট হত, আমি নীচে নেমে তাঁর গাড়িতে গিয়ে বসতাম, গাড়ি লেকে গিয়ে ধীরে ধীরে চক্র দিয়ে ঘুরতো। অনেক সময়ে থেমে দাঁড়িয়েও

থাকতো, তিনি বসে গল্প করতেন। গল্প করতে ভালবাসতেন তিনি। সাহিত্য ছাড়া অন্য কোনও বিষয় কদাচিৎ আলোচনা করতেন। শরৎ সাহিত্য এবং শরৎচন্দ্রকে নিয়েও তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হত। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং পুলিনবিহারী সেন প্রমথ চৌধুরী বিষয়ে লেখার জন্য আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছেন। আমি তাঁর সম্পর্কে লেখার যোগ্যতা নিজের মধ্যে অনুভব করিনা কোনওদিন। কখনও কলম ধরিনি তাঁর সম্পর্কে, ধরতে আজও ইচ্ছুক নই। সব মানুষকে সঠিকভাবে ব্যক্ত করার মত শক্তিমান কলম আমার নয়, এই আমার বিশ্বাস।

শরৎদা সম্পর্কে তিনি একদিন যে-কথা আমাকে আমাদের বৈঠকখানায় বসে বলেছিলেন, সেইটি আজ বলব।

আমি চৌধুরীমশায়কে বলেছি একাধিক দিন, শরৎদা নিজেব সম্পর্কে নিজে কত মন্দ কথা বলতেন। নিজেকে যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেন। এব কারণ কি?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—মনে হয়, যে-জীবন তাঁর রুচিবিগর্হিত ছিল, যে পথ তিনি ঘৃণা করতেন, সেই পথেই তিনি নিজের জীবন টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। অল্পবয়স থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত যে দিকে তিনি হাঁটলেন, সে দিকটি যে ভুল-দিক, এটি যখন তাঁর চৈতন্যে এলো, তখন ক্ষতিবোধে এতই আহত হয়ে থাকলেন নিজের সর্বনাশেব দিকে তাকিয়ে,—যাব ফলে, সারাজীবনে নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি।

নিজেব নামে মিথ্যা-কলঙ্ককাহিনী শুনেও অবিচলিত ঔদাস্যে থাকা, নিজের নেশাভাঙ, নিষিদ্ধ পল্লীর অভিজ্ঞতার কাহিনী শ্রোতাব নিন্দাযোগ্য কবে অদ্ভুত বর্ণনায় বলা,—এসবের কারণ, তাঁর আত্মধিক্কার।

শরৎদার কথাবার্তার মধ্যে নিজেব প্রতি নিষ্করুণতা দেখে আমাব বিস্ময়-বিমূঢ়তাব কিনারা ছিল না। চৌধুরীমশায় বলেছিলেন—এটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া। দারিদ্র্যে তাঁব সহজপ্রকৃতি মিলত না, অথচ দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁকে বেড়ে উঠতে হয়েছিল। আত্মসম্ভ্রমবোধ তাঁর সহজাত ছিল, অথচ বাপ মাকে মামার বাড়িতে কুণ্ঠিত জীবনযাপন করতে দেখতে হয়েছিল। এর বিদ্রোহে নিজে বেপরোয়া হয়ে নিজেকে ছোটো থেকেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলেছিলেন। নিজে যা হয়ে উঠেছিলেন, তা তাঁর নিজস্ব প্রকৃতির পছন্দসই ছিলনা নিশ্চয়, তাই সর্বদা নিজেকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন।

আমি জানিনা, চৌধুরীমশায়ের কথাব মধ্যে কোনও বিজ্ঞানসম্মত মনস্তাত্ত্বিক সত্য আছে কি না। তবে এইরকমই কোনও একটা কিছু বিরুদ্ধ দ্বন্দ্ব যে শরৎদার মধ্যে ছিল, এটি অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন।

২৮

আমার স্বামী স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেব 'শরৎচন্দ্র' নামে শরৎদার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছিলেন একটি মনঃক্ষোভ নিয়ে।

তিনি বইখানির ভিতরে নিজেকে কোথাও রাখবেননা, কেবলমাত্র শবৎচন্দ্রেরই কথা লিখবেন এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে কলম ধরেছিলেন। ফলে, লিখবার সময়ে তাঁর যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছিল। নিজের জানা অনেক ঘটনা, অনেক গল্প কিছুই দিতে পারলেননা—নিজেকে নিশ্চিহ্ন রাখার ইচ্ছায়। তিনি যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েও নিজেকে অপরিচিতের মতই দূরে সরিয়ে রাখলেন। ফলে, বইখানিতে যতটা বাস্তবতার স্পর্শ আসত এবং প্রাণ সঞ্চারিত হত তা হলনা। তিনি বর্মায় শরৎচন্দ্রের একটি ছেলে হয়েছিল প্রধানত এই তথ্যটি বাঁচাবার জন্য কলম ধরলেন তাঁর তিরোধানের বছরেই কয়েক মাসের মধ্যে। তমাললতা বসুর লেখা তথ্য, সম্পাদকের সম্পাদনায় পরিবর্তিত হওয়ায় বন্ধুবান্ধবের: অনেকে বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। যেহেতু, একটি সত্য-তথ্য এর ফলে মিথ্যায় পরিণত হয়ে থাকবে। একদল আপাতকালে বদ্ধ দৃষ্টি মানুষ বলেছিলেন—ওটা চাপা থাকাই ভালো। প্রকাশ কবার দরকার কী? অন্যদল এর বিবোধী ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, শরৎচন্দ্রের জীবন, ছকে-বাঁধা অন্য সব-মানুষের জীবনের মত নয়। তাঁব জীবনে যতটুকু যা সত্যই ঘটেছে—তা প্রকাশ থাকলে ভবিষ্যৎকালে এই মানুষটির চরিত্র ঠিকমতন লোকে বুঝতে পারবে। শিল্পীর জীবন, সাধাবণ মানুষের মতন প্রায়ই হয়না, আমার স্বামী শেষোক্ত দলেব সঙ্গে একমত ছিলেন।

স্বর্গীয় নবেন্দ্র দেবেব লেখা 'শরৎচন্দ্র' জীবনীতে মোটামুটি তাঁর সব তথ্যগুলি দেওয়া আছে, হিবণ্ময়ী এবং নিরুপমা দেবীর তথ্য ছাড়া। স্বর্গীয় জলধর সেন বইখানিব ভূমিকায় লিখেছিলেন—

"শ্রীমান নবেন্দ্র যে শরৎচন্দ্রের পবম স্নেহাস্পদ ও একান্ত অন্তবঙ্গ বন্ধু,—একথা অনেকেই জানেন। আমারও আগে নরেন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে। স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সহায়তায় ১৩১৯ সালে শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীমান নরেন্দ্র পরিচিত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের নিকট-আত্মীয়গণ এঁকে চেনেন। শিবপুরের বাটীতে প্রায় প্রতি রবিবারেই এঁকে যাতায়াত করতে দেখেছি। সামতাবেড়ের বাটীতেও ইনি একাধিকবাব গেছেন জানি। শ্রীমান নরেন্দ্রের বালিগঞ্জের বাটীতে শরৎচন্দ্র প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় উপস্থিত থাকতেন।

শরৎচন্দ্রের জীবনেব নানা ঘটনা তাঁর নিজের মুখ থেকে শুনবার এঁর অনেক সুযোগ ঘটেছে। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের অন্তঃপুর হতে এবং তাঁর অনুজ শ্রীমান প্রকাশচন্দ্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণের নিকট ইনি অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সুতরাং এঁর রচিত শরৎচন্দ্রের জীবনী সর্বরকমেই নির্ভরযোগ্য মনে করি।

এই গ্রন্থখানির মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। শরৎচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে নানা ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও শ্রীমান নরেন্দ্র এই জীবনী রচনায় নিজেকে সতর্কভাবে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখেছেন। বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোথাও আত্ম-বিজ্ঞাপনের এতটুকুও চেষ্টা করেননি। বইখানি একেবারেই 'আমিত্বে'র অহংকার শূন্য। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের স্বল্প আয়তনের মধ্যেই ইনি শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেক অপ্রকাশিত নূতন অধ্যায় আমাদের সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন, সেজন্য আমরা এঁর নিকট কৃতজ্ঞ। ইতি—শিবচতুর্দশী। ১৩৪৪

শ্রীজলধর সেন।"

ভূমিকাটির মধ্যে জানা যায়, তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ ছিলেন। জীবনীর মধ্যে প্রদত্ত তথ্যগুলি তিনি কোথায় কবে কেমনভাবে পেয়েছিলেন সেটিও লেখা থাকত, যদি বইয়ের পাতায় নিজেকে না-রাখাব ঝোঁকটি তখন তাঁর মাথায় না আসত। তথ্যগুলি যথেষ্ট দৃঢ়ভিত্তিক হতে পারত সন্দেহ নেই। অবশ্য প্রকাশবাবু ও জলধরবাবু লিখেছেন তাঁব তথ্যে অসত্য বা অতিরঞ্জন নেই। তাঁরাও ঐ তথ্য জানতেন, সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এই তথ্য যাঁদের অবিদিত নয় আমি বার বাব এখন তাঁদেরই মুখে প্রশ্ন শুনছি —কোথা থেকে আমি জানলাম শবৎচন্দ্র ব্যাচেলার? এর উত্তর শবৎচন্দ্রের কণ্ঠেই দিতে চাই।

"—এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইযো না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক, তাহাকে দমন কবায পুণ্যও সংসারে অল্প নয়!

যে-বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেবায় একেবারে উপব পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত, থাক না। কি সেখানে আছে, নাই-বা জানা গেল। কি এমন ক্ষতি?...

—জগতে মানুষেব এমন কথাও থাকিতে পারে, যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও, তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।"

(*শরৎচন্দ্র*—৩য় খণ্ড পত্রাবলী—২২৫ পৃষ্ঠা। পত্র-সংকলক : গোপালচন্দ্র রায়।)

আমি আগেই লিখেছি, তথ্যগুলি যে ভুল নয়, কাল্পনিক নয়, এর প্রমাণ গবেষকরা একটু খোঁজখবর করলে সঠিক পেয়ে যাবেনই। আমি একা নই, আরও অনেকেই জীবিত আছেন, যাঁরা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ জানাতে পারবেন। আনুমানিক তথ্য আমি লিখিনা। উত্তরপুরুষদের কাছে আর শরৎ-সাহিত্যের প্রতি অপরাধ কবা হবে, যদি আমরা বদ্ধমূল সংস্কার আর আপাত স্বার্থ-সুবিধার দিকে তাকিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনে ভুল-তথ্য সাজিয়ে রেখে যাই। যে-শক্তিবলে মিথ্যাকে সত্য, আর সত্যকে মিথ্যা করা হয়ে থাকে সংসারে,—সে শক্তি আমার নেই। নিন্দা আর প্রশংসা, দুটিই

আমার এ বয়সে এখন সম-অনুভবের। কেবলমাত্র নিজের সততার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও আমার জবাবদিহি নেই।

বার বার কবির কর্ণ-কুন্তী সংবাদের দুটি পংক্তি মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে—

"ধনলোভে, যশলোভে, বাজ্যলোভে অয়ি
বীরের সদগতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

সৎ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট না হওয়া, মানবজীবনে বীরত্বেরই সুকঠিন পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন, যাঁরা পারেন,—তাঁরাই হয়তো জানেন, অন্তর্জীবনে নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রাপ্তির পূর্ণতাসুখ কেমনতর। কোনো যশস্বী, ধনী, ক্ষমতাবান মানুষ এই পূর্ণতা সুখের আস্বাদ পান কিনা জানিনা।

নিজেকে আদর্শবাদী বলার মূঢ়স্পর্ধা বিন্দুমাত্র রাখিনা আমি। তবে, সাহিত্যজীবনে সারাজীবনই নিজস্ব একটি আদর্শবাদে অনড় থাকতে চেষ্টা করেছি বরাবর। যশলোভ বা অর্থলোভে প্রলুব্ধ হইনি।

সংসার থেকে আমি বিদায় নেবার আগে আমার দেশবাসী কোনো লোভেব কলঙ্কে কলঙ্কিত করবেননা আশা রাখি। কারণ, যশ আর অর্থ এই দুটি প্রলোভন বা 'মার'কে আমি সাহিত্যের নির্মল তপস্যায দূরে রাখতে পেরেছি, এই একটিই মাত্র আত্মতৃপ্তি আমার জীবনে। অপ্রিয় সত্য যদি কিছু উচ্চারণ করে থাকি, তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি, কিন্তু তথ্যে যে আমার ভ্রান্তি বা অতিরঞ্জন নেই, তাঁরা নিশ্চয় তা জানবেন।

মনে ক্লান্তি আর ঔদাস্যের ভার। কলম থেমে থাকতে চাইছে। শরৎদার চিঠিপত্র, ছাপা বইগুলি নাড়তে-চাডতে ভালো লাগছে। এখানে তাঁর সেই কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কখনও উৎসাহে উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত, কখনও উদাস বিষণ্ণতায় করুণ, গূঢ় ব্যঙ্গে তির্যক, তীক্ষ্ণ। শরৎদার কণ্ঠে তাঁর কথাই কিছুক্ষণ পাঠকরা শুনুন না হয়। আমার স্বব একটু বিরতি নিক।

"অনেক সময়েই যে তুমি আমার কথা মনে করিবে, তাহা আমি জানি। কেননা, যাদের মনে করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তারাও যখন করে, তখন তুমি ত কবিবেই।

আমার ভাগ্যবিধাতা আমার সমস্ত শাস্তির বড় এই শাস্তিটা জন্মকালেই বোধ হয় আমার কপালে খুঁদিয়া দিয়াছিলেন।

আজ যদি আমি বুঝিতে পাবিতাম, আমার পরিচিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবেরা সবাই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি সুখী হইতাম, শান্তি পাইতাম। তা হইবার নয়। আমাকে ইঁহারা স্মরণ করিবেন, সন্ধান জানিতে চাহিবেন, বিচার করিবেন এবং অনবরত আমার অধোগতির দুঃখে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মর্মান্তিক দুঃখের বোঝা অক্ষয় করিয়া রাখিবেন।

লোকে যে আমার কাছে কি আশা করিয়াছিলেন, কি পান নাই, এবং কি

হইলে যে আমাকে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, এ যদি আমাকে কেহ বলিয়া দিতে পারিত, আমি চিরটা কাল তাহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিতাম।"

"নিরপেক্ষতা সত্য—এইটাই আমি সাহিত্যে চাই। এর মধ্যে খাতির চাই না।...যদি আংশিক পরিবর্তন কেহ প্রয়োজন বিবেচনা করেন, তাহা কিছুতেই হইতে পারিবে না, উহার একটা লাইনও বাদ দিতে দিব না।...আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না, গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি—এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়া যায় না।

"সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধু হওয়া উচিত—গালাগালি দিয়া অপ্রতিভ করিব—দাবাইয়া ধরিব এ মৎলব ভাল নয়।"

"...লোকে যতই নিন্দা করুক না, যাবা যত নিন্দা করিবে তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে।"

"টাকাই সব নয়, দেশের কাজ কবা দরকার; পাঁচজনকে যদি বাস্তবিক শিখাইতে পারা যায, গোঁড়ামির অত্যাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে কথা বলা যায় তার চেয়ে আনন্দের বস্তু কি আছে? আজ আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেব কথা না শুনিতে পারে, কিন্তু একদিন শুনিবেই।"

শবৎদাব কণ্ঠস্বরে এই কথাগুলি ভেসে আসছে অর্ধ শতাব্দীরও ওপাব থেকে। আজও এ কথাগুলিব প্রয়োজনীয়তা ফুবিয়ে যায়নি তাঁর শতাব্দী প্রান্তিক জীবন থেকে। এটিও একটি আশ্চর্য বলতে হয়।

এই কথাগুলি তিনি চিঠিতে লিখে বলছেন—তাঁর অন্তবঙ্গ ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রমথনাথকে আব হিতার্থী বন্ধু পুস্তকপ্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে।

এই সূত্রে একটি গল্প মনে পড়ে গেল। গল্পটি ইতিপূর্বে আমি অনেককে বলেছি। শরৎদা বলতেন—তাঁর 'একাদশী বৈরাগী' গল্পটি হরিদাসবাবুরই চরিত্র। তিনি হরিদাসবাবুকে যেমন দেখেছেন, সেইটিই নাকি 'একাদশী বৈরাগী'তে তুলেছেন। আড়ালে আমাদের অনেকেরই কাছে রসিকতা কবে তিনি হরিদাসবাবুকে কখনও 'বৈরাগী', কখনও বা 'একাদশী' বলে উল্লেখ করতেন। আমরা সকলেই এটি নিয়ে কৌতুক উপভোগ করতুম। তখনকার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অনেকে এটি জানতেন।

২৯

লেখক পাঠক দুটি বিভাগে ঘনিষ্ঠ সংশ্লিষ্ট হয়ে বেঁচে আছি সুদীর্ঘকাল। বাংলা সাহিত্য-স্রোতে মীন হয়ে প্রাণধারণ করে গেলুম মানবজন্মে।

শরৎদা বলতেন,—কলম চালনা করা শক্ত নয়, কঠিন কাজ কলম সংবরণ করা। কলম-সংবরণের কঠোর পরীক্ষায় পঁচিশ বছরেবও বেশী কাল ব্যাপৃত আছি। লেখক বিভাগ থেকে সরে এসে পাঠক বিভাগে আমি বরাবর মনোযোগী ছাত্র। এ ছাড়া নিজের কাছে নিজেব অন্য পরিচয় কিছু পাইনি।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কিছু সত্য তথ্য না বলে গেলে অপরাধ থেকে যাবে অনুভব করে দীর্ঘকাল বাদে নতুন করে কলম তুলে নিতে হয়েছে।

আমার মূল বক্তব্য—শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে সব অভিমত প্রকাশিত হচ্ছে সে অভিমতের সঙ্গে আমার শিল্প-অনুভব মেলে না। আমার মনে হয় এই অভিমতগুলি যথেষ্ট সূক্ষ্মতায় ও গভীরতায় আধুনিককালে যাচাই হয়নি। অনিচ্ছুক পরীক্ষকেব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে চোখ বুলিয়ে লেখার খাতায় নম্বর দেওয়ার মতন—সমালোচনা।

সব সাহিত্যই যে একজাতের বা একই ধাতের হবে এমন কথা নেই। পশ্চিমী সাহিত্যে এখন যে-সকল লক্ষণ, গুণ আর উপকরণ দেখা যায়, শরৎসাহিত্যে তা অনুপস্থিত। সেইজন্যই শরৎসাহিত্য মেয়েদের উপযোগী সাহিত্য বা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিতের সাহিত্য যাঁরা বলেন,—সাহিত্যগুণ, সাহিত্যরস,,তাঁদের কাছে যথার্থ মূল্য লাভে যে বঞ্চিত, এইটি আমি বলতে চাই। কেবলমাত্র বিশ্বের বিবিধ বিষয়ে সুবিস্তৃত জ্ঞান আর বুদ্ধি ও মেধার দীপ্তি থাকলেই মহৎ সাহিত্য হয়না। অতি ক্ষুদ্র পবিধির মধ্যে অতি সামান্য বিষয়বস্তু নিয়েও মহৎ সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে। উপকবণই সাহিত্য নয়।

শরৎচন্দ্রের বই অনুভবগ্রাহ্য। বুদ্ধিগ্রাহ্য সাহিত্যের প্রাবল্য এখন পশ্চিমী দুনিয়ায়। বুদ্ধির পবিবর্তন এবং বিবর্তন আছে। অনুভবেব বিবর্তনও থাকতে পারে, কিন্তু সেটি বুদ্ধির মত এত দ্রুত কি? স্পষ্ট কি? অনুভবের পরিবর্তন তো এখনও দেখতে পাইনা। আদিম কাল থেকে মায়েদের স্বভাব তো বদলালোনা জীবজন্তুর দুনিয়ায় চেয়ে চেযে দেখি। মানুষের হৃদয়ের অনুভবের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি কি ভবিষ্যতে থাকবে না? কী জানি, বলা যায়না কিছু। হয়তো অনুভূতিশূন্য, বুদ্ধিপ্রখর মানবজাতি পৃথিবীর বুকে কোনো একদিন বিচরণ করবে—যারা পুরোনো যুগেব এই সব লেখা পড়ে অবাক হযে ভাববে—হৃদয় নিয়ে মন নিয়ে অনুভব নিযে এত চঞ্চলতা কেন ছিল এদের? কান্না, চোখের জল এ সব তো শৈশব বাল্যের ব্যাপার। পুরোবয়স্ক মানুষেব চোখে যখন-তখন জল,—এ আবার কী হাস্যকর কাণ্ড!

শরৎবাবুর লেখা অনুভববেদ্য। মস্তিষ্ক শক্তির কাছে মানুষের অনুভব শক্তি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় যতদিন না হবে, ততদিন শবৎচন্দ্রের লেখা মানুষের হৃদয়ের তন্ত্রীগুলি অনুরণিত করতে পারবে মনে হয়।

কোনও একটি সাহিত্যকাল যদি সূক্ষ্ম অনুভূতির তারের কাজগুলিকে মানবসুলভ না বলে নারীসুলভ বলে বিদ্রূপে অবজ্ঞা করে যায়,--তবে সেই কালের

জন্য কোনও অনাগত কাল যে অরসিকের আসন এগিয়ে দেবেনা, এমন কথা বলা যায়না।

কোনও একটি কালের বিশিষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে—চিরকালের মানব হৃদয়কে যদি অস্বীকার কিংবা তুচ্ছ করার চেষ্টা করা হয়, আপাতকালে হয়তো তা সিদ্ধও হতে পারে, কিন্তু পরবর্তীকালের আদালতে পূর্ববর্তীকালের সিদ্ধান্ত নাকচ হওয়ার দৃশ্য সাহিত্য-ইতিহাসের পাতায় আমরা অনেক দেখেছি, এইটি মনে রাখব।

নিজেদের বিশেষ ধরনের স্বাদের অভ্যাস নিয়ে মহৎ সাহিত্যের যাচাই চলেনা। নিজেদের আপতিক প্রয়োজনে আচ্ছন্নদৃষ্টি হয়েও নয়। রাজনৈতিক খোঁজেন শরৎবাবুর লেখার মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস আর অভিমত কতখানি সমর্থন পাচ্ছে ;— সমাজসেবীরা বা সমাজতাত্ত্বিকও ঠিক একই পথে সাহিত্য বিচার করেন। সমাজতত্ত্বের ছাঁকুনি হাতে নিয়ে তিনি শরৎবাবুর লেখা ছাঁকুনি দিয়ে দিয়ে চেলে নিচ্ছেন, স্পষ্ট দেখেছি। সনাতন বর্ণাশ্রমী হিন্দু আর প্রগতিবাদীরাও এই একই নিয়মে পাশ-মার্ক ফেল-মার্ক দিয়ে রাখছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যে অভিভূত, পাশ্চাত্তা চিন্তাভাবনা ও বিচারে সশ্রদ্ধ-বিশ্বাসী অল্পবয়সীরা খোঁজেন শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাশ্চাত্ত্য কোণের চিন্তা, দৃষ্টি আর ধাতুর সমধর্মিতা সৌসাদৃশ্য কতটুকু? কারণ, এখন আমাদের আধুনিকতার মাপকাঠি সেখান থেকে ধার করা। খণ্ডিত দৃষ্টিতে, কোনো দেশে কালে, কোনও সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন হয় কিনা আমি জানিনা।

যে-সাহিত্যের মধ্যে বর্তমান পশ্চিমী মূল্যবোধের ছায়া নেই, তাকে আমরা আধুনিক ভাবতে ভয় পাই। কিন্তু সাহিত্যে সমসাময়িকতার চেয়ে চিরন্তনতার দাম বেশী, এটি কারুর অজানা নয়। সময়ের সঙ্গে সামাজিক বিষয়বস্তুর বদল হয়, কিন্তু মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলিব পবিবর্তন নেই। শরৎচন্দ্রে বর্ণিত সমাজ এখন বদলেছে কিনা, তার উপর শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এখনও রসোত্তীর্ণ কিনা, সে সত্য নির্ভর করেনা। কালিদাসের কালও বদলেছে, শেক্সপীয়র, ডিকেন্সের কালগুলিও আর নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের সমাজ বদলে যাবে, এটাই স্বাভাবিক। শরৎচন্দ্র একটি বিশেষ কালের ছবি আঁকছিলেননা, আঁকছিলেন কতকগুলি মানুষ। কালটা তাদের পটভূমি মাত্র।

এক একটি বিশেষ কালে, বিশেষ দেশের মানবসমাজে, সাহিত্য মানুষের মন থেকে, অনুভব থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ। এটি কোন দেশে কেমন রঙের কেমন আকৃতির হবে,—কেমন গন্ধেব আর স্বাদের হবে সেটি নির্ভর করে সেই দেশের মাটির আর জল হাওয়া রৌদ্রের উপরে।

সাহিত্যের এই মাটি সে-দেশের মানুষের সেখানকার সমাজে আকৃতিপ্রাপ্ত মন। বিভিন্ন দেশের সমাজে মানব-মন বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস, মূল্যবোধ আর সংস্কারে গড়ে ওঠে। সাহিত্যে এরাই বিভিন্ন ধরনের মাটি। যদিও মূলত প্রাকৃতিক নিয়মে

সব দেশে সব কালে সব মানুষের মনে একই রকমের কতগুলি বৃত্তির ক্রিয়া দেখা যায়। স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য, করুণা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, সংশয়, কুটিলতা, মহানুভবতা সব দেশে সব কালে মোটামুটি এক। মনুষ্যসমাজচিত্রণই সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হয়না, মনুষ্য প্রকৃতি চিত্রণই সাহিত্যের ভিতরের কথা।

দীর্ঘায়ু সাহিত্য মানব-মনের মূলকে আঁকড়ে উদ্ভিন্ন হয়। বাইবের জগতে অনেক কিছু আসে, অনেক কিছু বদলায়। যা বদলায়না, বদলাবার উপায় নেই, তাকেই ছুঁয়ে থাকে বলে কোনো কোনো সাহিত্য চিরজীবী বা সুদীর্ঘজীবী হয়ে ওঠে।

শরৎচন্দ্রের লেখায় বর্তমানকালের চাহিদার সামগ্রী কি কি নেই,—তার তালিকা আমরা দীর্ঘ করে তৈরি করতে নিশ্চয়ই পাবি। কিন্তু, যা তার আছে,—যেটুকু তার আছে, তাকে সহজে মুছে দেওয়া কঠিন। কারণ, তা সব দেশের, সব কালের মানুষের মধ্যে আছে। বরাবর তা থাকবেও, প্রকৃতির নিয়মেই।

সমাজের চেহারা বদলে যাচ্ছে—যাবেও, গ্রামের চেহাবাও বদলাচ্ছে, আবও বদলাবে—পাবিপার্শ্বিক অন্য রকম হয়েছে, আরও হবে। কিন্তু মানুষের হৃদয় আর মন? হৃদয় মনের কি আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে—যেখানে মানুষ প্রাকৃতিক? কেবল সামাজিক ·মাত্রই নয়।

ষোলো বছরের মেয়ে আর বাইশ বছরের ছেলের মন তো কোনওকালেই বদল হবেনা! দবিদ্র মানুষের অন্নসন্ধানী একাগ্র চিন্তা দেশে-কালে বদল হয়না। বাল্যের উদ্দামতা, যৌবনেব উন্মাদনা, বার্ধক্যেব ক্লান্ত ঔদাস্য এর তো দেশ কাল নেই।

শবৎচন্দ্রের বিষয়ে আলোচনা তো অনেক হল, এবাবে ববং আমবা তাঁব নিজের মুখে বলে যাওয়া কথাগুলি আজ তাঁব জন্মশতবার্ষিকীতে একটু ভালো কবে কান পেতে শুনি। তিনি বলছেন—

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থেব অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীব সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তবাধিকার সূত্রে আব কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সে সারা ভাবত ঘুরে এলাম। আর, পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভোর আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা,—এক কথায় সাহিত্যেব সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনোটাই তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি।

কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছু দিন বাদে গল্প রচনা অকেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোনকালে একটি লাইনও লিখেছি, সে কথাও ভুলে গেলাম।

আঠারো বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈবদুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদেব কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমি লেখা দিতে স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য—কোন রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছতে পারলেই হয় কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোটগল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে-না-হতেই বাংলার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাংলাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক, যাকে কোনদিন বাধাব দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।" (*বাতায়ন*—সাপ্তাহিক, শবৎ স্মৃতি সংখ্যা—১৩৪৪।)

সাহিত্য সম্পর্কে শরৎচন্দ্রেব নিজেব আদর্শ কি ছিল, আমবা তাঁর বইগুলির মধ্যেই দেখতে পাবো তার রূপ। শরৎচন্দ্রের বচনা তাঁর পূর্বগামী লেখকদের লেখা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

জীবনে দৃশ্যমান অংশটুকু থেকে তাব সমগ্রতা চেনা যাযনা, ভিতরেই বহমান থাকে তার সার অংশ—এটি শরৎচন্দ্র তাঁর শিল্পে সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন। সর্বভারতীয় সাহিত্যে তাঁর এই নতুনধারা সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁব আগে অবশ্য এর দরজা খুলেছেন বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি, গোরা, গল্পগুচ্ছে। অন্তর্জীবন আর বহির্জীবনের দ্বৈত স্তর এই লেখাগুলির মধ্যে আমাদের সাহিত্যে প্রথম দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সার্থকশিষ্য বলা চলে শরৎচন্দ্রকে। কারণ, তিনি রবীন্দ্রনাথে দাগা বুলিয়ে তাঁর নিখুঁত অনুকরণ করে লেখার আসরে যে নামেননি, এটি লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাই তিনি আন্তরিক আনন্দে অভিনন্দিত করেছিলেন শরৎচন্দ্রেব আবির্ভাবকে। সাহিত্যের মানদণ্ডে শরৎচন্দ্রের রচনা শিল্পোত্তীর্ণ এবং উচ্চমানের সামগ্রী এ কথা তিনি একাধিকবার মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গিয়েছেন।

১৩৩৮ সালে ১লা আশ্বিন তারিখে 'নবশক্তি' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —"বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তেব উইল-এর পর অনেক দিন কেটে গেল। আবার দেখি, গল্পসাহিত্যে আরেকটা যুগ এসেছে। অর্থাৎ, আরও একটা পর্দা উঠল। সেদিন যেমন ভিড় করে রবাহূতের দল জুটেছিল সাহিত্যেব প্রাঙ্গণে, আজও তেমনি জুটেছে। তেমনি উৎসাহ, তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবার নিমন্ত্রণকর্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে রসকে তিনি নিবিড় কবে জুগিয়েছেন, সে হচ্চে সুপবিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি, পাঠকেব আরো অনেক কাছে এসে পৌছল। তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে, স্পষ্ট করে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর করে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদঘাটিত করে দেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হল। তাদের আনাগোনাও চলচে। একদিন তারা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাঁকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু, আশা করি, পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভোলে, তবে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে।"

কবির ঋষিদৃষ্টিতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে যে সম্ভাবনা দৃশ্যমান হযেছিল, এখন তাই-ই আমরা লক্ষ্য করছি। পাঠকের আসর থেকে শরৎচন্দ্র একটুও তিরোহিত হননি, শুধু বাংলা নয়, সারা ভাবতবর্ষ জুড়ে তাঁব পাঠকসমাজ তাঁকে আজও ঘিরে বয়েছে কৃতজ্ঞ পরিতৃপ্তি নিয়ে। তিনি একটুও ফুবিয়ে যাননি, নতুনকাল তাঁকে মুছে ফেলতে পারেনি মোটেই।

শরৎচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে আমরা আজ রবীন্দ্রনাথেরই কণ্ঠস্বর শুনব—

"আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক যে তাঁর দানের মনোহারিতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। ইতস্তত যদি কিছু প্রতিবাদ থাকে তো ভালই, না থাকলেই ভাবনার কারণ।...যে-লেখায় প্রাণ আছে, প্রতিপক্ষতাব দ্বারা তার যশেব মূল্য বাড়িয়ে তোলে, তার বাস্তবতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের, তারা বিপরীত পন্থার ভক্ত। রামের ভয়ঙ্কর ভক্ত যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে, নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়রহস্যে। সুখে দুঃখে, মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তাবা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।...তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রেব জন্যে অপেক্ষা করেননি। আজ তাঁব অভিনন্দন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে স্বতউচ্ছ্বসিত। শুধু কথাসাহিত্যের পথে নয়,

নাট্যাভিনয়ে, চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েচেন।

সাহিত্য-উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণদৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।"

সমালোচকদের সামনে, কবির এই শেষ কথা ক'টি রাখছি—

"**চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণদৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে।**"

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য এই গুণেই অক্ষয় সাহিত্যে পরিণত হয়েছে।

প রি শি ষ্ট

এই বচনাটি 'দেশ' পত্রিকায় ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়াব সময়ে শবৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ী দেবী প্রসঙ্গে আলোচনা বিভাগে প্রচুব উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এখানে শরৎচন্দ্রের যুগেব (এবং বর্তমান কালেরও) তিনজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদেব অভিমত সংযোজিত হলো।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতামালা (১৯৭০) উপলক্ষে গত বৎসব রামকৃষ্ণ মিশনের শিবানন্দ হলে শ্রীযুক্তা বাধাবাণী দেবী প্রদত্ত "শরৎচন্দ্র—জীবন ও সাহিত্য"-শীর্ষক বক্তৃতামালার আমিই উদবোধক ছিলাম। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দকে বিশ্ব-নারীবর্ষ বলিয়া চিহ্নিত করা হয় এবং ঐ বৎসবই এদেশে শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব আবম্ভ হয়—ইহা একটি বিশেষ আনন্দের বিষয়। শ্রীযুক্তা বাধারানীর বক্তৃতাগুলি পবে যখন 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন আমি উহা যত্ন সহকারে পড়িবার সুযোগ পাই। শ্রীযুক্তা রাধারানী ও তাঁহাব স্বামী কবি নরেন্দ্র দেবের সহিত শবৎচন্দ্রেব যেরূপ পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ও হৃদ্য সম্পর্ক আমি প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ করিয়াছি বর্তমান কালে জীবিত আর কাহাবও সহিত সেরূপ সম্পর্ক ছিল ইহা আমার জানা নাই। সুতরাং শরৎচন্দ্র বিষযে স্মৃতিভাণ্ডার মন্থন কবিযা শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবী তাঁহাব জীবন-কাহিনী আমাদেব সম্মুখে যেভাবে উদঘাটিত কবিয়াছেন তাহার জন্য তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মূল্যাযনে রাধারানী দেবীব সহিত মতভেদ হইতে পারে কিন্তু শবৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিযাছেন—তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। বিশিষ্ট ও চূড়ান্ত বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আমি রাধারানী দেবী-প্রদত্ত তথ্যের বিরুদ্ধে যে সকল মন্তব্য 'দেশ' পত্রিকায় দেখিয়াছি উহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করি না। শবৎচন্দ্রের জীবনের কোন কোন ঘটনা তাঁহার মান ও মর্যাদার বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে। এই সমুদয় গ্লানিকর ঘটনা যে রাধারানী দেবী তাঁহার আজীবন সুহৃদ ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভাজন শরৎচন্দ্রের খ্যাতি লাঘব করিবার জন্য সত্য না হইলেও সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

আজকাল যে দুই একজন নব্য 'শরৎ-সাহিত্য ও জীবনী-বিশারদ' তাঁহার জীবনের কাহিনীর সব-জান্তারূপে সহসা গজাইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক সত্যকে বিকৃত করিয়া দুরপনেয় ঐতিহাসিক ক্ষতি করিতেছেন। আমি সে যুগে নানাভাবে নানাজনের

নিকট হইতে শুনিয়াছি যে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করেন নাই। এ বিষয়ে রাধারানী দেবী যাহা লিখিয়াছেন—তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। রাধাবানী দেবী সত্যই লিখিয়াছেন যে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে ধর্মপত্নীর পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত বাখিয়াছিলেন। এই উক্তি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে রাধারানী দেবী শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে মনগড়া কোন অপবাদ দিবার প্রয়াস করেন নাই। মানুষকে সত্য কথা উচ্চারণের সুযোগ না দেওয়া কোন দেশেই সভ্যতার প্রগতির লক্ষণ নহে। ইহাতে শরৎচন্দ্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—এই ধ্বনি তুলিয়া কয়েকজন তথা-কথিত সাহিত্যিক যে আলোড়ন তুলিয়াছেন—শরৎচন্দ্রের জীবনের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় বা তাহার দাবি আছে আমি ইহার পূর্বে শুনি নাই। স্মৃতিনির্ভর রচনায় যদি কোনটি সামাজিকভাবে ভাল দেখাইবে, কোনটি মন্দ দেখাইবে এই বিবেচনাব ফলে সত্য গোপন কবিতে হয় তবে ইতিহাসের মর্যাদা বক্ষা হয় না। বাধারানী দেবী ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সৎসাহস দেখাইয়াছেন—ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর "অখ্যাতি" গোপন করেন নাই—ইহার জন্য ঐতিহাসিক মাত্রই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন। শরৎচন্দ্রকে ঘনিষ্ঠরূপে জানিবাব সুযোগ আমারও ঘটিয়াছিল। বহুরাত্রির দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ঘাটে বসিয়া তাঁহার জীবনী ও সাহিত্যের আদর্শেব ও লক্ষ্যের কথা শুনিয়াছি। রাধারানীর বর্ণনায় ঠিক সেই শরৎচন্দ্রই জীবন্ত হইয়া ফুটিযা উঠিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক যুগে যে নূতন এক শরৎচবিত্র গঠনের প্রয়াস চলিতেছে তাহাতে শরৎচন্দ্র বিষযে বহুবিধ বিভ্রান্তিকর সাজানো কথা ইদানীং বাজারে ছড়ানো হইতেছে। এমন কি শরৎ শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহাতেও শরৎচন্দ্রের 'সংক্ষিপ্ত জীবনী'তে অপ্রমাণিত বহু কথা তথ্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। সুতবাং ভবিষ্যদ্বংশীযদের নিকট শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবীব এই গ্রন্থখানি শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে একখানি অতিশয় মূল্যবান আকরগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য ইহা আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি। এ পর্যন্ত যত গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে রাধারানী দেবীর লিখিত বক্তৃতামালা শরৎচন্দ্রের জীবনী বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে পূর্বেই বলিয়াছি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক মূল্যায়ন সম্বন্ধে মতভেদ পূর্বেও ছিল এখনও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবীর লেখা বই "শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য" "দেশ" পত্রিকায় ২৭ ভাদ্র ১৩৮২ বঙ্গাব্দ হইতে ৮ ফাল্গুন ১৩৮২ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই। "দেশ"-এর এই সংখ্যাগুলি তিনি বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহে এই বাঁধা "দেশ" পত্রিকায় "শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য" পড়িয়া দেখিবার সুযোগ সম্প্রতি

আমার—এই শরৎ শতবার্ষিকীর সময়ে—ঘটিয়াছে। বইখানি পড়িয়া আমার ভালই লাগিয়াছে। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই সাহিত্যিক মৌসুমে বহু পুস্তক পুস্তিকা ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে ও হইতেছে—কিন্তু দুই-চারিখানি প্রামাণিক ভাবসমৃদ্ধ পুস্তকের বাহিরে বেশির ভাগই গতানুগতিক পদ্ধতি ধরিয়া লেখা—মামুলী কথার পুনরাবৃত্তি—সেই শরৎচন্দ্রের চরিত্রসৃষ্টি, শরৎচন্দ্রের মানব-প্রীতি, শরৎচন্দ্রের লিপিকুশলতা, শরৎচন্দ্রেব রচনার "আঙ্গিক", ইত্যাদি লইয়া। মানুষ শরৎচন্দ্রকে অনেকেই ধরিতে ছুঁইতে পাবেন নাই। তাঁহার চরিত্র এবং জীবনচর্যার ঋজুতা, সারল্য, দৃঢ়তা এবং সততা, আমাদের সাধারণ সংস্কার-বিজড়িত মনন ও চিন্তনের নাগালের বাহিরে। সমাজেব বিধি-নিষেধ খানিক দূর অবধি তিনি স্বীকার কবিতেন, কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ এই বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তাহা স্বীকার কবিতে তাঁহার মনে দ্বিধা ছিল না, এবং নিজের জীবনে যাহা উচিত এবং সত্যকার মানবধর্মের অনুমোদিত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা করিয়া গিয়াছেন। সাধাবণ সামাজিক বিধি-নিষেধের নিগডেব শৃঙ্খলের দ্বাবা আবদ্ধ বাঙ্গালী গৃহস্থ কিন্তু একথা বুঝিবে না, চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিবে না, তাহাতে স্বস্তি পাইবে না। "মানুষ" শরৎচন্দ্র আমাদের অনেকেরই জ্ঞানগম্য ছিলেন না। সময় ও সুবিধা পাইলেই, শরতের অনুরাগী সাহিত্য-ব্যবসায়ী সামাজিক সজ্জন নিজেব মন-গড়া শবৎচন্দ্রকে না পাইলে খুশী হইতেন না, বা হয়েন না, তাঁহাবা সকলেই চাহেন, তাঁহাদের মতে আদর্শ-চবিত্রেব শরৎচন্দ্র তাঁহারা গড়িয়া তুলিবেন। এইজন্য তাঁহারা শরৎচন্দ্রের জীবন-কথাব মধ্যে সত্যকার তথ্য এবং তত্ত্ব খুঁজিয়া বাহির কবিবাব এক বিকট আকাঙ্ক্ষা লইয়া শরৎ-চরিত্র-চিত্রণে অবতীর্ণ হন, পুনর্গঠন ও অনুমানের সহায়তায় যেটুকু সত্যকাব তথ্য তাঁহারা পান সেইটুকুকে আরও পল্লবিত করিয়া তাহাদের সমান-ধর্মা সকলের উপভোগ্য ও গ্রহণ-যোগ্য করিয়া তুলেন। যাঁহারা এই কার্য করেন, তাঁহারা সদভাব এবং সদুদ্দেশ্য লইয়াই তাহা করেন, কিন্তু যে বস্তু শরৎচন্দ্রের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল, তাহার কথা ভুলিয়া যান। বর্মায রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের যৌবনকালের সহধর্মিণী শান্তি দেবী, এবং তৎপরে তাঁহার সমগ্র জীবনের অর্ধাঙ্গিনী হিরণ্ময়ী দেবী, ইঁহাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি এবং প্রত্যক্ষদর্শী শরৎচন্দ্রের আত্মীয় ও সুহৃদ্‌বর্গের স্পষ্ট অভিমত উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। এই বিষয়ে, সরল অকপটভাবে, নিজের চোখে দেখা ও শরৎচন্দ্রের মুখের কথা নিজের কানে শোনা ঘটনা ও কথা, শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবী ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য স্পষ্ট ভাষায যাহা তাঁহার "শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য" গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়া গেলেন, তাহাই আমার মনে হয় সত্য ঘটনা ও সত্য কথা। শরৎচন্দ্র, এবং শ্রীযুক্তা বাধারানী দেবী এবং তাঁহার স্বামী নরেন্দ্র দেব, ইঁহাদেব মধ্যে যে স্নেহের সংযোগ এবং সম্বন্ধ ছিল, যাহা কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে ইঁহাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বিধায় বহু বর্ষ ধরিয়া দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া, শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের উক্তিব আধার যে স্বয়ং

শরৎচন্দ্রের মুখের কথা, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ নাই। ইতি

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৩১ ভাদ্র ১৩৮৩,
শরৎ-জন্ম-শতবার্ষিকী।

হিরণ্ময়ী দেবী শবৎচন্দ্রের বিবাহিত স্ত্রী ছিলেন কিনা এই নিয়ে এখন বাদপ্রতিবাদ চলছে। আমার শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশে আমার অভিমত আমি এই পত্রে দিচ্ছি।

হিরণ্ময়ী দেবী শবৎচন্দ্রের যে ভার্যা ছিলেন তাতে কোন পক্ষেরই মতান্তর নেই। মতান্তব হয়েছে ভার্যাত্বেব শাস্ত্রসম্মত বৈধতা নিয়ে।

শ্রীমতী বাধারানী দেবী বলেছেন, হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের ভার্যা স্ত্রী ছিলেন তবে বিধিমত অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রসম্মত (অথবা রেজেস্টরীকৃত) বিবাহিত পত্নী ছিলেন না। রাধাবানী দেবী ও তাঁর স্বামী স্বর্গত নরেন্দ্র দেব মহাশয় দুজনে দীর্ঘকাল ধরে এবং শেষ পর্যন্ত একটানা শরৎচন্দ্রের প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা ভোগ করে এসেছিলেন। সুতরাং শবৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত ব্যাপাব তাঁদের জানবার যতটা সুযোগ ছিল এমন অনেকেরই ছিল না, এখন যাঁবা রাধারানী দেবীর প্রতিবাদ করছেন তাঁদের মধ্যে কারো আছে বলে আমার মনে হয় না।

বাধারানী দেবীর উক্তি যাঁরা সমর্থন করতে পারতেন এখন তাঁদেব কেউই জীবিত নেই। সুতরাং তাঁর পক্ষে তাঁর কথাই সম্বল। অপর পক্ষে বিরোধী দলেরও কোন স্বাধীন প্রমাণ নেই। তাঁদেরও সম্বল তাঁদের উক্তি—শুনেছি, জেনেছি. দেখেছি (—অবশ্যই বিবাহ-অনুষ্ঠানটি নয়)!

দু পক্ষের যখন একই অবস্থা তখন মধ্যস্থের দৃষ্টিতে বিচার করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের চারিত্র্য সম্বন্ধে যাঁর এতটুকুও সত্যবোধ জন্মেছে তিনিই স্বীকার করবেন যে সমাজের সাধারণ convention গুলির আবরণে তিনি মোটেই গতানুগতিক ছিলেন না। আর বাংলায় বা বর্মায় যেখানেই হোক তিনি যে পুরোহিত ডাকিয়ে শালগ্রাম আনিয়ে লাজহোম ও কুশণ্ডিকা করে—"বিশুদ্ধ" হিন্দুমতে যাকে 'বিবাহ' বলে—হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন এমন ভাবনা যাঁর মনে স্থান পাবে তাঁকে হয় পাগল নয় পবমহংস বলব। রেজেস্টরী বিয়ের কথা ওঠে না, কেননা তা ছাপা যেত না কিছুতেই।

আসল কথা, বিয়ে অনেকরকম আছে। মনু মহারাজও রাক্ষস পৈশাচ গান্ধর্ব প্রাজাপত্য প্রভৃতি নানারকম বিবাহপদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। তার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে "সঙ্গ বিবাহ", যা একদা যোগীরা করতেন, যা অদ্যাপি কণ্ঠিধারী বৈরাগীরা করেন এবং যা কোন কোন প্রাচীন অথচ অনুন্নত সমাজে এখনও অজ্ঞাত নয়। এ বিবাহও

পরিপূর্ণ বৈধ বিবাহ (—আইনে কি বলে তা জানি না)। শরৎচন্দ্র যদি এইরকম বিবাহ করে থাকেন তবে তিনি নিজের সত্যস্বভাব অনুসারেই করেছেন। ঢাকঢোল বাজিয়ে শালগ্রাম এনে তা করলে তাঁর পক্ষে মিথ্যাচার হত।

দু পক্ষের কথাতেই বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ীকে পরিপূর্ণ পত্নীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং হিরণ্ময়ী দেবী তাঁকে পতিদেবতা রূপে গণ্য করতেন। পরস্পরের এই কমনীয় ব্যবহার কণ্ঠিবদল বিবাহের পরিণতিতে দেখা যায়। ঢাকঢোলের বিবাহে মধুর রস একটানা নয়, ভক্তিরস দেখাই যায় না, এবং তিক্ত রসকে চাপা দিতে অনেক প্রযত্ন করতে হয়। কোন পক্ষই শরৎ-হিরণ্ময়ীর সম্পর্কে এ ব্যাপার লক্ষ করেননি।

সুতরাং আমার অভিমত হল এই যে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করেছিলেন সে কথা সত্য। কিন্তু সে বিবাহে শালগ্রামের উপস্থিতি বামনাই কাণ্ড ঘটেনি।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ শ্রীসুকুমার সেন

।। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চিঠির প্রতিলিপি।।

২১.২.৭৬ তারিখে 'দেশ' সাপ্তাহিকে শ্রীযুক্তা রাধারানী দেবী লিখিত 'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটির একটি তথ্য সম্পর্কে আমি নিজে যা জানি, তাহা এখানে প্রকাশ করা উচিত মনে করিতেছি। এ সম্পর্কে গোপালচন্দ্র রায়ের বিবৃতি লক্ষ্য করিয়াছি।

গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী এবং 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী আমার পিতা স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের মুখে আমি দীর্ঘকাল ধরিয়াই শুনিয়াছি হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন না। এ বিবরণটি বাবা বিশদভাবেই প্রথমে জানিয়াছিলেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের নিকটে। প্রমথবাবু শরৎচন্দ্রেরও বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

প্রমথবাবুরই সহায়তায় আমার পিতার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল শরৎচন্দ্রকে বর্মামুলুক হইতে এ দেশে স্থায়ীভাবে ফিরাইয়া আনা। প্রমথবাবুই বাবাকে পরামর্শ দিয়া শরৎচন্দ্রের জাহাজভাড়া এবং দেনা শোধের ব্যবস্থা করান। শরৎচন্দ্রকে ক্রমান্বয়ে পত্র লিখিয়া প্রমথবাবুই তাঁহাকে দেশে ফেরার দ্বিধা সংশয় হইতে মুক্ত করেন। এ সম্পর্কে আমি বহুদিন ধরিয়া এইসব আলোচনা ও বিতর্ক শুনিয়াছি।

আমি নিয়মিত গুরুদাস চ্যাটার্জির দোকানে আমার পিতার পাশেই উপবিষ্ট থাকিতাম। গোপালচন্দ্র রায় যখন ভারতবর্ষ কার্যালয়ে চাকুরি করিতেন, তখন শরৎবাবু তিরোহিত হইয়াছেন।

শরৎচন্দ্রকে বরাবর ১২০ টাকা হিসাবে সংসার খরচ দিবার পাকাপাকি লিখিত

প্রতিশ্রুতি পাঠাইবার পরে—শরৎচন্দ্র বর্মামুলুকেব চাকুরি ছাড়িয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত অনেক বইতে এই তথ্যটির উল্লেখ দেখা যায় না, অথচ শরৎচন্দ্রের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এটি একটি বিশেষ তথ্য। শরৎচন্দ্রের লিখিত কিছু কিছু চিঠিপত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

হিরণ্ময়ী দেবী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া মেদিনীপুরের গণ্ডগ্রাম হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিতা হইয়াছিলেন। ১৯১২ সালে শরৎচন্দ্র যখন বর্মা হইতে চাকুরিতে ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত পরিচিত হন। বর্মায় তাঁহার গৃহস্থালি চালনার জন্য সেবাযত্নপরায়ণ একটি নারীর অভাব থাকায় তিনি অসহায়া হিরণ্ময়ী দেবীকে ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সঙ্গে লইয়া যান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রমথবাবুই আমার বাবাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র বাবার কাছে কোনদিনই ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, বরং হিরণ্ময়ী দেবীর ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা শবৎচন্দ্রের অবর্তমানে কি করা সমুচিত হইবে, তাহা বাবার সহিত পবামর্শ করিতেন। বাবার পরামর্শে, শবৎচন্দ্র তাঁহার জীবনকালেই হিরণ্ময়ী দেবীকে তাঁহাব নিজেব লেখা কিছু পুস্তকেব স্বত্ব দান করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থ হিরণ্ময়ী দেবীর নামে পৃথক হিসাবে থাকিত এবং পৃথক করিয়া পাঠানো হইত শরৎচন্দ্রেব জীবিতকালেই।

শরৎচন্দ্রেব দুশ্চিন্তা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার আইনানুগ উত্তরাধিকারীরা হিরণ্ময়ী দেবীকে হয়তো বা নিরাশ্রয় কবিলে করিতেও পারেন। নিজের অবর্তমানে হিরণ্ময়ী দেবী যাহাতে কাহারও দ্বারস্থ বা করুণাপ্রার্থী না হন, এজন্য শবৎচন্দ্র যাঁহাদেব সহিত পবামর্শ করিতেন বলিযা আমি জানি, তাহার মধ্যে আমার পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং এটর্নী নির্মলচন্দ্র চন্দ্রই প্রধান ছিলেন। স্বর্গীয় জলধর সেন এবং কবি নরেন্দ্র দেবকেও আমি এ সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ করিতে দেখিয়াছি। তাঁহারাও এই গুহ্য বিষয়টি তখন ভালই জানিতেন, কিন্তু বাহিবে কখনও কিছু আলোচনা করিতেন না।

শরৎচন্দ্রকে তাঁহার বৈষয়িক আইন উপদেষ্টা নির্মলচন্দ্র চন্দ্র পরামর্শ দিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্রের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার উইল করিয়া হিরণ্ময়ী দেবীর নামে জীবনস্বত্বে লিখিয়া দিলে হিরণ্ময়ীকে কেহই আঘাত করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু উইলপত্রে তাঁহাকে 'ওয়াইফ' বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। নচেৎ ইহার প্রতিবাদে কেহ মামলা করিলে উইল নাকচ হইতে পারে, যেহেতু হিরণ্ময়ী দেবীর পক্ষ লইয়া মামলা লড়িবার মত কোনও লোক সংসারে কেহই তাঁহার ছিল না। তিনি নিজেও বিশেষ ভীরু এবং অনভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন।

শরৎচন্দ্রকে গোপনে একটি ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনে সহি করিয়া রাখার জন্য নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং আমার পিতা যে প্রায়শই পরামর্শ দিতেন, ইহার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র বলিয়াছিলেন, জীবনস্বত্বে উত্তরাধিকারিণী হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের

কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রকে পাওয়ার অব এটর্নী দিবেন, ফলে সম্পত্তি ও টাকার কর্তৃত্ব প্রকাশচন্দ্রের হাতে পৌছিবে, তিনি তখন হিরণ্ময়ীর অধিকার অনধিকার লইয়া নাড়াচাড়া করিবেন না। ইঁহারা উভয়ে কেহই সম্পত্তি নষ্ট করিতে বা দান বিক্রয় করিতে পাবিবেন না। হিরণ্ময়ী দেবী যথাযথভাবে টাকা পাইতেছেন কিনা সেদিকে প্রকাশক ও এটর্নী উভয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।

শবৎচন্দ্রের উইলের 'ওয়াইফ' শব্দটি লইয়া এখন তর্কবিতর্ক শুনিতেছি। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ঐ শব্দটি উইলে বসাইয়াছিলেন, এবং বসাইতেই হইবে বলিয়াছিলেন। ঐ শব্দটি না বসাইলে, যদি কেহ আদালতে এই উইলের প্রতিবাদ করেন, ঐ উইল আদালতে বাতিল হইতে পারে, ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল। কারণ, তখন শরৎবাবুর আত্মীয়রা হিরণ্ময়ী যে বিবাহিতা নহেন, সকলেই তাহা জানিতেন।

শরৎচন্দ্রেব নির্দেশানুযায়ী হিরণ্ময়ী দেবীর পিতাকে মেদিনীপুরের গ্রামে আমাদের প্রকাশক সংস্থা হইতে আমবা কযেকটি টাকা মাসিক সাহায্য পাঠাইতাম শরৎচন্দ্রের বইয়েব হিসাব হইতে। বেঙ্গুনে তাঁহার অবস্থা সচ্ছল ছিল না, অনেক দেনাপত্র করিতে হইত শুনিয়াছি। রেঙ্গুন হইতে তিনি মেদিনীপুরে টাকা পাঠাইতেন কিনা শুনি নাই।

হিরণ্ময়ী দেবীর শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বর্মা গমনে তাঁহার পিতার কোনই ভূমিকা ছিল না। এ তথ্য প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের মুখে আমার পিতা জানিয়াছিলেন, ইহাই আমি তাঁহার কাছে শুনিযাছি। হিরণ্ময়ী দেবী পিতৃগৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি যে শরৎচন্দ্রের সহিত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বিবাহিতা ছিলেন না তাহার আরও অনেক প্রমাণ আছে। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীব কন্যার বিবাহে শরৎচন্দ্র আমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন :—

"ভায়া,

কাল যে বলেছিলাম একটা পরামর্শ করবার আছে, পার্টিকুলার্স না জানায় কাল সুবিধা ছিল না। চিঠি লিখেও সব কথা বলা যায় না। কিন্তু সময় নেই, যা পারি চিঠিতে বলি। একটা জবাব দিয়ে দেবেন। জানেন বোধ হয়, আমার ভাগ্নীর বিয়ে, এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি, দেশে আমি 'একঘরে'। আমার কাজকর্মের বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয। যাক সেজন্যেও ভাবিনি, কিন্তু টাকা দেওয়া চাই। অথচ আমি না-যাই, এটা তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চাব শ টাকাব অকুলান। এটা আমার চাই।"

আমার বাবাকে লেখা শরৎচন্দ্রের এই পত্রখানি গোপালবাবুরই 'শরৎচন্দ্র' বইয়ের ৩য় খণ্ডে পত্রাবলীতে মুদ্রিত আছে। গোপালবাবুর লিখিত পাদটীকাতেও আছে —"শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন কেউ কেউ হিরণ্ময়ী দেবী কোথাকার কি জাতের মেয়ে, এই নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলত। শরৎচন্দ্রের দিদিদের অঞ্চলের কেউ কেউ নাকি জেনেছিল, হিরণ্ময়ী দেবী বৈষ্ণবেব মেযে এবং

ঠিক হিন্দু প্রথায় নাকি তাঁদের বিয়ে হয়নি। তাই যারা শরৎচন্দ্রের বিবাহিত জীবন নিয়ে জল্পনা কল্পনা করত, তারা শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে 'একঘরে'ও করেছিল।"

রাজেশিবপুরে শরৎচন্দ্র তখন হিরণ্ময়ী দেবী সহ বসবাস করিতেছিলেন। ভাগ্নীর বিবাহে সম্ভবত শরৎচন্দ্রের যোগ দেওয়া হয় নাই।

এই একই কারণে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে তাঁহার পৈতৃক ভিটায় বাড়ী করিতে চেষ্টা করিয়াও তাহাতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। দেবানন্দপুরে নিজ গ্রামে পৈতৃক ভিটায় বাড়ী করিতে সমাজপতিদের অনুমতি না পাইয়া অবশেষে নিজের দিদির বাড়ীর কাছাকাছি বাস্তুজমি কিনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দেবানন্দপুরের সমাজরক্ষক চাঁই ব্যক্তিরা গ্রামেরই ছেলেকে বাহির হইতে প্রচুর নামযশ এবং প্রভূত অর্থ লইয়া পৈতৃক ভিটা কিনিয়া অসামাজিক গার্হস্থ্য জীবন স্থাপনের অনুমতি দেন নাই। শৈশবভূমি দেবানন্দপুরের প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর আকর্ষণ থাকিলেও হিরণ্ময়ী দেবীর কারণেই সেখানে তাঁহার যোগাযোগ ছিল না। সেইকালের সমাজপতিরা তাঁহাদের আদর্শে কঠোর ছিলেন।

আদালতের পাকা আইনজীবীরা কেবলমাত্র আইন এবং যুক্তির প্যাঁচে অনেক সময়ে সর্বজনবিদিত সত্যকে অপ্রমাণ করিয়া থাকেন। গোপালবাবু এই ব্যাপারটিতে ওস্তাদ উকীলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিতে ইহাই লক্ষ্য করা গেল। বাস্তবে যাহা ঘটে নাই, কাগজে ও কলমে তাহাই গোপালবাবু ঘটাইয়া দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকপ্রাপ্তির পরে তাঁহার সমাজসম্মত বিবাহ দিবার যে সুবর্ণসুযোগ গোপালবাবু পাইয়া গিয়াছেন, শরৎবাবুর জীবিতকালে তাঁহার আইন উপদেষ্টা এবং পুস্তক প্রকাশক তাঁহার হিতার্থী ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইয়াও, বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই দুর্লভ সুযোগটি পান নাই। ইহা আমি নিজে ভালরূপেই জানি। এ সম্পর্কে আমি কোনও উত্তর প্রত্যুত্তরে নামিব না। শরৎবাবু যে হিরণ্ময়ী দেবীকে শেষ পর্যন্তও বিবাহ করেন নাই এই তথ্য নিতান্তই দুঃখকর সত্য। তাই এক পক্ষে মনে হয় শ্রদ্ধেয়া রাধারানী দেবী এ প্রসঙ্গ হয়ত উত্থাপন না করিলেই পারিতেন। অবশ্য অন্য পক্ষে গোপালবাবু তাঁহার অযথা অবাস্তব কথা না প্রচার করিয়া তিনিও ব্রজেনবাবুদের ন্যায় যত্নে এ প্রসঙ্গটি এড়াইয়া গেলেই ভাল করিতেন।

সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চ্যাটার্জি অ্যান্ড সন্স
২০৩/১/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

১০ ৪ ৭'১ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায়
এই চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছিল।

ছোটগল্প

দাবি-হারা

[সরিতে'র কথা]

হ্যাঁরে নন্দ! বাবুর ধুতি কৈ কুঁচিয়ে রাখিস্‌নি? অম্‌নি জড়ো ক'রে রাখা হয়েচে! হতভাগা!! কাছারী থেকে খেটে-খুটে এসে তিনি নিজে ধুতি কুঁচিয়ে কাপড় পরবেন, নয়? আর তুমি শুধু আয়েস করে বেড়িয়ে বেড়াবে? শীগগির ধুতি কুঁচিয়ে, মুখ হাত ধোবার জল, চটীজুতো, তোয়ালে ঠিক করে রাখ। আজ তিন বচ্ছর রয়েছিস, এই তিন বছর ধরে তোকে শিখিয়ে শিখিয়ে আর পারলুম না। যেটি নিজের চোখে না দেখবো, সেইটিতেই একটি-না-একটি খুঁৎ থাকবেই। আমি এই শরীর নিয়ে তোদের সঙ্গে আর কত বক্‌তে পারি বল দেখি? নে, ধুতিখানা শীগগির কুঁচিয়ে রাখ্‌। ওঁর গেঞ্জিতে আজ সাবান দিতে বলেছিলুম, দেওয়া হয়েচে? '...' এখনো শুখোয়নি? বেলা তিনটের পর কাচলে কি রোদ্দুর থাকে? কোন্‌ সকালে বলেছিলুম কেচে দিতে। আর একটা গেঞ্জিও আলমারী থেকে বার কর তা'হলে। এই আমার মাথার বালিশের নীচে আলমারীর চাবি আছে, নিয়ে যা।

এইরকম বকিয়ে বকিয়েই তোরা আমায় বিছানা থেকে উঠতে দিবিনে দেখ্‌চি। বামুন ঠাকুরকে একবার আমার কাছে ডেকে দে দেখি। হ্যাঁ,—এই যে, তোমাকেই ডাকতে বলছিলুম। এখন এলে নাকি? বাবুর খাবার তৈরী হয়েচে? '...' ঐ যাঃ! লুচি এরই মধ্যে তোমায় কে ভাজতে বল্লে? তোমরা সকলেই দেখচি নিজের ইচ্ছেমত কাজ আরম্ভ করেছ। আমি বলেছিলুম, লুচির ময়দা মেখে রেখে দেবে, উনি খেতে বসলে গরম-গরম ভেজে দেবে। যাঃ! আমার মাথা-মুণ্ডু খেয়ে রেখেছ, কি করি এখন? উনি এসে হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে জিরুতে, ততক্ষণে ও-লুচি তো ন্যাকড়া হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠাকুর! একমাস দেশে গিয়ে তুমিও কি নতুন হয়ে এলে না কি? এই একমাস ধরে একটা নতুন জংলী ভূত বামুনকে নিয়ে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়েচি। তুমি এসেছো, কোথায় নিশ্চিন্ত হলুম যে, ঠাকুর এসেচে, ওঁর খাওয়াদাওয়ার আর কষ্ট হবে না।—তা' আমারই বরাত! নৈলে বারোমাস আর এমন করে কে বিছানায় পড়ে থাকে বল না? আমার আজ সামর্থ্য থাকলে তোমাদেরই বা খোসামোদ কর্ত্তে যাবো কেন? সেই কোন্‌-সকালে দু'টি ভাত মুখে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, এসে খেতে পাবেন না। নাঃ, শুয়ে শুয়ে নিজের চোখে এগুলো আর দেখ্‌তে পারা যায় না। '...' হ্যাঁ, আবার লুচির ময়দা মাখতে হবে, তাও বলে দিতে হবে না কি?

কিরে নন্দ! সব ঠিক হয়েচে? সরবৎ করেচিস্‌? '...' তরমুজের, আবার ঘোলের দু'রকমের কি দরকার ছিল? তা যাক্‌, করেছিস বেশ করেছিস। বরফ এনেছে নিধিয়া? '...' আচ্ছা। এখনি সরবতে দিসনি যেন। বরফদানীর ভিতর রেখে দিগে যা। খাবার সময় সরবতে আর খাবার জলে দিয়ে দিবি। পান এনে রেখেচিস?

'...' ছাঁচি কেন? মিঠে-পানের দোনা কিনে এনে রাখবি বলে দিয়েচি, তাও কি ছাই রোজই বলে দিতে হবে রে? দোকানের সাজা পান উনি কি খেতে পারেন? তবু মিঠে-পান হলে যা-হোক্ হয়।...যা, চট্ করে ছাঁচিপান বদ্‌লে মিঠে-পান এনে রাখ্।

—এসো। '...' হ্যাঁ, বেশ ভালই আছি। আজ আর শরীরে কোনও উপসর্গ নেই। '...' না—না—বেশী কথা কইনি গো, ঐ নন্দটাকে কাজকর্ম্মগুলো বলে দিচ্ছিলুম। ওরা নিজে কি আপনা-হাতে কিছু কর্ত্তে পারে? '...' হ্যাঁ, পারে বৈকি। কাজ আপনিই হয়ে যাবে বটে!! বাবা, একটি দণ্ড পাশ ফিরে শুয়ে থাকলে সংসার উলোট-পালোট করে দেয় হনুমানের দল। ওরা নাকি আবার নিজেরা দেখে-শুনে কাজকর্ম্ম করবে? '...' তুমি তো বলবেই গো 'হোক্‌গে', কিন্তু 'সংসার' জিনিসটি তো ঠিক তোমাব নয়, ওটা যে আমারই নিজস্ব জিনিস। নিজের জিনিস কে আর চোখের সামনে লণ্ডভণ্ড হওয়া দেখতে পারে বল? তা' সে যাকগে। তুমি এখন ধড়াচুড়ো ছাড় দেখি? না—না—আমার মাথায় কিছু এমন ভীষণ শিরঃপীড়া ধরেনি যে, তোমায় সমস্ত দিন খেটে-খুটে ক্লান্ত হয়ে এসে, পোষাক না ছেড়েই আমার মাথায় হাত বুলুতে বস্‌তে হবে! না, না—ওঠো, ওঠো, লক্ষ্মীটি!

নন্দ গেল কোথায়? এই যে, হাঁ করে কোথায় ছিলে? জুতো খুলে দেবে না? না গো, আমি এই শুয়েই একটু বাতাস করি। না, না, আমার এতে কিছু কষ্ট হচ্চে না। হুঁ, এতেই কষ্ট বটে! তুমি খেটে-খুটে এসে ঘেমে নেয়ে বসে থাকবে, আব আমি শুয়ে শুয়ে দুই চক্ষু মেলে তাই দেখলেই খুব তৃপ্তি পাব। না গো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় পাখাখানা একটু নাড়তে দাও। নন্দ! বাবুর শার্ট গেঞ্জি সব বাইবে হাওয়ায় শুখুতে দে। আঃ, নন্দ রয়েচে যে, কী যে পাগলামী কব, হাত ছেড়ে দাও। '...' না শরীবে এখন কোনও কষ্ট নেই, এখন বেশ ভাল। '...' আহাঃ,—না গো, শরীরে কোনও কিছু কষ্ট নেই—মিথ্যে কবে বল্‌তে হবে না কি? '...' এবার থেকে তোমার কোনও অসুখ করলে, ওষুধের বন্দোবস্ত না ক'বে একখানা আরশী এনে তোমার সামনে ধরলেই হবে, সব সেরে যাবে এখন। '...' ওঃ! আমার মুখ দেখলেই তোমার অসুখ সেরে যাবে? তাই বটে! আমি তো আর বলিনি যে 'আমার মুখ দেখলে তোমার সব অসুখ সেরে যায়!' বরং আমার এই ছাই মুখ দেখলে তোমার অসুখ উল্টে আরও বেড়ে যাবে। যাকগে, যাক্‌গে, কী যে সব ছাইপাঁশ কথা তুললে তুমি, মুখ দিয়ে আমার অলুক্ষণে কথা সব বেরিয়ে গেল। যাও, ছেলেমান্‌ষী করে না,—এখুনি নন্দ এসে পড়বে। সত্যি তোমার সঙ্গে আজকাল আর আমি মোটেই পেরে উঠি না। '...' আঃ—। তোমার হাতখানি বেশ নরম! এত লোক কপালে হাত বুলোয়, এমনিটি কিন্তু কারুর নয়। '...' হ্যাঁ, আমারই গুণে বৈকি? আর অত ঠাট্টা কেন? রুগ্ন, ঘাটের মড়া, ফেলে দিয়ে এলেই হয়, তার আবার—না না থাক্ থাক—আর বোল্‌বো না লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না '...'

আচ্ছা আচ্ছা—আর কোরবো না এমন দোষ,—ছাড় ছাড়, ঐ বুঝি কে আস্‌চে।

কিরে নিধিয়া? বাবুর ঠাঁই হ'য়েচে? এই ঘরেই ঠাঁই ক'রে দে। ঠাকুরকে খাবার দিতে বল্‌।' '...' হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার ওষুধ খাওয়া হয়েচে, তোমায় আর শিশি দেখতে হবে না। না বাপু, আমি আর দিনরাত্রি ঐ ছাই ওষুধগুলো গিলতে পারি না। '...' আচ্ছা, আমি খাচ্ছি নিজে, তোমার আর অত অনুনয়-বিনয়ে কাজ নেই, তুমি নিজে এখন খেতে বস দেখি! '...' হুঁ, আবার সুলোচনা-নার্সকে রাখবে বৈকি! আমি তাকে আর থাকতে দিলে তো? বাবা গো! নার্সে আর আমার কাজ নেই; দিনরাত্রি ঘড়ি ধরে ওঠা-বসা, খাওয়া, কথা কওয়া, ঘুমুনো সমস্তই ঘড়ির কাঁটা মেপে করা। সেই বন্ধনের মধ্যে থেকে আমার রোগ যেন আরও চেপে ধরে বেশী। এ আমি বেশ আছি। পাঁচুর মা আর লছ্‌মী আমায় খুবই যত্ন করে। হ'লেই বা ঝি, নার্সের চেয়ে ঝিই আমার ভাল। ওদের হুকুমে তো আমায় চলতে হয় না, বরং আমার হুকুমেই ওরা চলে। '...' আচ্ছা গো—এক্ষুনিই তো আর তোমার নার্স আসচে না। এখন খেতে বসো দেখি! ও কি! পটল-ভাজাগুলো পুড়িয়ে কালি করেচে যে,—আর পায়েসের রং অমন দুধ-সাগুর মত হ'ল কেন? নাঃ—এ একেবারেই নাচার। আমি বেশ বুঝতে পারচি, আমাব এই কাল রোগটি এসেচে, আমাকে মারবার জন্যে নয়, তোমাকে মাববার জন্যে। এই খাটুনির উপর এইরকম খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হ'লে মানুষেব শরীর আর ক'দিন টেঁকে? '...' তুমি তো শুধু আমাকেই উপদেশ দিচ্ছ। বামুন চাকরকে ভুলেও তো একটি কথা বলবে না। এইবকম উপদেশ কিছু কিছু ওদের দাও না, আমি তা'হলে একটু রেহাই পাই। '...' কোনও কষ্ট হ'চ্ছে না বল্লেই হবে? তোমার খাওয়া কিসে ভাল হয় না হয়, কখন পেট ভরে না ভবে, সে কি আমাব চেয়ে তুমি বেশী জান? হুঃ, তাই যদি হবে, তবে আর আমার আজ এত ভাবনা কেন বল? নিজের শরীরের দিকে, খাওয়া দাওয়ার দিকে দৃষ্টি থাকলে, আমায় আজ এই অফুরন্ত ভাবনার বোঝায় পিষে মরতে হবে কেন? '...' তুমি বল্লেই কি ভাবনা আমায় ছাড়বে? আমি তোমার অনুরোধে চুপ করতে পারি বটে, কিন্তু ভাবনা তো তোমার অনুরোধে চুপ করবে না। '...' হ্যাঁ, বকে-বকেই মারা যাব বটে! এত সহজেই মেয়ে-মানুষের মৃত্যু হয় না গো! ও কি। উঠে পড়লে যে! আর লুচি নিলে না? নাঃ,—আমার আর কিছুই বলবার নেই।

না, আমার পান চাই না, তুমি খাও। তুমি এইবার একটু বেড়াতে বেরোও কিম্বা খেল'গে। দিনরাত্রি রুগীর ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকা ভাল নয়। এ বিছানায় কেন? ঐ সোফাটায় বোসো না—! '...' না, রুগীর বিছানায় বসে না, ওঠো। রোগীর বিছানা মাত্রই সুস্থ'র পক্ষে অস্পৃশ্য। দিনরাত্রি কি রোগীর বিছানায় শোওয়াবসা ঠিক? '...' হ্যাঁ, আমি ডাক্তার-সাহেব বৈকি? ভাল কথা বল্লেই তুমি অমনি হেসে উড়িয়ে দেবে, নয়তো ঠাট্টা করবে! নার্স রাখা দেখচি একরকমে ভাল। তুমি তা'হলে বাইরের

আলো-হাওয়ার মুখ দেখতে পাও। আচ্ছা, সুলোচনাকেই চিঠি লিখে দাও, সে এসেই থাকুক। '...' রাগ হ'ল বুঝি? এ' কিন্তু তোমার অন্যায় রাগ। '...' আহা,—কি কথাতে কি কথাই আনলেন! ও-কথার মানেই হয় না। তোমার অসুখ হ'লে আমি তোমার বিছানাতে বোসবো না এ'ও কি আবার একটা কথা? তোমার জীবনে আর আমার জীবনে যে আসমান-জমিন্ তফাৎ। তুমি দেখচি সত্যি সত্যিই পাগল। '...' না —না, আমি কি তোমায় ঘর থেকে চলে যেতে বলেছি? আমি বললুম, বিছানায় না-বসে ঐ সোফাটায় বোস, তারপর একটু বেড়াতে বেরোও। '...' হুঁ, এই রোগীর বিছানাটাই বড় মিষ্টি নয়? '...' যাঃও, তোমাব সব তাতেই ঠাট্টা আর দুষ্টুমী। '...' না, আমি আর গ্লুকস্ খেতে পাবি না। আমি খাবো না। '...' আঃ,—মাগো,—নাও, হোল তো? তুমি দিনরাত্রি ওষুধ আর পথ্যি নিয়ে নিজেও পাগল হ'বে, আমাকেও পাগল ক'রে ছাড়বে দেখ্‌চি। '...' ভাল আর এ জন্মে হ'ব না। এই শোওযাই আমার শেষ শোওয়া। আব যে উঠবো, এ আশা আমি করিনি,—আচ্ছা আচ্ছা, চুপ ক'রেছি। লক্ষ্মী রাগ কোরো না। তোমার কণ্ঠা বেরিয়ে পড়েচে—বড্ড রোগা হ'য়ে গেছ। এত রোগা তুমি কোনওদিন ছিলে না। এ শুধু আমারই জন্যে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, একটু বাইরে যাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হয়েচে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, চিন্তা, রোগীর সেবায় মানুষের স্বাস্থ্য কতদিন আর ভাল থাকে?

'...' কি বলছ? হ্যাঁ, কি সুন্দব লাল আকাশ! ওদিকে জানালাগুলো সব ভাল করে খুলে দাও না,—আঃ—কী চমৎকাব। পশ্চিম-আকাশে আজ যেন হোলী খেলা হয়েচে'। দেখ, দূবে ঐ নারকেলগাছগুলো যেন গলানো সোনার ধারায় চান্ করেছে। আ —কী সুন্দর! প্রকৃতির সান্ধ্য সৌন্দর্য্যই সব চেয়ে সুন্দর ও মনোরম, না? দিন-শেষে এই সন্ধ্যা—এই শেষ আলো—আ—। কবে আমার জীবন-আলোর সন্ধ্যা এমনি ক'রে সৌন্দর্য্যেব ঝর্ণা উৎসাবিত কবে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে! কী সুন্দব মিষ্টি হাওয়া বইছে! রজনীগন্ধার গন্ধ পাচ্ছ? তোমার হাতখানি আমার বুকের ওপর রাখ না—। আঃ—মুক্তি,—মুক্তির জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে; কতদিন আর এমন বন্ধ হয়ে থাকবো? '...' না, না, আমায় আর বাধা দিও না। আমায় বলতে দাও। আজ অনেক কথা আমাব বলবার আছে। আমার রুদ্ধ মনের কথাগুলো প্রকাশ কর্ত্তে দিযে, আমায় একটু লঘু হ'তে, সুস্থ হ'তে, শান্ত হ'তে দাও।

আমি জানি, আমি আর ভাল হ'ব না। না—না, কেন আমায় বলতে বাধা দিচ্ছ তুমি? যা' সত্যি, তা চিরকালই সত্যি। মিথ্যাব কপট-আচরণে সত্য কখনও চিরদিনের মত ঢাকা থ'কে না। কেন আমায় তুমি ভোলাচ্ছ আর? আমি নিজের রোগ-যন্ত্রণার চেয়েও বেশী কষ্ট পাচ্ছি তোমার জন্যে। '...' হ্যাঁ তোমারই জন্যে। আমি এইরকমভাবে বেঁচে থেকে যে তোমার কতখানি কষ্ট দুশ্চিন্তা ও ব্যথার কারণ হ'য়ে রয়েচি, সে

তো অহর্নিশি দেখতেই পাচ্ছি। আবার মরেও তোমায় কতখানি গভীর কষ্ট দেব, তাও আমি একটু একটু অনুভব করছি। ওগো, তোমারই চিন্তা আমায় পাগল করে তুলেচে। এই সাত বৎসর ধরে রোগ-শয্যায় পড়ে অনেক ভেবে অনেক চিন্তা করে এই বুঝিচি—বিধিলিপির উপর কারুর হাত নেই। আমায় নিয়ে চিরকাল কষ্টই পেলে শুধু। '...' না, না, ওগো বলতে দাও আমায আজ। প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার প্রাণের সুখ শান্তি আনন্দ আমি গ্রাস কবছি। এতদিন এত অসুখে ভুগেও মর্ত্তে চাইনি। কারণ, এই সুদীর্ঘ বোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও আমি যা' সুখ, যা' আনন্দ পেয়ে আস্‌চি, —সুস্থ শরীবে অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও কেউ ঠিক এমনিই বুকভবা তৃপ্তি ও আনন্দ পেয়েছে কি না আমি জানি না। তোমায় ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কোথাও যেতে চাইনি তা' তুমি বেশ জান। তোমায় ছেড়ে স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করবারও আমার উপায নেই!

তোমায় ছেড়ে মৃত্যুর ওপারে যাওয়াব কথা ভাবলে, আগে শিউরে উঠতুম, কিন্তু না, এখন আর তা' নয়। এরকম চিররুগ্না যার স্ত্রী, শাস্ত্রকারেরা তার বিবাহের ব্যবস্থা করে গেছেন। তুমি এ অবস্থায় আবাব বিবাহ ক'রলেও কোন পাপ বা অন্যায় তোমায় স্পর্শ করতে পারে না। অবশ্য আজই আমি তোমায় তা' ক'রতে বলছি না, কারণ, আমি জানি, সে তোমাব পক্ষে অসম্ভব, আর, আমার যখন দিন ফুরিয়েই এসেছে, তখন আর তাডাতাড়ির বিশেষ আবশ্যকতা নেই। আজ আমার একটি কথা তোমায় বাখতেই হবে, নইলে হবে না। '...' না না, অত কাতর হ'লে চলবে না আজ। দেখ্‌চ, আমি আজকে কতদূর শক্ত হয়েচি? তোমাকেও আজ কঠিন হতে হবে। এইতেই যদি তুমি এত কাতব হয়ে পড়,—তখন কি করবে? অন্ততঃ আজকের মত তুমি আমার মুখ-চেয়ে শক্ত হও। '...' কি অনুরোধ শুনতে চাও? বলচি, কিন্তু আগে প্রতিজ্ঞা কর আমার মাথায় হাত দিয়ে, আমার কথা রাখবে? না, আগে প্রতিজ্ঞা কর, না করলে হবে না। '...' আমি কি কখনও কোনওদিন অন্যায় অনুরোধ করেচি তোমায? না—না, এ কথাটি রাখতেই হবে তোমায়, নৈলে মরেও আমি নিশ্চিন্তি হতে পারবো না। বল, রাখবে? '...' রাখবার যোগ্য হ'লে তবে রাখবে? অন্যায বা অযোগ্য হলে তোমায় কি আমি বলতে পারতুম? আমার এই শেষ অনুরোধ—শেষ ভিক্ষাটি পূর্ণ কোরো। আমি চলে গেলে তুমি স্নেহকে বিয়ে কোরো। ও কি? অমন ক'রে চমকে উঠলে কেন?...না—না, তোমার অমন বেদনা-কাতর মুখ আমি সইতে পারি না। কি ক'রব, উপায় নেই, তাই আজ এ-কথা বলতে হ'চ্চে।

স্নেহকে কেন বিয়ে কর্ত্তে ব'লে যাচ্ছি জান? মাসিমা ওকে সৎপাত্রে দিতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। স্নেহ'র মত বুদ্ধিমতী ধীর ও সহৃদয়া মেয়ে আমি কমই দেখেচি। ওর অন্তরটা খুব উঁচু ও উদার। তুমিই ত' বল যে, মানুষের 'অন্তঃকরণ'ই হ'চ্চে আসল জিনিস। গুণও নয়, রূপও নয়, অর্থও নয়। খাঁটি প্রাণ

মেলে বড় অল্প।

স্নেহের মধ্যে এই 'প্রাণ' জিনিসটা বড় বেশীই বলে মনে হয়। বড় সৎ, লক্ষ্মী, কোমলমনা মেয়ে সে। মাসিমা'র আজকাল যেরকম অবস্থা, অমন সোনার প্রতিমা মেয়ে, হয়তো কোনও বাঁদরের হাতেই পড়বে। তাই বলচি, স্নেহকে ঘরে আনলে, সহায়-সম্পত্তিহীনা বিধবার উপকার করা হবে, আর পাবেও একটি খাঁটি মানুষ। সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, লেখাপড়া, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম, সবদিকেই নিখুঁত সুন্দর সে। নেই শুধু টাকা! তা' তোমার টাকার দরকার নেই। কিন্তু তা বলে তুমি ভেবো না যেন, বিয়ে করে তুমি স্নেহকে দয়া ক'রলে বা উদ্ধার করলে। সে বরং উল্টো। স্নেহকে যদি তোমার গৃহলক্ষ্মী করে বরণ করে আনতে পার, তবে তোমারই সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিও,—সে একটি অমূল্য রত্ন। আমি বেশ জানি, তোমার এই সংসারের, আর তোমার জীবনের হাল যদি কেউ অবলীলাক্রমে ধবতে পারে, তবে সে এক স্নেহ। হাজার হোক, আমার বোন তো সে।

তারপর আর একটি কথা। এতদিন ধরে তোমায় ঢের ভোগই ভুগিয়েছি, আরও কতদিন ভোগাব জানি না; কিন্তু মরণের কূলে এসে দাঁড়িয়ে, আবাব তোমায় কি দিতে বসেছি জানিনে। আমি তো সন্তান চাইনি কোনওদিন? ভয় হ'ত আবার কাকে ডেকে এনে তোমার ভাবনার বোঝা, ব্যথার বোঝা আরও কি বাড়াব? সমুদ্র-মন্থনে আমার ভাগ্যে বিষের আশঙ্কাই বেশী। তাই 'ও' প্রার্থনা ক'রতে ভয় হ'ত মনে। তোমার কাছে লুকাব না—কিন্তু তবু—তবুও কতদিনই ঐ চিন্তা, ঐ সাধ আমাব নিজের অগোচরেই মনের ভেতর উঁকিঝুঁকি দিয়েচে। যখনি একলা থেকেচি— একখানি কচি মুখের ছবি কল্পনায় কেবলই চোখের সামনে ভেসে উঠেচে, তন্ময় হয়ে মুগ্ধ হয়ে সেই চিন্তায় ডুবে গেছি। তারপর যখনই চমক ভেঙেছে, তখনই লজ্জায় মুষড়ে পড়েচি, ছি ছি! যে চিররুগ্না হয়ে স্বামীকে এত কষ্ট দিচ্ছে, তার আবার সন্তান-সাধ!! রুগ্না মায়ের তো রুগ্ন সন্তান হবার ষোল আনাই সম্ভাবনা। নিজেকে নিজে কঠোর তিরস্কার করেছি—ব্যর্থতার ধিক্কারে অন্তর পূর্ণ হ'য়ে উঠেচে। তোমাকে মুক্তি দেবার জন্যে আমার শেষের দিন যখন এগিয়েই এল, তখন ভগবান এবাব কী পাঠাচ্ছেন, বুঝতে পারচি না। এ' তোমার ফুলের মালা হবে, না, লোহার শিকল হবে, তাই ভাবচি। মরণ-নদীর তীরে দাঁড়িয়ে, জীবনের প্রথম ও শেষ উপহার কী তোমায় দিয়ে যাব, তা' বুঝতে পারছিনে। কীই যে হবে, তা' কে জানে? তাই বড় ভাবনা,—ওগো আমার বড় ভয়। '...' না, না, আমি শ্রান্ত হইনি। তুমি প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমায় এমন ক'রে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ শান্তি দিয়ে আর অপরাধী করে তুলো না। '...' না, আমি আর ওষুধ খাব না। আর আমার একটুও ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে না। শুধু কেবল একটাকে পেটে ধরেছি বলেই ওরই জন্যে আমার ওষুধ খাওয়া, ওরই জন্য ভাবনা। ভগবান যখন পাঠিয়েছেনই, যেন অসম্পূর্ণ করে কেড়ে না নেন, এই সর্ব্বদা মনে হয়। না—না,—কেন তুমি আমার জন্য এত ব্যস্ত!

সুস্থ মানুষ তুমি,—কি করে অহোরাত্র এই রোগীর বদ্ধ-কারায় স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন সঙ্গ নিয়ে আবদ্ধ হ'য়ে আছ বল দেখি? একটু বাইরে বেড়িয়ে এস না।—উঃ, বুকের যন্ত্রণাটা যে আবার বাড়লো—

এখন একটু ভাল আছি। না, না, আর কক্ষনো বলবো না। লক্ষ্মীটি, তোমাব চোখে জল আমি সইতে পারি না। ছি ছি, রাক্ষুসী আমি, তোমায় কেবল ব্যথা দেবার জন্যে এসেছিলুম। '...' ও'সব কথা ভুলবো? আচ্ছা, কাজ নেই আর ও'সব কথায়। তুমি একটা গান গাও না,—সেই, সেই গানটা—

জানি গো দিন যাবে এ'দিন যাবে
একদা কোন্ বেলা শেষে
মলিন ববি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চা'বে।

'...' হ্যাঁ, বেহালাই ভাল, অর্গ্যানের আওয়াজ বড্ড কানে লাগে।

আর! আমার সারা দেহের শিরগুলোর ভেতরেও যেন বাজ্‌চে—'ওগো দিন যাবে, এ'দিন যাবে।' এ'যে দেখছি তুমি সত্যি সত্যিই 'সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে।' বুকটার ভেতর কেমন ক'রচে। ওগো তুমি উঠে এস আমার কাছে। না, না, জানালা বন্ধ কোরো না, খোলা থাক্ অম্‌নি।

[স্নেহ'র কথা]

না—বৌদি! ভুল বুঝেচ। তুমি সরিৎদিকে জানতে না, তাই ঐ কথা বলচ। সরিৎদি'র মত মেয়েব স্বামী যিনি, তিনি আবার কখনও বিয়ে করতে পারেন না। তাঁর এই বিয়ে করা কেন জান? এ'ও সেই সরিৎদিরই জন্যে। এ' বিয়ে তাঁর নিজের জন্যে তো নয়ই, বরং তাঁর নিজের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে, প্রকাণ্ড বিড়ম্বনা —শাস্তি বলেই মনে হয়। তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না বৌদি, এর মধ্যে কতখানি ব্যথা লুকানো আছে! '...'একটা নির্দ্দোষ বালিকার জীবন নষ্ট কর্ব্বার জন্যে উপযাচক হ'য়ে এ' বিয়ে কেন করলেন, জিজ্ঞাসা ক'রছ? জীবন নষ্ট করা?—না, সার্থক করা, ধন্য করা বলো। একে কি জীবন নষ্ট করা বলে?

বৌদি! স্ত্রী মারা গেলে সাধারণতঃ পুরুষমানুষেরা কেউ বা অশৌচান্ত হ'লেই বিয়ে করে, কেউ বা বড় জোর দু'পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করে। তাদের মধ্যেই আবার কেউ কেউ বা প্রথমটা স্ত্রীর ছবি পুজো করে, কিম্বা উম্মাদ পাগল সাজে; কেউ বা গেরুয়া পরে দিনকতকের জন্য সন্ন্যাসীও হ'য়ে যা'য়। তারপব যথাসময়ে নতুন কোনও আলতা-পরা পদপল্লব পুজো কর্ত্তে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তুমি জেনো বৌদি! স্ত্রী মারা গেলে যাঁদের ঘরে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', 'এষা' প্রভৃতি শোক-কাব্য ও

মৃতা পত্নীর পুষ্প-পূজিত ফটোগ্রাফ দেখবে, তাঁদের ঘরেই শীঘ্র আবার দ্বিতীয় পক্ষের প্রিয়ার 'মান-ভঞ্জন' চিত্রটাও দেখতে পাবে। তাদের দলে যেন এঁকেও টেনে নিও না। ইনি তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে, সম্পূর্ণ বিপরীত। '...' তুমি কি পাগল বৌদি? স্বামীর প্রতি অল্প ভালবাসায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি এ'কথা বলছি, এ তোমার মস্ত বড় ভুল ধারণা। প্রথমতঃ, আমার 'স্বামী' কে, যে, তাঁকে ভালবাসব? ভালবাসার পাত্রই যখন অনুপস্থিত, তখন অন্ধ কিম্বা চক্ষুষ্মান কোনও ভালবাসাই এখানে আস্‌তে পারে না। '...' গালে হাত দিয়ে অবাক্ হওয়াই তোমাদের পক্ষে সম্ভব বটে! কিন্তু ছি বৌদি, অমন করে একজন নির্দ্দোষ দেবচরিত্র লোককে বিনা কারণে গালাগালি দিও না—এর বাড়া পাপ আর নেই।

'...' তুমি বলতে পার বটে, যদি এতই মৃতা স্ত্রীর উপর প্রেম, তবে স্ত্রী মারা যাবার পরই এত শীঘ্র বিবাহই বা করা কেন, আব, একটা নির্দ্দোয কুমাবী-জীবন এমন ক'রে ব্যর্থ ক'বে দেওযারই বা উদ্দেশ্য কি? কিন্তু আমি তো তা' মোটেই বল্‌তে পারি না। বৌদি! খোকার কথা কি তোমরা একটিবারও ভাবতে পারচ না? যত ভাবনা কি এই বুড়ো মেয়ের জন্যে? পৃথিবীতে নবাগত এই অসহায় শিশুটিব এই মুহূর্ত্তেই কি প্রয়োজন এখন? '...' তুমি নিজে 'মা' হ'য়ে কি ক'বে ও কথা উচ্চারণ ক'রলে ভাই? '...' দাই রেখে মানুষ করা? পৃথিবীতে এসে আজ কি ওর দাইয়ের অভাবটাই সবচেয়ে বড় বলে বোধ হবে? মাতৃস্তন্যটাও হয়ত' না হ'লে চলতে পারে, কারণ খাঁটি দুধের অভাব পৃথিবীতে নেই; কিন্তু খাঁটি স্নেহের অভাব বড় বেশী। মাতৃস্নেহ থেকেই যদি এ' আজন্ম বঞ্চিত থাকে, তবে জীবনের গোড়াটাই যে সব ফাঁকিতে ভরে' যাবে!

'...' আমি যে ওকে মাতৃস্নেহে বুকে তুলে নিতে পারব—সরিৎদি'র কাছে এই ভরসা পেয়েই উনি আমাকে নিয়ে গেছেন। উদিতেন্দু'র মা করেই আমায় নিয়ে গেছেন—সরিৎদির' সতীন করে নিয়ে যাননি। আমি সরিৎদি'রই বোন বলেই বোধ হয় আমার উপর এই বিশ্বাস উনি স্থাপন করতে পেরেছেন।

বৌদি! আমি উদিতে'ব মা হয়েচি—এটা বেশী গৌরবেব, সুখের, না—যদি সরিৎদি'র সতীন হতুম, সেটা বেশী গৌরবের হ'ত? ভগবান রক্ষে করেছেন। সে হলে এটাও যে প্রমাণ হ'ত—উনি পূর্ব্বে সরিৎদি'কে যা' দিয়েছিলেন, সেটা মিথ্যা এবং এখন আমি যা পেতুম সেটাও মিথ্যা—কারণ, এ' একটা এমন জিনিস, যা অটুট্ অবস্থায় কেবল একজনকেই দেওয়া যায়, দু'জনকে দেওয়া চলে না।

'...' হাঁ, আমি চিরদিনই দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। তুমি ভেব না—আমি অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মতেরও পরিবর্ত্তন ক'রব। সাধারণতঃ অনেকেই এরকম করে থাকে বটে, তার দৃষ্টান্তও আমাদের দেশে খুব দেখা যায়। আমি বলি, স্বার্থ বা আবশ্যকানুরোধে বিপরীত-পন্থী হওয়াটা অন্যায় নয়। তবে মতটাও যাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সমূলে পরিবর্ত্তন করেন, তাঁরা দুর্ব্বল। তাঁদের মেরুদণ্ড নেই। কিন্তু আমায় তা ভেব' না। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ আমি এখনও অন্তরের সহিত

ঘৃণা করি এবং চিরদিনই ক'রব।

'...' উনি যদি আজ আমাকে 'দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী' ক'বে নিযে যেতেন, তা'হলে আজ আমার মুখে এই অম্লান হাসি—এই সুখের ও গর্ব্বের হাসি দেখতে পেতে না। ভাই, যে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে, সে কেবল একটা জীবনই ব্যর্থ করে না —তিন-তিনটা জীবন ব্যর্থতায় ও ফাঁকিতে ভবে দেয়। তুমি তো জান, মা এই বিয়েতে সম্মতি দেবার আগে গোপনে আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এতে আমাব মত আছে কি না! আমি দ্বিধাহীন চিত্তে মার কাছে সম্মতি জানিয়েছিলুম; কারণ, সবিৎদি' মারা যাবার আগে দু'বার আমায় তাঁর কাছে নিয়ে গেছ্‌লেন। দিদির কাছে আমি ওঁর সব কথা জেনেছিলুম। তারপর যখন সরিৎদি' মারা গেলেন, মা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মা উদিতকে বুকে কবে যখন আমার কাছে নিয়ে এলেন, একরাশ শাদা ফুলের মত ছোট্ট কচি ছেলেটা—তখনও চোখ মেলতে শেখেনি, —কয়েক ঘণ্টামাত্র পূর্ব্বে সে এই পৃথিবীতে এসেছে। উদিত যে আমারই কোলে চোখ মেল্‌তে শিখল, দুধ খেতে শিখল, হাসতে শিখল! আমি তখনই স্থির কবে ফেললুম, স্বামীর দিক থেকে ফাঁকি পাওযাই যদি আমার অদৃষ্টে থাকে,—উদিতকে বুকে নিয়ে সব ব্যথা ভুলতে—সব ফাঁকি সইতে পাববো। বৌদি! আমাব মত সৌভাগ্যবতী ক'জন আছে জানি না। এমন খাঁটী প্রেমিক, এমন সত্যগত-প্রাণ, মহৎহৃদয় দেবতার দাসী ক'জন হ'তে পেরেছে জানি না। '...' স্বামীর অহঙ্কার? বৌদি! বার বার ঐ ভুল কথাটা কেন বোল্‌চ? আমাব বিয়ে হযেচে বটে, কিন্তু 'স্বামী' তো হয়নি। তা' এর জন্যে কি বুক-ফেটে মরে যেতে হবে? কি করে তোমায় বোঝাবো যে— এই বিবাহে আজ যদি আমি স্বামী পেতুম, তা' হলে সত্যিই স্বামী হারাতুম। আমি তাঁকে পাইনি বলেই আজ আমার এত গর্ব্ব, এত গৌবব। বৌদি! আমি কোনওদিনই আশা করিনি যে, আমাব মতো একজন দীনা, নগণ্যার এত বড় সৌভাগ্য হবে যে, আমি একটা মহৎ কাজের পাত্রী নির্ব্বাচিতা হ'ব— যিনি দেবতার চেয়েও মহান্, এমন একজনের সঙ্গিনী হ'ব, সেবিকা হ'ব, সবচেযে তাঁর মহৎ কর্ম্মের সহায় হ'ব! এ যে আমার নিতান্তই স্বপ্নাতীত ছিল।

'...' আমায় বিয়ে করে উনি যে মা'কে উপকৃতা ও আমায় উদ্ধার করেছেন, এ' তো বাস্তবিক সত্যই। তবে শুধু এই উদ্দেশ্যেই উনি বিয়ে করেননি।

বৌদি! তোমরা যা' বুঝবে না, তা' বোঝাবার বৃথা চেষ্টা ক'রে আরও কতকগুলো ভুল ধারণা মাথায় ঢুকিয়ো না। আমি অসুখী—কি করে জানলে, কি দেখে বুঝলে ভাই? আমি সত্যি সত্যিই বলচি, এর মধ্যে এতটুকুও মিথ্যা নেই, আমি সুখী, —খুবই সুখী। আমার কথা'তে যদি বিশ্বাস স্থাপন করতে না পার, কোর না; কিন্তু কতকগুলো মিথ্যা, অমূলক, কাল্পনিক দুঃখের সৃষ্টি করে, শেষে আমার মায়ের মনে একটা মিথ্যা কষ্ট ডেকে এনে দিও না।

'...' তোমরা চির প্রথামত যা' দেখতে না পেয়ে এত হা-হুতাশ করচ, সেটা

থাকলে যে আমি সত্যিই বড় কষ্ট পেতুম—নিজেকে দুর্ভাগিনী বলে মনে করতুম, —এ' কথা তো বার বার বলচি ভাই! তবুও কি তুমি আমার কথা বিশ্বাস ক'রতে পারচো না?

'...' মাফ্ কোরো ভাই,—আমি এ'সব কথা বেশী আলোচনা করতে পারি না। তোমরা এ-বিষয়ে ভালমন্দ কিছু না ভাবলেই সুখী হ'ব। কারণ, আমি গুছিয়ে সব কথা বলতে গেলে, আপনা আপনি কি-জানি-কেন আত্মহারা হয়ে পড়ি। আমি যে 'ভাব' নিয়ে একটা কথা বলি, ভাষার দোষে হয়তো সেটার বিপরীত অর্থ দাঁড়ায়।

—খোকনকে দুধ খাওয়াবার সময় হ'ল, যাই ভাই!

[দিব্যেন্দু'র কথা।]

ঘর থেকে যেও না স্নেহ! তোমায় আজ আমার কিছু বলবার আছে। ঐ কৌচটার উপর বোসো। থাক্— থাক্, এই যে আমি এই চেয়ারটাতেই বস্‌ছি। তুমি এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ কেন? বোধ হয় একটু বেশীক্ষণই তোমাকে আমার কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা ক'রতে হবে।

শোনো স্নেহ! আমি তোমার কাছে অত্যন্ত অপরাধী!...আমায় তুমি ক্ষমা ক'রতে পারবে কিনা জানি না,—কিন্তু ক্ষমা আমি চাই না, কাবণ, তার যোগ্য পাত্র আমি নই। আমার স্বার্থপরতার বিষয় শুনলে হয়তো তোমাব অন্তর ঘৃণায় ভরে উঠবে, —আর সেটা আমি স্বাভাবিকই মনে করি। তবে একটা অনুরোধ,—তুমি আমার দিক্ দিয়ে একবার বিষয়টা ভাল করে বুঝে দেখবার চেষ্টা কোরো। আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির এ ছাড়া বোধ হয় অন্য পন্থা ছিল না। তবে সেটা শুধু আমার নিজেরই দিক্ দিয়ে।

আমি বড় হতভাগ্য, স্নেহ! আমার নিজের এই দুরদৃষ্টের সঙ্গে—আজীবনব্যাপী দুঃখের সঙ্গে, অম্লান ফুলটিরই মতো আনন্দ-প্রতিমা তোমায় কেন জড়িত করে, শুধু এই দুঃখেরই অংশ দিতে নিয়ে এলুম, তাই ভাব্‌চি। তবে এ'ও আমি জানি এবং আমার চেয়েও আমাব কথা যে আরও ভাল করে জানত, সেই সরিৎও জেনেছিল, আমার মত লোকের ভার যদি কেউ গ্রহণ করতে পারে ও আমায় ঠিক্ বুঝতে পারে, তবে সে কেবলমাত্র তুমিই। সরিৎ আমাকে তোমার কথা বার বার ক'রে কেন বলে গিয়েছিল, তা এখন বুঝতে পারচি। কিন্তু সে'ও তার স্বামীর জন্য একটা মস্ত বড় স্বার্থপরতা করে গিয়েছে; কারণ, সে শুধু তার স্বামীর দিক্‌টাই চিন্তা করেছে, ও তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে; কিন্তু তোমার দিকটা একেবারেই চেয়ে দেখেনি।

'...' সরিতের সঙ্গে তোমার এ' বিষয়ে কথা হয়েছিল? সে তোমায় এ' সম্বন্ধে কতকটা বলে গেছে? ওহ্! সরিৎ তা'হলে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত, তার এই অক্ষম অপারগ স্বামীরই ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হয়েছিল!! মৃত্যুকে সে শান্তিতে বরণ করে নিতে পারেনি এই অভাগার জন্যে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি!

আমাব মনে হয, মৃত্যুও তাকে এই চিন্তা হতে অব্যাহতি দিতে পাবেনি, বৈতবণীব ওপাবেও সবিৎ, ঠিক তেমনিই আমাব জন্য চিন্তাকুল উদ্বিগ্ন প্রাণ নিয়ে দাঁড়িযে আছে।

—যাক। তুমি যদি কিছুমাত্রও আভাস সবিতেব কাছে পেযে থাক, তবে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপাব বোধ হয বলবাব দবকাব হবে না। তবে আমাব নিজেব যা বলবাব আছে তোমায, তাই বলছি, শোনো।

সবিৎকে আমি ভালবাসতুম খুবই, কিন্তু সে যে কতখানি, তাব পবিমাণ আজ সবিৎকে হাবিযে বুঝতে পাবচি। আমি চিবকালই নিজেব সম্বন্ধে একটু অধিক পবিমাণেই উদাসীন, তা' জানো বোধ হয। তেবো বছবেব মেযে সবিৎ এসে আমাব সমস্ত ভিতব বাইবেব ভাব এমনিই অবলীলাক্রমে সম্পূর্ণভাবে নিজেব হাতে তুলে নিযেছিল যে, তাতে আমি নিজেব সম্বন্ধে এতই বেশী অজ্ঞ হযে পড়েছিলুম, যা বোধ হয সচবাচব কোনও মানুষেই হয না। আমাব জীবনে যখনি যে জটিল সমস্যা জোট পাকিযে উঠেছে, তাব প্রত্যেকটি গ্রন্থি সবিৎ নিজেব হাতে খুলে না দিলে, আমাব নিজেব খোলবাব শক্তি ছিল না।

সে চিব-রুগ্না ছিল। শেষেব দুই-এক বৎসব কি-জানি-কেন সে আপনা আপনিই নিজেব রুগ্নতাব জন্য ক্ষুব্ধ লজ্জাব ব্যথায আমাব উপব তাব সেই অটুট অধিকাব ও দাবি যেন হাবিযে ফেলছিল। আমি প্রাণপণ যত্নে তাব এই অমূলক লজ্জাব দুঃখ মুছে নিতে চেষ্টা কবেছি, কিন্তু পাবিনি। সে নিজেব অক্ষমতা রুগ্নতাব জন্য, নিজেব উপব ভযানক বিবক্ত হযেছিল ও ইদানীং আমাব উপব তাব আগেকাব দাবি নেই বা থাকতে পাবে না এই ভ্রান্ত ধাবণা হযেছিল। কিন্তু আমাব উপব তাব অগাধ ভালবাসা একদিনেব জন্যও ম্লান হযনি। তাব এই কল্পিত দাবি-হাবানোব ব্যথা শেষকালে আমায বড়ই আঘাত দিযেচে। নিজেব অক্ষমতাব অজুহাতে একটা কল্পিত অপবাধ সৃষ্টি কবে, সবিৎ শেষটায কেনই যে এত কষ্ট নিজে পেয়ে গেল, আব আমাকেও দিযে গেল, তা বুঝতে পাবি না।

যা হযে গেছে, তা' গেছে। এখন এই যে একটা জটিল সমস্যায় পড়ে গেছি, —সবিৎ তো নেই, কে আমাব এই সমস্যাব মীমাংসায সাহায্য কৰ্বে? তোমাব কাছে তাই এলুম স্নেহ। সমস্যাটা হচ্ছে, নিজেকে নিযে, তোমাকে নিযে ও উদিতকে নিযে। প্রথম তোমাব কথা বলি।

আমি তোমায বিবাহ কবেছিলুম যখন, তখন আমি স্থিবচিত্তে কিছু চিন্তা কবতে বা ভবিষ্যৎ ভাবতে পাবিনি; কাবণ, তখন উদিতেন্দু'ব চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন কবে বেখেছিল। সবিতেব চিব-প্রস্থানেব জন্য আগে থেকেই তিল তিল কবে প্রস্তুত হযেই ছিলুম; কিন্তু উদিতেন্দু'ব জন্য তো মোটেই কোনও চিন্তা কবিনি বা প্রস্তুত হইনি। আমি কেবল বুঝেছিলাম তখন, উদিতেন্দুব একজন 'মা' চাই। এমন একজন কাকব কোলে ওকে তুলে দিতে হবে, যে ওব সত্যই 'মা' হবে, ভিতবে বাইবে কোনওখানে এককণা

ফাঁকি থাকবে না। আমি তাকে হাজার স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘিরে রাখলেও মার প্রাণের অভাব ঠিক ঠিক কি পূর্ণ কর্ত্তে পারবো? নিজের উপর তখন এক বিন্দু বিশ্বাস নেই। আর আমার অন্তরের অন্দর-মহলের খবব যে জানত, সে তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি পাগলের মত ভাবতে লাগলুম। ধাত্রী আনবো কি? কিন্তু 'মায়ের স্নেহ' কি তাবা দিতে পাববে? কখনও নয়। তারপর বিমাতা। মাতৃহারা বালকের জীবনে সে তো একটা অতিরিক্ত অভিসম্পাত স্বরূপ। আমি যে চাই উদিতে'র মা,—বিমাতা ত' নয়।

সেই ভাবনার মধ্যে তোমারই কথা মনে জেগে উঠল্। সরিৎ আমায় তোমার কথাই বলে গিয়েছিল। আমি তোমাব নিজের দিকের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখ কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে সরিতের উপদেশ ও উদিতেন্দু'র প্রয়োজন স্মরণ করে অবিলম্বে তোমায় নিযে এলুম। উদিত ছাড়া আরও একটা কথা আছে। আমি সাংসারিক ব্যাপারে, গৃহস্থালীর ভাব ও নিজের শরীর-রক্ষা ব্যাপাবে একান্ত অপটু। উদিতে'র জন্য মুখ্যতঃ তোমায আনলেও, ওব মধ্যে গৃহস্থালী ও নিজেব সুবিধাও ষোলআনা গৌণভাবে বর্ত্তমান ছিল। তা'হলে বুঝচো স্নেহ, তুমি যে আমায় উদাবচেতা বা মহৎ-প্রাণ বলে ভাবচো, সেটা একেবারেই ভ্রম। মহৎ তো মোটেই নই,—উপরন্তু ভীষণ স্বার্থপব।

'...' তুমি কুণ্ঠিত হ'য়ো না, আমায় সব কথা ভাল করে বলতে দাও। শোনো স্নেহ! তোমার কাছ থেকে আমার নেবার জিনিস তো এত, কিন্তু তোমায় দেবার কিছু নেই। তোমায় সুখী ক'রবো, এ ভাবনা আমি একবারও ভাবিনি। তোমাকে বিবাহ ক'রবার আগে সে কথা ভাবতে পারিনি, এখন সেই ভাবনা প্রবল হয়েছে। আমি খুঁজে-পেতে দেখলুম স্নেহ, তোমায় দেবার মত কিছুই পেলাম না। তোমাকে বিবাহ করে তোমার জীবন যে কতখানিই ব্যর্থতায় ভবে' দিয়েচি, সেটা এখন সম্যকরূপে বুঝতে পেরে অনুতাপে মন ভরে গেছে।

সবিৎ জীবিতাবস্থায় আমাব উপর যেমন দাবি হাবিয়েছিল, মরণের পরপারে গিয়ে সেটা খুবই পুষিয়ে নিয়েচে। আজ সরিৎকে হারিযে বুঝতে পারচি, আমার উপরে তার কতখানিই অধিকার ছিল। আমার নিজের উপর একটুকুও অধিকার কিছু নেই, যে অধিকারে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি! কিন্তু সরিৎ মৃত্যুর ওপারে থেকেও তার স্বামীর উপর পূর্ণাধিকারে রাণী হয়ে প্রতিষ্ঠিত' থাকবে, আর তুমি সব হারিযে নিঃস্ব হয়ে সবিতেরই স্বামী-পুত্রের সেবিকা হয়ে থাকবে,—এ'ও কখনো হ'তে দিতে পারি না। আমি তারই একটা ব্যবস্থা করতে চাই।

আমি তোমায় বিবাহ করে এনেছি বটে, কিন্তু তুমি আমায় স্বামীর চক্ষে দেখো না—এই-ই আমার একমাত্র নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জ অনুরোধ। তুমি বিবাহের পূর্ব্বে আমায় যে সম্পর্কে শ্রদ্ধা-ভক্তি ক'রতে বা ভালবাসতে, সেই সম্পর্কই বজায় রেখে, তেমনি চোখেই দেখতে চেষ্টা ক'রবে। আমি তোমার কাছে আগেও যেমন ছিলাম, এখনও তেমনি সেই তোমার দিদিরই স্বামী থাকতে চাই। মন্ত্রপাঠ ক'রে, দেবতা-ব্রাহ্মণ সাক্ষী

করে, তোমাকে সব চেয়ে নিকটতম সম্পর্কে বেঁধে এনেছি বটে, কিন্তু তা উদিতেন্দু'র জন্য! যদি এমন কোনও মন্ত্র বা নিয়ম পদ্ধতি থাকত, যার দ্বারা মাতৃহারা শিশুর কেবল 'মা' করে আনা যেত, তা'হলে আজ তোমায় উদিতেন্দু'র মা হ'বারই মন্ত্রপাঠ ক'রে নিয়ে আসতুম। কিন্তু তা' যখন নেই, জগতের চোখে তোমায় উদিতেন্দু'র মা করে দাঁড় করাতে গেলে, আমার যে এই মন্ত্রপাঠ—এই ক্রিয়া-পদ্ধতির শরণাগত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, তাই বাধ্য হয়েই আমায় করতে হয়েচে।

উদিত্ পৃথিবীতে এসেই মা-হারা হয়েছে, এখন তুমিই ওর মা। সত্যিকারের মা, গর্ভধারিণী মা। এই মাতৃত্বের মধ্যে কোথাও একটুও ফাঁক আমি রাখতে চাই না। সরিৎ তোমায় স্বামী দিলে না, আমি তোমায় তার সন্তান কেড়ে নিয়ে দিচ্ছি। ও' তোমারই ছেলে। ও' যাতে জানতে না পারে, ওর গর্ভধারিণী অন্য কেউ ছিল, —তার ব্যবস্থাও আমি করেছি।

বাংলা দেশ ছেড়ে এই সুদূর প্রবাসে আমার চলে আসবার কারণই হচ্ছে ঐ। আমার উচিত ছিল উদিতের মনে শৈশব থেকেই তার মায়ের ছবি এঁকে দেওযা, তার মায়ের প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি কথা তার শিশু-চিত্তে মুদ্রিত করে দেওয়া। আর সরিতেরই শেষ উপহার একমাত্র জীবন্ত-স্মৃতি ব'লে উদিত্কে সরিতের স্মৃতি মাখিযে বুকে করে নিয়ে রাখা—এই আমার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমি তা' না করে, —তার দেহের রক্তে গড়া, তারই শরীর পাত করা সন্তানকে তার দাবি থেকে, তার নাম থেকে, তার স্মৃতি থেকে জন্মের মত ছিঁড়ে নিয়ে, তোমারই কোলে তুলে দিচ্চি। যদি বাঁচিযে রাখতে পারো, যথার্থ মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে পারো, তবে স্বামী-না-পাওযার ফাঁকিটা অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারবে,—খুব বেশী ঠকবে না...। নারী-জীবনে রমণীত্ব আর মাতৃত্ব—এর মধ্যে কোনটায বেশী সার্থকতা বলতে পারো ?—

কলকাতার বাড়ীখানি আমার কত প্রিয় ছিল, তা' তোমায় বেশী বলতে হবে না বোধ হয। সেই বাড়ীতে আমি তের বছরের কিশোরী সরিৎকে যখন নিয়ে আসি, তখন আমার মা বেঁচে ছিলেন। বাবা গেছেন, মা গেছেন ঐ বাড়ীতে। সরিৎকে পেয়েছিলাম ঐখানে, রেখেছিলাম ঐখানে, আবার হারিয়েছিও ঐখানেই। আশৈশবের কত স্মৃতি, কত আশা-বাসনা মাখান আছে সেইখানে, সে শুধু আমিই জানি। সে বাড়ীর সর্ব্বত্র চারিদিকে এখনও বোধ হয সরিতের পায়ের দাগ আঁকা আছে, মুছে যায়নি। সে বাড়ীর বাতাসে বোধ হয় এখনও চুলের গন্ধ, হাসির রেশ মিশানো আছে। পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে কাম্য, সবচেযে প্রিয়, সব তীর্থের সেরা সেই বাড়ী যখন জন্মের মতন, হ্যাঁ, জন্মের মতনই বৈ কি,— ছেড়ে চলে এসেচি, আমার বুক ভেঙে গেছে...।

...এমনি করে সরিতের চিহ্ন, সরিতের স্মৃতি বাইরে থেকে ধুয়ে মুছে উঠিয়ে দিতে, আমার প্রাণে যে কতখানি ব্যথা বেজেছে, তা' শুধু অন্তর্যামীই জানেন। উদিত্

যে তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন্ত-স্মৃতি—তার মৃত্যু'র দান! তাও আমি তার নাম থেকে মুছে সরিয়ে নিলুম। আমি নিজের অন্তরে-অন্তরে ভাবতে চেষ্টা ক'রছি, উদিত্ তোমারই ছেলে। সরিতের একখানি ফটোগ্রাফ্ কি একটি তার ব্যবহৃত জিনিস পর্য্যন্তও আমি এখানে আনিনি, পাছে ভবিষ্যতে কোনওদিন উদিত কিছু জানতে পারে! স্বদেশ, বাসভূমি, পৈতৃক-ভিটা, আত্মীয়-স্বজন, কর্ম্মের উন্নতি—সব ছেড়ে এই দূরদেশে এসেছি স্নেহ, সরিতের ছেলেকে সম্পূর্ণরূপে তোমার করে দেব বলে। পুরানো ঝি-চাকরেরা আসতে চাইলেও তাদের ঐজন্যই আনিনি। পাছে কোনওদিন তারা কোনও কথা প্রকাশ করে দেয়। তুমি বোধ হয় হঠাৎ আমার এই উন্নতির আশাহীন সুদূর বিদেশে 'প্র্যাকটিস্' করতে আসায়, ও পুরানো আমলের লোকজনেরা আসতে চাওয়া সত্ত্বেও তাদের না নিয়ে আসায়, একটু আশ্চর্য্যই হয়েছিলে, নয়? এখন বোধ হয় বুঝতে পারচ।

—তুমি এই যে আমায় ভূমিষ্ঠা হয়ে প্রণাম কচ্ছ স্নেহ, এতে বুঝলুম, তুমি আমায় মার্জ্জনা করেচ, ও আমার প্রস্তাবেও সম্মতা হয়েচ। এতে যে আমি কতটা শান্তি পেলুম, সে আর তোমায় কি বলবো।

তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রবার ক্ষমতা আমার নেই। যিনি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রতে পারেন, তাঁর কাছে আমিই যে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করছি। আর, তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার আমার তো কোনও অধিকার নেই, কারণ তোমার যা আশীর্ব্বাদ করবার, তার সঙ্গে আমারও যে স্বার্থ সম্পূর্ণ জড়িত রয়েচে। তবে তুমি আমার উদিতেন্দু'র মা,—তোমায় যেন যোগ্য-সম্মানে যোগ্য-স্থানে চিরদিন রাখতে পারি,—তাঁর কাছে এই প্রার্থনা আমার চিরদিন যেন অব্যাহত থাকে।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

মাসী

১

সকালবেলা অশ্রু-লাঞ্ছিত গণ্ডে দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া অস্ফুট স্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মীনু আসিয়া মায়ের কোলের ভিতর মুখ লুকাইল।

'কি হয়েছে রে?'—বলিয়া মা তাহার ক্ষুদ্র হাত দুইখানি আপনার জানু হইতে খুলিবার চেষ্টা করিলেন।

মীনু আরও জোরে শক্ত করিয়া মা'কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

মা সস্নেহে অভিমানিনী কন্যাকে জানু হইতে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে? সকালবেলাই কান্না কেন?'

ক্রন্দনবিজড়িত স্বরে মীনু বলিল, 'অজিত মেরেছে।'

'অজিত মেরেছে? তারই জন্য কান্না? কি লজ্জাব কথা! ও যে তোমার ছেলে হয়, তুমি হচ্ছ ওব মাসী, ওর মারে তুমি কেঁদে ফেলেছ?'

লজ্জিতা মীনু ময়লা ফ্রকের প্রান্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে অপ্রতিভ স্বরে বলিল, 'শুধু মারেনি, আমার রবারের বেলুনও কেড়ে নিয়েছে।' মীনুর চক্ষুতে আবাব বন্যা আসিল।

মা আনতা হইয়া অঞ্চল-কোণে কন্যার অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন, 'তারই জন্য তুমি কাঁদছ? কিন্তু তুমি অজিতের মাসী—তোমার ত নিজ থেকেই বেলুনটা তোমার ছেলেকে দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।'

মীনু লজ্জিত হাস্যে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'না, মা, না, তার জন্যে আমি কাঁদবো কেন? বেলুন ও নিক না, কিন্তু ও যে আমার সঙ্গে আর খেলবে না বলেছে!'

মীনুর ধূলি ও অশ্রু-লাঞ্ছিত সুন্দর কচি মুখখানি অঞ্চল দিয়া সস্নেহে পরিষ্কার করিতে করিতে মা হাসিমুখে বলিলেন, 'বললেই বা! ওর কথা কি তোমার গ্রাহ্য করতে আছে? তবে তুমি কীরকম মাসী! অজিত তোমার ছেলে কি না, ওর কথায়—ওর মারে কাঁদতে নেই, বুঝেছ?'

মীনু নিতান্ত লজ্জিতভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া চপলচরণে শশক-শিশুর মত ছুটিয়া পলাইল। তাহার ক্রন্দনারক্ত অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে তখন হাসির উজ্জ্বল দীপ্তি বর্ষণান্তে স্বর্ণ-রৌদ্ররেখার ন্যায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে।

অজিত ছিল মীনুর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, মীনুর বিধবা বড়দিদির একমাত্র সন্তান। পিতৃমাতৃহীন অজিতকে নিরাশ্রয় করিয়া তার মা'ও যখন পরপারে যাত্রা করিল, তখন মীনুর মা কন্যাশোক সংযমিত করিয়া পিতৃমাতৃহীন দৌহিত্রটিকে আপনার

কাছে লইয়া আসিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

স্বাস্থ্যসবল হৃষ্টপুষ্ট অজিতকে মীনু অপেক্ষা অনেক অধিকবয়স্ক বলিয়া ভ্রম জন্মিত। দৈহিক আয়তনে বড় হইলে কি হয়? পিতৃমাতৃহীন বালক মাতামহীর স্নেহাদরে লালিত হওয়ায় তাহার স্বভাবটি হইয়াছিল নিতান্ত শিশুর মত চঞ্চল, অবুঝ, আবদারী, অভিমানী।

মীনু বাহিরে গিয়া হাসিমুখে রাঙ্গা বেলুনের স্বত্ব ত্যাগ করিবামাত্র অজিত খুসী হইয়া সন্ধিস্থাপনা করিয়া ফেলিল,—'মীনু ভাই, দাদুকে ব'লে আমি তোকে একটা বেলুন কিনে দেব।'

'না, না, আমার দরকার নেই। ও বেলুনটা আমি তোকে আগেই দিতুম, ভাই! আমি তোর মাসী হই কি না, আমাকে দিতে হয়।'

চিন্তিত মুখে অজিত বলিল, 'আচ্ছা, তুই যদি আমার মাসী হ'স, আমি তা হ'লে তোর কে হই, বল দিকিন?'

আনন্দ-দীপ্ত মুখে মীনু বলিল, 'ছেলে।'

'দূর! তা কি হয়? আমি তোর চেয়ে ক—ত বড়। আয় না, মেপে দেখ।'

শঙ্কিত মুখে মীনু বলিল, 'না, না তুমি আমার ছেলে হও, মা ব'লে দিয়েছেন। তাই ত তোমাকে খেলনা দিয়ে কাঁদতে নেই।'

ভ্রূকুটিপূর্ণ সন্দিগ্ধ মুখে অজিত বলিল, 'আচ্ছা, চল দিকিনি দিদা'ব কাছে।'

মীনু উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, 'হ্যাঁ, চল না।'

উভয়ে ছুটিতে ছুটিতে অন্তঃপুবে আসিয়া প্রায সমস্ববে চীৎকাব করিয়া জিজ্ঞাসা বরিল, 'হ্যাঁ, দিদা, মিনি আমার কে হয়?'

'হ্যাঁ মা, আমি অজিতের মাসী নই?'

মা কুটনা কুটিতে কুটিতে হাঁ হাঁ করিযা উঠিলেন— 'থাম থাম, বঁটীর উপবে প'ড়ে গিয়ে খুন হবি যে।' চলনবেগ সংবরণ কবিয়া তাহারা আবার উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল। মা বঁটীখানি কাৎ কবিযা বাখিয়া অজিতকে উভয বাহুপ্রসারণে বুকের মধ্যে টানিযা লইয়া মিষ্ট স্বরে বলিলেন, 'মীনা তোমার মাসী হয়, দাদা!'

মীনু আনন্দে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অজিতের উদ্দীপ্ত মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। সে দিদিমার ক্রোড়েব মধ্যে নিজের শরীরটাকে একটা বিপুল ঝাঁকুনি দিয়া অসন্তোষ এবং আবদারের সুরে বলিল, 'ও আমার মাসী হয়, আমি তা হ'লে ওর কে হই? আমি যদি ওকে "মাসী" ব'লে ডাকি, ও আমাকে কি ব'লে ডাকবে?'

মাতা হাসিতে হাসিতে অজিতের গাল টিপিয়া আদর করিয়া বলিলেন, 'তুমি ওর বোন-পো হও, ও তোমাকে "ছেলে" ব'লে ডাকবে।'

বিদ্রোহী অজিত সজোরে মাথা নাড়িয়া বিরক্ত স্বরে কহিল, 'না, আমায় "ছেলে" বলতে হবে না! ও কি আমার চেয়ে বড়? ঐটুকু মিনিকে আমি কক্ষনো "মাসী"

বল্‌ব না। আমি ওর চেয়ে ক—ত বড় বল ত?'

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা হ'লে তুমিই ওকে মেয়ে ব'লে ডেকো, ও তোমাকে "বাবা" বল্‌বে—কেমন?'

অজিত আরও রাগিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, না, তাও হবে না। মীনুর বাবা ত দাদু! আমি কেন হ'তে যাব? আমি বাবা হ'তে চাই না।'

মা বলিলেন, 'তবে তুমি মীনুব কে হবে, বল, শ্বশুর?'

রাগান্বিত অজিত বুঝিল, দিদিমা পবিহাস করিতেছে। সে ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে দিশাহারা হইযা আবও জোরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, 'না না, কিচ্ছু না, আমি ওর কেউ হব না। ভারী ত ঐটুকুন মেয়ে!'

মীনুব ম্লান মুখখানি ক্রমশঃ অশ্রুসজল হইয়া আসিতেছিল, অভিমানিনী কন্যার ছলছল নেত্রেব প্রতি কোমল দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষিপ্ত নাতির বিপর্যস্ত কেশগুলি গুছাইতে গুছাইতে স্নিগ্ধকণ্ঠে মা বলিলেন, 'আচ্ছা, ওকে তোমার কিছুই বলতে হবে না। কিন্তু তুমি যখন ওর চেয়ে অনেক বড় —ও তা হলে তোমাকে কি ব'লে ডাকবে, সেটা ব'লে দাও।'

— 'না, না, ওকে কিচ্ছু বলতে হবে না, হুঃ!'

—'তার চেয়ে তুমি ওকে "মিনু মাসী" ব'লে ডেকো, ও তোমাকে "অজি মামা" ব'লে ডাকবে, সেই বেশ হবে, কেমন?'

এবাবও অজিত প্রবল আপত্তি কবিযা বলিল,—'না, তা হবে না। আমি ওর চেযে ঢেব বেশী বড, ও যদি আমাকে "দাদা" বলে, তবে আমি ওকে "মাসী" বলবো!'

মীনুর বাবা বারান্দায ইজি-চেযারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে কন্যা ও দৌহিত্রেব কলহ শুনিতেছিলেন, উচ্ছ্বসিত অট্টহাস্যে তিনি বলিয়া উঠিলেন, —'দূব শালা।'

অপ্রতিভ অজিত দিদিমাব ক্রোড হইতে নিজেকে সজোবে ছিনাইয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। মীনুও তাহার পিছু পিছু ঝুমকো কালোচুলে ঢেউ তুলিয়া, অর্দ্ধমলিন গোলাপী ফ্রকের লেসের ঝালর দোলাইযা, প্রভাত হাওযার মত চপল লঘু নৃত্যতালে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

২

পাঁচ বছরের মীনু এখন বারো বছরের, আর দশ বছরের অজিত সতেরো বছরের হইয়াছে। অজিত মীনুকে আর 'মাসী' বলিতে আপত্তি করে না, মীনুও যখন-তখন মাসীত্বের দাবী লইয়া মায়ের কাছে সাশ্রুনেত্রে নালিশ করিতে ছুটে না। অজিত মীনুকে ডাকে 'মীনু মাসী' আর মীনু অজিতকে ডাকে 'ছেলে'।

অজিত স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহার ছোট পড়ার

ঘরখানি সৌখীন-রুচিতে সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে। বায়স্কোপ, থিয়েটার, মিটিং, বক্তৃতা, পলিটিক্স, সোশিয়্যালিজিম, ইংরাজী সংবাদপত্র, বন্ধুবান্ধব ও কলেজ লইয়া অজিতের দিনগুলি কোথা দিয়া কাটিয়া যাইতেছে, তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না।

আর মীনু মায়ের কাযের সাহায্য করে, পান সাজে, কুটনো কোটে, বাবার ও অজিতের মোজা মেরামত করে, কাপড় রিপু করে, জামার বোতাম বসায়। অবসরমত 'রয়্যাল রিডার নম্বর থ্রী' বইখানি পড়িতে বসে। সে আগে স্কুলের গাড়ী করিয়া স্কুলে যাইত, কিন্তু এখন আর তা যায় না, কারণ, তাহার বারো বৎসর বয়স হইয়াছে, বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।

বিকালবেলা মীনু কাপড় কাচিয়া ভিজা কাপড় ছাড়িয়া চাঁদেব আলো রঙ্গের ডুরে শাড়ীখানি সেমিজের উপর গুছাইয়া পরিতেছিল, অজিত মুগা'র পাঞ্জাবী দোলাইয়া ব্যস্তভাবে সেইদিকে আসিয়া বলিল—'মীনু মাসী! একটা চুলের কাঁটা দে ত!'

মীনু কাপড় পরা শেষ করিয়া শাড়ীর প্রান্তে চাবির গুচ্ছ বাঁধিতেছিল। চাবিবদ্ধ আঁচলটা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া, সযত্নরচিত উঁচা জাপানী খোঁপাব উপর আলগোছে একবার বাম হাতখানি বুলাইয়া লইয়া বলিল,—'আমার খোঁপায় সেলুলয়েডের ক্লিপ আছে, লোহার কাঁটা নেই!' চঞ্চল অজিত অধীরভাবে বলিল, 'একটাও নেই? আঃ, তোরা যে কি-ই ফ্যাশান করতে শিখেছিস। মেমেদের মত ক্লিপ্ ইউজ করা।'

ভীত উদ্বিগ্ন মুখে মীনু বলিল, 'সেফটিপিনে হবে কি?'

সাগ্রহে ঝুঁকিয়া অজিত বলিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই দে, শীগগির—'

বাম হাতের সোনার চুড়িতে দুই তিনটা সেফটিপিন আটকান ছিল, মীনু তাড়াতাড়ি একটা খুলিয়া অজিতের হাতে দিল। সেফটিপিন লইয়া অজিত অতি ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

মীনু ভিজা কাপড় বারান্দার রেলিঙ্গের উপর শুকাইতে দিতে দিতে ভাবিতে লাগিল, অজিত কেন তাহাকে এত তাচ্ছিল্য করে? সে অজিতেব চেয়ে বয়সে ছোট, এছাড়া আর তাব কি ত্রুটি আছে?

বারান্দার থামের উপরকার টব হইতে বিলাতী ফুলের তীব্র গন্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। মীনু চিন্তা-ম্লান মুখে ছাতে উঠিবার কাঠের সিঁড়ির উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কেন এমন হয়? সে ত অজিতের আপনাব মাসী, বয়সে ছোট বলিয়া অজিত তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে কেন?

দেওয়া-নেওয়া সম্পর্কটাও তাহাদের মধ্যে এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছে, অজিত জানে সে যাহা পায় তাহা তাহার ন্যায্য প্রাপ্য, ইহার মধ্যে কিছুই বিশেষত্ব নাই। আব মীনু জানে, তার দেওয়ারই কথা, ত্রুটি হইলে অজিত অসন্তুষ্ট হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

অজিতেব জন্য মীনু নিজেব হাতে সুন্দব সুন্দব রুমাল তৈয়াবী কবিযা, কোণে ফুল-লতা আঁকিযা তাহাব মধ্যে অজিতেব নামে মনোগ্রাম কবিযা দেয়, ভাল কারুকার্য্যখচিত টেবল-ক্লথ, জানালাব সৌখীন পর্দ্দা সযত্নে বহু পবিশ্রমে নিজহস্তে প্রস্তুত কবিয়া দেয। অজিত গম্ভীবভাবে গ্রহণ কবে, যেটা অপছন্দ হয—'এটা ক্যাডাভাবাস হয়েছে। অসভ্য ডিজাইন', এমনই একটা কিছু বলিযা নিন্দা কবে, ভাল হইলে প্রাযই কিছু বলে না।

মীনু মাযেব সঙ্গে নানাবকম খাবাব তৈযাবী ক'বে, অজিতেব পাতে দিযা হযত হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা কবে—'আচ্ছা ছেলে, বল ত আজকেব কপিব কচুবীটা কেমন খেতে হযেছে?'

অজিত খাইতে খাইতে গম্ভীব ঔদাস্যভবে সংক্ষিপ্ত উত্তব দেয—'মন্দ নয়।'

তাহাব পব অজিত হযত কোনওদিন মীনুকে শুনাইযা বলে, তাহাব কোন বন্ধুব বোন কি চমৎকাব খাবাব তৈযাবী কবিতে পাবে। সে খাবাব একবাব খাইলে বহুদিন তাব আস্বাদ ভোলা যায না। শুধু খাবাব তৈযাবী নয, তাব মত গান গাহিতে এবং এসবাজ বাজাইতেও নাকি কম মেযে পাবে। পডাশুনাতেও তাব খুব মনোযোগ, হাতেব সেলাইও অতি চমৎকাব, অথচ বযসে সে মীনুব চেযে ছোট।

সেদিন মীনুবাণীব খাবাব তৈযাবীব সমস্ত উৎসাহই যেন মুহূর্ত্তেব মধ্যে নিভিযা যায,—সে মনে মনে ভাবিতে থাকে, সে কেন এমন মূর্খ হইল।

মীনু অজিতকে একজন অসাধাবণেব মধ্যে গণ্য কবিযা মনে মনে তাহাব সম্বন্ধে উচ্চ ধাবণা পোষণ কবিত, কিন্তু অজিত কোনওদিন কল্পনাই কবিতে পাবিত না —ছোট্ট মীনুমাসী—সে আবাব আলোচনা, নিন্দা, প্রশংসা বা চিন্তাব যোগ্য মানুষ হইতে পাবে।

এইরূপে বিভিন্ন মনোভাবে দুইটি তরুণ তরুণীব চিত্ত অভিভাবকদেব স্নেহচ্ছাযাতলে পাশাপাশি বাডিযা উঠিতেছিল।

২ ৫

প্রহবে তীব্রোজ্জ্বল বৌদ্র কলিকাতা মহানগবীকে উত্তপ্ত কবিযা তুলিযাছে। স্বচ্ছ নী আকাশ গলিত অগ্নিধাবা-সিক্ত হইযা আলোক-প্রতিফলিত একখানি প্রকাণ্ড আ'ব মত দৃষ্টি ঠিকবাইযা দিতেছিল। শুভ্র মল্লিকাদামেব মত এক এক স্তবক মেঘ াকাশেব এদিকে ওদিকে লঘুভাবে লাগিযা আছে। চিলগুলি প্রায মেঘেব কাছ ববাবব ঠিযা তীক্ষ্ণ করুণ চীৎকাবে ক্রমাগত পাক খাইযা ঘুবিতেছিল। বাস্তাব গলীতে গলীতে সন বিক্রেতাদেব ঢং—ঢংঢং কাসিব আওযাজ ও জামা বিক্রেতাদেব 'বডী- —জা—ম স—মিজ চাই'ব সুব ব্যতীত অন্য ফেবীওযালাব শব্দ নাই।

মীনু যব ঘবেব জানালায বসিযা নীল ভেলভেটেব উপব সিল্কেব ফুল, জবি, পুঁতি ভৃতি বসাইযা কৃত্রিম লতাপুষ্প তুলিযা একটা অ্যালবাম তৈযাব কবিতেছিল।

চাঁপা বঙ্গের সিল্কের টুকরা কাটিয়া একটি সুদৃশ্য চাঁপাফুল ভেলভেটের উপর বসাইতে বসাইতে তাহার সবুজ পুঁতির বৃন্তটি কেমনভাবে বেঁকাইয়া বসাইলে সুশোভন হইবে, একান্ত মনোযোগ সহকারে যখন সে চিন্তা করিতেছিল, অজিত হাতে একজোড়া সাদা ধবধবে গরম দস্তানা লইয়া তখন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—'মিনু মাসী। আজ পিকচার প্যালেসে একটা নতুন ভালো ফিল্‌ম আছে,— একটা টাকা দিতে পাবিস? এ মাসে আমার সব খরচপত্র হয়ে গেছে।'

মীনু 'দিচ্ছি' বলিয়া উৎসুক নেত্রে অজিতের হাতের দিকে চাহিয়া বলিল —'তোমার হাতে ওটা কি?'

অজিত গম্ভীর স্বরে বলিল—'গ্লাভস। আমার বন্ধু বিনয়কে জানিস ত? তাব বৌদি তৈরী করেছেন।'

মীনু উঠিয়া বাক্স খুলিয়া অজিতেব হাতে একখানি একটাকার নোট দিয়া তাহাব হাত হইতে দস্তানা-জোড়া চাহিয়া লইয়া আগ্রহান্বিতভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

অজিত মীনুর হাতে তৈয়ারী কালো বেশমে বোনা একটি সুদৃশ্য ছোট থলি বুক-পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার মধ্যে নোটখানি রাখিয়া পকেটে পুরিতে পুরিতে বলিল—'কেমন হয়েছে, বল দিকিনি? ঠিক যেন কলে তৈরী! ধরবার জো নেই! হুঁঃ, খালি মোজা বুনে আর রুমাল তৈরী করেই তোরা অহঙ্কাবে গেলি, এমনি নাইস গ্লাভস করতে পারিস?'

মীনু দীপ্ত মুখে বলিল—'কেন পাববো না? বাবার জন্য যে সোয়েটারটা বুনেছি, সেটা ত এই বুনুনি। দস্তানাটা পেলে ওব ঘর হিসাব ক'রে নিয়ে আমি ঠিক তৈরী করতে পারি।'

'হ্যাঁ, এরকম আর করতে হয় না! আচ্ছা, তোকে সাদা উল এনে দেব, দেখি কেমন কবিস?'

'সাদা উল আমাব আছে: তোমাকে ঐরকম দস্তানা তৈরী ক'রে দিলেই ত হ'ল।'

অ্যালবামটাব দিকে তাকাইয়া অজিত বলিল—'ওটা কি হচ্ছে? যতসব ববর হিজিবিজি কায! ফাইন টেস্টই তোদের নেই। কি জিনিষ ওটা?'

মীনু একটু ম্লান মুখে বলিল—'অ্যালবাম।'

ভাল করিয়া অ্যালবামটা দেখিতে দেখিতে সেইদিকে একটু ঝুঁকিয়া পা অজিত জিজ্ঞাসা করিল—'কার জন্যে তৈরী হচ্ছে?'

'বাবার বন্ধু শরৎ কাকাবাবুর জন্যে।'

'গ্লাভস জোড়া দে, বিনয়কে দিযে আসি!'

মীনু মিনতিভরা চক্ষুতে কহিল—'এটা আজ আমার কাছে কল, ছেলে।'

অজিত অবজ্ঞার সুরে বলিল—'না না, পরের জিনিষ, ত নোংরা-ফোংরা

লেগে নষ্ট হয়ে যাবে, দিয়ে দে। তুই যে কত পাবরি, সে জানাই আছে।'

মীনু আহতা হইয়া নিঃশব্দে দস্তানা-জোড়া ফিরাইয়া দিল। অজিত দস্তানা লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—'আমার বিছানার চাদর ছিঁড়ে গেছে, আব গেঞ্জির বোতাম নেই, সেলাই ক'রে রাখিস।'

মীনুর গলার কাছে ঠেলিযা আসিল,—'আমি পারবো না,' কিন্তু সে মুখে কিছু উচ্চাবণ করিতে পারিল না।

অজিত বি, এ, পাশ কবিযাছে। মীনুর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী মাঘমাসে তাহার বিবাহ।

সন্ধ্যাবেলায় মীনু বারান্দায় গ্যাস স্টোভ জ্বালিয়া পেয়ারার জেলি প্রস্তুত করিতেছিল। মা ঘবেব ভিতর লুচি ভাজিতেছিলেন। মীনুকে ডাকিয়া বলিলেন—'মিনা, অজি'কে ডেকে দে ত। খাবাব চেয়ে কোথায় চ'লে গেল? লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!'

মীনু গর্জ্জমান স্টোভের উপর এলুমিনিয়ম প্যানেব হ্যাণ্ডেলটা বামহাতে শক্ত করিয়া ধবিয়া ডান হাতে এনামেলেব বড় চামচ দিযা একান্ত মনোযোগেব সহিত জেলিটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—'ছেলেকে ডাকতে গেলে আমার জেলিটে নষ্ট হয়ে যাবে, মা!'

মা বলিলেন—'ঐখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাক না,—সে বোধ হয় পডার ঘরে আছে।'

মীনু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—'ছেলে,—ছেলে—ও ছেলে—তোমাকে মা খাবার খেতে ডাকছেন!'

উত্তর আসিল না, মীনু আবার ডাকিল।

এবাব চটি-জুতায উচ্চ চটপট শব্দ তুলিয়া অজিত ক্রুদ্ধ-মুখে ভিতবে আসিযা বিরক্তিকঠিন স্বরে বলিযা উঠিল, 'কি যে অসভ্যের মত চেঁচাতে শিখেছিস। ছেলে ছেলে ছেলে! বন্ধুদের সামনে যখন তখন আমায় অপ্রস্তুত হ'তে হয়! আমার নাম ধ'রে ডাকিস, ছেলে বলিসনি, বারণ ক'রে দিলুম।'

মা ঘরের ভিতব হইতে বলিলেন—'তা "ছেলে" বল্লেই বা, বেশ মিষ্টিই শোনায তো বাপু! অত বড় বোনপোকে নাম ধরেই বা ডাকবে কি ক'রে বল না?'

'না, না দিদা, আমাকে সকলকাব কাছে ভারী অপ্রস্তুতে পড়তে হয! তা ছাডা এইবার ওর বে'-থা হবে, এখন থেকে ঐ বদ-অভ্যেসটা ছাড়ান দরকার।'

অজিত অপ্রসন্ন মুখে লুচির রেকাবীব সামনে পিঁড়িব উপর বসিয়া পড়িল।

মা বলিলেন—'আচ্ছা বাপু, এবার থেকে মীনা অজি' বলেই ডাকবে এখন, থাম!'

বাহিরে বারান্দায় মীনুর সুন্দর তরুণ মুখখানি লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে রাঙ্গা হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আজ হইতে প্রাণান্তেও 'ছেলে'

শব্দ উচ্চারণ করিবে না। মনটা এত চঞ্চল ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, অন্যমনস্কতায় সযত্ন-প্রস্তুত জেলিটা বেশী পাক হইয়া চিটা হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা অজিত তাহার পড়িবার ঘরের টেবিল-সংলগ্ন বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শার্টের উপর গ্যালিস-সংযুক্ত প্যান্ট পরিয়া গলার 'কলারে' 'টাই' বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। মীনু অজিতের চা আনিয়া টেব্‌লের উপর রাখিয়া, কিছুক্ষণ বিস্মিত নেত্রে অজিতের নূতন সাজসজ্জা এবং টাই বাঁধিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঈষৎ উৎসুক অথচ কুণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিল—'কোথায় যাবে?'

গম্ভীর মুখে নিরুত্তরে অনেকক্ষণ টাই বাঁধিবার ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া অজিত উত্তর দিল—'দরকার আছে এক যায়গায়!'

বার বার নানারকম কায়দায় বঙ্গীন সিল্কের ফিতাটিতে যতরকমেই ফাঁস টানে উল্টা 'বো' হইয়া যায়, কিছুতেই ঠিকমতটি হইতেছিল না। প্রায় কুড়ি মিনিট আরশীর সামনে দাঁড়াইয়া 'নেক্‌টাই' বাঁধিবার বহু প্রয়াস ব্যর্থ হইবার পর বিরক্ত-অধীর মুখে অজিত 'দূর ছাই' বলিয়া টাইটা কলারের ভিতর হইতে সজোরে টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিল।

মীনু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। তাহাব মনে কৌতুকের সহিত সহানুভূতিও জাগিয়া উঠিতেছিল। একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিল, 'আমি বেঁধে দেব অজি?'

বিপদগ্রস্ত উদ্বিগ্ন অজিত মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট হইলেও বাহিরে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিল, 'পারবি কি তুই?'

মীনু বলিল, 'হ্যাঁ, পারবো।'

তাহার পর মীনা অগ্রসর হইয়া গিয়া অজিতের নিকট হইতে যথাসম্ভব তফাতে দাঁড়াইয়া সন্তর্পণে ফাঁস টানিয়া অজিতের নেকটাইটিতে নিপুণ সুন্দর 'বো' বাঁধিয়া দিল। সে প্রতিদিন তাহার পিভাকে পোষাক পরার সময়ে সাহায্য করিত, সেই-জন্য 'নেকটাই' বাঁধিবার সহজ কৌশলে অভ্যস্তা ছিল।

মীনু অজিতের ওয়েস্টকোটের পিছনে বক্‌লস্ আঁটিয়া দিয়া কোট ও ওয়েস্টকোটটি উত্তমরূপে 'ব্রাস' করিয়া দিল।

অজিত খুসী হইয়া বার বার আয়নার সম্মুখে ঘাড়টি হেলাইয়া ঘুরাইয়া নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া লইল। জুতা পরিয়া 'ফেল্ট' টুপীটি মাথায় দিয়া অত্যন্ত প্রফুল্লভাবে সাহেবী কায়দায় লম্বা পাদক্ষেপে অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যাইবার সময় সরু লোহার চেন-বাঁধা চাবি-রিংটি ঝনাৎ করিয়া মীনুর সামনে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল— 'মীনুমাসী! আমার ডেস্কের ভিতরটা বড় অপরিষ্কার হয়ে আছে, গুছিয়ে রাখিস্ ত।'

মীনু খুসী হইয়া চাবি-রিংটা কুড়াইয়া লইল। সকাল হইতে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত

ঝাঁটা ও ঝাড়ন লইয়া সমস্ত ঘরখানির কড়িকাঠ হইতে মেঝে পর্য্যন্ত ঝাড়িয়া, ধুইয়া, মুছিয়া, সুন্দররূপে বই, খাতা, জিনিষ-পত্র সাজাইয়া, গুছাইয়া, ছবি টাঙাইয়া, ফিটফাট করিয়া রাখিয়া ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে মলিন-বসনে প্রসন্নমুখে স্নান করিতে গেল।

* * * *

যথাসময়ে মীনুরাণীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহে মীনু খুবই সন্তুষ্ট হইল, কাবণ সে প্রচুর জিনিষপত্র, বস্ত্রালঙ্কার, খেলনা-পুতুল, প্রসাধন-দ্রব্যের প্রাচুর্য্যে ও সকলের নিকটে আদর-সোহাগের আতিশয্যে অভিভূতা হইয়া পড়িযাছিল। তদুপরি নব-পরিচিত তরুণ বন্ধুটির অশ্রান্ত প্রেম-গুঞ্জন তাহাকে যেন এক মোহন-স্বপ্নলোকে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয়, অজিত আজকাল তাহার সহিত বেশ কথাবার্ত্তা কয়, —আর 'তুই' বলে না, বেশী তাচ্ছিল্য কবে না। এই আনন্দ এবং এই গর্ব্বই মীনুর ক্ষুদ্র বুকখানিকে পুলকে দোলাইযা দিতেছিল।

স্বামী সৌরীন্দ্রের সহিত মীনু অধিকাংশ সময়ে অজিতেবই গল্প করিতে ভালবাসিত। সৌবীন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসা কবিল—'আচ্ছা, মীনু, তুমি ত বল, অজিতকে আগে তুমি ছেলে ব'লে ডাকতে, এখন আর তা' ডাক না কেন?'

মীনু হাস্যোজ্জ্বল-নেত্রে বলিল, 'ওর লজ্জা করে ব'লে!'

সৌরীন্দ্র হাসিতে হাসিতে কৌতুকের স্বরে বলিল, 'আচ্ছা, আমি এবার যখন তোমাদের বাডী যাব, অজিতকে "ছেলে" ব'লে ডাকবো, দেখবো, সে কি করে?'

মীনু ভীতস্বরে বলিল, 'না না, খববদার, তুমি তাকে "ছেলে" ব'লো না। তা হ'লে সে বুঝতে পারবে, আমি তোমায ব'লে দিয়েছি।'

'বাঃ রে, তুমি বলেই দিয়েছ ত সত্যি। আমি গিয়ে বলবো, তোমার মাসী আমাকে তোমার নাম ধ'রে ডাকতে বারণ করেছেন, ছেলে ব'লে ডাকতে ব'লে দিয়েছেন।'

মীনু কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল—'আমি তাই বলেছি? ওঃ, কি মিথ্যে কথা!'

উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগ অতিকষ্টে সংববণ করিতে করিতে সৌরীন্দ্র বলিল—'আচ্ছা, তুমি নিজে বলনি অজিত তোমার ছেলে?'

ক্রুদ্ধা মীনু বলিল—'হ্যাঁ, ছেলেই ত—'

সৌরীন্দ্রের এবার হাসির বোঝা সজোরে ফাটিয়া গেল—'বেশ! বেশ! বাহবা, তা' অতবড় ছেলেটির মায়ের আবার বিয়ের কি দরকার ছিল?'

'যাও, তুমি ভারী দুষ্ট!'

স্বামীর কথার পরিহাস-ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মীনু লজ্জায় লাল হইয়া তাড়াতাড়ি সৌরীন্দ্রেরই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া ফেলিল।

হাসিতে হাসিতে তরুণী বধূকে বক্ষে টানিয়া লইয়া সৌরীন্দ্র তাহার কানে চুপি চুপি বলিল—'আচ্ছা, তোমার যখন সত্যিকারের ছেলে হবে, তখন তার অজিত নাম রেখো, কেমন?'

স্বামীর বাহুডোর-বদ্ধ মীনু মুখটা স্বামীর বক্ষের মধ্যে আরও লুকাইবার চেষ্টা

করিতে করিতে লজ্জাজড়িত কুপিত স্বরে বলিল,—'না না চুপ কর, ছিঃ!'

৩

মাত্র সাত মাস অতিক্রান্ত হইতে না হইতে সোনার স্বপ্ন অকস্মাৎ ভাঙিযা গেল। সৌরীন্দ্র 'ইরিসিপ্লাস' ব্যারামে মীনুবাণীর সীঁথির নবীন সিন্দূর-রেখা মুছিয়া দিয়া অকস্মাৎ অজানা লোকে চলিয়া গেল। মীনুরানীর পিতা রোরুদ্যমানা সদ্যোবিধবা কন্যাকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস এইখানেই সমাপ্ত হইল না। মীনুর পিতা মাসকতক জ্বরাতিসারে ভুগিয়া পরলোকে যাত্রা করিলেন। সংসারে বহিল দুইটি শোকাতুরা বিধবা নারী এবং সংসাবানভিজ্ঞ তরুণ অজিত।

মীনু বৈধব্যের দারুণ আঘাত সংবরণ করিতে না করিতেই পিতৃশোকে মৃতবৎ হইয়া পড়িল। বক্ষের শোকাগ্নিদাহন এবং চক্ষুর অশ্রান্ত অশ্রুধারা তাহাকে নিদাঘশুষ্ক লতা অপেক্ষা শীর্ণ ও করুণ করিয়া তুলিয়াছিল।

মাতা অভাগিনী কন্যা ও অসহায় দৌহিত্রেব অবস্থা স্মরণ করিয়া নিজে সংযতা হইযা উঠিবাব চেষ্টা কবিলেন।

এমনই কবিয়া গম্ভীর শোকস্তব্ধতা ও বিবাট শূন্যতার মধ্য দিয়া বৎসর প্রায শেয হইযা আসিল। বাটির তিনটি প্রাণীর একজনেরও মুখে পূর্ব্বকার সহজ হাসি ফিরিয়া আসিল না।

বৎসবান্তে অজিত কঠিন ব্যারাম প্লুবিসিতে শয্যাগত হইয়া পড়িল।

মীনু তাহার নির্জ্জন গৃহ-কোণ ছাড়িযা অজিতের রোগশয্যাপার্শ্বে আশ্রয় লইল এবং সহরের একাধিক নামজাদা চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসাব বন্দোবস্ত করিল।

এই সময়ে মীনুর মা তাঁহার পুবাতন ব্যাধি লিভারের বেদনায় শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। মীনু দুই ঘরে দুইটি রোগী লইয়া বিশ্রামহীন দিবা এবং নিদ্রাহীন রজনী অচঞ্চলভাবে কাটাইতে লাগিল। মা দিনকতক পরে একটু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া রহিলেন।

মীনু যন্ত্রপুত্তলীর ন্যায় একভাবে আপনাকে অজিতের শুশ্রূষায় নিয়োজিত করিয়া রাখিল। সমস্ত দিনে এবং রাত্রিতে ঘড়ীর কাঁটার সঙ্গে সে আপনাকে ঘড়ীর কাঁটারই মত নিয়মিত করিয়া অজিতের মুখ ধোয়ান, ঔষধ খাওয়ান, পথ্য প্রস্তুত করা, পথ্য খাওয়ান, বুকে-পিঠে সেক দেওয়া, পুলটিস লাগান, মালিস করা, জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা, বমি-মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, বিছানা বদলান, সর্ব্বদা গৃহ পরিষ্কার রাখা, রোগীব সদাসর্ব্বদার শারীরিক অবস্থা এবং ঔষধ-পথ্য সেবনের ভিন্ন ভিন্ন চার্ট লিখিয়া রাখা, রাত্রি জাগা, বাতাস করা, নানাপ্রকার প্রক্রিয়ায় রোগীর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা, ঘুম পাড়ান, গল্প করা, সান্ত্বনা দেওয়া, বই পড়িয়া শুনান প্রভৃতি কর্ম্ম অত্যন্ত ধীরে অথচ ক্ষিপ্রতা সহকারে শিক্ষিতা, সেবাকারিণী ও স্নেহময়ী জননীব মতই

সুনিপুণভাবে করিয়া যাইত।

পীড়িত অজিত রোগযন্ত্রণায় অত্যন্ত চঞ্চলতা ও অধীরতা প্রকাশ করিত। মেজাজও অত্যন্ত রুক্ষ ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। রোগেব যন্ত্রণা তাহার অকালগাম্ভীর্য্য ও মৌনতা ভাসাইয়া দিয়া কিশোববয়স্ক দুরন্ত অবুঝ বালকে পবিণত করিয়াছিল, কিন্তু পঞ্চদশবর্ষীয়া মীনু যেন আরও পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম কবিযা প্রৌঢ়াসুলভ স্থির, গম্ভীর, অচঞ্চল হইয়া উঠিযাছিল।

তাহার শোকস্তব্ধ শান্ত মুখে সর্ব্বদা প্রসন্নতা বিরাজমান। রোগীর সহস্র অত্যাচাবে ও অধীরতায বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা চাঞ্চল্য নাই, কর্ম্মে শ্রান্তি বা আলস্য নাই। ধৈর্য্যশীলা জননীর মত, স্নেহময়ী ভগিনীর মত, অন্তরঙ্গ বন্ধুটিব মত আপনার বিপুল স্নেহ, যত্ন, সহানুভূতি ও সেবা দ্বারা এই রোগাতুর দুবন্ত, তরুণ শিশুটির দেহে ও মনে স্বাচ্ছন্দ্য দিযা রাখিত।

রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। নীল বেশমী শেড-ঢাকা ল্যাম্পের মৃদু আলো, গৃহখানি আলোকিত, অথচ স্নিগ্ধ ছাযাময করিয়া রাখিযাছে। টেবলেব উপব বি-টাইমপিস ঘড়ীটি এক সুরে টিক-টিক কবিযা গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কবিতেছিল। ফর্সা ন্যাপকিন ঢাকা টুলেব উপব ও টেবলের উপর ঔষধের শিশি, ছোট মেজার গ্লাস, বড় কাচের গ্লাস, বার্লির পেয়ালা, ছানার জলেব পাত্র, ডালিম, বেদানা, থার্ম্মমিটার, ফিডিং কাপ, 'থার্ম্মফ্লাক্স', 'হটওয়াটার-ব্যাগ' প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঔষধপথ্যাদি শৃঙ্খলা সহকারে সজ্জিত।

স্বল্প আসবাব; ঘবখানির চারিদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইউক্যালিপটাসের তীব্র গন্ধে ও সুমিষ্ট ধূপের সৌরভে কক্ষ বায়ুভারাক্রান্ত। বোগীর মাথাব দিকে ও পাশের দিকে দুইটি জানালা রুদ্ধ, আর সমস্ত জানালাগুলি উন্মুক্ত। আধভেজানো দরজায় সবুজ ছিটেব মোটা পর্দ্দা টানা।

মীনু একখানি টুলের উপর বসিয়া ঘুমন্ত অজিতের শিরে হাতপাখা দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতেছিল।

অর্দ্ধপ্রহর অতীত হইয়া 'টং' শব্দে ঘড়ী জানাইয়া দিয়া গেল। অজিত অস্ফুট কাতরোক্তি সহকারে পাশ ফিরিতে ফিরিতে প্রশ্ন করিল, 'ক'টা বাজল?'

মীনু বলিল—'আড়াইটা।'

'তুমি এখনও জেগে ব'সে আছ? হাত ব্যথা করছে না? এইবার একটু শোও!'

'শোব অখন! তুমি এখন একটু হরলিক খাবে কি?'

'আচ্ছা, দাও।'

মীনু ঘরের কোণে স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়া ফুড প্রস্তুত করিয়া ল্যাম্পের নীল শেডটা একটু সরাইয়া দিয়া, বাতিটার বোতাম ঘুরাইয়া, আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ফিডিং কাপে একটু একটু করিয়া খাওয়াইয়া দিল। তোয়ালে দিয়া মুখ মুছাইয়া, মুখের ভিতর একটি লবঙ্গ দিয়া, আবার আলোক মৃদু করিয়া শেড টানিয়া দিয়া

পাখা হাতে লইয়া টুলে বসিল।

অজিত বলিল, 'আজ আমি অনেক ভাল আছি, তুমি একটু শোও না, মীনুমাসী!'

মীনু বলিল 'আমার এখনও ঘুম আসেনি। ঘুম পেলে শোব। তুমি আবার একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর। মাথা চুলকে দেব?'

'না, থাক। আচ্ছা, দাও।—মীনুমাসী—'

'কি বাবা?'

'আমি আর তোমায় "মীনুমাসী" বলবো না, এবার থেকে 'মাসীমা' বল্‌ব—কেমন?'

'বেশ ত!'

'আচ্ছা, মাসীমা। তুমি আমাকে বড্ডো ভালবাসো—না?'

মীনু একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল। তাহার পর সহজ প্রসন্ন স্বরে উত্তর দিল —'তা' আর বাসবো না?'

'না, তুমি ছেলেবেলা থেকেই আমায় খুব ভালবাসো, আমার কত অত্যাচার সহ্য কর। এতদিন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি। তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না, মাসীমা!'

মীনু একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিয়াছে, মাঝে মাঝে অজিত ভাবাধিক্যে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। এইরূপ ধরণের কথাবার্ত্তা সে প্রায় রাত্রির দিকে বেশী বলে। রুগ্নাবস্থায় শরীর ও মনের শক্তির অভাবে অনেক সময়ে মনের গোপন কাহিনী প্রকাশ হইয়া যায় কিংবা অল্পেই অত্যন্ত তুষ্ট বা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উঠে। দুর্ব্বল অজিতের এই কৃতজ্ঞতার আতিশয্যও যে রোগক্রিয়া-সঞ্জাত, মীনু অনভিজ্ঞা হইলেও বুঝিতে পারিত।

অজিতের কপালে অডিকলোন-মিশ্রিত শীতল জল সিঞ্চিত করিতে করিতে মীনু বলিল—'আচ্ছা, সে হবে এখন, তুমি এখন একটু ঘুমাও দেখি!'

'না না, মাসীমা, আমি এখন ঘুমুব না। আমার কথা কইতে খুব ভাল লাগছে। ...আচ্ছা, তুমি এত আমার সেবা করছো কেন? বল, কেন? কেন?'

মীনু উত্তর না দিয়া বাম হাতে অজিতের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ডান হাতে পাখার হাওয়া করিতে লাগিল।

'কি? তুমি বলবে না, মাসীমা?...আচ্ছা থাক...'

প্রায় মিনিট পাঁচেক চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিবার পর আবার চোখ মেলিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে মীনুর মুখের প্রতি চাহিয়া অজিত আগ্রহভরে বলিল—'আচ্ছা, আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন, এই অসুখে এর চেয়েও কি বেশী সেবা করতে পারতেন? এর চেয়েও কি তাঁর প্রাণ আরও ব্যস্ত হ'ত...বল না? কথা কইচ না কেন? আর—বাতাস করতে হবে না, জবাব দাও!'

অজিত রাগিয়া মীনুর হাত হইতে তালপাখাখানি টানিয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

মীনু ধীরস্বরে বলিল—'তা কি বলা যায়? কি ক'রে জানব, তিনি কি করতেন?'

'কেন বলা যাবে না? হয়ত তোমার মত এমনই করতেন, কিন্তু এর চেয়ে বেশী করতে পারতেন না।'

'তা হবে।'

'আচ্ছা, লোক বলে, মা-মাসী, মা আর মাসী প্রায় একই, না মাসীমা?'

অজিত মীনুর ডান হাতখানি দুই হাতে মুঠা করিয়া চাপিয়া নিজের শীর্ণ বুকের উপর রাখিল।

মীনু শান্তকণ্ঠে উত্তব দিল,—'মা আর মাসী একই বৈ কি।'

'মাসীমা, আমি এবার যদি বেঁচে উঠি, তা হ'লে দেখো, তোমার কখনও কষ্ট হবে না। তোমায় আমি আমার মায়ের মত ক'বে—মেয়েটির মত ক'বে চিবদিন আমার কাছে বেখে দেব, কোথাও যেতে দেব না।'

'তোমার আজ কি ঘুম আসছে না, অজি? বেশী রাত জাগলে আবার মাথার যাতনা বাড়বে কিন্তু!'

'আমার ঘুম আসছে না। আচ্ছা, মাসীমা?'

'কি?'

শিশুর মত আবদারের সুরে অজিত বলিল—'তোমাকে যদি আমি "মা" ব'লে ডাকি, তা হ'লে কি তোমার লজ্জা করবে?...আচ্ছা, যদি শুধু "মা" বলতে না দাও তা হলে "ছোট-মা" বলবো—কেমন?'

অজিত মীনুর নরম হাতখানি নিজের গণ্ডে, ললাটে ও মুখের উপব বুলাইতে বুলাইতে আদরের সুবে বলিতে লাগিল—'মা-টি—আমার ছোট্ট মা-টি—'

মীনু একটু লজ্জিত ও বিপন্ন বোধ করিতেছিল, অথচ হাতখানি অজিতের মুঠাব মধ্য হইতে টানিয়া লইতেও ভরসা হইতেছিল না।

'আচ্ছা মাসীমা, 'কথা ও কাহিনী'র সেই "দেবতার গ্রাস" কবিতাটা তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, সেই যে সেইখানটা কি চমৎকার—

'রাখাল থাকিবে সুখে
মা'র চেয়ে আপনার মাসীমাব বুকে।'

তোমার কি মুখস্থ আছে সবটা?'

মীনু কুণ্ঠিত আপত্তির সুরে বলিল—'তিনটে বেজে গেছে, অজি! এখন একটু ঘুমোও। সকালবেলা তোমাকে দেবতার গ্রাস প'ড়ে শোনাব।'

'না, না, এখন আমার শুনতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। তোমার মুখস্থ না থাকে, বই আনো। এখন আর ঘুম হবে না।'

মীনু বুঝিল, রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেশী জেদ করিলে উল্টা ফল হইবে। আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া শেলফ হইতে 'কথা ও কাহিনী' বইখানি টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া, ল্যাম্পের শেড অল্প সরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে পড়িতে আরম্ভ করিল—

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে,
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে।'

ধীর মধুর উদাত্তকণ্ঠে সুস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ এবং কণ্ঠস্বর যথাস্থানে হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া করিয়া কবিতাটি আবৃত্তি করিতে প্রায় পনেরো মিনিট সময় লাগিল। শেষের দিক্‌টা পাঠ করিবাব সময়ে ভাবাবেশে মীনুর চক্ষুর্দ্বয় সিক্ত হইযা কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। পড়া শেয হইলে আট-দশ মিনিট কেহ কোনও কথা কহিল না!

নিশীথ রাত্রির গভীর নিস্তব্ধতা, কক্ষের ছায়াময় নীলাভ আলোক, ঘড়ীর টিক-টিক শব্দ, সবকিছু মিলিয়া, মনকে ঘিবিয়া অননুভূতপূর্ব্ব উদাস-বৈবাগ্য, স্নেহাকুল করুণ বেদনা জাগাইতেছিল।

'নিরুপায় অনাথের অন্তিমেব ডাক'—'মাসী-মাসী—মাসী' যেন সত্যই সেই নীরব কক্ষের নিস্তব্ধতায় অনাহত-শব্দে করুণ আর্ত্তনাদে ধ্বনিত হইয়া 'বহ্নিশলাকার ন্যায রুদ্ধ কর্ণে' বিদ্ধ হইল।

রোগদুর্ব্বল অজিতের গণ্ড বাহিয়া দুই চোখে অশ্রু ঝরিয়া পডিল। অশ্রুরুদ্ধ আবেগপূর্ণ স্বরে অজিত বলিল— 'আচ্ছা, রাখালের মৃত্যু তাব মা মোক্ষদার বেশী বাজবে, না মাসী অন্নদার?'

মীনু ম্লান হাসিয়া উদাস স্ববে কহিল—'দু'জনেরই লাগবে।'

'উহুঁ, অন্নদার বেশী লাগবে, সে-ই রাখালকে মানুয করেছিল। সাগরে পাঠাতে রাজী হয়নি। আর রাখাল যে মায়ের চেয়ে মাসীকেই বেশী ভালবাসত। জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে অন্তিমসময়ে তার ত মায়ের মুখ মনে পড়লো না, "মা" শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'ল না—মাসীকেই মনে পড়েছিল—আঃ!-চমৎকার "সিন্"।'

অজিত ভাবাবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মীনু প্রস্তর-পুত্তলিকার ন্যায় নীথর হইয়া বসিয়া রহিল। টংটং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। মীনু সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত ডাকিল—'মাসীমা!'

'কি বলছো?'

'আমার মাথার যাতনাটা বাড়ছে। ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে পার?'

মীনু উদ্বিগ্নস্বরে বলিল—'আমি বলেছিলুম, এখন প'ড়ে কায নেই, সকালে প'ড়ে শোনাব। মাথার যাতনা হচ্ছে, হয়ত জ্বর বাড়বে।'

তুমি গান গেয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও!'

মীনু অজিতের মাথাটি কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, চুলের ভিতর অঙ্গুলিচালনা করিয়া চুলকাইয়া দিতে দিতে মৃদুমন্দ গুঞ্জনে কি একটা গান ছড়ার সুরে গাহিয়া

ঘুম পাড়াইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া নিশাশেষের শীতল হাওয়ার স্পর্শে অজিত ঘুমাইয়া পড়িল। শ্রান্ত মীনু খাটের বাজুর উপর মাথা রাখিয়া ভারাক্রান্ত চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল।

সকালবেলা পিকদানী ধুইতে দেরী হওয়ায় অজিত মীনুকে অত্যন্ত তিবস্কার করিল। তীব্র ঝাঁজযুক্ত বিস্বাদ ঔষধের স্বাদে ক্রোধক্ষিপ্ত হইয়া মীনুর হাত হইতে ঔষধের গ্লাস কাড়িয়া লইয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিল। গ্লাসটা মীনুর কপালে সজোরে লাগিয়া মাটিতে পড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। কপাল কাটে নাই, তবে বেশ আঘাত লাগিয়াছিল। সে নিঃশব্দে ভাঙা কাচের টুকরাগুলি গৃহতল হইতে কুড়াইতে লাগিল।

অজিত তখন ক্রোধোত্তেজিতকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিতেছে— 'খবর্দ্দার, তুমি এ ঘরে ঢুকো না। জ্বালাতন হয়েছি! নারসিং জানে না মোটেই—সবেতেই নিজের বুদ্ধি খাটান চাই। এবার থেকে আমাকে না দেখিয়ে কোনও ওষুধ আমায় খাওয়াবে না, বলে রাখলুম।...ওটা কখনও খাওয়ার ওষুধ নয়, নিশ্চয় মালিশ! নইলে এত ঝাঁজ হয়? লেবেল পড়বার বিদ্যে নেই যাদের, তারা আবার আসে "নার্স" কর্‌তে! কোন দিন "মার্ডার" করবে দেখছি।'

মীনু নিরুত্তরে অবিচলিত মুখে আপনাব কায করিয়া যাইতে লাগিল, যেন কিছুই হয নাই! সে যে ঔষধ খাওয়াইতে ভুল করে নাই, ঠিক ঔষধই খাওয়াইয়াছে, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল না, কারণ, তাহা বুঝাইতে হইলে বা তর্ক করিলে অজিতের আরও উত্তেজিত হইয়া উঠা সম্ভব। এরূপ ভর্ৎসনা তাহার সদাসর্ব্বদা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

৪

সুদীর্ঘ বৎসব অতীত হইয়া গিয়াছে। মীনু মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে যায, অধিকাংশ সময পিত্রালয়ে মাযেব কাছেই থাকিত। কযেক মাস হইল, মীনুর মা-ও মারা গিয়াছেন।

আষাঢ় মাস। বর্ষণক্লান্ত অপরাহ্লে বারিধারা-সিক্ত গাছগুলি স্বর্ণ রবিকরপাতে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। দূরে একটা কাঁঠালগাছের উপর একঝাঁক শালিকপাখী উচ্চ কোলাহলে বিবাদ করিতেছে।

মীনু বারান্দায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা পড়িতেছিল। পৃথিবীর অপর প্রান্তে সুদূর অন্ত-সীমানার কোন একটি তুষারাচ্ছন্ন দেশের বিবরণ, দেশবাসীর আচার-ব্যবহার, প্রথা, নিয়ম, সেই 'দেশ-বিববণে' লিখিত ছিল। পাঠশেষে মীনু বইখানি মুড়িয়া কোলের উপর রাখিয়া উদাস দৃষ্টিতে পুঞ্জীভূত ঘন কালো মেঘাচ্ছন্ন সজল আকাশের পানে চাহিল। রাশি রাশি ধূমল বর্ণের, শ্যামল বর্ণের মেঘভার আকাশের এক কোণ হইতে অপর কোণে যাতায়াত করিতেছে। আবাব বর্ষণের আয়োজনে তাহাদের সুগম্ভীর মূর্ত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

মীনু ভারাক্রান্ত মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। অজিতের বিবাহের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মা নাই, অজিতকে একা রাখিয়া সে শ্বশুরালয়ে যাইতে পারিতেছে না। অথচ বাড়ীতে এইরূপভাবে একাকিনী থাকিতে তাহারও ভাল লাগিতেছে না। অজিতের বিবাহের বয়সও হইয়াছে। একটি বয়স্থা পাত্রী অন্বেষণের নিমিত্ত মীনু ঘটক-ঘটকী নিযুক্ত করিয়াছে।

'কৈ গো দিদি ঠাকরুণ?'—কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ ঝঙ্কার তুলিয়া জনৈকা ঘটকী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল।

'কে? ঘটক ঠাকরুণ না কি?'

মীনু ব্যগ্রভাবে রেলিং-এর উপব ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিল।

'হ্যাঁগো, আমিই।'

'উপরে এসো।'

ঘটক ঠাকুরাণী দোতলায় উঠিয়া গেলে মীনু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'খিদিবপুবের মিত্রদের বাড়ীর সেই সম্বন্ধটির কি হ'ল? অজি যে-কটি মেয়ে দেখে এসেছে, এর মধ্যে ঐটিই ওর পছন্দ হয়েছে ব'লে মনে হ'ল।'

ঘটক ঠাকুবাণী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—'মেয়ে ত দেখতে ভাল আর বেশ ডাগরও, কিন্তু মেয়ের মা বড় দজ্জাল।'

'তা' মেয়ের মা কড়া হলেই বা! মেয়ে ত শান্ত?'

'মেয়ে শান্ত বটে, কিন্তু মায়ের বড় খুঁৎখুঁতে মন!'

'কেন? অজি'র কি খুঁৎ আছে?'

'মা বলে—ছেলের ত বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, এতদিন কেন বিয়ে করেনি? বাড়ীতে বিধবা মাসী আছে শুনেছি। সে নাকি ছেলের চেয়ে বযসে অনেক ছোট! সে ছাড়া আর ঘরে মেয়েমানুষ নেই! তার ছেলেপিলেও হয়নি! তা' মাসীর কি শ্বশুরবাড়ী নেই? সে কি বারোমাস এখানেই থাকে?'

মীনুর ব্রহ্মরন্ধ্রের ভিতব যেন জ্বালা করিয়া উঠিল! অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর আরক্তমুখে সংযতস্বরে বলিল—'তাঁদের তুমি বোলো, এই মাসকতক হ'ল ছেলের দিদিমা মারা গেছেন, তাই মাসী একলা আছেন। বোন্‌পোর বিয়ে দিয়ে, বৌয়েব হাতে সংসার তুলে দিয়ে তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবেন। এখানে তিনি থাকবেন না।'

ঘটকী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—'ঐ সম্বন্ধটা তুমি ছেড়ে দাও, দিদিমণি! ওদের গিন্নীর বেজায় ছোট মন। তার চেয়ে শ্যামবাজারের রায়েদের বাড়ীর সম্বন্ধটা দেখ। সে মেয়েও দিব্যি সুন্দরী।'

মীনু অন্যমনস্ক শুষ্কস্বরে বলিল—'না, ঐ মেয়েটিই অজি' পছন্দ ক'রে এসেছে, এটিই তুমি দেখ। যদি বেশী অমত করে, তা হ'লে—তা হ'লে তুমি আমায় বোলো—আমি না হয়, বিয়ের আগেই চ'লে যাব।'

ঘটকী জিভ কাটিয়া বলিল—'ও মা, ছি ছি, তোমার বাপের বাড়ী, তুমি কেন পরের কথায় গৃহত্যাগী হবে, দিদিমণি!'

মীনু গম্ভীর স্বরে বলিল—'না, ঐ সম্বন্ধটিই ঠিক ক'রে ফেল। টাকা কিছুই চাই না। শুধু তাদের মত হলেই হ'লো।'

ঘটক ঠাকুবাণী চলিয়া গেলে মীনু চিন্তা-শুষ্ক বিষাদ-গম্ভীর মুখে ঘরের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল। ঘটক ঠাকুরাণী তাহাকে আজ আভাসে যে অপমানকর কথা শুনাইয়া গেল, তাহা সে আজ নূতন শুনে নাই। মা রোগশয্যায় পড়িয়া থাকিতে তখন হইতেই এইরকম কথা সে আত্মীয়া ও প্রতিবেশিনীদের মুখে শুনিয়াছে। অজিতের প্রতি এই অত্যন্ত স্নেহানুরক্তির জন্য শ্বশুরবাড়ীতেও সে অনেকের অপ্রিয়পাত্রী হইয়াছে। অপরাধ! সে অজিতের জন্মের পাঁচ বৎসর পরে পৃথিবীতে আসিয়াছে! সেইজন্য অজিতের প্রতি তাহার সন্তান-স্নেহ উদ্ভব হওয়া না কি অসম্ভব! হায়! দুনিয়ায় বযসের তাবতম্যের উপরেই কি চিত্তবৃত্তির বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে?

মীনু ভাবিতে লাগিল, যদি এইসকল নীচ সন্দেহের কাহিনী অজিতের কানে উঠে। ঘৃণায়, অপমানে, ক্ষোভে শিহরিয়া মীনু বালিসের উপরে মুখ লুকাইল।

অজিত বারান্দায় আসিয়া ডাকিল—'মীনুমাসী!'

মীনু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বাহিবে আসিল।

'সন্ধ্যাবেলায় শুয়েছিলে কেন, অসুখ করেছে না কি?'

মীনু সংক্ষেপে বলিল, 'না।'

অজিত বলিল, 'তোমার ভাসুর আর দেওর এসেছেন। তাঁরা দাদামশাইয়ের উইল দেখতে চান। উইল লোহার সিন্দুকে তোমার কাছে আছে।'

মীনু শুষ্কস্বরে বলিল, 'আমি সে উইল রাখবার দবকার মনে করিনি। উইল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।'

'সে কি? ছিঁড়ে ফেলেছ কেন? তাতে যে তোমাকে বাড়ীর অংশ দিয়ে গিয়েছেন!'

ব্যথা-প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্যের সুরে মীনু বলিল, 'আমার বাড়ীর অংশের কিছু দরকার নেই, ও তোমারই থাক। সে উইল থাকলে অশান্তির সম্ভাবনা বেশী, তাই রাখিনি। বাড়ীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী তুমিই।'

'কিন্তু তোমাব দেওর-ভাসুর ওঁরা কি ভাববেন? ওঁরা মনে করবেন, আমিই ঠকিয়ে উইল নষ্ট করেছি। তাও যদি না ভাবেন, তা হ'লে— তা হ'লে', অজিতেব মুখে-চোখে হঠাৎ অত্যন্ত অস্বস্তিপূর্ণ ব্যাকুলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিযা কেমন কালো হইয়া গেল।

মীনু বুঝিতে পারিল, অজিত কি যেন বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না। তাহার মুখমণ্ডল দীপ্ত হইয়া উঠিল—কঠিন স্বরে মীনু বলিল, 'তা ছাড়া কি?'

অজিত অন্ধকার মুখে বলিল, 'তুমি ছেলেমানুষ, সংসারের কিছু বোঝো না,

।! উইল ছিঁড়ে ভয়ানক খারাপ করেছ তুমি। এতে যা ক্ষতি হবে, তার চেয়ে বাড়ীর অংশ নিয়ে বিবাদ করা ঢের ভাল ছিল।'

মীনু উত্তেজিতস্বরে বলিল, 'কি বলতে চাও তুমি, স্পষ্ট ক'রে বল, অজি! নীচ ইতরমনা লোকরা ছোট কথা বলবে, তাদের নীচতাকে গ্রাহ্য ক'রে আমাকে ভয়ে ভয়ে চলতে হবে, এই কি বলতে চাও তুমি? বেশ করেছি, আমি আমার বাবার উইল—আমার নিজের উইল ছিঁড়েছি! আমি চাই না, আমার বাবার ভিটায় বাইরের লোক শরিকদার হয়ে এসে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তোলে।'

অজিত কালো মুখে বলিল, 'কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে তোমাকেই সব চেয়ে বেশী কষ্ট পেতে হবে, এও মনে রেখো।'

'তা হোক্।'

৫

অজিতের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বধূ বয়স্থা, সুন্দরী ও শিক্ষিতা। সংসার এবং স্বামীর তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিয়াছে।

অজিতের প্রতি মীনুব গভীর স্নেহ এবং ত্রুটিহীন যত্ন আর সকলকাব মত সে-ও অপরাধেরই চক্ষুতে গ্রহণ করিল। এই লইয়া মীনুর সহিত যত হোক্ না হোক্, অজিতের সহিত শুক্লার মনোমালিন্য-মেঘ যেন একটু একটু করিয়া জমিয়া উঠিতে লাগিল। মীনু আতঙ্কিতা হইয়া উঠিল। বুঝিল, সে শুধু শ্বশুরবাডী চলিয়া যাইলেই যে সংসারে শান্তি স্থাপিত হইবে, তাহা নহে। যাইবার আগে অজিতের স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কবিয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা উপায় নাই।

মীনু অজিতকে ডাকিয়া বলিল, 'অজি! আমি উইল ছিড়ে ভুল করেছি। মাথার ঠিক ছিল না। বাড়ীর অর্দ্ধেক অংশ আমাব ছিল, সেই টাকাটা আমাকে দাও।'

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আমি এখন টাকা কোথায় পাব? তুমি ত সবই জানো—আমার উপার্জ্জনের উপরই সব নির্ভব করে। নগদ অত টাকা আমার নেই।'

'অজি, অনাথা বিধবাকে ফাঁকি দিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাকে হয় বাডীর অর্দ্ধেক অংশ লিখে দাও, আমি অন্যের কাছে ঐ অংশ বিক্রী ক'রে টাকা নেব, না হয় আমাকে তুমি ন্যায্য দাম দিয়ে দাও, আমি টাকা নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাব। এখানে তোমার সংসারে আমার পোষাচ্ছে না।'

অজিত বলিল, 'আমি কোনওদিন তোমাকে টাকা দেব বলিনি, বাড়ীর অংশ চাইনি। তুমি স্বেচ্ছায় উইল ছিঁড়েছ। তুমি টাকা চাও, আমি উপার্জ্জন ক'রে আমার সাধ্যানুসারে নিশ্চয়ই তোমায় দেব। কিন্তু এখন আমার হাতে একটি পয়সা নেই জেনেও কি জুলুম করতে চাও?'

'বেশ, গরীব অনাথা বিধবা তার ন্যায্য পাওনা চাইলেই বুঝি জুলুম হয়? তোমার টাকা আছে না আছে, আমার জানবার দরকার নেই। আমি তোমার এখানে যখন

থাকবোই না, তখন কেন টাকা নেব না?'

অজিত উত্তেজিত হইয়া উঠিল—'ন্যায্য প্রাপ্য কিসের? আমি কি তোমায় টাকা দেব বলেছিলুম? না,—বাড়ীর অংশ চেয়েছিলুম, উইল ছিঁড়তে পরামর্শ দিয়েছিলুম? ওঃ, স্ত্রীলোককে মোটে চেনবার উপায় নেই।'

'অজি, আমার টাকা দেবে কি না বল? নইলে শ্বশুববাড়ী গিয়ে ভাসুর-দেওরকে দিয়ে আমি তোমার নামে মোকর্দ্দমা করাব।'

'তোমার যা ইচ্ছা করতে পার, আমি একটি আধলাও দিতে অসমর্থ।'

'বেশ, তাই হবে।'

অজিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত, ঘৃণা-কাতর মুখে বলিল, 'উঃ, পৃথিবীতে মানুষ চেনা সবচেয়ে শক্ত।'

মীনু অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে মনে মনে বলিল, 'সত্যিই।'

পাশের ঘরে শুক্লা টেবল-হার্ম্মোনিযামে গাহিতেছিল— 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর —ক্ষমা কর—প্রভু—'

মীনু টলিতে টলিতে তাহাব মায়ের ঘরেব ভিতব আসিযা মেঝেব উপব উপুড় হইয়া শুইয়া, গুমরিয়া কান্না চাপিতে লাগিল! সে কতক্ষণ এইভাবে পড়িয়াছিল, নিজে জানে না।

শুক্লা ঘবে ঢুকিয়া সুইচ টিপিযা আলো জ্বালিয়া তীক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'মাসীমা, ভর সন্ধেবেলা অমন ক'রে কাঁদবেন না, ওঁর অকল্যাণ হবে।'

মীনু ত্রস্তে উঠিয়া বসিযা বলিল, 'ষাট—ষাট্—'

'আপনার কত টাকা চাই, বলুন, আমি ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আমার গায়ের গয়নাও ত রয়েছে। আমি আপনাকে ফাঁকি দিতে চাই না—যদিও আইনতঃ আপনি কিছুই পান না।'

মীনু আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—'হ্যাঁ বৌমা, ঠিক বলেছো মা! মানুষের প্রাণটাকেও প্রাণের মাপকাঠিতে মাপতে যাওয়া ভুল, সেটাও আইনেব মাপকাঠিতে মাপতে হয়। নইলে কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক। আইনতঃই যে আমার দুনিয়ার কাছে কোনও কিছু পাওনা দাবী-দাওয়া নেই, মা।'

শুক্লা মুখ ভার করিয়া বলিল, 'আপনি শাপ-মন্যি দেবেন না মাসীমা, আমি আপনার টাকা নিশ্চয়ই দিযে দেব।'

'বৌমা, তুমি মেয়েমানুষ—তুমিও মা, আমায় শাস্তি দিও না।'

শুক্লা মীনুর বেদনাবিবর্ণ কাতর মুখের প্রতি চাহিয়া থমকিয়া গেল।

মীনু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, 'তুমি জন্ম-এয়োস্ত্রী হযে সুখে থাক, মা, আমাকে তোমায় কিছুই দিতে হবে না। শুধু দয়া ক'রে এইটি দিও'—মীনুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। গলা ঝাড়িয়া আবার বলিল, 'শুধু এই চাইছি—যদি কখনও অজির অসুখ-বিসুখ হয় বা তোমাদের দরকার হয়, সেদিন তোমাদের মাসীমাকে ভুলে থেকো

না, ডেকো। আমি, মা, তোমার ঘর-কন্না গুছিয়ে-গাছিয়ে নিষ্কণ্টক ক'রে রেখে গেলুম। অজি আর আমায় জীবনে বিশ্বাস করবে না, ক্ষমাও করবে না'—মীনুর স্বর বন্ধ হইয়া গেল, উদ্যত ক্রন্দন চাপিতে চাপিতে মুখে আঁচল দিয়া সে সরিয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা মীনু আজন্মের আশ্রয়-নীড় পিত্রালয় জন্মের মত ত্যাগ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

যাইবার সময় অজিত গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল, মীনু কথা কহিল না। অজিত প্রণাম করিল, মীনু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। বাক্স-তোরঙ্গ তুলিয়া দেওয়া হইল। ঘর্ঘর শব্দে গাড়ী অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অজিতের ম্লান ব্যথা-কাতর মুখের উপর একটা বিরাট ঔদাস্যের ছায়া জাগিয়া উঠিতেছিল। জগৎটা যেন একটা প্রকাণ্ড স্বার্থপরতার ক্ষেত্র, অবিশ্বাসের লীলাভূমিরূপে তাহার আহত অন্তরে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে শুক্লা তখন ঘরের মেঝেয় মাথা নোয়াইয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা করিতেছিল--'মাসীমা, আমি তোমায় বুঝতে পারিনি, মাপ করো। তুমি সতীলক্ষ্মী দেবী— আমি যেন শীগগিরই তোমায় ফিরিয়ে আনতে পারি।'

মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩৩

নিশীথ রাতের বাদল-ধারা

আকাশ-ভরা কালো মেঘ। মেঘের উপরে মেঘ—তার উপরে মেঘ। বর্ষণেরও বিরাম নেই, মেঘ জমারও বিশ্রাম নেই।

কখনও ব্যাকুল-আবেগে ঝাঁপিযে পড়ে, কখনও অধীর-নৃত্যে ঘুরপাক খেয়ে, কখনও নীরব ব্যথায় অঝোর অশ্রুধারে—অশ্রান্ত বারিধারা ঝরচেই—ঝরচেই।...মাগো —রোদ্-তামা জ্যৈষ্ঠি আকাশের জ্বলন্ত বুকের ভেতর এত কান্না গোপনে জমা হয়েছিল কি করে কে জানে!!... আজ নব আষাঢ়ের প্রথমেই রূপ ধরে যে-কান্না মূর্ত্ত হয়ে নেমে এলো!!

জানালার পাশে চেয়ারটা টেনে নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলুম। কালো কালির মত মেঘের তলা দিয়ে দুধের মতো শাদা একসারি বক উড়ে গেল।

...দেখলে মনে হয, ওবা অনাদিকাল ধবে' এই কালো মেঘের নীচেই উডে চলেচে--অনন্ত কালই এমনি ধারা উড়ে চল্‌বে! ওদের কোনও নীড় ছিল না কোনওদিন,—ওদের নীড় যেন থাকতেও পারে না কখনো। উড়ে-যাওযাই ওদের পেশা—উড়ে-যাওয়ার মধ্যেই ওদেব জীবন। কিন্তু সত্যি কি তাই-ই?

শীকর্-ভাবাক্রান্ত স্নিগ্ধ বাদলা হাওয়ার গন্ধটুকু সোঁদা-সোঁদা—মিষ্টি-মিষ্টি। বড ভালো লাগে।

—কিন্তু গায়ে লাগলে অসুখ কবে; নরম ধোসাখানা বেশ করে গাযে জড়িয়ে নিযে বসলুম।

ঘরের ভেতরটা থম্‌থমে; শোকাহতা নীরব-প্রকৃতি সহিষ্ণু নাবীর মতো।

বিছানা, টেবিল, আলনা, ব্র্যাকেট, ছবিগুলো নিত্যকার মতো চুপটি করে আপন-আপন স্থানে দাঁড়িয়ে একমনে 'ক্লকে'র 'টিক-টিক' গান শুনচে। কিন্তু আজ যেন ওদের উপবে মৌন-বিষাদের গাঢ়চ্ছায়া নেমে এসেছে, অথচ প্রতিদিন তারা যেখানে যেমনভাবে ছিল, আজও তাই-ই আছে।

প্রতিদিন ঘরে যা ছিল আজও তাই-ই আছে কি? বোধ হয না। কিন্তু কী যে নেই তাও তো জানিনে।

ঘরের এই বিষাদ-গাম্ভীর্য্যটুকু বিরক্তিকর কিম্বা উত্যক্তকব নয়কো,—শুধু কেমনতর একটা বিপুল ঔদাস্য জাগিয়ে তোলে মাত্র।

সব জিনিষগুলোই আজ যেন বলতে চাইচে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটা গোপন-অর্থ আছে। তারা কেউ নিরর্থক নয়কো। বরং যে-অর্থে তাদের ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েচে সেটাই তাদের কাছে নিরর্থক, কারণ তার চেয়েও অনেক গভীর অর্থ

তাদের নিজের ভেতরে রয়েছে—যা' তোমরা কেউ জানো না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই?

যা' একান্ত সহজ, একান্ত সুস্পষ্ট, যা স্বচক্ষে দেখে, স্বকর্ণে শুনে, স্বহস্তে স্পর্শ করে' অর্থ পরিগ্রহ করা যায়, তারও কি অন্য কোনও লুকানো-অর্থ সঙ্গোপিত থাকতে পারে নাকি?—হয়তো পারে।

আমিনা এসে চেযাবের পিঠের কাছে দাঁড়াল, টের পেলুম, কারণ সরু সোনার চুড়ির মৃদু-ঝঙ্কারে শ্রবণ পুলকিত হযে উঠেছিল, কেয়াফুলের চঞ্চল-গন্ধে নাসা বিধুর হয়ে পড়েছিল।

আমি কেয়াফুলেব গন্ধ ভালবাসি সে কবে টেব পেয়েচে জানিনে। বাদলা-দিনে প্রায়ই দেখি তার কেয়াখয়ের তৈরী করবার দরকার হয়, তাই রাস্তা দিযে 'চা—ঈ কে—যাফুল—' -কে ডাকে। ফুলগুলোর গন্ধ পালিয়ে যাবে বলে' যত্ন করে তাদের নিজের রঙীন শাড়ী-ব্লাউজে জড়িয়ে রেখে দেয!... সেই কেতকী-সুরভিত শাডী-ব্লাউজ সে কেবলমাত্র তখনই পববার সুযোগ পায় দেখেচি—যে সময়টিতে তার, আমার সান্নিধ্য লাভের সম্ভাবনা আছে...

দেখতে পাই সবই— বুঝতেও পারি সবই—কিন্তু— ওগো—এত-কিছু সবে'র মাঝে ঐ একটি ছোট্ট 'কিন্তু'ই সবচেযে প্রকাণ্ড হয়ে জীবনের সকল আনন্দটুকু চিরতবে গ্রাস কবে' নিয়েচে।

কাঁধের উপর নবম-হাতের মৃদুস্পর্শ পেলুম। পদ্মপাতার মতো কচি হাতখানি আমাব কাঁধেব উপরে স্থাপন করেচে। কুন্তলেব সুগন্ধে সর্ব্বেন্দ্রিয আবিষ্ট হয়ে পড়ল। সমস্ত দেহের মধ্যে বিপুল পুলক-শিহবন জেগে উঠেছে। বুকের ভেতর সিন্ধুব তরঙ্গমালা এসে ঢুকলো কি করে? মনে হচ্চে বেশীক্ষণ এমনভাবে থাকলে অনুভূতি লুপ্ত হয়ে যাবে।

পিছন ফিবে তাকালুম। মেঘলা-রঙেব নীলাম্বরী শাড়ীখানির সঙ্গে রামধনু বঙের সিল্কের ঢিলে-ব্লাউজটা চমৎকার মানিযেচে। বাইরের বাদল-প্রকৃতি যেন মূর্ত্তিমতী হযে আমার ছাযাচ্ছন্ন ঘবের ভেতব এসে দাঁড়াল।

নয়নেব উৎসাবিত অমৃত-ধাবে আমায় অভিষিক্ত করে সে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

অপূর্ব্ব মাধুর্য্যশ্রী-বিমণ্ডিত মুখখানি তাব, রস-ভরা আঙুরের মত নিটোল টল্‌টলে দেখাচ্ছিল। স্নিগ্ধ-সপ্রেম দৃষ্টি দিয়ে পূত-প্রীতিধারা ঝরে পড়চে! বড্ড ভালো লাগল।

একটুখানি আদর করবাব ইচ্ছা আমার অদম্য হয়ে উঠতে লাগল। সামনের সেই জীবন্ত প্রতিমাবও চোখের স্বচ্ছ কালো মণিদু'টির মাঝে মৌন-ভাষার সুস্পষ্ট অক্ষরে আমারই আকুল আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠচে দেখতে পেলুম।

ছোট বোন মায়া অনেকদিন হল মারা গেছে। সে একটা গান শিখেছিল—

'ছিন্ন কর, ছিন্ন কব, অপেক্ষা আব নয়।
ধূলায ঝরে পড়বো পাছে সেই জাগে মোব ভয।'

আমিনাব চোখের নীরব-ভাষায় আজ ঐ গানের লাইনদু'টি এমন জাগ্রত মূর্ত্ত হযে উঠলো কি করে?...

অনেকদিনেব ভুলে-যাওয়া গানটা মনে পড়াব সঙ্গে সঙ্গে মায়াকেও মনে পড়ে গেল। এগাব বছরের বোনটি মাবা গেছে প্রায় পাঁচ বছর! বেঁচে থাকলে এতদিনে কত বড হয়ে উঠতো—কেমন দেখতে হ'তো কে জানে?

বোধ হয় অনেকক্ষণ আত্মবিস্মৃত হযে অপলকনেত্রে তার পানে তাকিযেছিলুম, কারণ তাব সুগৌর মুখখানি বাঙা হয়ে উঠেছিল, শান্ত চোখে ঘন পল্লব আনন্দ - বিমিশ্র লজ্জাভারে অবনত হয়ে এসেছিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হলুম।

অভিনয়?.. হাঁ অভিনয়ই তো!

সমস্ত জীবনটাই তো একটি প্রকাণ্ড অভিনয মাত্র।

বাতায়ন-পথে মেঘান্ধকার আকাশপানে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে উদাস স্বরে বললুম—'আমার একজন বন্ধুর আসবার কথা আছে, তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি।' আমিনা আমার কাঁধেব উপর হতে হাতখানি নামিয়ে নিয়ে একটু সবে গেল।

আমি এবার তাকেই লক্ষ্য করে বলে ফেললুম—'তুমি একটু পবে এ-ঘবে এসো, কারণ, এখন আমার বন্ধুটি আসবেন।'

নীববে আস্তে আস্তে সে চলে গেল। চেয়ে দেখলুম—ঘন-কৃষ্ণ তাব আঁখিদু'টির মাঝে অপমান, অভিমান ও বেদনার মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে নেমে আসচে।

বুঝলুম কোথায় তার বেজেচে!

ইচ্ছে হ'ল উঠে গিয়ে তার পদ্মফুলের পাপড়ীর মতো সুন্দর আঁখিপাতে একটি-মাত্র নীরব ছোট্ট প্রেমাভিব্যক্তিব ছোঁয়া দিয়ে, ঘনায়মান বেদনার মেঘরাশি অন্তর্হিত করে' কোজাগরী-জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলি! ব্যাকুল-বাসনাকে নির্ম্মমভাবে চোখ রাঙিয়ে উঠলুম! তার কণ্ঠরোধ করে ধবলুম।

দরজা দিয়ে বেব্ হয়ে সে দালান পার হ'য়ে গেল। তার বাঁ হাতের মুঠোব ভেতর একছড়া সাদা ধব্ধবে বেলফুলের সরু-মালা। সেটাকে লুকিযে বাখার একান্ত প্রয়াসে মুঠোর ভেতর নিঠুর-পেষণে চেপে আছে,—কিন্তু চাঁপা-রংয়ের ছোট ছোট সরু আঙুলগুলির ফাঁক দিয়ে শাদা ফুলগুলো, তাব গোপন প্রয়াসকে উপহাস করে জ্যোৎস্না-আলোয় শাদা মেঘখণ্ডের মত উঁকি মাবছে।

ছাদে মাটীর টবের সারি দিয়ে সে একটি বেলফুলেব ছোট বাগান তৈরী করেচে। বর্ষায় চারাগুলো খুব ঝাঁক্‌ড়া হয়ে বেড়ে উঠেচে। সেই তার টবের বাগানের বেলফুলেই বোধ হয় ঐ মালাছড়া আজ গাঁথা হয়েছে।

—কিন্তু গাঁথবার সময়ে নিশ্চয়ই সে ভাবেনি যে, এই মালাটিকে তাব নিজের

হাতের মুঠোতেই এমন করে পিষে বিদলিত ক'রে ফেলতে হবে! তাহ'লে নিশ্চয়ই এ মালা সে গাঁথতো না।

—হ্যাঁ, জগতে ফুলের মালা কেউ কখনও নিশ্চয় গাঁথতো না—যদি গাঁথবার সময় টের পেত, এ মালা কারুর গলায় উঠবে না! কেউ এর আদর করবে না! এ মালা তাজা থাকতে থাকতে তাকেই আবার নিজের হাতে পিষে নষ্ট করতে হবে!

গাছের ফুল গাছে ফুটে থাকাই সব চেয়ে ভালো।

* * * *

না-পাওয়া ঢের ভাল। না-থাকা আরও ভাল। পেয়ে না-পাওয়া সবচেয়ে কষ্ট।

কিন্তু প্রেমে বরেণ্য কি? আত্মসুখ না আত্মত্যাগ? নিজের তৃপ্তি—না, প্রিয়ের কল্যাণ?...

বিকেল হ'য়ে আসচে, কিন্তু মনে হচ্ছে রাত্রি হ'য়ে গেছে—এত নিবিড় মেঘান্ধকার! যেন ঘন-ঘোর তিমির!

আজ দ্বিপ্রহরের দীপ্তচ্ছটা, অপরাহ্নের সোনার হাসি, গোধূলিব সিঁদুররাগ, সন্ধ্যার আলো-ছায়ার খেলা কিছুই দেখা গেল না। একেবারে আঁধার রাত্রি নেমে এল।—সারা দিনটা যে বর্ষণ-মুখর মেঘান্ধকারের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদেচে খালি!

গান গাইতে ইচ্ছে করচে—

'আমি, জ্বাল্‌ব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমি, শুনবো বসে আঁধার-ভরা গভীব বাণী।
আমার, এ দেহ্‌-মন মিলাযে যাক নিশীথ-বাতে,
আমাব, লুকিযে-ফোটা এই হৃদয়েব পুষ্প-পাতে
ওগো থাক্ না ঢাকা মোব বেদনার গন্ধখানি।'

* * * *

আমিনা ঘুমুচ্ছে। শান্ত মুখখানি গোপন-বেদনার ফিকে-আভায় করুণতর। নিশ্বাসের মৃদু তালে সারা তনু আস্তে আস্তে দুলচে।

চুপি চুপি চোরের মত সন্তর্পণে খাটের পাশে দাঁড়ালুম। আমিনা সিঁদুরের ছোট্ট টিপ্ পরেচে। আজন্মকাল হিন্দু বাঙালী-সংসর্গে ও আবেষ্টনে বর্দ্ধিত হয়ে, হিন্দু মেয়ে-স্কুলে লেখাপড়া শিখে তার আচার-ব্যবহার-রুচি সবই হিন্দু মেয়ের মত হয়েচে। সেইজন্যেই বোধ হয় আমি বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলুম। ওর স্কুলের মেয়েরা চিঠি লেখে 'আমিনা' নামে নয়—তারা ওর নাম দিয়েচে 'অমিয়া'। আমার কিন্তু 'অমিয়া'র চেয়ে 'আমিনা' নামটিই বেশী মিষ্টি লাগে!

ঘুমন্ত মুখখানির প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে মনের ভেতর ব্যাকুল-আবেগ ফুলে-ফুলে উঠ্‌ছিল। বড্ড ইচ্ছে হতে লাগ্‌ল—শিশির ধোয়া পদ্মের মত ঘুমন্ত মুখখানি একবার নিঃশব্দে বুকের ভেতরে চেপে ধরি—

—না, নিজেকে বিশ্বাস নেই। চুপি চুপি অপরাধীর মত পালিয়ে এলুম। খাটের

ছত্‌রির উপরে আমিনার গোলাপী-রংয়ের সলুকাটা ঝুলছিল, নিজের অজ্ঞাতে সেটাকে কখন্ জামার ভেতর লুকিয়ে নিয়েছি টের পাইনি।

নিজের ঘরে এসে দেখলুম, আমিনার ছোট সলুকাজামাটা নিয়ে চলে এসেচি— ফিরিয়ে দিয়ে আস্‌তে ইচ্ছে হল না, নিজের কাছেই রেখে নিলুম।

* * * *

শরীব ক্রমশঃই দুর্ব্বল হয়ে আসচে। আর বেশীদিন যে নিজের অবস্থা আমিনার কাছে লুকিয়ে রাখতে পারবো, ভরসা হচ্ছে না। ওকে শিগগিরই সরিয়ে দেওয়া দরকার।

দাদী এসে কাছে দাঁড়ালেন। বললেন—হ্যাঁরে, তোর রকম কেমন বল দেখি? বৌটাকে একটু আদর-যত্ন কিছুই করিস্ না নাকি?

—আদর-যত্ন আবাব কি কববো?

—সারাদিন বাইবে থাকবি, রাত্রে বৈঠকখানায শুবি, এসব আমি মানে বুঝতে পাবি না।

—আমার বাড়ী থাকবার সময় হয না।

—অবাক্ করলি! তবে পরের মেয়ে সাদী করে আনলি কেন?

সত্যিই তো পরের মেয়ে সাদী করে আনলুম কেন? চুপ কবে ভাবতে লাগলুম।

দুঃখের পসরা মাথায় চাপাবো বলে আনিনি তো,—সুখী করতেই এনেছি! বিবাহ কববো না ব'লে এতকাল কাটিয়ে, তারপরে এই সপ্তদশীর রহস্য-নিবিড় কালো আঁখির অতল-মায়ায় ডুবলুম, বাঁশীর চেয়ে মিষ্টি-গলার সুরের জালে বন্দী হলুম, স্নেহ-গভীর সুন্দর মধুর প্রাণটুকুর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলুম। সব ভুললুম।

হায় মৃত্যুদূত! তখন যদি এতটুকু আভাসেও তোমাব বার্ত্তা পৌছে দিতে পারতে, বন্ধু,—তা হ'লে জন্ম-জন্মান্তরে তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইতুম। কখনই এ নিরপরাধা বিহগীটিকে তার নিশ্চিন্ত আনন্দ-নীড় হ'তে সোনার পিঞ্জরে চির-বন্দিনী করে আনতুম না।

—না-না—আমার অনিন্দ্য আনন্দ-প্রতিমাকে বিষাদের গভীর আঁধারে, ব্যর্থতার অতল-কূপে নিক্ষিপ্ত করতে পারবো না। তার সোনার ঊষায় শর্ব্বরীর কালি লেপে দিতে পারব না।

যৌবনের প্রভাত ও মধ্যাহ্ন মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদাগার ও 'ল্যাবরেটোরী'র মধ্যে পরীক্ষার উৎসাহে—কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল টেব পাইনি। নামের পিছনে দীর্ঘ উপাধিশ্রেণী ও বিপুল যশ অর্থ নিয়ে আমি যে সন্তুষ্ট না হয়েছিলুম তা নয়, কিন্তু যৌবন তো তাতে তৃপ্ত হ'ল না। তাই সে তার যাবার বেলায়— প্রখর মধ্যাহ্ন-শেষে অপরাহ্ণের নিষ্প্রভ-আলোয় বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে জয়মুকুট কেড়ে নিয়ে পরলে।... সে বিদ্রোহ জেগে উঠল আমারই ছাত্রী তরুণী সপ্তদশী আমিনাকে

কেন্দ্র করে।—আর ঠিক সেই সময়টিতেই সুদূর সমুদ্র-পারে আমার নব-আবিষ্কারের পরিচয় দেবার জন্য চিকিৎসক-বুধ-সভা হ'তে সসম্মান আহ্বান এল।

যাবার আগে আমিনাকে নিজের শূন্য প্রাসাদে গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠা করে রেখে বিদায় নিলুম। সেখানে সুদীর্ঘ একটি বৎসর কাটিয়ে বাড়ী ফিরে এসেচি—জীবনব্যাপী কঠোর শ্রম ও কায়মন-উৎসর্গিত সাধনাব জয়মাল্যখানির সঙ্গে দুরাবোগ্য যক্ষ্মা-ব্যাধি নিয়ে।

এই একটি বছর শুধু লিপির সেতু রচনা করে বারিধির ওপাব থেকে দু'জনে দু'জনের মনের বলে পরিচিত হচ্ছিলুম। তখন বুঝিনি এই লিপির স্বপ্ন এ শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে,—বাস্তবের মৃণাল-বৃন্তে এ প্রেমস্বপ্ন সত্য-শতদলরূপে বিকশিত হয়ে উঠবে না! এক ঝাপটা দমকা হাওয়ায় সাত-মহলা তাসের প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে।

সেখানে ডাক্তারেরা বললে—খুব-শিগগির মারা যাবেন না।

বুঝলুম,—'বলি' নয়, 'জবাই'!

বিদেশী বন্ধুরা সবাই বললে—দেশে ফিরে যাও।

মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ল। ভাবতে লাগলুম, —আমিনাকে কি কবে বাঁচাব। শুধু দেহে বাঁচিয়ে রাখা নয়, প্রাণে বাঁচিয়ে রাখা।

হিন্দু মেয়ের সংস্কার তার সারা মন আচ্ছন্ন করে রেখেচে। তার অন্তব যদি একবাব কারুর প্রেমেব পরশে বিকশিত হয়—তা' হ'লে সে আর এ জীবনে অন্যজনকে বরণ কবতে পারবে না। আমার প্রেমের ক্ষণ-স্পর্শটুকু পেলে, সে সারা জীবন হিন্দু-বিধবার সুকঠোর-বৈধব্যব্রত গ্রহণ করে নিজেকে পিষ্ট করে ফেলতে দ্বিধা করবে না। আর এখন যে তার অন্তরখানি আমাবই প্রেমেব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে!

আমিনাকে এখন প্রিয়ারূপে গ্রহণ করলে—তাকে জীবন্ত-মৃত্যুর দ্বারে অগ্রসর করে দেওয়া হবে! না হয় এই সংক্রামক-ব্যাধি উপহার দিয়ে নিজের মৃত্যুপথের সঙ্গিনী করা হবে!

ইচ্ছা হ'তে লাগল—যদি মরতেই হয় দুজনে একসঙ্গেই মৃত্যুর অতল-নীরে তলিয়ে যাই না কেন?

কিন্তু তা' হয় না। জীবনটা যে কতবড় কাম্য, কী অপরিসীম সুধারসে ভরা, তার মূল্য বোধ হয় শুধু যক্ষ্মারোগীরাই সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারে।

না—নিজের প্রাণের চেয়েও সত্যিই যার প্রতি বেশী অনুরাগ—তাকে কি এই সুন্দর ধরার আলো হ'তে মৃত্যুর অজানা অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারি?

আমার ফিরবার আশায় সে বিপুল আগ্রহ-কম্প্র বুকে অধীর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে। যদি দেশে ফিরে না গিয়ে এই সুদূর বিদেশে চিরবিশ্রাম গ্রহণ করি—তা

হলে সে তার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই দেখতে-না-পাওয়ার ব্যথা ভুলবে না। আমার প্রতি তার কল্পিত প্রেমের অর্ঘ্য-সম্ভার আরও যত্ন করে সন্তর্পণে তুলে রেখে দেবে পরপারের জন্য। জীবনের ব্যর্থতাব দুর্ব্বিষহ বোঝা নিয়ে মরণ-খেয়াঘাটে পৌঁছুবে—তবু নিজে বিচলিতা হবে না।

না—না—সে হবে না। আমি তার প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে যাব। তা হলে যদি সে আবার জীবন গড়ে তুলতে পারে। আমি আমার মানস-পীঠের দেবী প্রতিমাকে চির-ব্যর্থতা চির-বিষাদের অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে রেখে যাব না।

আমি তাকে আমার হাত হতে বাঁচাব—আমি তাকে মুক্তি দিয়ে যাব—হাঁ—নিশ্চয়ই—পথ পেলুম খুঁজে। কিন্তু ভীষণ দুর্গম বন্ধুর।...এ পথ উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন—অতি কঠিন। তা হোক্—আমি এই বন্ধুর কঠিন পথেই আমার প্রেমের জয়যাত্রায় বেরুবো।

আমার প্রিয়ার জীবন ব্যর্থতার তমসায় আচ্ছন্ন হ'তে দেব না। নারী প্রিয়তমের জন্য সব সইতে পারে, সইতে পারে না শুধু তার প্রেমের অবমাননা। নারীর জীবনে প্রেমাস্পদের চেয়ে ববেণ্য শুধু—প্রেম।

'আমি আমাব অপমান্ সহিতে পাবি
প্রেমেব সহে না তো অপমান,
অমবাবতী ত্যজে হৃদযে এসেছে যে
তাহাবো চেযে সে যে মহীযান।'

চোখে-না-দেখা এক অপবিচিতা ফরাসী-নর্ত্তকীর ছবি, আর তিন-শিলিং-মূল্যে কেনা একগুচ্ছ সোনালী কেশ লকেটে বন্ধ কবে সোনাব চেনে গেঁথে নিযে—বেরিয়ে পড়লুম।

পাণ্ডুব শেষ-নিশাব বিবর্ণ পূর্ব্বগগনে দীপ্ত শুকতারাব মত, আমাব মরণ-বিবর্ণ পাণ্ডুর হৃদয়-গগনে—দু'টি সলজ্জ সপ্রেম-আঁখিসহ একখানি স্নিগ্ধ-মধুর মুখ প্রদীপ্ত হ'যে জ্বলতে লাগ্‌ল। যার মাধুর্য্যের তুলনা নীল সাগরেব এপাবে-ওপাবে কোথাও দেখতে পাইনি; বোধ হয় এ সমুদ্রের চেয়েও বিশালতর যে পাবাবার এবার পার হ'ব—তার ওপারেও পাবো না!

আমিনা যতখানি বিপুল আশায় পথ চেয়েছিল—তার অনেকখানিই ধূলিসাৎ হয়ে গেল, আমার অস্বাভাবিক নীরস শুষ্ক-ব্যবহারে।

কাজের ভান করে বাইরের 'ডিস্পেন্সরী' আর নিজের 'ল্যাবরেটরী'তে আশ্রয় নিলুম। চিকিৎসা-চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। লুকিয়ে লুকিয়ে পীর, ফকির, দরবেশ, সন্ন্যাসী, অবধূত, মাদুলী পর্য্যন্ত বাকী রাখলুম না। দিনের পর দিন শরীর-গতিক নিজে বেশ বুঝতে পারচি।—ডাক্তার হয়ে অনেক যক্ষ্মারোগী ঘেঁটেচি—অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যক্ষ্মা বীজ নিয়ে বহু গবেষণা করেচি—কিন্তু যক্ষ্মাটা কী—তা' এইবার ঠিক বুঝতে পারা যাচ্চে।

এই বিপুল বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা নিয়ে মরণের অপেক্ষায় বেঁচে

থাকাটাই মৃত্যুর চেয়ে ভয়ঙ্কর।

মৃত্যু? সে তো মুহূর্ত্তের পরশ মাত্র।

ইচ্ছা হয় জীবনের শেষ-পরম-ক্ষণটুকু প্রাণভরে প্রেমরস পান করে নিয়ে সেই নেশায় বিহ্বল হয়ে পরপারে যাত্রা করি!

'—জীবন-সুরা শূন্য হ'বাব আগে
পাত্রখানি নাও ভরে নাও নিবিড় অনুরাগে।'

কিন্তু আমিনার জীবনটা যে তা' হলে দগ্ধ হয়ে যাবে। অফুরন্ত বেদনার বোঝা নিয়ে মরণেরই নামান্তর দুর্ব্বহ বৈধব্য জীবন সে বইবে কী করে!

আমি জানি প্রফেসর আনসারি তাকে ভালবেসেছিল— আজও সে অবিবাহিত। সে তাকে সুখী করতে পারবে।

—কিন্তু আমিনা,... সে কি আনসারিকে ভালোবাসতে পাববে?... হয়তো পারবে। আমিনার মনের মুকুরে এখনও তো কারুর সুস্পষ্ট ছায়া পড়েনি!

আমার ছায়া?... হয়তো একটুখানি অস্পষ্ট আভাসে পড়তে সুরু হযেছিল —আমি নিজের হাতেই তো তা মুছে দিচ্ছি!

এই নীরস-শুষ্ক ব্যবহাব—এই ব্যবধান-পূর্ণ আচরণ,— এই নর্ত্তকীর ছবি—স্বর্ণাভ -কেশের গুচ্ছ—এই-ই ঠিক।

আমিনা সঙ্কুচিতভাবে আমার কাছে আসে— কুণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করে—তোমার চেহারা ভয়ানক খারাপ হয়েছে—কোনও অসুখ করেচে কি?

সংক্ষেপে উত্তর দিই—না।

জিনিষ খোঁজার মিথ্যা-ভান কবে গ্লাসকেসের চাবি খুলি—সামনেই ব্র্যাণ্ডিব বোতল আর ওয়াইন্-গ্লাসটা যাতে ভাল কবে দেখতে পাওয়া যায়। আমিনা বিবর্ণমুখে সে-গুলার দিকে তাকিয়ে থাকে—মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

তারপর অকারণে গা থেকে কোট্ জামাটা খুলে বিছানার উপর ফেলে বেখে বাথরুমে চলে যাই, বুক পকেট হতে সে কোন্ অজ্ঞাত বিদেশিনী-নর্ত্তকীর নির্লজ্জ্ হাস্যবিকশিত মূর্ত্তির—সুবর্ণমণ্ডিত আলোকচিত্র আর তিন শিলিং দামের স্বর্ণকেশগুচ্ছ অর্দ্ধেকটারও বেশী বাইরে বেরিয়ে থাকে।

আমিনা আর আমার কাছে আসে না। এসে এসে ফিরে গিয়ে—এখন নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সামনে আসতে চায় না।

বেলফুলগাছের টবগুলো ছাদের পাঁচিলের কোণে স্তূপাকার করে' ফেলে রাখা হ'য়েচে। এগুলো নাকি সমস্ত ছাদটা জুড়ে রেখে বেজায় অসুবিধা করে। জীবন্ত গাছগুলো ভারী ভারী টবের চাপে পিষে মরে গেছে। অনেকগুলো কচি গাছ থেঁত্‌লে আধ-মরা হয়ে গেছে।

সামনের রাস্তা দিয়ে বুড়ো কেয়াফুল-ওলা-টা 'চা—ঈ কেয়া—ফুল—' হেঁকে যায় এখনও, কারণ বর্ষা ফুরোয়নি। আমিনার আর কেয়া খয়ের ক'রবার আগ্রহ নেই, তাই তাকে ডাকবার প্রয়োজন হয় না।

*   *   *   *

ক'দিন বৃষ্টির পর আজ রোদ উঠেছে। দুপুরবেলা বৈঠকখানা ঘরে চুপ করে শুয়ে আছি। বুকের ব্যথাটা বেড়ে উঠেচে। বক্তও উঠেছে, জ্বরও হচ্চে।

আর নয়। আমিনাকে শীঘ্র বাপের বাডী পাঠিয়ে দিয়ে পশ্চিমে কিম্বা সমুদ্রতীরে চলে যাব। এমন নিভৃত সুদূর দেশে যাব—যা' বাংলা হ'তে অনেক দূর। সেখানে নিঃশব্দে মববো।

এখানে অম্লান পবিত্র ফুলটি অম্লানই থাকুক। শোকেব ঝড় যেন তার আনন্দ-পাপড়িগুলি ঝরিয়ে না দেয়।

দুপুববেলা কি দবকারে সে একবার এ-ঘরে এসেছিল। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে বিস্মিতভাবে থমকে দাঁড়াল। নয়নে একান্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফুটে উঠল। স্পষ্ট বুঝলুম —আমার অসুখ করেছে কি না প্রশ্ন করতে চায়— কিন্তু আত্মসম্মান ও সঙ্কোচ তাকে বাধা দিচ্ছে।

এই ক'দিনেই চেহারা শুখিয়ে আধখানা হয়ে গেছে। চোখের দীপ্তি নিভে গেছে, আননে গভীব বিষণ্ন ছায়া।

প্রাণটা কেঁদে উঠলো। কোন এক বিপুল-আকাঙ্ক্ষায় বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল।

তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে দেয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ তৈলচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রলুম।

একটু সাম্‌লে নিযে তারপর আমিনার উদ্বিগ্ন শঙ্কিত আঁখির সপ্রশ্ন দৃষ্টির পানে গম্ভীর দৃষ্টি মেলে হঠাৎ নীরসকণ্ঠে প্রশ্ন করে ফেললুম—কিছু চাই কি?

তার মুখখানা অপমানে রাঙা হ'য়ে উঠলো। মাথা নেড়ে 'না' জানিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—কিন্তু রাণীর মত অঙ্গবিক্ষেপ-ভঙ্গীতে উত্তর পাওয়া গেল—সে ভিখারিণী নয়। চাওয়া এবং ভিক্ষা করাই কি তার স্বভাব? সে কারও কিছু দানের প্রত্যাশা করে না।

এ ঘরে যে-জিনিষ নেবার প্রয়োজনে তাকে আসতে হয়েছিল তা' তার নেওয়া হ'ল না।

এর জন্য দায়ী কে?...আমি কি?...বোধ হয় নয়।

—মোটের উপরে যা' নিতে এসেছিল তা' তার নেয়া হ'ল না। ভাগ্য-দেবতাই বোধ হয় এর জন্য দায়ী।

কিন্তু কা'র?...আমার —না তা'র?...

সাজানো প্রেমের ডালা ধুলোয় পড়ে চূর্ণ হয়ে গেছে। এ ডালা আর সাজানো যায় না—চূর্ণ জিনিষ কি খুঁটে তোলে কেউ? যে তোলে সে বৃথাই পরিশ্রান্ত হয়! সাজাতে প্রয়োজন হ'লে—আবার নতুন চাই।...

সন্ধেবেলা তাকে ডেকে পাঠালুম। মুখে চোখে সারা অঙ্গে একটা বিপুল ঔদাস্য জড়িয়ে, নিতান্ত অপরিচিতার মত সামনে এসে দাঁড়াল।

বল্লুম—আমি আবার সমুদ্র-পারে চল্লুম।

সে ভাব্‌ল বিলাত। চুপ্ করে রইল, কিছু উত্তর দিল না।

আবার বল্লুম—বোধ হয় শীঘ্রই যাব।

এবার উত্তর পাওয়া গেল—'ও!'

একটুখানি চুপ করে থেকে বল্লুম—তুমি বাপের বাড়ী যেতে চাও?

অনেকক্ষণ মৌন থাকবার পর উত্তর দিল—হুঁ!

—তোমার খরচের টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। তার সুদ মাসে দু'শো টাকা করে পাওয়া যাবে। সেই সুদে তোমার খরচ চালাতে পারবে। আর আমার এই বাড়ী, এ'ও তোমারই রইল।

আমিনা উত্তর দিল না, অপলক নেত্রে একদিকে চেয়ে রইল। তার সমস্ত শরীর বায়ুতাড়িত দীপশিখার ন্যায় ভিতর থেকে কেঁপে কেঁপে উঠচে বলে মনে হ'ল।

এবাব দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্ট প্রশ্ন হ'ল—আমাকে আপনার এ বাড়ীতে কেন এনেছিলেন, আর কি জন্যেই বা পাঠিয়ে দিচ্চেন জানতে পারি কি?

'তুমি' 'আপনি'তে গিয়ে পৌঁছেচে। দূরত্ব অনেকখানিই প্রসারিত হয়েচে—কিন্তু না—আরও—আরও বিস্তৃত ক'রতে হবে এ দূরত্ব।

'আপনার-জন' যদি 'পর' হয়ে যায়, তার চেয়ে 'পর' আর কেউ হ'তে পারে না! নিকটতম ছিল যে—সে যদি দূরে সরে যায়,—তার চেয়ে সুদূর আর কিছু থাকে না।

পকেট থেকে সোনার চেন্ টেনে লকেটসুদ্ধু মেমের ফোটোটা নাড়াচাড়া করতে করতে নিম্নস্বরে বল্লুম—তোমাকে এনে ভুল করিচি। তুমি সত্যই কুমারী আছ। পার তো জীবনটাকে বদ্‌লে নিও।

এবার তার গলার স্বর অত্যন্ত কঠিন শুনাল—মেয়েদের জীবন ক্ষণে ক্ষণে ত' বদলায় না।

তার-দেওয়া এ আঘাতটুকু—নিষ্ঠুর—তীব্র মর্ম্মভেদী!...

কাশি আসচে। কাশি চাপতে গিয়ে ভয়ানক কষ্ট হ'চ্চে। আচ্ছা—যক্ষ্মায় মুখ দিয়ে এত রক্ত ওঠে—বুক ফেটে রক্ত ঝরে না কেন?...তা' হলে বোধ হয় একটু আরাম পেতুম।...

আমিনা বল্‌লে—টাকা আর কাউকে বিলিয়ে দেবেন, আমি চাইনে।

—আমি তোমার যে ক্ষতি করেচি—

—পৃথিবীর রত্ন-ভাণ্ডার তা' পূরণ করতে পারে কি?—চুপ করে রইলুম।

ঘৃণা-ভরা দৃষ্টি নিয়ে আমার হাতের লকেটের ছবিটার পানে একটিবার তাকিয়ে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

বাইরে পোষা ময়ূরটা কর্কশস্বরে চীৎকার করে' উঠ্‌লো। ময়ূর নয়নের আনন্দদায়ক, কিন্তু শ্রবণের নয়। কোকিল শ্রবণের আনন্দ-সিঞ্চক, কিন্তু নয়নের নয়। কে বেশী মনোরম? কুহু না কেকা?...শ্রবণের তৃপ্তি বেশী সুখের,—না নয়নের তৃপ্তি বেশী সুখেব?...কে জানে? জীবনটা সত্য—না মরণটা সত্য?

মানুষের বাইরেটাই সব,—না—ভিতরটাই সব?...

ভোগ বড় না ত্যাগ বড়?

নানারকম অদ্ভুত প্রশ্ন মাথার ভিতরে জাগচে,—মাথাটা গুলিয়ে যাচ্চে যেন।...

রাত্রি অনেক হযেচে। অশ্রান্ত একসুরে বৃষ্টি ঝরচে। বিছানায় শুয়ে শুযে আজ ভারি কষ্ট হচ্ছে। জ্বরও বেড়েচে। দাদী ঘরের মেঝেয় গাল্‌চের উপরে চাদর মুড়ি দিয়ে অগাধে ঘুমুচ্চে। আমিনা বাপের বাড়ী চলে গেচে অনেকদিন! আর বোধ হয় এ জীবনে তাকে দেখতে পাব না।

যথা-সর্ব্বস্ব উইল্ করে তারই নামে উৎসর্গ করে রেখেচি।

শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে শুধু আমিনাকেই ভাবতে ভালো লাগচে। তার সেই সুন্দর মুখখানি! এই দেড় মাসের মধ্যেই,—আহা! বেচারা কি রোগা আর নিষ্প্রভই হয়ে গেছে!...

প্রাণটার ভেতর আকুলি ব্যাকুলি ক'রচে শুধু এই কথাটি একটিবার তাকে জানাবার জন্য—'ভালবাসি'! সে যদি আমায় ভাল-না-বাসে আব,—সে যদি আমাব প্রেমে প্রত্যাখ্যান করে— তা' হ'লে এই শেষ বাসনাটা পূর্ণ কবে নিতুম—কিন্তু —সে যদি এখনি প্রতিদান দিতে চায়?...না—না—এই-ই ভালো—এই ভালো।

ঝম্‌-ঝম ঝম্—ঝুপ-ঝুপ—বৃষ্টির আর বিরাম নেই। এস হে গোপনে—আমার স্বপন-লোকে দিশাহারা—ওগো ধীরে—মৃদুতর চরণপাতে—সঙ্গোপনে এসো —হে আমার মৃত্যু! ওগো অন্ধকারের অন্তরধন! এবার সকল পরাণ-মন ছাপিয়ে নেমে এস তুমি। আর আলো আসবে না—আর আলোর প্রয়োজন নেই। আমি চাইনে—আমি চাইনে —চাইনে তপন চাইনে তারা—

যক্ষ্মারোগী শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচতে চায়। বাঁচবার এই ঐকান্তিক প্রবল আকাঙ্ক্ষাই তার মৃত্যু-যাতনা।

—ওগো, বাঁচবার ব্যাকুলতাই হ'ল আজ মরণের আবেগ!...অদৃষ্টের কী পরিহাস!

কিন্তু ওগো রহস্য-ঢাকা অদৃষ্ট! এ তো আমিই তোমায় পরিহাস ক'রলুম। আমি আপন হাতে সমস্ত বাতি নিভিয়ে দিয়েচি। আমার বাতি তোমাকে নেভাতে দিইনি; —আমি বিজয়ী!...

কিন্তু তবুও সে আজ নতজানু হ'য়ে দু'হাত বাড়িয়ে ডাকচে তোমায়—এসো, এসো তুমি বন্ধু—এইবার নিবিড়তর রূপে—তোমার গাঢ় ছায়াখানি টেনে দাও আমার বুকের উপর—মুখের উপর!

টুপ্—টাপ—টুপ,—ফিস্ ফিস্—ফিস্—নিশুতি-রাত্রির সাথে বৃষ্টিধারার এ কি গোপন-আলাপ চলেচে গো—

ওরা স্পষ্ট ক'রে চেঁচিয়ে কথা বলুক না।

নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করে' পরম সত্যকে ঢেকে রেখে ওরা ব্যাকুল কান্না কাঁদ্‌চে কা'র জন্য?...

—ওগো অন্ধকার-রাত্রি! একটিবার তুমি তীব্র তড়িৎ-আলোকে ক্ষণ-প্রকাশিত হও। শুধু একটিবার মাত্র—ক্ষণকাল তরে জানতে দাও—তোমার নিবিড় নিকষ আঁধার যবনিকাব আড়ালে—প্রকৃতির কত বর্ণ গন্ধ হাসি কাননে কান্তারে জেগে রয়েচে—অন্ধকারটা শুধু আবরণ মাত্র।

এই দুর্য্যোগ-ঘন-নিশীথিনী অন্ধকারটাই তার সব কিছু নয়, এ কথা কেউ বিশ্বাস কববে কি?...ওগো আকাশ! একবার— শুধু একবার—তোমার বিদ্যুৎ-শিখা জ্বেলে পরম সত্যকে উদ্ভাসিত করে তোল।

...তারপর? তারপর আবার অন্ধকার দ্বিগুণতর হয়ে জমে যাক্—আকাশের বুকফাটা কান্না আরও ফুঁপিয়ে ঝরতে থাকুক্—ভিজে-হাওয়া নিরুপায় সর্ব্বনাশেব বেদনায় আত্মহারা হয়ে, ঘরে-ঘরে রুদ্ধ-বাতায়নে ব্যর্থ ক্ষোভে আছড়ে পড়ুক—হুহু—হুহু—

উত্তরা, আষাঢ় ১৩৩৪

'অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে'

১

দুপুরবেলা আহারান্তে বাহিরের দালানে একখানি ডেক্-চেয়ারে বসিয়া প্রভাত অন্যমনস্কভাবে কত কি ভাবিতেছিল।

প্রায় একমাস সে ওয়ালটেয়ারে তার বন্ধু সুধীরদের বাড়ি আসিয়াছে। সুধীরের স্ত্রী কমলা ও বৌদি সুহাসিনী দেবীর সহিত এই ক'দিনেই তার নিজের বৌদিদিদের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা পুঞ্জীভূত হইয়াছে,—সুধীরের জ্যাঠামশাই শরৎবাবু তো তাকে নিজের সন্তানের ন্যায়ই স্নেহ করেন! বিচিত্র লাগে তার শুধু—সুধীরের ছোটবোন সুধাকে। সুধাকে সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

এই সুন্দরী তন্বী তরুণী মেয়েটিব পরিশ্রমের ক্ষমতা অসাধারণ। সেবা-নৈপুণ্যও অদ্ভুত। বৃদ্ধ জ্যাঠামশাইকে সে যেন কোলের শিশুর মতো সদা সর্বদা শুশ্রূষা ও যত্ন দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে! দিনেব মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তার জ্যাঠামশায়ের নিকটেই কাটে,— কিন্তু তবুও বাড়ির এমন একটি লোকও নাই, যে সুধার হস্তের গভীর যত্ন ও সুমিষ্ট সেবা না পাইতেছে!

প্রভাতকেও সুধা খুবই যত্ন করে,—হাস্য-পরিহাসে গল্পে-গানের মূর্তিমতী সেবা ও আনন্দস্বরূপিণী হইয়া বাড়ির প্রত্যেকজনের মনের গভীর অন্তস্তলটুকু পর্যন্ত সে অধিকার করিয়াছে।

প্রভাত আজ একান্তে বসিয়া সুধারই কথা ভাবিতেছিল। খানিকটা নীলবঙের পশম হাতে ঘুরাইয়া গোলা পাকাইতে পাকাইতে সুধা দালানে বাহিব হইয়া আসিয়া, প্রভাতের পানে তাকাইয়া হাসিমুখে বলিল—'প্রভাতবাবু। আকাশের পানে চেয়ে কি ভাবছেন? বাড়ির লোকদের জন্য মন কেমন করছে বুঝি? কিন্তু আমরা তো আপনাকে এখন ছাড়ব না।— আপনার কাছে আমাদের একটা আর্জি আছে যে—'

প্রভাত চেয়ারে ভালো করিয়া উঠিযা বসিয়া সহাস্যে বলিল—'আর্জি কেন, আদেশ বলুন!'

সুধা হাসিয়া বলিল— 'যা আপনার অভিরুচি! কিন্তু আমাদের কথা রাখবেন কিনা আগে বলুন?'

'অবশ্যই রাখব।'

'বৌদিরা সীমাচলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। আপনি নিয়ে যেতে পারবেন কি?'

'হ্যাঁ। এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব।'

'প্রস্তাব তো উত্তম, কিন্তু ছোড়দা বলছে, দু'সপ্তাহ পরে যেতে। কিন্তু বৌদি, ছোটবৌদি দুজনেই আজ-কালের মধ্যে যেতে চায়।'

'জ্যাঠামশাই কি বলেন?'

'তাঁকে রাজী করার-ভার আমার।'

'সুধীর কোথায়?'

'ঐ তো মজা! বৌদিরা ছোড়দার সঙ্গে ঝগড়া করে আপনাকে মুরুব্বি ধরেছেন! আমাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন। আচ্ছা বসুন, বৌদিদের ডেকে আনি।'

সুধা স্মিতমুখে হাতের অবশিষ্ট পশমটুকু দ্রুত হাত ঘুরাইয়া জড়াইতে জড়াইতে চলিয়া গেল।

প্রভাত মুগ্ধনেত্রে সেইদিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—সুধা এখানকার সকল আমোদ-প্রমোদ আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে আছে তাই যেন এই পরিবারের আনন্দ এত মধুর! কিন্তু এই হাসিখুশি গান-গল্পের মধ্য দিয়া সুধাকে এত নিকটে পাওয়া গেলেও প্রভাতের কাছে সে যেন অনেকখানি সুদূর।

অল্পক্ষণ পবেই কমলা ও সুহাসিনীকে লইয়া সুধা ফিরিয়া আসিল। প্রভাত বলিল —'বৌদি! সত্যই সীমাচলে যাওয়া হবে না কি?'

বৌদি বলিলেন— 'সে আপনাদের অনুগ্রহ।'

কমলা বলিয়া উঠিল—'বহুবচনে নয় দিদি, একবচনে বলো।...ওঁকে তো আমরা ঝগড়া করে বাদই দিয়েছি,— প্রভাতবাবুই এখন আমাদের সীমাচলে নিয়ে যাওয়ার মুরুব্বি।'

প্রভাত হাসিয়া বলিল— 'কিন্তু আমার বন্ধু ব্যতীত আমি যে অচল!'

বৌদি বলিলেন— 'শেষ রাত্রে বগুির বন্দোবস্ত করতে হবে, তাহলে ভোরবেলাই সীমাচলের নীচে পৌঁছানো যাবে। উপরে উঠে পুজো-টুজো দিয়ে—দেখে-শুনে সেইদিনই সন্ধ্যায় বাড়ি ফিবব।'

'তা বন্দোবস্ত তো বেশ করেছেন, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার কি হবে?'

সুধা বলিল— 'ইক্‌মিক্ আর স্টোভ নেবো নাকি, বৌদি?'

বৌদি বলিলেন—'না, সেখানে বেশ ভালো খিচুড়ি ভোগ কিনতে পাওয়া যায়। চায়ের সরঞ্জাম, স্টোভ আর খান দুই পাঁউরুটি নিলেই ঢের হবে।'

রাত্রি প্রায তিনটা হইতে সকলে জাগিয়া বাহিরের দালানে প্রস্তুত হইয়া বগুির অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সুধীর ও প্রভাত দুইখানা ক্যাম্বিসেব চেয়ারে অর্ধশযান অবস্থায় বসিয়াছিল। কমলা ও বৌদি একখানি বড় চৌকির উপরে বসিয়া আছে। সুধা সিঁড়ির চাতালের পাশে উঁচু বেদীর নিকট পা ঝুলাইয়া বসিযা চন্দ্রালোকসিক্ত শুক্লা চতুর্দশীর জোযাব-উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের পানে তাকাইয়া ছিল।

প্রভাত, সুধীর, বৌদি ও কমলা চারজনের মৃদু গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে জ্যাঠামহাশয়ের কাশির শব্দ আসিতেছে। উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে সসাগরা নৈশপ্রকৃতিব কালো নারিকেলকুঞ্জগুলি স্বপ্নময় হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রের গর্জন ঝরনার প্রপাতধ্বনির মতো, দূরাগত সঙ্গীত-সুরের মতো, গভীর মধুর

মন্ত্রে নিশীথাকাশ ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ।

কমলা অধীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'এখনো চারটে বাজল না? নিশ্চয়ই ঘড়ি খারাপ। জ্যোৎস্নাতে ভোরের আলো বোঝা যাচ্ছে না, বোধ হয়।'

সুধীর গম্ভীরভাবে বলিল—'ঘড়িটাতে কাঁটা ঘুরিয়ে এখুনি সকাল করে দিতে পারি,—কিন্তু চাঁদটাকে ধাক্কা দিয়ে আকাশ থেকে সরিয়ে দিই কি করে?'

সুহাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—'কিন্তু এই হতভাগা চাঁদই আবার এক-একদিন চোখের নিমিষে কোথা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে এক নিমেষে ভোর এনে দেয়,—সেও কমলই সবচেয়ে ভালো জানে।'

সুধীর বলিল—'ঠিক বলেছ, বৌদি! চাঁদেব "ডিউটি" ফাঁকি দেওয়া সম্বন্ধে কমলকে অভিযোগ করতে আমিও শুনেছি বলে মনে পড়ছে!'

কমলা রাগিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সুধীর, কমলা ও সুহাসিনীর মধ্যে একটা কপট কলহ বেশ জমিয়া উঠিল। প্রভাত অর্ধশায়িতাবস্থায় ইহাদেব মধুর কলহ উপভোগ করিতে করিতে তন্দ্রাবেশে চক্ষু মুদিত করিতেছিল।

কমলা রাগ কবিয়া চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে সুধীরও কুপিতা কমলার অনুসরণ করিল। বৌদি ঢুলিতে ঢুলিতে চৌকির একপাশে বাহুতে মাথা রাখিয়া গাঢ় নিদ্রামগ্না হইলেন।

মশক-দংশনে তন্দ্রাটুকু হঠাৎ ছুটিয়া যাওয়ায় প্রভাত সচকিতে চক্ষু মেলিতেই চোখে পড়িল,—অদূরে সিঁড়ির বেদীতে উপবিষ্টা সুধাব দুইটি নির্ণিমেষ তৃষিত আঁখি। শুকতারার মতো উজ্জ্বল, সাগরেরই মতো অতল গভীব দৃষ্টিটুকু প্রভাতের নিদ্রিত মুখের উপর ঘন-নিবদ্ধ হইয়াছিল! প্রভাত সচকিতে উঠিয়া বসিতেই সুধা অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। প্রভাত কিন্তু নিস্তব্ধ চঞ্চল নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

এ ব্যাপার আজ নূতন নয়। সে আরো অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে, সুধা তাহাকে দেখিতে ভালোবাসে। সুধা গল্প করিতে করিতে প্রভাতের মুখের পানে তাকাইয়া হঠাৎ কথার খেই হারাইয়া ফেলিয়া অতিরিক্ত অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে! কিন্তু আজ রাত্রির এই চুরি করিয়া দেখা প্রভাতকে যেন হঠাৎ বিহ্বল করিয়া ফেলিল।

সুধা কিন্তু ব্যাপারটিকে মুহূর্ত-মধ্যে সহজ করিয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—'প্রভাতবাবু! আপনারা সকলেই বেশ একটু করে ঘুমিয়ে নিলেন দেখলুম, আমিই কেবল একা জেগে রয়েছি—'

শান্তপ্রকৃতি প্রভাত কোনোদিন সুধাকে বড় একটা পরিহাস করিত না,— কমলা ও সুহাসিনীকে লইয়া ভ্রাতৃজায়া সম্পর্কে তাহার যৎসামান্য রঙ্গ পরিহাস চলিত। আজ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—'ঘুমহারা সুধাংশুর সাথী হয়ে জেগে থাকা সুধাদেবীরই কাজ; আমাদের নয়।'—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া পরমুহূর্তে প্রভাত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল।

সুধা আরক্তিম হইয়া উঠিয়া—তখনই কিন্তু সহজভাবে হাসিয়া বলিল—'তাহলে সকাল হলেই আমাদের লুকিয়ে পড়া উচিত। যেহেতু প্রভাতের সঙ্গী প্রভাতবাবুরই হওয়া সমীচীন।'

সুধা এত সহজ পরিহাসের সুরে কথাগুলি বলিল যে—প্রভাত সঙ্কোচ হইতে অনেকটা যেন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিল। হাসিয়া উত্তর দিল—'হার মানলুম!'

দুইখানি বণ্ডি-গাড়ি আসিয়া গেটের বাহিরে দাঁড়াইল। সুধীর ও কমলা বাহির হইয়া আসিল। শরৎবাবু বাহিরের দিকের জানালা খুলিয়া বিছানার উপর হইতে চাদর মুড়ি দিয়া উঁকি মারিয়া বলিতে লাগিলেন—'সন্ধ্যার মধ্যে ফিরো—বেশি রাত করো না যেন— সুধা, তুই গায়ে একখানা র‍্যাপার নিলি নে কেন মা? শেষরাত্রির ঠাণ্ডা —প্রভাত, ছাতা নিয়েছ তো?'— ইত্যাদি। জ্যাঠামহাশয়ের প্রত্যেক কথার উত্তরে সংক্ষিপ্ত 'আজ্ঞে হ্যাঁ' বলিয়া সকলে গাড়িতে উঠিল।

সুধা জ্যাঠামশায়ের ঘরে বিছানার পাশে গিয়া ক্ষুণ্ন স্বরে বলিল—'আপনাকে রেখে গিয়ে একটুও স্বস্তি পাবো না, জ্যাঠামশাই!—এত করে বললুম "আমি থাকি" — আপনারা কেউই তা শুনলেন না!'

'—না রে না পাগলি! তা কি হয়? তুই থাকলে বৌমারা যাবে কেন? আমি বেশ থাকব, তুই তো আমার সবই গুছিয়ে রেখে গেলি বে!— ঠাকুর রইল, দাই রইল, বিশুয়া রইল, আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না।'

নিশা-শেষের বিবর্ণ জ্যোৎস্নাধারায় পর্বতশ্রেণী এবং বনানীপ্রদেশ যেন কোনো রূপকথার রুপাব কাঠি ছোঁয়ানো ঘুমন্ত পরীরাজ্যের ন্যায় দেখাইতেছিল। নিষ্প্রভ আকাশে এক একটা মরণোম্মুখী তারা দপদপ করিযা তখনও শেষ দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া লইতেছিল।

শহরের রাস্তা ছাড়াইয়া সুধাদের বণ্ডি দুইখানি গ্রামের পথে আসিয়া পড়িয়াছে। পথের ডানপাশে কালোরঙের পাহাড়! ঘন বন্যবৃক্ষ ও পার্বত্য লতা-গুল্মে পর্বতগাত্র সমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে। শুক্লা নিশি-শেষে নিদ্রিতা পার্বত্য প্রকৃতির মৌন, শান্ত শোভায় সকলেরই চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। সুধা ও কমলা পথিপার্শ্বের অচেনা পার্বত্য ফুলের গাছ হইতে ফুল সংগ্রহের ছলে বণ্ডি হইতে নামিয়া আনন্দ কলহাস্যে হাঁটিতে হাঁটিতে চলিল।

সুধীর অন্য গাড়ি হইতে মুখ বাহির করিয়া ধমক দিয়া বলিল—'এই সুধা! ফুল তুলতে যাসনি! সাপ-টাপ আছে হয়তো। গাড়িতে ওঠ তোরা—'

কমলা দুষ্ট শিশুর মতো চপল হাসিয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—'আমরা গাড়িতে উঠব না—হাঁটব।'

সুধা হাসিতে হাসিতে বলিল— 'দোহাই ছোড়দা! ভগবানের দেওয়া পা নামক

অঙ্গটির চলৎশক্তিরূপ গুণ আছে, সেটা একদিনের জন্যও আমাদের ভালো করে জানতে দাও, ভাই! সাপকে ভয় করে কি ওই গাড়ির গহ্বরে বন্দী হয়ে যেতে হবে?'

সুহাসিনী এ-গাড়ি হইতে বলিলেন—'হাঁটার মজা বেরুবে! হাজার ধাপ সিঁড়ি উঠতে-নামতে হবে— মনে থাকে যেন! গাড়ির ভিতরে উঠে আয় বলছি—'

সুধা অকারণ হাস্যে কুটি-কুটি হইয়া বালিকার ন্যায় কৌতুকতরলকণ্ঠে কহিল—'ছোটবৌদি! তুমি গাড়িতে ওঠো— জল্‌দি—', তাহার পর গুজরাটি গরবা'র সুরে সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইল—

—পারব না একলাটি আজ ঘরে পারব না রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে!
নিরালার কোল ভরা ফুল জাগে আলো-করা
যেচে কাব খুনসুড়ি সইতে!
অথই পাথার পারা জ্যোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।*

প্রভাত গাড়ি হইতে মুখ বাহির কবিয়া বলিল—'ছোটবৌদি! রাস্তা এখনো অনেক বাকি। এখন থেকেই যদি আপনারা হাঁটতে শুরু কবেন, তাহলে সীমাচলের নীচে থেকেই ফিরে আসতে হবে। উঠতে আর পারবেন না।'

সুধা প্রভাতের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিযা বলিল—'আপনারা নিজেরা পুরুষ-মানুষ হয়ে গাড়ি চড়ে যাচ্ছেন, আর আমরা মেয়েমানুষ হাঁটছি, তাই লজ্জা করছে বুঝি?'

প্রভাত এবার গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। সুধীরও নামিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিযা সুধা কমলার হাত ধরিয়া নিজেদের বণ্ডিতে উঠিয়া পড়িল এবং খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—'আপনারা যা করবেন, আমরা ঠিক তার উল্‌টো কবব। প্রভাতবাবু! আপনারা দুজনে হাঁটুন এইবার!'

সুধীব অবতরণোদ্যত পা গাড়ির মধ্যে টানিয়া লইযা হাসিতে হাসিতে বলিল—'প্রভাত! উঠে আয়, শয়তানদুটোর সঙ্গে পেরে উঠবিনে।'

সুধা বণ্ডির মধ্যে বসিয়া বলদের গলার ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজের মধ্যে আবার মিষ্ট কণ্ঠে গর্‌বা গাহিতে শুরু করিল—

চলল রে দখিণার হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ!
কোন্ বনে চন্দন — কোন বনে গন্ধ!

প্রাচীপট আরক্তিম হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গমের মধুব কলকূজনে পার্বত্য-প্রকৃতি মুখরিত হইয়া উঠিল। বণ্ডি দুইখানি যে পথে অগ্রসর হইতেছিল, সে পথটি পাহাড় ঘুরিয়া অপর পার্শ্বে চলিয়া গিয়াছে। পাহাড় ঘুরিযা গাড়ি দুইখানি সীমাচল

* কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত গুজরাটি গববা সুবের গান।

গ্রামে উপস্থিত হইল। গ্রামখানি অতি সুন্দর — পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছবির মতো। দুইটি-একটি করিয়া লোক জাগিতে শুরু হইয়াছে। গাড়ি গিয়া একবারে সীমাচল পাহাড়ের পাদদেশে থামিল।

একটি তেলেগু তরুণের শিরে জিনিসপত্রগুলি তুলিয়া দিয়া প্রভাতরা সিঁড়িতে উঠিতে শুরু করিয়া দিল। এই সোপান বাহিয়া সীমাচলের উপরে উঠিবার সময়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। প্রভাত ক্যামেরা লইয়াছিল — মধ্যে মধ্যে সোপানের উপরে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটো তুলিয়া লইতে লাগিল।

সুধা ও কমলা সিঁড়ির দুই পাশে জঙ্গলে হাত বাড়াইয়া ফুল তুলিতেছিল, —গান গাহিয়া, ভিখারীদের পয়সা দিয়া, পর্বতগাত্রে প্রবাহিতা ক্ষীণস্রোতা নির্ঝরিণীর মধ্যে ঢিল নিক্ষেপ করিযা, হাস্য পরিহাসে কৌতুকে মুখরা ছোট বালিকার মতো মহা উৎসাহে অবলীলাক্রমে দ্রুত উঠিতে লাগিল।

সুধীর তরুণী পত্নী ও ভগিনীর সহিত সিঁড়ি ওঠার পাল্লা দিল। তিনজনের কলহাস্যে ও কৌতুকালাপে নির্জন অবণ্য-প্রকৃতি মুখর হইয়া উঠিল। বিভিন্ন দেশীয় যাত্রীগণ পাহাড়ে উঠিতেছিল। সকলেই কৌতুকোজ্জ্বল নেত্রে এই তরুণ-সম্প্রদাযের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অপেক্ষাকৃতা স্থূলকায়া বৌদিদি ধীবে ধীরে সিঁড়ি উঠিয়াও অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়া পড়িতেছিলেন! প্রভাত বৌদিদির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে উঠিতেছিল।

সুধা উপর হইতে পিছন ফিরিয়া নীচের দিকে তাকাইয়া বলিল—'ওমা, বৌদি আর প্রভাতবাবু যে একেবারে নীচে পেছিয়ে পড়েছেন! ছোটবৌদি! এসো এইখানে আমরা একটু ওঁদের জন্য দাঁড়াই!'

সিঁড়ির উপরে মাঝে মাঝে পাথরেব দেব-দেবীর মূর্তি আছে। একটা অর্ধভগ্ন সিন্দূর-প্রলিপ্ত দেবমূর্তির পাশে পাথরের উপর বসিয়া পডিয়া সুধীর বলিল—'সুধা, এইবাব এইখানে একটু চা তৈরি কর, দিদি।'

কমলা বলিল—'এখানে দেবমূর্তির কাছে চা খাওয়া হবে না, আরও একটু উঁচুতে চলো—'

আরও ধাপ-কতক সিঁড়ি উঠিয়া সিঁড়ির একপাশে গাছের ছায়ায় বসিয়া সুধা তেলেগু বাহকেব মাথা হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া স্টোভ জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিল। বৌদি তখনো অনেক দূরে। তিনি বিশ-ত্রিশ ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া খানিকটা করিয়া বসিয়া জিরাইয়া লইতেছিলেন। প্রভাতবাবুও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধীরপদে উঠিতেছিলেন। কমলা হাসিয়া লুটাইয়া পডিয়া বলিল— 'সুধা! দিদির সঙ্গে প্রভাতবাবুর সুদ্ধ দুরবস্থা দেখ—'

সুধীর উপর হইতে হাঁকিল— 'কি বৌদি, কপিকল নামিয়ে টেনে তুলব না-কি?'

প্রভাত ও বৌদি আসিয়া পৌছিলে সুধা বলিল— 'বৌদি, তুমি একটু চা খাও ভাই!

নইলে তুমি মারা যাবে, এর মধ্যেই তোমার মুখ-চোখ যেন কেমন হয়ে গেছে—'

'না রে, না। তোরা সব ছেলেমানুষ, তোরা খা। আমি নৃসিংহদেবকে দর্শন করে, পুজো দিয়ে, তারপবে জল খাব।'

সুধীর বলিল, 'বৌদি, তোমার হয়ে আমি না হয় উপোস করছি! চা না খাও, কিছু জল-টলও খাও, নইলে উঠতে পারবে না।'

'আচ্ছা গো মশাই, উঠতে পারব কি না, তোমায় তত ভাবতে হবে না।'

সুধা নিপুণ হস্তে কেট্‌লিতে সুগন্ধি চা প্রস্তুত করিয়া পেয়ালা পিরিচগুলি ধুইয়া ফরসা ন্যাপকিনে ঝক্‌ঝকে করিয়া মুছিয়া— পেয়ালায় চা ঢালিয়া দুধ-চিনি মিশ্রিত করিয়া সুধীর, প্রভাত ও কমলার হাতে তুলিয়া দিল। তাহার পর ক্ষিপ্রহস্তে পাঁউরুটি কাটিয়া স্লাইসগুলি মাখম মাখাইয়া স্টোভে টোস্ট করিয়া গবম গরম প্রত্যেকের প্লেটে দিল।

প্রভাত একটু ইতস্তত করিয়া সুধাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল— 'আপনিও এক কাপ চা নিলেন না কেন? জুড়িয়ে যাবে।'

সুধীর বলিল— 'ও চা খায় না।'

সুন্দব বাসন্তী রঙের জেলি চামচে কবিযা ডিশেব উপব দিযা সুধা সন্দেশপূর্ণ অ্যালুমিনিযমের কৌটা খুলিতে খুলিতে বলিল—'প্রভাতবাবু। জেলিটা কিসের তৈরি বলতে পাবেন?'

প্রভাত রুটিতে কামড় দিযা বলিল—'ফলের।'

'জেলি ফল ভিন্ন অন্য কিছুর হয় না, কিন্তু কি ফল বলুন?'

'তা ঠিক বলতে পারছিনে। ঘরে তৈরি নাকি? চমৎকার টেস্ট কিন্তু!'

'উহুঁ, কেনা।'

'বেশ সুন্দর তো। আগে এমন খাইনি। বঙটিও বেশ।'

কমলা হাসিয়া বলিল—'সুধা তৈবি করেছে। আনারসের জেলি, তাই রঙ অমন সুন্দব হয়েছে।'

প্রভাত এ-কথা শুনিয়া যেন অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল,—'বলেন কি? উনি হাতে তৈরি করেছেন? ভারি চমৎকার হয়েছে তো!'

সুধা অপ্রস্তুত হইয়া উঠিল। প্রভাতের বিস্মিত প্রশংসা ঢাকা দিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—'ছোড়দা, আর দু'স্লাইস রুটি নেবে? সন্দেশ আর চাই?'

সুধীর বলিল—'আমরা যথেষ্ট খেয়েছি, এইবার তুই নিজে কিছু খা দেখি।'

— 'খাব অখন। এখন ক্ষিধে পায়নি।'

কমলা নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিল। সুধা কমলার পীড়াপীড়িতে একটা সন্দেশ খাইয়া জল খাইল।

আবার সিঁড়ি ওঠা শুরু হইল। উপরে উঠিতে 'হনুমান-তোরণে'র পার্শ্ব দিয়া,

'আকাশগঙ্গা'র প্রপাত বিপুল বেগে পাথরের উপরে আছড়াইয়া পড়িতেছিল ও সেই জল সোপানশ্রেণী প্লাবিত করিয়া বহিয়া যাইতেছিল। এখানকার পিচ্ছিল সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিতে করিতে সাবধানতা সত্ত্বেও কমলা সজোরে আছাড় খাইল।

হাসির অট্টরোলের মধ্যে সকলে উপরে পৌঁছিল। ছত্রের মধ্যে একখানি ঘরে জিনিসপত্র রাখিয়া বিশ্রাম করিতে বসিলে, সুধা স্নানের তেলের শিশি হইতে অল্প তেল লইয়া কমলার আঘাতপ্রাপ্ত পায়ে জোরে মালিশ করিয়া দিতে লাগিল। তাহার পর সকলে মিলিয়া মহানন্দে 'গঙ্গাধারা' নামক সুন্দর প্রপাতটিতে স্নানসমাপনান্তে সিংহাচলের নৃসিংহদেবের মূর্তি দর্শন করিয়া ও পূজা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচিত্র শিল্প-কারুপূর্ণ মন্দিরগুলি এবং অসংখ্য দেবদেবীর সঙ্গে রম্ভা, মেনকা, উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরার প্রস্তরময়ী মূর্তিগুলি পর্যন্ত দর্শন করিয়া ফিরিলেন। ফিরিবার পথে পূজারী ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত অর্থ দক্ষিণা দিয়া নৃসিংহদেবের উৎকৃষ্ট খিচুড়ি ভোগ সংগ্রহপূর্বক ছত্রে আহারে বসিলেন।

সুধা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল,—'ইক্‌মিক্‌টা আনলেই বেশ হতো, ঐ খিচুড়ি খেয়ে তোমাদের অসুখ-বিসুখ না করলে বাঁচি।'

বৌদি স্নানান্তে দেবতাদের পূজা দিয়া এখন একবাবেই ক্লান্তিতে অবসন্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি শ্রান্তকণ্ঠে বলিলেন—'সুধা, তুই এখন আর অত হাঙ্গামা তুলিসনে বোন,— ওদের খেতে দে।'

বড় বড় পদ্মপাতায় করিয়া গরম গরম খিচুড়ি সুধা প্রত্যেককে বণ্টন করিয়া দিল, পাতিলেবু, লবণ, কাঁচালঙ্কা, চাটনি ও আচার বাহিব করিয়া প্রত্যেকেব পাতে দিয়া স্টোভে পাঁপড় এবং বড়ি ভাজিতে বসিল।

সুধীর সবিস্ময়ে বলিল—'এ কি? তুই আচার, কাঁচালঙ্কা, বড়ি, পাঁপড় পর্যন্ত সঙ্গে এনেছিলি নাকি রে?'

সুধা বলিল—'যখন শুনলুম, খিচুড়ি ভোগ কিনে খাওয়াব ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন বুঝলাম, খিচুড়ির আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি না নিলে কেউই তোমরা ভালো করে খেতে পারবে না! তাই সব জোগাড় করে বেতের বাক্সটাব মধ্যে পুরে নিয়েছিলুম। বৌদি জানতে পারলে অযাত্রা বলে বড়ি-আচার এসব নিতে চাইতেন না।'

প্রভাত পরম তৃপ্তির সহিত কুড়কুড় করিয়া পাঁপড়ভাজা চিবাইতে চিবাইতে বলিল—'বড়ি পাঁপড় ও আচারের মধ্যে যে কি অপূর্ব সুস্বাদ আছে— তা এই সিংহাচলম্ পাহাড়ের উপরে পদ্মপাতায় খিচুড়িভোগের সঙ্গে এরকমভাবে না খেলে বোধ হয় জীবনেও এই অপূর্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যেত না।'

সুধীর গম্ভীর মুখে বলিল—'যে-স্থলে যে-জিনিস যত দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য, সে-স্থানে সেই জিনিসটি অতি তুচ্ছ হলেও মহা মূল্যবান এবং লোভনীয়।'

সকলের আহারাদি শেষ হইলে সুধা খানিকটা শুকনো কাপড় গরম করিয়া বৌদির পায়ে ও কোমরে সেক্‌ দিয়া আবার সরিষার তেল ডলিতে বসিল। কমলা

প্রথমটা অসম্মতা হইলেও শেষে সুধার জিদে পরাভূতা হইয়া চুপ করিলেন।

সুধা বলিল—'এখুনি আবার নীচে নামতে হবে তো? আছাড় খাওয়া পা দুটোকে একটু তাজা করে না নিলে ওরা আজ আর তোমাকে নীচে পৌছে দিতে রাজি হবে না, মনে থাকে যেন।'

সুধীর একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের উপরে বসিয়া দেয়ালে পিঠ দিয়া আরাম করিয়া সিগারেট টানিতেছিল। বলিল—'সুধা, আমারও পায়ে একটু তেল দিয়ে দিবি তো?'

'ঈস! বয়ে গেছে! ছোটবৌদি দিক না—'

'আহা! তোর ছোটবৌদিরই তো পায়ে তুই তেল দিচ্ছিস। সে কি আর আমার পায়ে মালিশ করবে? বরং আমাকেই হয়তো হুকুম করে বলবে'—

কমলা তর্জন করিয়া উঠিল—'মিছিমিছি আমার সঙ্গে লেগো না বলে দিচ্ছি।'

সুধা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'ব্যাটাছেলে—পায়ে দিব্যি জোর আছে— তোমাদের পায়ে অনর্থক তেল মালিশ করতে বয়ে গেছে!... নাও ওঠো, ভালো করে এবার মন্দির-টন্দির যা কিছু দেখবার আছে, দেখে শুনে — বেলাবেলি নামবার উদ্‌যোগ করো, – জ্যাঠামশাই ব্যস্ত হবেন! জ্যাঠামশাইয়ের জন্য এখানকার কোনো জিনিস একটা কিনে নিয়ে যাব ভাবছি। কিছুই তো নেবার মতো নেই! অনেক সুগন্ধ চন্দনকাঠ বিক্রি হচ্ছে,—একখণ্ড চন্দনকাঠ নেব, জ্যাঠামশাই গন্ধে খুশি হবেন।'

প্রভাত বিমুগ্ধভাবে লক্ষ্য করিতেছিল— সুধা শুধু সঙ্গীত-নিপুণা বা হাস্যরসনিপুণা নহে, তার সেবানৈপুণ্য ও যত্ন করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। অন্তরটি গভীর মমতাশীল। একটিও ভিখারি কিংবা প্রার্থী সুধার হাতের ক্ষুদ্র রেশমি থলির পয়সা হইতে বঞ্চিত হইতেছিল না। সদাসর্বদা হাস্য-পরিহাসে ব্যাপৃতা থাকিলেও তাহার হাত দুইখানি সর্বদাই প্রত্যেকের সেবাযত্ন ও প্রয়োজন পূর্ণ করিতে নিমগ্ন, মনটি সর্বক্ষণ প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছে।

নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তার লক্ষ্য খুবই কম। অথচ তাহাকে দেখিলে মোটে বুঝিবার উপায় নাই যে, মানুষটি নিজের প্রতি অত্যধিক উদাসীন! কারণ, তাহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুবিন্যস্ত বেশবাস, সদাপ্রসন্ন মুখ ও প্রফুল্ল আচরণের মধ্যে—নিজের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য যেন একটুও ধরিতে পারা যায় না।

২

সীমাচলে বেড়াইতে যাওয়ার দুই সপ্তাহ পরের কথা।

প্রভাত আগামীকল্য ওয়াল্‌টেয়ারে সুধীরদের আতিথ্য সমাপন করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবে, সেইজন্য আজ সকলে মিলিয়া ভাইজাগে 'ভ্যালি গার্ডেন' বা উপত্যকা উদ্যানে 'পিকনিক' বা বনভোজন করিতে আসিয়াছিল।

সকলে মিলিয়া মহানন্দে মাটি খুঁড়িয়া পাথর সাজাইয়া উনান প্রস্তুত করা হইল, শুষ্ক কাঠ, ডালপালা আহরণ করিয়া রান্না করা হইল। আহারান্তে একটা ঝোপের আড়ালে সুধীর কমলা প্রভাত ও সুহাসিনী চারজনে তাস খেলিতে বসিল। সুধা তাস খেলার তত অনুরাগিণী নহে, সে দূরবীণটা হাতে লইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে লাগিল।

'ভ্যালি গার্ডেনে'র ভিতরে যত কিছু দেখিবার না থাকুক, বাহিরের চাবিদিকের শোভা অতি রমণীয়। বাগানের ভিতরে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল-তরু ও অন্যান্য নানাবিধ ফল ও ফুলের গাছ। বাহিরে তিনদিকে সবুজ ও কালো পাহাড়, একদিকে 'ব্যাক্ওয়াটার বে'র কৃষ্ণাভ জলরাশি। একটি সুন্দর ঝরনা পাহাড় হইতে চপল নৃত্যে নামিযা আসিয়া 'ব্যাক্ওয়াটার বে'তে মিশিয়াছে।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম পাহাড়েব উপবে উঠিয়া নোনা গাছের মতো আকৃতি একটা অজানা গাছের ছায়ায় বসিয়া সুধা দূরবীণ দিয়া 'রস্ হিল' পাহাড়ের উপরের গির্জাটি লক্ষ্য করিতেছিল; প্রভাত ঘাসের উঁচু ঢিপিটার নীচে আসিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া কহিল—'আপনি এখানে? ওঁরা সকলে আপনাকে খুঁজছেন যে!'

সুধা চোখ হইতে দূরবীণটা নামাইয়া হাসিমুখে বলিল—'উপরে উঠে আসুন না! এখান থেকে দূরের পাহাড়েব সিনারিগুলো আর "ব্যাক্ওয়াটার বে"র জল চমৎকার দেখাচ্ছে!'

প্রভাত উপরে উঠিয়া আসিল। সুধা বলিল— 'বসুন। দূরের পাহাড়গুলো সন্ধ্যার সিঁদুর-মাখা হয়ে রাঙায়-কালোয় কি চমৎকার দেখতে হয়েছে দেখুন!'

সুধা প্রভাতের হাতে দূরবীণটা তুলিয়া দিল।

প্রভাত গাছের ছায়ায় বসিয়া চোখে দূরবীণ দিয়া দূরের দৃশ্য লক্ষ্য করিতে লাগিল।

'আচ্ছা প্রভাতবাবু! ঐ পাহাড়টার নাম ডলফিন্ নোজ কেন হলো বলতে পারেন? ওটা কি ডলফিন্ মাছের নাকের মতো দেখতে?'

প্রভাত চোখ হইতে দূরবীণ নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—' দেখে তো তা মনে হয় না। আমি ডলফিন্ মাছ দেখিনি।'

'আমিও দেখিনি কখনো।'

'ডলফিন্ নোজ' পাহাড়টি লইয়া সুধা ও প্রভাতের মধ্যে আলোচনা যখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ প্রভাত অস্ফুট আর্তনাদে চমকাইয়া উঠিল।

সুধা সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল—'কি হলো?'

'পায়ে কি যেন কামড়াল!'

মুহূর্তমধ্যে দেখা গেল, একটি উজ্জ্বল পীতাভবর্ণের অর্ধহস্ত-পরিমিত সরু সাপ দ্রুতবেগে সবুজ ঘাসের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে! প্রভাতের হাত হইতে বিদ্যুৎবেগে ছাতাটা টানিয়া লইয়া তাহারই বাঁটের দ্বারা সাপটার মাথায় উপর্যুপরি

বারকতক আঘাত করিয়া সুধা তাহার জুতা-সুদ্ধ ডান পা' টি সাপেব মাথায় সজোরে চাপিয়া ধরিল। সাপটি একটুখানি ছটফট করিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িল।

পরমুহূর্তে সুধা রুমালের কোণে বাঁধা চাবি-রিংয়ে ঝোলানো ক্ষুদ্র ছুরিখানি খুলিয়া প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায় কামড়েছে?'

প্রভাত তখন যাতনায় না হউক, ভয়ে অর্ধচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল। হাত দিয়া বাম পায়ের গোড়ালির খানিকটা উঁচুতে দেখাইয়া দিল। সুধা মুহূর্তমধ্যে সেই ছুরিখানি দিয়া দৃঢ়হস্তে সেখানটি গভীররূপে চিরিয়া দিল।

প্রভাত যাতনায় চিৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাসের উপরে এলাইয়া শুইয়া পড়িল। সুধা প্রভাতের দিকে না চাহিয়া, সেইখানেই হেঁটমুখে নতজানু হইয়া, ক্ষতস্থান হইতে রক্ত চুষিয়া ফেলিতে শুরু করিয়া দিল।

প্রভাত অস্ফুটস্বরে বলিল—'সুধা, কি সর্বনাশ করছ--আমি তো যাবই —তুমিও কেন আমার সঙ্গে মারা যাবে?'

সুধা উত্তর দিল না, ক্রমাগত রক্ত চুষিযা চুষিযা কুলকুচা করিয়া ফেলিতে লাগিল। যখন চুষিয়া আর রক্ত পাওয়া গেল না, তখন সে ক্ষিপ্রহস্তে নিজের আশমানি রঙের আলপাকা শাড়ির নিম্নাংশের পাড় সহ কাপড় লম্বা করিয়া ছিঁড়িয়া প্রভাতেব হাঁটুর নীচে হইতে বেশ সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিতে আরম্ভ কবিল।

ইতিমধ্যে বৌদি, কমলা, প্রভৃতি সকলেই তাহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধার মুখে ঘটনা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে মিলিয়া ভাইজাগের বড় হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হওয়ার বন্দোবস্ত করিল। চাকব লোকজন জিনিসপত্র সব পড়িয়া রহিল, তাহারা পরে যাইবে।

'ব্যাক্ওয়াটার বে'তে নৌকা প্রস্তুত ছিল, সকলে সত্বর গিয়া উঠিয়া বসিল। নৌকায় শায়িত প্রভাতের মাথার কাছে বসিয়া পাখা দিযা হাওয়া করিতে করিতে সুধা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল—'ভয় কি প্রভাতবাবু? আপনি অত ভয় পাবেন না, আমি বলছি, আপনার কোনো ভয় নেই।'

প্রভাত অবশহস্তে সুধার হাতখানি মুঠায় ধরিয়া অশ্রু-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল-'সুধা, এবাব যদি বেঁচে উঠি, সে কেবল তোমারই গুণে।'

সুধা সে কথায় কান না দিয়া শান্ত সংযতকণ্ঠে স্নেহপূর্ণ স্বরে প্রভাতের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—'ভয় কি? কালই আপনি উঠে হেঁটে বেড়াবেন! কাল তো আপনার কলকাতা যাওয়ার কথা!'

প্রভাত বালকের মতো ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া বলিল—'সুধা, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না,— তুমি না থাকলে আমি বাঁচব না'—

কমলা ও সুহাসিনী প্রভাতের পাশেই বসিয়াছিল, সুধীরও ছিল। সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া সুধার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিল।

সুধা একটুও লজ্জিতা বা সঙ্কুচিতা না হইয়া বরং অত্যন্ত সহজ শান্তমুখে শিশুকে

যেমন জননী প্রশান্ত-স্নেহে ভুলাইয়া থাকেন, তেমনই ভাবে প্রভাতের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল—'না না, আমি আপনাকে ছেড়ে যাব কেন? এই তো আমরা সকলেই আপনার কাছেই রয়েছি। আপনি চুপ করুন, কথা কইবেন না। আপনার কিচ্ছু ভয় নেই।'

প্রভাত সুধার হাতখানি টানিয়া নিজের বুকের উপর রাখিয়া শিশুরই মতো পরম আশ্বস্তচিত্তে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

'ব্যাক্‌ওয়াটার বে'র কালো জলে নৌকা বায়ু-তাড়নে দুলিতেছে। সন্ধ্যার সিঁদুরের মতো আকাশের রক্তিমছাযা কালো জলে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। হাওয়ায় সুধার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িল। সুধার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া প্রভাতের শিয়রের কাছে বসিয়া রহিল।

কমলা অনেকক্ষণ সুধার পানে অপলকনয়নে চাহিয়া থাকিয়া, সুহাসিনীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'সুধাব দিকে তাকিয়ে আজ আমার কেবল 'বেহুলা'র কথা মনে পড়ছে দিদি!'

সুহাসিনী একবার চকিতে প্রভাত ও সুধার পানে তাকাইয়া বলিল—'তা কি আর আমাদের ভাগ্যে ঘটবে ভাই?'

'প্রভাতবাবু যদি এ-যাত্রায় বেঁচে ওঠেন তো সে সুধারই জন্যে।'

'চুপ, আস্তে! সুধা শুনতে পাবে।'

নৌকা তীরে ভিড়িল। ভাইজাগে মেডিক্যাল কলেজ ও সিভিল হসপিটাল আছে। সুধীররা প্রভাতকে লইয়া মেডিক্যাল কলেজে উপস্থিত হইল। মৃত সর্পটিকে সঙ্গে আনা হইয়াছিল। ডাক্তার সর্পটি দেখিয়া বলিলেন—'এ যে "রিখিয়া" দেখছি! এ-দেশী সাপ, ভারী বিষাক্ত!' প্রভাতকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'তখনই গভীর কবে চিরে রক্তটা চুষে বের করে ফেলায় ও পা বেঁধে দেওয়ায় শরীরের রক্তে বিষ মোটে মিশতে পায়নি! ওষুধ দিচ্ছি, এইটে ব্যবহার করবেন। আরো খানিকটা রক্ত আমি বের করে দিচ্ছি, তাহলে আর কোনো ভয় থাকবে না। তবে হয়তো গায়ে একরকম "বিষাক্ত গরল" বেরুতে পারে। তার দরুণ গায়ের রং কালো হয়ে যেতে পারে।'

সুধাকে দেখাইয়া সুধীর বলিল—'এঁকে একবার দেখুন তো! ইনিই সে সময়ে এঁর কাছে ছিলেন এবং পা ছুরি দিয়ে কেটে রক্ত চুযে বের করে দিয়েছিলেন! এঁর তো কোনো আশঙ্কা নেই?'

প্রৌঢ় মাদ্রাজী ডাক্তার সুধাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'ইনি সদ্য সদ্য বিষটা মুখে করে টেনে নিয়েছেন, যদি জিভের লালার সঙ্গে সামান্যমাত্রও বিষ রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে, খুব সম্ভব অসুখ-বিসুখ করতে পারে। গায়ে যদি গরল হয়, রঙ একেবারে কালো হয়ে যাবে। এখন থেকে সাবধান হওয়া দরকার! ইনি বোধ হয় এঁর স্ত্রী?'

'না, ইনি আমার বোন, এখনও অবিবাহিতা, আর ইনি আমার বন্ধু।'

ডাক্তারের মুখে একটু সকৌতুক মৃদুহাস্য দেখা গেল। সুধীর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'প্রাণের আশঙ্কা আছে কিনা বলুন? আর যাতে ঐ গরলটা না হয়, তার কি কোনো উপায় করা যায় না?'

'প্রাণের আশঙ্কা আর নেই। গরলের আর কি উপায় হবে? একটা করে ইনজেকশান দিয়ে দিচ্ছি— যদি আটকাবার হয়, এতেই আটকাবে।'

প্রভাত অশ্রুবিহ্বলনেত্রে ভাবিতেছিল—সুধা আজ নিজের প্রাণের বিনিময়ে তাহাকে বাঁচাইতে গিয়াছিল। হয়তো প্রভাতের জীবনের মূল্যস্বরূপ তাহাকে তাহার তরুণ স্বাস্থ্য ও নবোদিত ঊষার ন্যায় স্নিগ্ধ কান্তি বিসর্জন দিতে হইবে। কিন্তু এই বেদনা, ক্ষোভ ও দুঃখের মধ্যেও আজ তাহার গোপন মর্মতারে কি যেন এক আনন্দ-ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিতেছিল— সুধা তাহাকে ভালোবাসে! তাহার কাছে সুধার সম্বন্ধে সংশয়ের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

৩

সেদিন ভাইজাগ হসপিটাল হইতে বাড়ি ফিরিয়া রাত্রিতেই সুধার খুব জ্বর আসিয়াছিল। প্রায় দুই সপ্তাহ ভুগিয়া কাল সে অন্নপথ্য করিয়াছে। কিন্তু আশঙ্কার কথা — সুধার সর্বাঙ্গে গরলের মতো ক্ষতচিহ্ন দেখা দিয়াছে এবং তাহার কনকচাঁপার মতো গৌরবর্ণও দ্রুত মলিন হইয়া আসিতেছে!

এই দুই সপ্তাহ সুধাকে লইয়া জ্যাঠামশায় হইতে আরম্ভ করিয়া, সুধীর, প্রভাত, কমলা, সুহাসিনী সকলেই সর্বক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। প্রভাত এখনও কলিকাতা ফিরে নাই। সুধা গায়ে একটু বল পাইলে সকলে মিলিয়া একত্রে ফিরিবে, ঠিক হইয়াছে।

সুধা আজ ঘর হইতে বাহির হইয়া বাহিরের দিকেব দালানে ঈজি-চেয়ারের উপরে বিছানা পাতিয়া বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়াছিল। এখনও সে নিজে হাঁটিতে গেলে টলিয়া পড়িয়া যায়, এত দুর্বল! সুধীর ও প্রভাত তাহাকে ঈজি-চেয়ারে শোয়াইয়া চেয়ারসুদ্ধ বাহিরে লইয়া আসিয়াছে।

কমলা ও সুহাসিনী বাড়ির ভিতরে ছিল, সুধীর ও প্রভাত সুধার কাছে বসিয়া গল্প করিতেছিল। সুধীর অল্পক্ষণ পূর্বে কি কাজে উঠিয়া গিয়াছে, প্রভাত সুধার পিছনদিকে একখানি ছোট চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

এই কয়দিনেই সুধার চেহারা এত খারাপ হইয়াছে যে, চিনিবার উপায় নাই। শান্ত সমুদ্রের পানে উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সুধা চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়াছিল। কি ভাবিতেছিল কে জানে? তাহার রোগশীর্ণ কৃষ্ণাভ গণ্ড বাহিয়া দুই ফোটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। প্রভাত সুধার বিষণ্ন মুখচ্ছবি এবং অশ্রুবিন্দু দেখিয়া বিচলিতচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু ঐ সময়ে সামনে যাইবে কি না ইতস্তত করিয়া পিছনদিকেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুধা ব্লাউসের হাতায় চোখদুটি ভালো করিয়া মুছিয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ডাকিল,—'দাই।'

প্রভাত সুধার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—'দাইকে কি ডেকে দেবো, সুধা?'

সুধা বলিল—'এই যে, আপনি আছেন? দাইকে ডাকছিলুম আমায় এস্‌রাজটা একবার এনে দেবে বলে।'

'আমি এনে দিচ্ছি'— বলিয়া প্রভাত চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে কালো রঙের ক্ষুদ্র এস্‌রাজটির রাঙা শালুর আবরণ খুলিতে খুলিতে বাহিরে লইয়া আসিয়া বলিল —'কিন্তু তোমার শরীর যে এখনও বড় দুর্বল, সুধা! বাজাতে পারবে কি?' প্রভাত এখন সুধাকে নাম ধরিয়া ডাকে ও 'তুমি' বলে। সুধা ইহাতে আপত্তি করে না।

সুধা হাত বাড়াইয়া এস্‌রাজটা প্রভাতের হাত হইতে টানিয়া লইয়া নিজের বাম কাঁধের উপর শোয়াইয়া ম্লানহাস্যে বলিল— 'গানই আমার প্রাণ, প্রভাতবাবু! আমার দৃষ্টি যদি অন্ধ হয়ে যায়, আমার তত দুঃখ হবে না, যদি আমার এই গান গাওয়ার সামান্য শক্তিটুকু নষ্ট হয়ে যায়।'

প্রভাত বিস্মিতনেত্রে সুধার পানে তাকাইয়া রহিল। কাঁধের উপরে ফেলা যন্ত্রটির উপরে শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি লীলায়িত করিতে করিতে ডান হাতে ছড়ির টানের সঙ্গে সে বলিল—'কি গান গাইব বলুন?'

'গান গাইলে বড় বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বে না কি সুধা? আজ সবে দুটি ভাত পেয়েছ!'

'না, কষ্ট হবে না। বরং দিনরাত্রি বিছানায় চুপটি করে থেকে থেকে বুকটার ভেতর যেন গুমরে উঠছে! গান কিছু মনে আসছে না। একটা গান মনে করে দিন না—'

প্রভাত উত্তর দিল না। স্নিগ্ধ গভীর দৃষ্টিতে সুধার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। সুধা প্রভাতের এই ভাষাপূর্ণ চাহনিতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া একটু উশ্‌খুশ করিয়া নড়িয়া চড়িয়া বলিল—'আপনারও কোনো গান মনে আসছে না বুঝি! আচ্ছা, আমার ঘরে শেল্‌ফের উপর থেকে গীতাঞ্জলিখানা এনে দিন তো।'

প্রভাত সুধাকে তাহার সেই মৌন করুণ-ভাষা-ভরা চাহনিতে অভিষিক্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল— 'তোমার মনে এখন যে গানের প্রেরণা আসছে, সেই গানখানিই গাও না, সুধা!'

সুধা মৃদু হাসিয়া বলিল—'এখন যে কোনো-কিছুরই প্রেরণা আসছে না। আচ্ছা বসুন, একটা গান মনে পড়েছে।'

সুনিপুণ অথচ শিথিল হস্তে এস্‌রাজে ছড়ি টানিতে টানিতে সুর-ঝঙ্কারের সহিত সুমিষ্ট দুর্বল কণ্ঠ মিশাইয়া সুধা আস্তে আস্তে গাহিতে লাগিল—

কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব— অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,

ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায়— যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে!—

প্রভাত অপলকদৃষ্টিতে সুধার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। গান গাহিবার সময়ে অধিকাংশ সময়ে সুধা যেন মূর্তিমতী বিষাদ হইয়া উঠে! তখন আর মনে হয় না, এই সেই সদা প্রফুল্লচিত্তা তরুণী সুধা! এ যেন কোন মূর্তিমতী বেদনা। গানের সুর ও কথার বাতায়ন দিয়া তাহার প্রাণের নিরুদ্ধ গোপন বেদনারাশি প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। মুগ্ধ প্রভাত শুনিতে লাগিল, সুধার রোগ-দুর্বল ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে ব্যাকুল মিনতি লুটাইয়া পড়িতেছে—

আজও সময় হয়নি কি তার কাজ কি আছে বাকী?
ওগো,— ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগর-তীরে—
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি
আপন,— কুলায় মাঝে সবাই এল ফিরে!
কখন তুমি আসবে ঘাটেব 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে
অস্ত-রবিব শেষ আলোটিব মতো
তরী— নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।

বাগানের বৃক্ষপত্রের মর্মর শব্দ ও দূরশ্রুত সমুদ্রতরঙ্গের অস্ফুট কলধ্বনির মধ্যে এই বেদনা-করুণ গানখানি পরিপূর্ণ ব্যথারসে সে সান্ধ্য-আকাশ কম্পিত—উদাস করিয়া তুলিল।

প্রভাত সুধার পানে আবেগপূর্ণ ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া দেখিল, তাহার সুন্দর ঘন কালো আঁখির দৃষ্টি নীল-সাগরের দিক্-চক্রবালে উড়িয়া গিয়াছে, শান্ত মুখখানির উপরে গভীর বিষাদের করুণছায়া স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে!

গান সমাপ্ত করিয়া প্রভাতের দিকে স্মিতহাস্যে চাহিয়া সুধা জিজ্ঞাসা করিল —'কেমন শুনলেন?'

প্রভাত আর থাকিতে পারিল না, ব্যাকুলভাবে উঠিয়া গিয়া নিজের কম্পিত হস্তের মধ্যে সুধার হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিয়া আবেগরুদ্ধস্বরে বলিল—'সুধা—সুধা—রাণী আমার,— তোমার কণ্ঠে যে আমি বিশ্বের অমৃত—', সুধা সচকিতে প্রভাতের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার রোগপাণ্ডুর মুখে চোখে ঘন বিস্ময় ও বিরক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল —'প্রভাতবাবু! আপনার কি হয়েছে? আমাকে এসব কি বলছেন আপনি?'

বিমূঢ় প্রভাত চকিত সন্ত্রস্ত নিজেকে সম্বরণ করিতে করিতে ব্যথাকরুণস্বরে বলিল— 'সুধা—তবে কি—তবে কি আমি ভুল বুঝিছি? তুমি কি আমাকে—'

'আপনাকে ভালোবাসি কি না জানতে চান? বাসি প্রভাতবাবু! এই এক মাস

দেড় মাসে আপনাকে আমি আমার ছোড়দারই মতো আন্তরিক ভালোবেসেছি! কিন্তু আর যদি কিছু মনে করে থাকেন, মাফ করবেন— আপনি ভুল করেছেন।'

প্রভাতের মুখে চোখে একটা বিপুল রিক্ততার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সুধীর সেই সময়ে আসিয়া পড়ায় প্রভাত ও সুধা দুইজনেই যেন বাঁচিয়া গেল।

সুধা বলিল—'ছোড়দা, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এইবার তোমরা আমাকে ঘরের ভিতরে তুলে নিয়ে চলো।'

৪

প্রভাত সমুদ্রবেলায় বসিয়াছিল, সুধীর আসিয়া পাশে বসিল।

'প্রভাত, তোকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন রে?'

'কই, না!'

তাহার পর এ-কথা সে-কথার পর সুধীর বলিল—'আসছে সোমবার কলকাতা রওনা হওয়া ঠিক করলুম, প্রভাত। সুধা একটু গায়ে বল পেয়েছে।—ওঃ! এমন সর্বনেশে সাপও দেখিনি। কিবকম শীগগিব সুধা কালো হয়ে যাচ্ছে দেখেছ তো?'

প্রভাত বিশুষ্কমুখে বলিল—'হ্যাঁ'—

অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া থাকিবার পর সুধীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল— 'যাক, তবু সুধার বিয়ের ল্যাঠা আর নেই— তাহলে আরো মুশকিল হতো!'

প্রভাত চমকিতভাবে সুধীরের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—'তার মানে?'

সুধীর প্রভাতের প্রতি চাহিয়া বলিল—'ও যে আর বিবাহ্ করবে না বলেছে! কেন? তুমি কি অজিতেব বিষয় জানো না?'

'কে অজিত?'

'প্রোফেসর অজিত সেন! অক্সফোর্ডের এম.এ.!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব জানি! আমরা একসঙ্গে ফার্স্ট ইয়ার থেকে কলেজে পড়েছি! খুব বন্ধুত্ব ছিল। আহা, সে তো বিলেত থেকে ফিরতে জাহাজে ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেল।'

সুধীর বিষণ্নমুখে বলিল—'তার সঙ্গেই সুধাব বিয়ের এন্‌গেজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল।'

প্রভাত উৎসুক মুখে বলিল—'তারপর?'

'সে বলেছিল, বিলেত থেকে ফিরে এসে বিয়ে করবে। সুধা বোর্ডিং-এ থেকে কলেজে আই.এ. পড়তে লাগল। দুজনে চিঠিপত্র লিখত। তারপর আর কি? সে বিলেত থেকে স্টার্ট করতে সুধা বোর্ডিং ছেড়ে বাড়ি এলো, এডেন থেকেও তার টেলিগ্রাম পাওয়া গেছল— ভালো আছে, নির্বিঘ্নে আসছে— বম্বেয় নামবার আগেই জাহাজে ঠাণ্ডা লেগে হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে সব শেষ হয়ে গেল।'

প্রভাত স্তম্ভিত মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুধীর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিল—'সুধাকে জ্যাঠামশাই ছোটো

থেকে মানুষ করেছেন। খুব ছোট অবস্থায় ও মাতৃহীনা হওয়ায় জ্যাঠামশাই ওকে নিজের সন্তানের চেয়ে গভীর স্নেহে মানুষ করেছেন। তারপর বাবাও মারা যাওয়ায় জ্যাঠামশাই সুধাকে আরো নিজের বুক দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। ওঁর নিজের তো স্ত্রী পুত্রকন্যা কিছু নেই। জ্যাঠামশাইয়ের ইচ্ছা—সুধা ভালো পাত্রে বিবাহিতা হয়ে সুখী হয়। ওঁর আশা,— মনের ধাক্কাটা সামলে গেলে সুধা এর পরে বিয়ে করবে! —কিন্তু সুধা যে আর বিয়ে করবে না, আমি জানি। ও শুধু জ্যাঠামশাইকে সুখী রাখবার জন্য ও আর সবাইকে সুখী করবার জন্য নিজে সর্বদা অত প্রফুল্লভাবে থাকে!'

প্রভাত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। একটিও কথা কহিতে পারিল না।

সুধীর আবার বলিল— 'সুধা প্রথমটা খুবই ভেঙে পড়েছিল,— তারপরে হঠাৎ একবারেই সামলে সহজ হয়ে গেল! তিন বছর অজিত মারা গেছে—জ্যাঠামশাই কত জায়গায় ওব বিয়ের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ও কিছুতেই রাজী হয় না।'

'অজিত সুধার হাতের রান্না খেতে বড় ভালোবাসত—বিলেত থেকে লিখত, দেশে ফিরে সুধার হাতেব রান্না খাবে। সেইজন্যে সুধা নিজের হাতের তৈরি কোনো রান্না মুখে তোলে না। অর্ধেক ভালো জিনিস সুধা খেতে পারে না, অজিত ভালোবাসত বলে!—ওর বাইরের হাসিখুশি সব মিথ্যে।'

প্রভাত যেন স্বপ্নাভিভূতের মতো চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সুধীরও আর কোনো কথা বলিতে পারিল না।

সেইদিনই বিকালবেলা সুধা বাংলো-সংলগ্ন বাগানে আস্তে আস্তে পায়চারি করিতেছিল। এখনও সে দুর্বল, বেশিক্ষণ হাঁটিতে পারে না। অল্পক্ষণ পায়চারি করিয়া ক্লান্তভাবে সে একটি লোহার বেঞ্চেব উপবে গিয়া বসিল।

প্রভাত আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। সুধা প্রভাতের দিকে চাহিয়া বেঞ্চের একপাশে কোণ ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিয়া ম্লানহাস্যের সহিত বলিল—'বসুন।'

প্রভাত বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসিতে বসিতে বলিল— 'তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে সুধা! সেদিন তুমি আমাকে সুধীরের সঙ্গে সমান আসন দিয়েছ, —সেই ভরসাতেই আজ তোমার সঙ্গে কথা কইবার স্পর্দ্ধা করছি।'

সুধার ম্লান বিষণ্ন মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রভাত বলিতে লাগিল— 'সুধীরের কাছে আমি তোমার বিষয় সব শুনেছি। তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তোমার এই মূর্খ নির্বোধ ভাইয়ের সেদিনকার মূঢ় আচরণ পারো তো ক্ষমা কোরো, সুধা! আমি আজ তোমার কাছে আর একটা নতুন দাবি নিয়ে এসেছি— আমি অজিতের বন্ধু— অজিতের সঙ্গে আমি অনেকদিন একত্র পড়াশুনা করেছি, — তার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারাব এত বেশি সাদৃশ্য ছিল যে, কলেজের ছেলেরা আমাদের যমজ ভাই বলত। আমি জানতুম না, অজিতের সঙ্গে তোমার—'

সুধা ব্যথিত-দৃষ্টি অবনত করিয়া বলিল— 'হ্যাঁ, সেই অদ্ভুত সাদৃশ্যটি আমি প্রথম দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি।'

প্রভাত বুঝিতে পারিল, সুধাকে ভুল বুঝা তাহার কোনখানটায় হইয়াছে! বুঝিতে পারিল তাহার মুখের পানে নির্ণিমেষ তৃষিত-নয়নে তাকাইয়া সে কাহার মুখের সাদৃশ্য অন্বেষণ করিত! গল্প করিতে করিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কেন মাঝে মাঝে সে অমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত!

প্রভাত প্রকৃতই অন্তরে অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া বলিল— 'আমার অভদ্র আচরণ ভুলে যেও, সুধা! আজ থেকে আমিও তোমার "দাদা"।'

সুধা স্নিগ্ধ হাসিয়া ধীর মৃদুকণ্ঠে বলিল—'শুধু আমার দাদা নয়,— তার চেয়েও বেশি—আপনি তাঁর বন্ধু—'

বার্ষিক বসুমতী, ১৩৩৪

মা

শেষ-চৈত্রের অগ্নিবর্ষী মধ্যাহ্ন। প্রখর রৌদ্রের রং চোখ-ঝল্‌সানো সুতীব্র। বাগানের ভিতরে ফুলগাছগুলো শোলার গাছের মত প্রাণহীন আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে অগ্নিপরীক্ষা দিচ্ছে। তাপসী-পৃথিবী যেন পঞ্চাগ্নি-তপে কৃচ্ছ্রনিমগ্না।

জানলার সামনে পুষ্পবহুল পেয়ারাগাছগুলার সবুজ শাখার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গন্ধ-মাতাল মৌমাছিদের গুঞ্জনধ্বনির বিরাম নেই। বিবিধ রংয়ের প্রজাপতিদলের পরাগ-রঞ্জিত পাখাগুলির উপরে সূর্য্যরশ্মিসম্পাত অগণন ইন্দ্রধনুর বর্ণলীলা স্ফুরিত করে তুল্‌ছে।

বিকাশ ঘরের ভিতরে পড়ার টেবিলের সামনে তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখদু'টি জোর করে' মেলে পড়ার বইয়ে মন নিয়োগের চেষ্টা করছিল। প্রখর গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের অলস তন্দ্রাবেশে মাথাটি বার বার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে অবশেষে টেবিলের উপরে বাহু দু'খানি উপাধান ক'রে বইয়ের পাশে লুটিয়ে পড়ল।

চঞ্চল চরণে একটি কিশোরী বালিকা ঘরের ভিতরে প্রবেশ ক'রে বিকাশের পিঠ স্পর্শ ক'রে ত্রস্তস্বরে ডাক্‌লে— দাদা, ওঠো—ঘুমিয়ো না—বাবা এইদিকে আস্‌ছেন!

শৃঙ্খলাকারে আবদ্ধ নিজের হাত দু'খানির মধ্যে মাথাটি ভাল ক'রে গুঁজে বিকাশ নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললে— জ্বালাতন করিস্‌নে, এখান থেকে যা' বল্‌ছি—

—যাচ্ছি। কিন্তু বাবা যে এইদিকে আসছেন। বিকাশ উত্তর দিল না।

—দাদা,—অ' দাদা—শুন্‌ছো? ওঠো শীগ্‌গির— কিশোরী বিকাশকে ঠেলে ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল।

তন্দ্রাজড়িত বিরক্তসুরে বিকাশ ব'ললে—আঃ মলিন্! বিরক্ত করিস্‌নে। বাড়ীর ভিতরে যা!

ইতিমধ্যে বারান্দায় সত্যসত্যই চটীজুতার আওয়াজ শোনা গেল এবং মলিনা পাশের দরজা দিয়ে ত্রস্তপদে অন্তর্হিতা হ'ল। বিকাশের নিদ্রাও মুহূর্ত্তমধ্যে যেন মন্ত্রবলে অপসৃত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসে হিস্ট্রীর পাতা উল্টাতে মনোনিবেশ করলে।

গায়ের রং রৌদ্রদগ্ধ তামাটে, লম্বা চওড়া আঁট্‌সাঁট্ চেহারা, ছাঁটা ঘন গোঁফ, গম্ভীর মুখকান্তি বিকাশের বাবা বিরাজমোহন ধীর-মন্থরপদে বিকাশের পড়ার ঘরের পাশে বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে চলে গেলেন।

বিকাশ অবনত মস্তকে অখণ্ড-মনোযোগে পুস্তকে অভিনিবিষ্ট থাকলেও, তার সর্ব্বাঙ্গের উপর একজোড়া সতর্ক আঁখির সুতীক্ষ্ণ-দৃষ্টি যে স্পর্শ বুলিয়ে গেল তা সে স্পষ্টই অনুভব করতে পারলে।

বিকাশের নিদ্রার আবেশ টুটে' গেছ্‌ল। বিরাজমোহন তাঁর অফিসঘরের দিকে চলে' গেলে—সে চেয়ার হ'তে উঠে জানালার ধারে তক্তপোষের উপরে শুয়ে পড়্‌ল। এই উত্তপ্ত-দুপুরে ঘর্ম্মাক্ত দেহে পড়ায় মনোনিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

রৌদ্রের তেজ ক্রমশ কমে এল, গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় ঠাণ্ডা-হাওয়ার আনাগোনা সুরু হল। বিকাশের বন্ধু অমল এসে ডাক্‌লে—বিকাশ! সিনেমায় যাবি? আজ 'চার্লি-চ্যাপ্‌লিন্' আছে।

বিকাশ ক্ষুণ্ণ মুখে বল্‌লে—আজ বাবা বাড়ী আছেন ভাই!

—থাকলেই বা। এই গরমে সারা দুপুরই তো গাধার মতো প'ড়্‌ছিস্। বিকেল-বেলাও ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকবি নাকি?

রঙ্গ-নিপুণ নট চার্লি চ্যাপ্‌লিনের ছায়াচিত্রের অভিনয় দেখার আগ্রহ বিকাশের খুবই ছিল, কিন্তু কঠোর-শাসক পিতার ভয়ে আপত্তি করতে বাধ্য হয়েছিল।

অমল ছাড়ল না। পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

বিকাশের দ্বিধাপূর্ণ চিত্তে লোভ ও ভয়ের দ্বন্দ্বে অবশেষে লোভেরই জয় হ'ল। অমলের সঙ্গে সে বায়স্কোপ্ দেখতে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। হুগলী-নদীর স্টীমারের তীব্র সার্চ্চলাইট্‌গুলি লম্বা লম্বা শাদা আলো ফেলে তারা-খচিত অন্ধকার আকাশ বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় ক'রে তুলেছে।

বিকাশের মা সরোজিনী বারান্দায় ব'সে প্রদীপের সলিতা প্রস্তুত করতে করতে মুগ্ধ-নয়নে আকাশের পানে তাকিয়ে সার্চ্চ্‌লাইটের বিচিত্র কিরণ-সম্পাত দেখ্‌ছিলেন।

স্বামী বিরাজমোহন এসে অতিরিক্ত গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—বিকাশ কোথায়?

সরোজিনী স্বামীর প্রশ্নের ধরণে চকিত হ'য়ে হাতের কাজ বন্ধ রেখে উদ্বিগ্ন মুখে তাঁর মুখের পানে তাকালেন।

বিরাজমোহন আরও কঠিন স্বরে প্রশ্ন কবলেন— তোমার বড় ছেলে কোথায়?

সরোজিনী শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন—কেন? সে পড়ার ঘরে নেই কি?

—না। পড়ার ঘরে অনেকক্ষণ থেকেই নেই। খবর নিলুম, সন্ধ্যার আগেই নাকি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে!

স্বামীর কঠিন অপ্রসন্ন দৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখতে না পেরে সরোজিনী আঁখি নত করলেন। তাঁর উদ্বেগব্যাকুল মুখখানি যেন ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে উঠ্‌ল।

বিরাজমোহন তীব্র গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললেন—চুপ ক'রে রইলে যে! জানো কি না-জানো বলো না?

সরোজিনী কাতর নেত্রে একবার স্বামীর পানে তাকিয়ে আবার দৃষ্টি অবনত ক'রলেন। ঠোঁট দু'খানি বারকতক নিঃশব্দে নড়ে উঠ্‌ল, কিন্তু কি যে তিনি বল্‌লেন বা বলতে চাইলেন তার এক বর্ণও বোঝা গেল না।

বিরাজমোহন স্ত্রীর প্রতি আর দৃক্‌পাত না ক'রে দৃঢ় পাদবিক্ষেপে বাইরের দিকে চলে গেলেন। সরোজিনী আতঙ্ক-ব্যাকুল মুখে সেইদিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে স্বামীর হাত দু'খানি ধরে ফিরিয়ে এনে কিছু কথা বলেন, —কিন্তু পুত্র-পক্ষ সমর্থন ক'রে কি যে বলবেন তা' ভেবে পেলেন না। এবং উঠে গিয়ে ক্রুদ্ধ স্বামীর হাত ধরবারও ভরসায় কুলাল না।

উঠানে আতা ও পেঁপেগাছগুলা অন্ধকারের ভিতর বাতাসে দুলছে। রান্নাঘরের টেপির ক্ষীণ আলোয় তাদের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। ঝিঁঝিঁপোকার একঘেয়ে সুরে নিস্তব্ধ উঠান প্রতিধ্বনিত। রান্নাঘর থেকে বামুনঠাকুরের খন্তির ঠিন্‌ঠিন্‌ আওয়াজের সঙ্গে ব্যঞ্জন-সাঁত্‌লানোর তীব্র মধুর গন্ধে অন্তঃপুরের বাতাস ভ'রে উঠেছে।

সরোজিনী কোলের আঁচলে পাকানো সলিতাগুলি নিয়ে নিস্তব্ধভাবে ব'সে আসন্ন-অশান্তির প্রতীক্ষা করছিলেন। ভয় হচ্ছিল, ক্রোধে জ্ঞানহারা স্বামী হয়তো বিকাশকে আজ বাড়ী হ'তে বার ক'রেই দেবেন!

কন্যা মলিনা এসে মায়ের পাশে বসে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে মা?

সরোজিনী অন্ধকারের মধ্যে শূন্য দৃষ্টিতে কন্যার পানে তাকিয়ে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন —বিকু কোথায় গেছে জানিস কি মলিনা?

মলিনা বললে—বিকেলবেলা অমলদা এসে বায়স্কোপ্‌ দেখতে ধ'রে নিয়ে গেছে।

সরোজিনী কোনও কথা কইলেন না। অন্ধকারে যেমন নিঃশব্দে বসেছিলেন, তেমনই রইলেন।

কড়া প্রকৃতি স্বামীর হাতে পড়ে নিরীহা সরোজিনী অপরিসীম ধৈর্য্যশীলা হয়ে উঠেছিলেন। পুত্রের শাসন সম্বন্ধে বিরাজমোহন এত বেশী কঠোর ছিলেন যে আজও পর্য্যন্ত ষোড়শবর্ষীয় বিকাশ স্বাধীনভাবে খেলাধূলা করা কিম্বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করবার অধিকার পায়নি।

বিকাশ বাড়ী ফিরলে বহির্ব্বাটীতে বিরাজমোহন পুত্রকে অল্প দু'চার কথাতেই ভর্ৎসনা কবলেন—কিন্তু, সে কথাগুলি শুধু অকথ্যই নয়— ষোড়শবর্ষীয় পুত্রের পক্ষে তা চরম রূঢ় ও নিদারুণ অপমানজনক।

বিকাশ অশ্রুস্তম্ভিত নেত্রে অবনত মস্তকে অন্তঃপুরের মধ্যে এল। শয়নকক্ষে যাবার সময়ে দালানে উপবিষ্টা সবোজিনীর প্রতি দৃকপাত না ক'রে দ্রুতপদে নিজেব ঘরে প্রবেশ কর্‌লে।

অল্পক্ষণ বাদে সরোজিনী বিকাশের শয়নকক্ষে গিয়ে তার বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। মায়ের হাতের চুড়ি ও আঁচলের চাবির ঝনৎকারে বিকাশ চকিতে একবার বালিশ হ'তে মুখ উঁচু ক'রে চেয়ে দেখে তৎক্ষণাৎ সবেগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সরোজিনী আস্তে আস্তে বললেন—বিকু, খাবি, উঠে আয়।

—আমি খেতে পারব না।

লক্ষ্মী বাবা আমার, আয়! রাত-উপোসী থাকতে নেই!

—আমি খেয়েছি!

—কোথায় খেলি আবার?

—অমলের মা খাইয়েছে!

—যথার্থ ব'লছিস্? মিছে কথা নয়?

বিকাশ তীব্র বিরক্তিপূর্ণ ঝাঁজের সহিত ব'লে উঠ্‌ল—অত দিব্যি করতে পারবো না! বলছি খেয়ে এসেছি—বিশ্বাস হ'চ্ছে না!

সরোজিনী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন— কেন বায়স্কোপে গেলি বিকু? জানিসই তো উনি কেমনধারা মানুষ—

বিকাশ একটু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—আচ্ছা, আচ্ছা —আর ব'লতে হবে না, ঢের হয়েছে—সরোজিনী করুণ হেসে অভিমানী পুত্রের মাথায় সস্নেহে হাত রেখে ব্যথিতকণ্ঠে বললেন—বিকু, বড় হচ্ছিস্ দিন-দিন,— এত অবুঝ হ'লে—

বিকাশ জ্বলে' উঠ্‌ল। মায়ের হাতখানি কপালের উপর থেকে সজোরে ঠেলে দিয়ে তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল— বেশ, অবুঝ তো অবুঝ, আর অত বুঝিয়ে কাজ নেই!... মা' হ'য়ে একবারটি কখনও ছেলের দোষ ঢেকে নিতে পারলে না?... বলতে পারলে না যে, 'তাকে আমি এক জায়গায় পাঠিয়েছি।'... বিকাশের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এল!

সরোজিনী ম্লান-হেসে বললেন—পাগল! আমি যদি তা' বলতাম, উনি আগেই জিজ্ঞাসা করতেন—'কোথায় পাঠিয়েছ?' তারপরে সেই মিছে-কথা ধরা পড়লে আজ কি কারুর রক্ষে থাক্‌ত! আমাকে সুদ্ধ তা' হ'লে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই কথাই স্পষ্ট বলো! নিজে পাছে একটু বকুনি খাও, সেই ভাবনাতেই অস্থির!... ছেলে মরুক্ না...

সরোজিনী এবার অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—বাবা, তুইও যদি অমন অবুঝ আর রুক্ষ মেজাজ্ হ'স্ তা' হ'লে যে—

বারান্দা হ'তে তীব্র শ্লেষপূর্ণ রূঢ়কণ্ঠে বিরাজমোহন বলে' উঠ্‌লেন—হ্যাঁ, ছেলের কাছে গিয়ে খোসামোদ করলেই— তার রুক্ষ মেজাজ্ ভাল হবে!... মা হ'য়ে পেটের ছেলেকে খোসামোদ করতে লজ্জাও করছে না?... এমন ধারা মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য মায়ের ঐরকম অসংযত স্বভাব ছেলে হবে না তো কি?

২

পৌষমাস। উঠান-কোণে তুলসীমঞ্চের চারিপাশে গাঁদাফুলের বনে হলুদ রং হেসে উঠেছে। ঘন-হলুদ, ফিকে-হলুদ, বাসন্তী রংয়ের রকম-বিরকম গাঁদাফুলে অগণিত ছোট ছোট গাছগুলি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে!

উত্তাপবিহীন বৈকালী রৌদ্ররেখা উঠানের আধখানা ছেড়ে ক্রমশ রান্নাঘরের দেয়াল বেয়ে শনৈঃ শনৈঃ উপরের দিকে উঠে চলেছে!

সরোজিনী দালানে বসে পিঠা ভাজছিলেন। বিকাশ এসে মায়ের সামনে দাঁড়াল।

ষোল বছরের বিকাশ এখন তেইশ বছরের যুবা! শিবপুর কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। 'বড়দিনে'র ছুটিতে শিবপুর থেকে হুগলীর বাড়ীতে এসেছে!

অগ্নিতাপে আরক্ত মুখখানি তৃপ্তির হাসিতে বিভাসিত করে মা বিকাশের পানে তাকিয়ে বললেন, বোস না, গরম গরম আলুর পিঠে খানকতক দিই!—তুই ভালবাসিস বলে আজ অনেক রকম পিঠে করছি!

বিকাশ বললে—রেখে দিও, রাত্রে খাব। এখন একটু বাইরে যাচ্ছি!...হ্যাঁ মা! বাবাকে আমার টাকার কথা বলেছিলে কি?...

সরোজিনী কুণ্ঠিতভাবে বললেন—হ্যাঁ বাবা, বলেছিলুম...

—কি বললেন তিনি?

সরোজিনী পিঠার কড়াটি উনানের উপর থেকে মাটীতে নামিয়ে মাথা নত করে পিঠাগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে আমতা আমতা করে বললেন—উনি—বললেন? ... উনি বললেন যে...

বিকাশ উত্তেজিতস্বরে বলে উঠল—থাক, আর বলতে হবে না! বুঝেছি!

সরোজিনী মাথা উঁচু করে করুণনেত্রে পুত্রের পানে তাকালেন। বিকাশ অভিমান ও ক্রোধে মুখ কালো করে বললে—কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকেই জিজ্ঞেসা করি মা! মলিনাকে তত্ত্ব পাঠাবার বেলায় তো তোমাদের টাকার অভাব হয় না! আমি দু'বেলা জলখাবার খেতে পাইনে—জামা ছিঁড়লে জামা করাতে পারিনে—কিন্তু মলিনার তো এসেন্স, তেল, সাবান, আল্‌তা দিয়ে মাসে মাসে শীতের তত্ত্ব, দোলের তত্ত্ব, পুজোর তত্ত্ব করতে তোমার কম উৎসাহ দেখিনে—টাকারও অভাব হয় না!

সরোজিনী আহত কণ্ঠে বলে উঠলেন—বাবা, তুই কি জানিস্ না—তোর মায়ের হাতে নিজের বলে আলাদা একটি পয়সাও নেই! আমার হাতে টাকা থাকলে—আজ কি তোর চাইবার দরকার হত রে?

বিকাশ সে কথায় কর্ণপাত না করে সমান উত্তেজনায় আপনার মনে বলে যেতে লাগল—আমি তো আর বাবুগিরি বিলাসিতার জন্যে টাকা চাইছিনে! যে টাকা বাবা আমাকে পাঠান, তাতে শুধু কলেজের মাইনে আর হোস্টেলের খরচটি চলে! দু'বেলা জলখাবারের পয়সা পর্য্যন্ত পুরো কুলোয় না। তারপর নিজের কাপড়জামা, বই-টই, অষুধ-বিসুধে খরচ আছে তো?

সরোজিনী বললেন—একটি কাজ যদি করতে পারিস্ বাবা, তা হলে হয়! আমার চেন-হারছড়া বারোমাস তোলা পড়ে আছে, ঐ হারছড়া বিক্রী করে শ' দুয়েক টাকা পাওয়া যেতে পারে। ঐ টাকা থেকে মাসে মাসে পনেরো টাকা হিসাবে যদি কেটে নিস্, তা' হলে তোর বছরখানেক চলতে পারে।

বিকাশ দ্রুতপদে চলে যেতে যেতে বলে গেল—আমার এমন লেখাপড়া শেখার চেয়ে না শেখা ভাল!...তোমার গায়ের গয়না বিক্রী করে আমার টাকা চাই,—এই

কি আমি বলেছি ?... আমাকে কি তোমরা সকলে মিলেই এত ইতর ভাবতে সুরু করেছো ?—

মলিনা মা'র কাছে বসে পিঠে গড়ছিল। মায়ের বেদনা-অঙ্কিত মুখের পানে তাকিয়ে সে উত্তেজিতস্বরে বললে—মা, তুমি অত ভয়ে ভয়ে থাকো বলেই ত' দাদা তোমার উপরে এত জুলুম করতে পারে! বাবাকে ভয় করো বলে' দাদাকে সুদ্ধু ভয় করে চল্‌বে নাকি ?... বাইরে বাবার কাছে তো কারুরই দন্তস্ফুট করবার জো নেই,—সকলেই ভিতরে এসে মা'র উপরে সেই রাগটা ঝেড়ে যাবেন!

সরোজিনী করুণ হেসে বললেন—ওরে, আমিও যদি ওর আবদার অভিমান একটু সহ্য না করি—তা'হলে জগতে ও কোথায় দাঁড়াবে বল্ ?... একটা দিক অতিরিক্ত কঠিন হয়েছে বলেই না আর একদিককে অধিকতর নরম হতে হয়েছে!

মলিনা মুখভার করে' বললে— কী-বলে' গেল্ বলো তো—'মেয়েকে দেবার বেলায় তোমাদের টাকার অভাব হয় না!'

সরোজিনী স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের পানে তাকিয়ে বল্‌লেন—ও কথাটা বিকু খালি অভিমানের বশে আমাকে আঘাত দেবার জন্যই বলে গেল।

মলিনা তবুও মুখভার করে বললে—যাই বলো মা,— দাদা কিন্তু যত বড় হচ্ছে —ততই বাবার মত রুক্ষ-মেজাজ হচ্ছে।

সরোজিনী ঝাঁঝরায় পিঠা তুলে রসের পাত্রে ফেলতে ফেলতে ম্লান হেসে বললেন—ও যাঁর ছেলে, তাঁর প্রকৃতি ও এড়িয়ে যাবে, এ কি কখনও হতে পারে ? ... এও জানিস্ মা, বিকু মায়ের চেয়ে জগতে কাউকে ভালবাসে না!... ও যা কঠিন কথা বলে—সে কি আমাকে বলে রে ?... বলে অন্যজনকে! ও আমার পেটের ছেলে—আমি যে ওর নাড়ীর খবর জানি।

মলিনা অভিমানপূর্ণ স্বরে বল্‌লে—আমাকে বাপু তোমরা আর তত্ত্ব-টত্ত্ব কোরো না বলছি!—

সরোজিনী এবার হেসে ফেল্‌লেন! বললেন—হ্যাঁ রে মলিন্! তোর দাদা তোকে হিংসে করে মনে কর্‌লি বুঝি ?

মলিনা এবার সত্য সত্যই অপ্রস্তুত হয়ে পড়্‌ল। কুণ্ঠিত অপ্রতিভকণ্ঠে বললে —না, দাদার খরচের অত টানাটানি—মিছিমিছি আমাকে অত ঘটা করে তত্ত্ব না করে, সে টাকাটা দাদাকে পাঠালে ঢের বেশী উপকার হবে মা!

বিকাশ রাত্রে মায়ের কাছে পিঠা খেতে বসে মলিনাকে ডাক্‌লে—মলিন্, আয় আমার সঙ্গে পিঠে খাবি!

তারপর মলিনার স্বামী নিয়ে তার সঙ্গে রঙ্গ রহস্য করে—খুন্‌সুটী করে মায়ের কাছ থেকে বার বার পিঠা চেয়ে নিয়ে খেয়ে—দুই ভাই-বোনে একত্রে আহার সমাপ্ত করলে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বিকাশ অকারণ অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করতে লাগল। মা হার বিক্রয় করতে চাওয়ার পর হতে বিকাশ বুকের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করছিল।

সরোজিনী প্রতিদিনকার মত ঘরে এসে বিকাশের মাথার শিয়রে টুলের উপরে জলের গ্লাসটি সরপোষ্-চাপা দিয়ে রেখে তার মশারী ফেলে দিতে গেলেন। বিকাশ লেপের ভিতর হতে মুখ বের করে বললে—কে—... মা?

সরোজিনী বললেন—তুই জেগে আছিস্ নাকি রে? বিকাশ বললে—হুঁ। বিকাশের স্বরটা একটু ভারি শোনাল। সরোজিনী উদ্বিগ্নসুরে বললেন—সর্দ্দি হয়েছে নাকি? গলার স্বরটা যেন ভার-ভার ঠেক্‌ছে! কপালটা দেখি?...

মা লেপ সরিয়ে বিকাশের কপালে হাত দিলেন। বিকাশের ইচ্ছা হল মা'র ঠাণ্ডা-কন্‌কনে হাতখানা কপালের উপর দু'হাত দিয়ে জোরে চেপে ধরে! মাকে একটুখানি তার বিছানায় বসতে অনুরোধ করে। কিন্তু লজ্জায় তা' পারলে না।

কপাল হ'তে হাতখানি সরিয়ে নিয়ে মা আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন—ওঁকে টাকার সম্বন্ধে আবার কেন বলতে গেলি বিকু?.. কিছু না বললেই পারতিস্! আমি তো বললুম—আমার হারছড়া বিক্রী করে—

বিকাশ হঠাৎ ধড়্‌মড়্ করে বিছানায় উঠে বসে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল —বেশ করেছি, বলেছি! যিনি আমার খরচ দিতে বাধ্য তাঁকে আমি নিশ্চয়ই বলবো! দিন আর না-ই দিন!... বার বার তোমার গয়না বিক্রীর কথা আমাকে শুনিয়ো না বল্‌ছি—

সরোজিনী ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন—বিকু, তোর মেজাজ ক্রমেই ওঁর মত হয়ে উঠছে!... কোনও কথা কানে না তুলেই রেগে উঠবি!... আজ মুখের উপরে কী জবাব করেছিস্—উনি ভিতবে এসে বাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়েছেন!... ওঁর বয়স হয়েছে—উনি যদিও একটা অন্যায় কিম্বা ভুল করেন—

বিকাশ অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে বললে—সে ত চিরদিনই তোমার মুখে শুনে আস্‌ছি মা! বাবা যত বড় অন্যায়ই করুন না কেন,—তুমি চিরদিন খালি আমারই দোষ দেখতে পাও—

সরোজিনী পুত্রের একান্ত অমূলক অভিযোগের কোনও প্রতিবাদ না ক'রে মশারী ঠিক ক'রে, আলো নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বিকাশ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাতে পারলে না, বিছানায় লেপের তলে বিনিদ্র নয়নে ছট্‌ফট্ ক'রে কাটালে।

৩

কয়েক বৎসর পরের কথা। বিকাশের বিবাহ হয়েছে। মোটা মাহিনার চাকুরীও হয়েছে। বিকাশের বাবা বিরাজবাবু মারা গেছেন, বিধবা সরোজিনী মৃতা-কন্যা মলিনার ছোট

ছোট ছেলে-মেয়ে ক'টিকে নিয়ে বিকাশের কাছে আছেন।

বধূ ললিতা বয়স্থা, সুন্দরী ও ধনীকন্যা। বিকাশ নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে করেছে; কিন্তু তাদের দাম্পর্ত্য-প্রণয় নিবিড় হয়ে ওঠেনি। ললিতা অতিরিক্ত অভিমানিনী ও অসহিষ্ণু প্রকৃতি। অল্পবয়সে মাতৃহীন, ধনী পিতার অত্যধিক আদরে বর্দ্ধিতা এই অধৈর্য্য-প্রকৃতি অভিমানিনী মেয়েটিকে সরোজিনী সহজেই তাঁর কোমল স্নেহপ্রবণ-প্রকৃতি ও ক্ষমাশীল শান্ত স্বভাবের দ্বারা নিজের বশীভূত ক'রে নিতে পেরেছিলেন। মাতৃহীন শিশু ভাগ্নে-ভাগ্নীগুলির সঙ্গে'ও ললিতার বেশ সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হ'য়ে গেছল —গরমিল হয়েছিল আসল জায়গায়—স্বামীর সঙ্গে।

বিকাশ চিরকাল তার মাকে স্বামীর আজ্ঞা পালনে তৎপরা ও একান্ত বাধ্য দেখে এসেছে। সেজন্য বিকাশের মত বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ললিতা যে অন্যমত বা অন্য ইচ্ছা প্রকাশ ক'রতে পারে এ ধারণাই তার ছিল না। তাই ললিতা যখন তার আহ্বান অবহেলা করে তার কাছে না গিয়ে সবার ছোট কচি ভাগ্নেটিকে নিয়ে খেলায় মেতে থাকত, কিম্বা তাদের সব-কটিকে একত্র করে পাঠশালা খুলে সাড়ম্বরে গুরুগিরি করতে বসত—তখন বিকাশ বিস্ময়ে ক্ষোভে অভিমানে আত্মহারা হয়ে পড়ত।

বিকাশের সেই ক্রোধ কিম্বা ক্ষোভের এতটুকু আঁচ যদি কোনওক্রমে ললিতাকে স্পর্শ করত, তাহলেই অভিমানিনী ললিতার ফিট্ হয়ে পড়ত কিম্বা সত্বর পিত্রালয় যাত্রার দিন এসে পড়ত।

বেলা আন্দাজ বারোটা। জানালার পাশে গোড়া লেবুর ঝাঁক্‌ড়া গাছটা থেকে একটা সুমিষ্ট অথচ তীব্র সৌরভ এসে ঘরেব বাতাস গন্ধমদির হয়ে উঠছে। একটা প্রকাণ্ড কালো ভীমরুল একটানা সুরে ভোঁ—ও শব্দে ঘরের ভিতরে ছাদের কড়িকাঠের কোল ঘেঁষে অলসমন্থর পক্ষে ক্রমাগত একটানা আনাগোনা করছে!

বিকাশ আহারান্তে শয়নকক্ষে দাঁড়িয়ে পোষাক পরছিল। পেন্টুলেনে গ্যালিস্ আঁটতে আঁটতে চারিদিকে চেয়ে ব্যস্ত উচ্চ সুরে হাঁকলে—মা, আমার কলারের বোতাম-টোতামগুলো গেল কোথায়?

সরোজিনী ভাঁড়ারঘরে বসে ডাল বাছছিলেন। ছেলের উচ্চ চীৎকারে উদ্বিগ্ন মুখে উঠে গিয়ে ললিতাকে এ-ঘর সে-ঘর খুঁজে দেখলেন—পশ্চিম দিকের বারান্দার কোণে সে নিশ্চিন্তচিত্তে পা ছড়িয়ে ব'সে একটি ফাউণ্টেন পেন্ হাতে নিয়ে পোস্টকার্ডে পত্র রচনা করছে!

সরোজিনী ব্যস্ত ও বিস্মিত স্বরে বললেন—বৌমা, তুমি বিকুর ঘরে যাওনি? ... এখন এখানে বসে' কি করছ?—যাও মা, ওঠো,— সে বোতাম না কি খুঁজছে!... আমি ভেবেছি তুমি তাকে পোষাক-টোষাক ঠিক করে দিচ্ছ!

ললিতা শাশুড়ীর দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে— কলারের, শার্টের সব বোতামই তো পরিয়ে ঠিক ক'রে রেখে এসেছি মা!...

সরোজিনী উৎকণ্ঠিত মুখে বললেন—তা'হলেও এখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় মা! আফিস্ বেরুচ্ছে—কি দরকার-টরকার হবে, এখন কি অন্য জায়গায় থাকতে আছে?

বিকাশ আবার চেঁচিয়ে ডাক্‌লে—মা, অ' মা—আঃ কারুর সাড়াশব্দ নেই, —আমার রুমালটা যে বদ্‌লে দিতে হবে!—

সরোজিনী এবার ললিতার হাত ধরে টেনে তুলে বললেন—শীগগির যাও লক্ষ্মী মা আমার! সে তোমাকে খুঁজছে!... রুমাল না কি চাইছে—দিয়ে এসো—

ললিতা নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠনখানি কবরীর উপর হতে টেনে ললাট পর্য্যন্ত নামিয়ে দিযে আস্তে আস্তে স্বামীর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল।

বিকাশ তখন আলমারী খুলে সমস্ত কাপড়-চোপড় পোষাক-পত্র হাঁটকে ছড়িয়ে, আলমারীর অভ্যন্তরে একটি ছোটখাট সমুদ্র-মন্থন সুরু করে দিয়েছে।

ললিতাকে দেখে রাগ করে বল্‌লে—আফিস যাবার সময়ে একদিনও তোমাকে পাবাব যো নেই!... আমি বাঘ না ভালুক,—না, তোমার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করি যে তুমি আমার সামনে আসতে চাও না!..

ললিতা উত্তর করলে—তুমি আমাকে দেখলেই অম্‌নি উপদেশ দাও, আমি অত উপদেশ সইতে পারিনে।

বিকাশ আরক্ত মুখে বললে—তুমি আমার উপদেশ শুনতে অবশ্য বাধ্য।

স্বামী-স্ত্রীর উত্তর-প্রত্যুত্তর ক্রমশই বেড়ে চললো এবং অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে ললিতার ফিট্ হয়ে পড়ল্।

এমন ধারা প্রায়ই হত। ইদানীং ললিতা যথাসম্ভব স্বামীকে এড়িয়ে চলতো! জেদ্ উভয় পক্ষেই প্রবল হওয়ায় সন্ধি হল না!

৪

ললিতার সন্তান-সম্ভাবনা জানা গেল। সরোজিনী ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সে পিত্রালয়ে যেতে ইচ্ছুক কিনা!

ললিতা লজ্জারক্ত মুখে নত-দৃষ্টি হয়ে বললে—না মা, থাক্। আপনার কাছেই বেশ আছি!

শাশুড়ী বধূর মুখের পানে সস্নেহে অথচ একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনের ভাবটা যেন পড়ে নিতে চাইলেন!

বধূ আরও আরক্তিম হয়ে উঠ্‌ল। শাশুড়ীর মুখখানি সেদিন পরম তৃপ্তি ও নিশ্চিন্ত আনন্দের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো। বধূকে বুকে টেনে নিয়ে ললাট চুম্বন ক'রে বললেন—এতদিনে পাগ্‌লীর জ্ঞান হল?...

বিকাশ যখন শুন্‌ল—ললিতার পিতা কন্যাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন এবং সরোজিনীও পাঠাতে সম্মতা ছিলেন, কিন্তু ললিতা যেতে চায়নি,—সে অত্যন্ত বিস্মিত

হয়ে পড়ল। কারণ, পিত্রালয়ে যাবার প্রস্তাবে ললিতার যত হর্ষ ও উৎসাহ দেখা যায়, এত অন্য কিছুতেই দেখা যায় না। তাই ললিতাকে বিস্ময় ও সন্দেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি নাকি বাপের বাড়ী যাবে না বলেছ?

ললিতা অর্থপূর্ণ অথচ কোমল দৃষ্টিতে স্বামীকে অভিষিক্ত ক'রে নখ খুঁটতে খুঁটতে লজ্জাজড়িত মৃদুকণ্ঠে বল্‌লে—না—

বিকাশ ললিতার এই অবনত ভাব ও নূতন ধরণের চাহনিতে শুধু বিস্মিতই হল না, বিহ্বলও হয়ে পড়ল। হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেললে—কেন?

অন্যদিন হলে ললিতা এরকম প্রশ্নের খুব একটা কঠিনতর উত্তর দিয়ে ফেল্‌ত কিম্বা মোটেই উত্তর দিত না, কিন্তু আজ সে তা করলে না। অবনত আঁখির সলজ্জ দৃষ্টিটুকু চকিতে একবার স্বামীর মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে আরক্ত মুখে বললে —এ' ক' মাস তোমার কাছ ছাড়া হতে ইচ্ছে হচ্ছে না!... কি জানি—যদি...যদি আর না বাঁচি—

বিকাশ বিপুল বিস্ময় ও আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ে পত্নীকে নিবিড় প্রেমে বুকের কাছে টেনে নিলে। তাদের সজল আঁখির মৌন-চাহনি সুখ ও বেদনা বিমিশ্র নীরব-ভাষায় মুখর হয়ে উঠ্‌ল।

ললিতার সুন্দর একটি খোকা হল, স্বাস্থ্যসবল, হৃষ্টপুষ্ট, চাঁপার মত বর্ণ! তার মাস কতক বাদেই সরোজিনী সামান্য কয়েকদিনের ব্যারামে ইহলোক ত্যাগ ক'রলেন!

সরোজিনীর মৃত্যুর পর ললিতা এবং বিকাশ উভয়েই অত্যন্ত শোকার্ত্ত হয়ে পড়ল।... বিকাশ আঘাত সামলাল বটে কিন্তু ব্যথা ভুলতে পারল না।

মায়ের মৃত্যুর পর মাস কতক কেটেছে। ললিতা সকালবেলা বারান্দায় বসে' কুট্‌নো কুট্‌ছে—

বিকাশ ঘরের ভিতর হঠাৎ হাঁ হাঁ করে' চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। ললিতা বঁটি কাৎ করে' রেখে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখে—খোকা এক দোয়াত কালি বিকাশের একটি শাদা ধব্‌ধবে শার্টের উপরে উপুড় করেছে!—

বিকাশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—সকালবেলা ছেলেটাকে এ-ঘর থেকে নিয়ে যেতে পারো না? আমি কি তোমার চাকর যে, সকালবেলায় নিজের কাজকর্ম্ম না করে' —তোমার ছেলে আগলে বসে' থাকবো!

কথাটা রাগের বসে বলে ফেলে বিকাশ পরমুহূর্ত্তেই শঙ্কায় কাঠ হয়ে উঠ্‌লো! বুঝলে—আজ আর রক্ষা নেই! এখনই ললিতা কেঁদেকেটে ফিট্ বাধিয়ে বস্‌বে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তার কিছুই হল না— উপরন্তু ললিতা একটু অপ্রতিভভাবে খোকাকে নিয়ে সেই শার্টটি পরিষ্কার করতে চলে গেল।

বিকাশ জীবনে প্রথম আজ নিজের মেজাজের জন্য গভীর লজ্জানুভব করলে এবং নিজের ব্যবহারের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হয়ে পড়ল।

তার কিছুদিন পরের কথা। খোকা বেজায় দুষ্ট হয়ে উঠেছে। হামা দিয়ে গিয়ে সমস্ত জিনিষপত্র ভাঙে-চোরে ফেলে-ছড়ায়! সেদিন নির্জ্জন স্তব্ধ দুপুরে মায়ের ঘুমের অবসরে দুরন্ত শিশু কখন্ বিকাশের সোনার চশ্‌মাখানি হস্তগত করে তার একটি ডাল্ মুচড়িয়ে ভেঙে রেখেছে!

ললিতা ঘুম থেকে জেগে ছেলের অপকর্ম্ম দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। বিকা্শ যে তার চশমার দুরবস্থা দেখে ললিতার উপরে খুবই ক্রুদ্ধ হবে তাতে তার সন্দেহ্ রইল না।

বিকালে বিকাশ বাড়ী ফিরলে ললিতা স্বামীর শ্রান্তি অপনোদন ও জলযোগের পরে কুণ্ঠিতভাবে যখন ছেলের দস্যুপনার কথা বিবৃত করে' ভাঙা চশ্‌মাটি ভয়ে ভয়ে দেখাল, বিকাশ বিস্মিত চোখে পত্নীর মুখের পানে তাকিয়ে বল্‌লে—তাতে কি হয়েছে, লতা?—খোকা চশ্‌মা ভেঙেছে, তুমি নিজে তো আর ভাঙোনি?—তোমার এতে কুণ্ঠিত হওয়ার কি আছে?

ললিতার আজকের এই অপ্রতিভ মুখভাব ও কুণ্ঠিত চাহনি বিকাশের মর্ম্মে যেন সজোরে এক ঘা চাবুক কসিয়ে দিল!...পত্নীর মুখে বিকাশ তাব নিজের মৃতা-জননী সরোজিনীর সন্তান-মমতা-করুণ মুখের ছায়া ও সেই বেদনা-গভীর চাহনি দেখে বিস্ময়ে ও ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে গেল!

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার নিজের শৈশবজীবনেব কথা। রুক্ষ কঠোর-প্রকৃতি পিতার ভয়ে তার অপার ধৈর্য্যশীলা স্নেহময়ী জননী—পুত্রকন্যাদুটিকে কত সাবধানে আগলে রাখতে চেষ্টা করতেন।

ললিতার মত জেদী অভিমানিনী মেয়ের চোখে নিজের স্বর্গগতা জননীর সহিষ্ণুতা-ভরা গভীর চাহনি যে কোনওদিন ফুটে উঠ্‌তে পারে, বিকাশ কল্পনাও করতে পারেনি। তাই সে আজ হর্ষ ও বেদনায় বিমূঢ় হয়ে পত্নীর পানে তাকিয়ে রইল। তারপর ললিতার হাতখানি নিজের হাতের উপর তুলে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে ব'ললে—তোমার ছেলে চশমা ভেঙ্গেছে বলে এত কুণ্ঠিত হ'চ্ছ লতা?... কিন্তু ও যে আমারও ছেলে!...ছেলে চশ্‌মা ভাঙায় অপরাধ হয়ে থাকলে তোমার একলারই হয়নি—আমিও তার সমান ভাগী... তাই নয় কি?

ললিতার চোখে দুই বিন্দু অশ্রু ফুটে উঠ্‌ল।

...খোকা হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত কচি ঠোঁট্ দু'খানি খুলে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় অস্ফুট স্বরে ডেকে উঠল—ম্মা—মা—ববা—

কল্লোল, কার্তিক ১৩৩৪

'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে'

'ঝুপ ঝুপ ঝুপ ঝুপ'—অশ্রান্ত ধারা অঝোরে ঝরে চলেচে। অপূর্ব্ব রহস্যময় এই আঁধার-ঘন নিবিড় শ্রাবণ-সন্ধ্যা! মূকের প্রাণের ভাষা আজ যেন মুখর হ'য়ে উঠেচে! মৌনের নীরব বাণী আজ যেন নিঃশব্দে ব্যক্ত হ'তে চাইচে!

'রিম-রিম রিম্-ঝিম—' আকাশ-বীণা উদার-তারে কোন জলতরঙ্গ যন্ত্রের মধুর নিক্কণ ঝঙ্কৃত করে চলেচে।—কে গো অদৃশ্য গুণী! মেঘের মৃদঙ্গে মৃদুনাদে নিপুণ তাল দিয়ে চলেছো!

মাঝে মাঝে আকাশের বুক চিরে দীপ্ত বিদ্যুতের বিচিত্র লেখা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে এই বর্ষণ-অলস আসরে উঁকি মেরে যেন তীব্র উপহাসের হাসি হেসে চলে যাচ্চে—

চুপ করে শুয়ে আছি ঘরের ভিতব। বিছানার পাশের জানালার বন্ধ শার্শিগুলোর ভেতর দিয়ে আঁধার-ঘন বর্ষণসিক্ত বাইরেটাব কিছুই দেখা যাচ্চে না! শুধু আবছা-আবছা চোখে পড়ছে প্রাঙ্গণের পেঁপেগাছগুলো বৃষ্টির মধ্যে নিশ্চল হ'য়ে ঘন পাতাব গোল ছাতাটি মাথায় খুলে এক-পেয়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজচে।

বিদ্যুতের চকিত আলোয় জানালার বাইরের আগাছা ও কাঁটা-জঙ্গলে ভবা কবেকার জীর্ণ ফুল-বাগানের খানিকটা অংশ—আর আঁকা-বাঁকা রাস্তার ওপাবে শস্যক্ষেত্রের দিগন্ত-বিশ্রান্ত সবুজ আঁচলখানি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্চে!...

...চুপ করে চেয়ে থাকতেই ভালো লাগে শুধু। মনে হ'চ্চে ম্লান মেদুর শ্রাবণ-আকাশ অনন্তকাল ধরে' আমার কানে তার ধারাযন্ত্রেব এই স্নিগ্ধ মধুর করুণ-রাগিণী বাজিয়ে চলুক,—বৃষ্টি-সিক্ত পূবে-হাওয়া অন্ধকারে পথ হারিয়ে অস্ফুট অজানা ভাষায় তার গোপন-হিয়ার ব্যথা-প্রচ্ছন্ন আকুল দীর্ঘশ্বাস নিয়ে এই পথ দিয়েই গুম্‌রে গুম্‌রে চলে যাক—আঁধার মেঘপুঞ্জের গভীর গুর-গুর রব নিখিলের নিবিড়-বেদনা জাগ্রত ক'রে তুলুক—

এই অপূর্ব্ব আনন্দ-বেদনার মাঝখানে এই মিলন ও বিরহের যুগপৎ-লীলা-সমন্বয়ের উৎসব-অঙ্গনে আমার চিরবন্দী আঁখি-তারা আজ নির্ণিমেষ হ'য়ে থাক্! চির-তৃষিত শ্রবণদ্বয় মেলে দিয়ে মর্ম্মের অনুভূতি-পুটে অঞ্জলি ভরে সবটুকু রস সঞ্চয় কবে নিই। যদি ডুবে যাই, যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, ক্ষতি কি? সেই হারানোই তো নিজেকে নূতন ক'রে পাওয়া!!

—দিদি, অ' দিদি—

—থাম—ডাকিস্‌নে, ঘুমিয়েচে বোধ হয়—

—বাতিটা কমিয়ে দেব কি?

—হ্যাঁ। গায়ের বালাপোষটা ভাল করে' টেনে দে। ঠাণ্ডা লাগবে।—আস্তে—ঘুম না ভাঙ্গে—

—ডাক্তার আজ কী বলে' গেলেন মা?

—কী আর বলবে—রোজ যা' বলে তাই—

—ওর বেঁচেই বা কি হবে মা? বরং—

—ওরে! চুপ্ চুপ্—ও-কথা আমার কাছে বলিস্‌নে তোরা! ও যে আমার নাড়ী-ছেঁড়া ধন,—আমার প্রথম সন্তান!

—ও যদি বেঁচে থেকে এই ভীষণ দুঃখভরা অপমানিত জীবন বহন করে, তাতেও কি তুমি শান্তি পাবে মা?

—ওরে! সংসারে যে সকলেই স্বার্থপর!—'রেণু'র মুখেই যে আমি প্রথম 'মা' ডাক শুনেচি। 'মা' হওয়ার সুখ, 'মা' হওয়ার আনন্দ 'রেণু'ই প্রথম আমায় দিয়েচে। ওর চলে যাওয়া তো আমি সইতে পারবো না বেণু!

—হ্যাঁ মা! সমীরবাবুকে এই অবস্থা জানিয়েচো কি?

—চুপ কর্ মা! যদি জেগে থাকে শুনতে পাবে। দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আয়, ও ঘুমুক একটু।

আঃ—মাগো—আমার মুখে 'মা'-ডাক শোনার সাধ এখনও তোমার মেটেনি? আমারও যে 'মা'-বলার সাধ মেটেনি মা। তাই তো আমি জানি—আমি কোথাও যাবো না, কোথাও হারাবো না—তোমার বুকেব ভেতরে স্থির হ'য়ে জেগে থাকবো—বেণু'ব গলাব ভেতর দিয়ে বার বার তোমায 'মা' বলে' ডাকবো। আমি তোমায় আরও গভীর করে' ঘিরে থাকবো,—এর পরে তখন হয়ত বুঝতে পারবে!

পৃথিবীটা কি সত্যিই দুঃখে ভবা? সত্যিই কি সে অসুন্দর? না—না—তা' নয় গো তা' নয়—তা হলে এই ধারা-মুখর গভীর রস-ঘন শ্রাবণসন্ধ্যা আঁধার-অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে এমন সৌন্দর্য্য-শতদল মেলে ধরলো কী করে' আমার মর্ম্ম-মুকুরে?...

সবার চেয়ে গভীর-বাণীর প্রকাশ কি মৌনতায়? যে কথা বুকের, সে কি মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলে?...

...সব চেয়ে যে কালো, সেই হয়তো সব চেয়ে সুন্দর?... হ্যাঁ, তাই তো, —ঠিক তাই। দুঃখই যে সব চেয়ে বড় সুখ, —এ-কথা তো আজ আমায় স্বীকাব ক'রতেই হবে। নিবিড় দুঃখের ভিতবে নিবিড়তম সুখ! অঝোর-কান্নায় অশেষতর তৃপ্তি!

'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' এই কাঁচা-মাটীর নশ্বর বুকের নব-নব শোভা,

এই বিচিত্রা প্রকৃতির নিত্য-নূতন সৌন্দর্য্য, এরা এ কি নূতন স্বর্গলোকের স্বপ্ন-দুয়ার আমার চোখের সামনে উন্মুক্ত করে' দিলে আজ।... ওগো। ওদের পানে তাকিয়ে কিছুতেই যে স্বীকার ক'রতে ইচ্ছে হচ্চে না—এ পৃথিবী নিরানন্দ, এখানে অসুন্দর আছে— অকরুণা আছে—

—কে বলে গো মানুষে'র প্রেম নেই? প্রেম নইলে কি মানুষ বেঁচে থাক্‌তে পারতো ?...

আমাকে আমার সমীর আর ভালোবাসে না, এ কি কখনও সত্য হ'তে পারে!... এরা শুধু একটা ভ্রান্তি, একটা মিথ্যাকে সত্যে'র ছদ্মবেশ পরাতে চাইচে!

যে সমীর চিরদিন চিরকাল আমায় ভালবেসে এসেচে,— যার ভালবাসা দিনের আলোর মত সত্য, হাওয়ার মতো সহজ, সাবলীল, সে ভালবাসা 'আর নেই' বল্লেই অম্‌নি তা বিশ্বাস করবো ?...ঐ সবুজ-মাঠের ওপারে ঘন-শালবনশ্রেণী, দূরের ঐ ছোট ছোট পাহাড়ের সারি—আমার জানালার বাইরের ঐ কাঁটা-ঝোপের জঙ্গলগুলো —ওরাও মাত্র এই ক'দিনেই আমায ভালোবেসেচে। ওদের নীরব ভালবাসার মৌন ভাষা, ওদের অলক্ষ্য আঁখির গভীর দৃষ্টি আমি সব সময়ে অনুভব ক'রচি! ওরা যদি আমায় মনে মনে ভালো না বাসতো—তা' হলে আমার বুকে ওদের প্রতি এত স্নেহরস্‌, এত প্রীতিধারা জেগে উঠতো না...সমীর রেণুকে আর ভালবাসে না —এ কথা পৃথিবী-সুদ্ধ লোক বল্‌লেও আমি সত্য বলে মানতে পারবো না—সমীর নিজে বল্‌লেও নয়—যে পর্য্যন্ত না আমার মন আমায় সে কথা শোনাবে! কৈ ? আজও তো আমার মন দৃঢ়ভাবে বিদ্রোহী হ'য়ে অস্বীকারই করছে—এ বাণী মিথ্যা —মিথ্যা—ভ্রান্তি!—তবে কেন আমি অন্যের কথা বিশ্বাস করবো ?

সমীরের মধ্যে আমি সুন্দরকে দেখতে পেয়েচি, তাই সমীরকে ভালোবেসেচি। সমীর আমার ভালবাসা ভুলেচে, আর আমায় সে চায় না—এটা একেবারেই মিথ্যা —এবং সেই প্রকাণ্ড মিথ্যাটাকে দিয়েই সমীর আজ নিজেকে শুধু প্রতারিত করছে মাত্র।

সবাই বলে সমাজে অত্যন্ত নিন্দা উঠেচে এতদিনের বাগ্‌দত্তা ভাবী-বধূকে সমীর বিয়ে ক'রবে না বলায়। আমার নাকি সহজে আর অন্য কোনও ভাল জায়গায় বিবাহ হবে না!...মা আমার সেই দুঃখেই চোখের জলে অন্ধ হ'চ্ছেন! বেণুর মুখে আষাঢ়ের কালো-ছায়া।

আমার খালি হাসি পায়! অন্য জায়গায় বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কি আমি আবার অন্য একজনকে বিয়ে ক'রতুম ?... বিবাহটা কি ? কতকগুলো মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে, লোক সাক্ষী করে একটা শুধু সামাজিক বন্ধন ? অগ্নি, দেবতা, ব্রাহ্মণ এঁরা সাক্ষী হ'লেই মানুষের সত্যিকারের অন্তরের বন্ধন কি সম্ভবপব হ'য়ে উঠে ? না

—এইটেই সত্যিকারের সবচেয়ে বড়?...বিবাহের মন্ত্রের মূল অর্থ হিসাবেই যদি বিবাহকে স্বীকার করতে হয়, তা হ'লে তো আমরা বহুদিন পূর্ব্বেই বিবাহিত হ'য়েছি! প্রেমই যদি বিবাহের প্রধান বন্ধন ও মূল প্রতিষ্ঠা হয়, সে বাঁধন তো আমার আজও অক্ষয় হ'য়ে রয়েচে!...

মনে মনে যাকে প্রতিনিয়ত কামনা করা যায়, অহরহ চিত্তের মধ্যে নিবিড়ভাবে যার সান্নিধ্য অনুভব করা যায়, যার স্পর্শ, সঙ্গ, প্রেম, কল্পনায় প্রাণ-পাত্র পূর্ণ করে রেখে দেয়, তাকে বাহিরে না দেখা, না ছোঁওয়া, না মেশাটাই কি তা হলে মানুষকে বিশুদ্ধ করে রাখতে পারে?...মন্ত্রোচ্চারণ হয়নি বলেই আমি কুমারী?...সমাজ এতবড় মিথ্যাকে যদি মেনে নিতে চায়—নিক্! নিয়ে সে উচ্ছন্নয় যাক্!—কিন্তু আমি তার সঙ্গে সায় দিতে পারবো না!...

যদি বেঁচে উঠি, আমার কোনও দুঃখ নেই, যদি না'ও বেঁচে উঠি, তাতেও দুঃখ নেই। সমীরের ভালোবাসা হারিয়েচি বলে নয়—পেয়েচি বলেই! আমি যে তাকে ভালোবেসেচি—সেই তো আমার পাওয়া, সেই ত আমার পরিণয়!

'তুমি যে এসেছো মোর ভবনে—
তাই, রব উঠেছে ভুবনে!
নইলে, ফুলে কিসের রং লেগেছে
গগনে কোন গান জেগেছে
কোন পরিমল পবনে—'

সমীর আমার সামনে আসতে চায় না, লজ্জা পায়, কুণ্ঠিত হয়। আমার এই রোগ-শীর্ণ কু-রূপ তার দৃষ্টিকে পীড়িত করে,—এই সংক্রামক ব্যাধি তাকে ভীত করে' তোলে!... তাকে বাবা আস্‌তে লিখেছিলেন, কিন্তু সে আসেনি।

তার উপরে আমার একটুও রাগ হয় না, বা ঘৃণা হয় না,—বরং তার জন্যে দুঃখই হয় বেশী! যদি কেউ পথ ভুলে ভ্রান্ত পথে চলে, সেই অভাগা পথিকের উপরে কি কেউ রাগ করতে পারে? তার জন্য মনে বেদনাই জাগে!...যখন সে নিজের ভুল বুঝবে—তখন কি তা'র সেই ভুলে-চলে-যাওয়া সুদীর্ঘ পথটি চিনে সে আবার নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রতে পারবে? তার সময়, তার সুযোগ আর কি জীবনে মিলবে তার?

সবাই বলে, সে তার গানের ছাত্রী লীলার রূপে মুগ্ধ হয়েচে! আমার জন্য আছে তার শুধু লজ্জা বেদনা কুণ্ঠা! কিন্তু আমি যে আমার আপন-প্রেমের উজল-বাতি নিয়ে, আমার ভালবাসার আলোয় তার অন্তরের সবটুকুই তন্ন তন্ন করে' দেখতে পেয়েচি!...তার মর্ম্মের কোনও স্থানটুকুই তো আমার অজানা নেই!...ক্ষণিক রূপের তৃষ্ণা—দেহের মোহ,—সে কি প্রেম হ'তে পারে?...

ওগো আমার প্রিয়! আমি হাসিমুখে তোমায় মুক্তি দিয়ে যাচ্চি;—কিন্তু তোমার মুক্তি কোথায়? তোমার অন্তরের প্রেম একদিন যার পানে চেয়ে সর্ব্বপ্রথম আঁখি

মেলেছিল, একদিন যার স্পর্শে তার মুদিত দলগুলি প্রথম বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল —তাকেই যে তোমার অতৃপ্ত মন জন্ম-জন্মান্তরে যুগে যুগে চিরদিন সন্ধান ক'রে ঘুরবে! কত লীলার মাঝেই সে প্রতি জীবনেই তার হারানো রেণুকে খুঁজে ফিরবে!

তুমি যাকেই বিবাহ করো না কেন, কিছু আসে যায় না—তাদেরই মাঝে তুমি ব্যাকুল হ'য়ে পেতে চাইবে একমাত্র তোমার এই রেণুকেই,—এ আমি বেশ জানি।

কিন্তু—ওগো পথ-ভোলা! প্রেম যে বড় সঙ্গোপনের ধন, বড় সযতনের সামগ্রী! তাকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে নেই, বাইরের আলোয় সবার দৃষ্টির সামনে ধরে ম্লান করতে নেই! মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে' একান্তে তার আরাধনা ক'রলে, তবেই সে তার আপন আলোয় তোমার জীবনের ভিতর-বাহির আলোকিত করে তুলবে;—সেই আলোর জ্যোতিতে ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য তোমার চোখে ফুটে উঠবে! —আর প্রেমকে যদি তোমার মলিন করের কলুষ স্পর্শে চূর্ণ করে ধূলায় ছড়িয়ে ফেলো,—তা'হলে না জানি কত যুগ-যুগান্ত তোমাকে প্রেমহীন ব্যর্থ জীবন বয়ে' বেড়াতে হবে,—তাব চেয়ে কঠিনতর শাস্তি, তাব চেয়ে শোচনীয় দৈন্য, তার চেয়ে ভীষণতম রিক্ততা বুঝি আর কিছুতেই নেই। মৃত্যুর চেয়েও নির্ম্মম মরণে ভরা সেই প্রেমহীন জীবন!

—হ্যাঁ দিদি—কি ভাবচো?

—কি আর ভাব্‌বো ভাই?

—আচ্ছা, ঐ পাহাড় আর শালবনগুলো দেখে দেখে কি তোমার অরুচি হয় না?

—যা' সুন্দর, তাতে কি কখনও অরুচি ধরে বেণু?—

—আমার তো ধরে বাপু!

—তা' হলে নিশ্চয় তুই সুন্দরের সন্ধান পাস্‌নি!

—দিদি, তুমি এ দেশে এসে ভাবুক হয়েচ দেখচি! চেঞ্জের পক্ষে হয়তো দেশটা ভালো হ'তে পারে, কিন্তু ভাই বারোমাস থাকা'র পক্ষে মোটেই ভাল নয়।

—কেন বল্‌ দেখি?

—ছাই, —কিছু পাওয়া যায় না—কিচ্ছু দেখা যায় না—খালি পাহাড় আর শালবন!

—পাহাড় আর শালবন কি দেখবার মতো কিছু নয়?

—ও' তো দু'দিনেই পুরোনো হ'য়ে যায়! আমি এই ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠেচি যেন!

—আমার কিন্তু এ দেশ থেকে আর কোথাও ফিরতে ইচ্ছা হয় না। তোরা ফিরে গেলেও আমি থাকবো— চিরকালের মতো!

—দিদি! তুমি কি পাষাণ মেয়ে দিদি!—

—না বোন—তোরা সকলেই আজ আমায় ভুল বুঝিসনে—

—আমি এই বলে দিচ্চি দেখো—তোমার জীবন যে নিষ্ঠুর এমনিভাবে নষ্ট করে' দিল,—তার কখনও ভাল—

—চুপ্—বেণু, চুপ—

—কেন, চুপ ক'রবো কেন?—

—বেণু এখনও তোর বুঝবার ঢের বাকী। অসহিষ্ণু হ'সনে বোন—

—অত সহিষ্ণুতা আমার নেই। তোমার অত ক্ষমাশীলতা আমার ভাল লাগে না—

—তোর ভাল না লাগে তুই আমাব প্রতি দয়া করে চুপ কর ভাই—

—আমাব যে দিন-রাত্রি মন পুড়ে যাচ্ছে!

—কেন? তুইও কি তবে সমীবকে ভালবেসেছিলি নাকি?

—ঠাট্টা ভাল লাগে না দিদি! জীবনে আমি আর পুরুষ জাতকে বিয়ে ক'রবো না—

—তবে কি মেয়ে-মানুষকে বিয়ে ক'রবি?

—সম্ভব হ'লে ক'রতুম।

—সে কি রে?

—দিদি, তোমার গলা শুখিয়ে গেছে, একটু বেদানার রস দেব?

—দে। মুখ আঁধার করিসনি বেণু! আমার যাবার বেলাটা হাসি দিয়ে উজ্জ্বল কবে দে বোন!—

—দিদি,—হাস্‌বো কি করে ভাই?—

—চুপ। কাঁদিস্‌নে দিদি! তোদের সমীরবাবুর উপরে তোরা অভিমান করিসনে, রাগ করিসনে—সে তোর দিদির চেয়েও দুঃখী, অভাগা—

—রাগ-অভিমান যোগ্য লোকের উপরেই করা চলে; নীচ ক্ষুদ্রের উপরে করা চলে না!

—তুই কেবলি রাগছিস বেণু! হয়তো আমার জীবনের এই অভিজ্ঞতা একদিন তোরও আসবে,—সেদিন বুঝবি তোদের সমীরবাবু সত্যিই কৃপাব পাত্র!

—সে অভিজ্ঞতা আমি চাইনে। কিন্তু আমি অবাক্ হচ্ছি, লীলা কি বলে সমীর-বাবুকে বিয়ে ক'রতে রাজী হ'ল?

—তার কিচ্ছু দোষ নেই!

—না, কারুর দোষ নেই, যত দোষ সব তোমার—

—দোষ না হ'ক, ত্রুটি আমারই। এটা জেনে রাখিস্ বেণু,—পুরুষ শুধু নারীর অন্তরের প্রেমেই পরিতৃপ্ত হ'তে পাবে না!— সে রূপ-পিপাসু; তাই রূপও চায়; সে গুণাকাঙ্ক্ষী, তাই গুণও খোঁজে; —কিন্তু নারী প্রেমাস্পদের প্রেমের মাঝেই তার সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু খুঁজে পায়। তার সকল পিপাসা তৃপ্ত হয়, সকল কামনা

সার্থক হয়—একমাত্র ভালবাসায়!—যেখানে তার হৃদয় আপনার প্রতিবিম্ব খুঁজে পেয়েচে সেইখানে!

—পুরুষ জাতটা বড় ভোগলিপ্সু, কপট—

—তা' নয় বোন্, ওরাও ভালবাসে, ওদেরও প্রেম আপনাকে উৎসর্গ করে' দগ্ধ হয়, কিন্তু সে কেবল রূপের অনলে!

—মেয়েরা তো কেউ অমন হয় না!

—তা' হলে কি আজ তারা 'মা' হ'তে পারতো রে!—হ্যাঁ, ভাল কথা বেণু, সমীরকে এইবার আমার জবানী দিয়ে একখানা চিঠি লেখ!

—না, কক্ষনো না—

—হ্যাঁরে, এইবার লেখবার সময় হয়ে এসেছে। আমার জন্য ডাকা নয়, তার জন্যই তাকে ডাকা!

খোলা-জানলার ফাঁকটুকু দিয়ে আকাশ, মাঠ, ক্ষেত, পাহাড়, আর মরা-নদীব শাদা বালির রেখাটুকুর পাশে তাকিয়ে তাকিয়ে তৃষ্ণা আর মিটছে না! প্রাণেব গোপন অমৃতরসটুকু আজ ওরাই সোনার কাঠি ছুঁইযে জাগিয়ে দিয়েচে যেন!...পারের নৌকায় পা দিয়ে মরণ-পথের যাত্রী আজ জীবন-রস-সুধায় বিহ্বল হ'য়ে পড়েচে...

লোহার সরু সরু রেলিং-টানা একটি ছোট জানলা—তার ফ্রেমে আঁটা ফাঁকটুকু ঠিক যেন চলচ্চিত্রের দৃশ্যপট। ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র ছবি নব নব রূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেচে।...

একখানি ছোট জানলার ফাঁকে এত যে অফুরন্ত রূপলীলা লুকানো থাকতে পাবে,—মরণের স্পর্শ না পেলে জীবন কি আমায় এ অভিজ্ঞতা দিতে পেরেছিল?

নিশি-শেষে স্বর্ণরঞ্জিতা ঊষার প্রথম পাদক্ষেপ হ'তে গোধূলির আবীরমাখা সন্ধ্যার অনুরাগ,—নিশীথের আঁধার আকাশে নিস্তব্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ, পূর্ণিমা'র উল্লসিত জ্যোৎস্না হাসি, সবই যেন কত বিচিত্র অভিনব বেশে এসে দাঁড়াচ্চে!—এই একই আকাশ প্রভাতে ঘন-নীল অরুণোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেচে— সন্ধ্যায় সিঁদুর-মাখা রক্ত-রাঙা হ'য়ে উঠেচে,—ঊষায় শুভ্র-স্ফটিক, দ্বিপ্রহরে দগ্ধ-তাম্রবর্ণ হ'য়ে উঠেচে! কখনও পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের আড়ালে সারা আকাশ লুকিয়ে প'ড়ছে—কখনও অশ্রান্ত-ধারাবর্ষণে ঝাপসা হ'য়ে যাচ্ছে—কখনও বা জ্যোৎস্নারাতে হাল্‌কা মেঘশিশুদের সাথে লুকোচুরি খেলচে!

ভোরের বেলা সদ্য-ঘুমভাঙ্গা পাখীর তাজা গলার মিষ্টি কাকলি এই বাতায়নে ভেসে এসে শ্রবণকে বিহ্বল করে' দেয়! গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গান আর চাকার আর্ত্তনাদ—বাইসাইকেলের ক্রিং—ক্রিং—সন্ধ্যাবেলা সাঁওতাল-বধূদের ঝুমুরের সঙ্গে মাদলের আওয়াজ—পথ-চলা পথিকদের গল্পের সাড়া—ক্বচিৎ বা দুর্ব্বোধ্য ভাষার গানেব একটা লাইন্!—

দূরে পাহাড়তলীর গ্রাম-সীমানায় মেলা বসেচে! দলে দলে সকল বয়সের পুরুষ

ও নারী বিচিত্রবেশে সেজে চলেচে। সামনের সরু রাঙা রাস্তাখানি পার হ'য়ে তারা ঐ পোড়া কালোরংয়ের ছোট পাহাড়টার কোল-ঘেঁষে ধব্‌ধবে শাদা কাঁচা মাটির রাস্তাটি ধুলোয় ঘোলাটে করে চলে যাচ্চে! পরনে তা'দের হলুদ-ছোপানো শাড়ী, কুস্‌মী রংয়ের ধুতি,—শাদা রাঙা হল্‌দে রঙের ফুল তাদের খোঁপায় কিম্বা কানে,— তৈল-নিষিক্ত কালোচুল সযত্নে আঁচড়ানো।

ওদের প্রত্যেকের চলার ভঙ্গী বিভিন্ন, গতির ছন্দ বিচিত্র। দূর হ'তে মাদলের আওয়াজ ওদের পথ চলা পা' দু'খানাকে নাচের ছন্দে দুলিয়ে দিতে চাইচে!—

বেণু আমায় বলেছিল—'দিদি, তুমি পরপারের পরওয়ানা এত শীগ্‌গির পেয়ে গেছ বলেই আজ এতবড় প্রকাণ্ড আঘাত এমন সহজে অবহেলা করে যেতে পারলে, নইলে পারতে না।'

হয়তো তা সত্যি। জীবন আমাদের শুধু জীবনের উপরকার ভাসা-ভাসা হাল্‌কা ছবিগুলোই দেখিয়ে যায়; মানব-জীবনের অতল গভীর রস, বিশ্ব-প্রকৃতির আনন্দবীণার অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা,—জগতের গোপন অন্তরের অনবগুণ্ঠিত রূপ, সে শুধু বোধ হয় মরণই আমাদের চোখের সামনে উম্মুক্ত করে' দিযে যায়। তাই জীবনে যেটা হযতো প্রকাণ্ড ক্ষতি বলে' মানুষের মনে হয়, মৃত্যুব দুয়ারে পা দিয়ে সেই মস্ত ক্ষতিটাই নিতান্ত সহজ এবং তুচ্ছ হয়ে যায! আবার— জীবনে যাদের অতি অকিঞ্চিৎকর—নিতান্ত সাধারণ বলেই মনে হ'তো—মরণের বেলাভূমে তারাই অনেকে কত মহত্তর, সুন্দরতর ও বৈচিত্র্যময় হ'যে উঠে।

—বেণু—বেণু—ঝড়ে আমার জানলার শার্শি ভেঙে গেল—

যাই দিদি! আঃ। সমস্ত বিছানা যে ধুলোয় ভরে' গেল! দেখি,—খড়্‌খড়িটা বন্ধ করে' দিই!

—না না, ওটা একটু খোলা থাক্‌। ওরা আমায় ডাকচে।—ওরা আজ জানালা ভেঙে আমার ঘরে এসে আমাকে আলিঙ্গন করচে! এই ধুলোবালির কাঁকর উড়িয়ে আমার গায়ে কে আজ আবীর-কুঙ্কুম ছুঁড়ে মারচে।

* * * *

—ঠিক এই জানলাটির পাশে ঐ চৌকীর উপরে পাতা বিছানায় দিদি শুয়ে থাকতো—

বেণু—বেণু—আমিই বোধ হয় তাকে মারলুম?

—সে আপনাকে ক্ষমা করে গেছে!

—না না, ও-কথা বোলো না। বলো সে আমায় অভিশাপ দিয়ে গেচে। তার মর্ম্মান্তিক বেদনার অশ্রুজল, তার অন্তরের নিদারুণ যাতনা-বহ্নি আমার চারিদিকে বাড়বানল হ'য়ে ঘিরে থাকুক।

—সে আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করে' আপনার শুভ কামনাই করে' গেছে সমীরবাবু। না—না ভুল বল্‌চি— সে আবার ক্ষমা ক'রবে কি, সে তো আপনার

অপরাধই কিছু দেখতে পায়নি!

—সে আমায় অপরাধী ভাবেনি?

—না।

—কিন্তু সে যে চিরদিন বড় অভিমানিনী ছিল!

—না, তা' নয়। সে আর সে-মানুষ ছিল না! মরণের বাতায়ন-পথে সে নতুন জগৎ দেখতে পেয়েছিল। তার নয়নে শুধু আনন্দ, শুধু মাধুর্য্য, শুধু সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছায়া পড়েছিল!

—আমি কিছু বুঝতে পারছিনি! সত্যিই কি সে আমার নেই?—না না, এ' তুমি বোধ হয় পরিহাস ক'রছো বেণু!—বলো—কোথায় তাকে তোমরা লুকিয়ে রাখলে?

—ঐ যে নদীর শাদা বালুচর দেখা যাচ্চে—ঐ ছোট পাহাড়টাব নীচে মহুয়া-গাছগুলোর বাঁ পাশে তার নির্ব্বাণপীঠ! সে নিজে ঐ জায়গাটি পছন্দ করে গেছল!

—সত্যিই তবে পালিয়েছে? ক্ষমা চাইবার অবকাশও দিলে না? একটিবার দেখতে পেলুম না,—একটি কথা শুনতে পেলুম না।—

—যাবার আগে সে একটা কথা বলে গেছে সমীববাবু! বেশ জোর করেই বলে গেছে যে, লীলাকে বিয়ে ক'রলেও আপনি লীলার মধ্যে তাকেই খুঁজবেন শুধু!

—সে ভুল তো আমার ভেঙেছে বেণু—

—দিদিও এ-কথা বলেছিল! কিন্তু আপনার দেরী হ'য়ে গেল যে!

ভাবতবর্ষ, কার্তিক ১৩৩৪

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা

বাবা মারা গিয়েছিলেন অনেকদিনই, মাও হঠাৎ মারা গেলেন। নিরাশ্রয় মালতীকে তার দিদি কমলা ভবানীপুরে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখলেন।

মালতী কলকাতায় বেথুনে থার্ড ক্লাসে পড়ছিল। ভবানীপুরে এসে কমলার ছোট ননদ মৃণালের সঙ্গে গোখলে স্কুলে পড়তে লাগল।

কমলার দেবর নির্মল শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ভাল ছেলে। বছর বছর গোল্ডমেডেল ও স্কলারশিপ পায়। শিবপুরেই থাকে। ছুটিছাটা পেলে বাড়ী আসে।

বৌদির বোন মালতীকে নির্মল ছোটবেলা থেকে অনেকবার দেখেছে। তার মায়ের মৃত্যু এবং এখানে এসে থাকবার সংবাদও শুনেছে। তবু বাড়ী এসে এবার মালতীকে দেখে বেশ একটু বিস্ময় অনুভব করলে।

মালতী যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। তার ম্লান মুখ ও বিষণ্ন চোখদুটির পানে তাকিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই নির্মল মনে মনে ব্যথিত, সহানুভূতির একটি নিশ্বাস ফেললে।— আহা বেচারা।

কয়েকদিন যায়— সকালবেলা মালতী নির্মলের আদা ছোলা ও লেবুর সরবৎ নিয়ে তার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। নির্মল শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে বই গুছাতে গুছাতে মুখ না তুলেই বলে, বইগুলো মাঝে মাঝে ঝেড়ে গুছিয়ে রাখতে পারিস না রে — দেখ তো কিরকম ধুলো জমেছে—

কথা শেষ হতে না হতে মুখ তুলে মালতীকে দেখে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কুণ্ঠিত অপ্রতিভের মত বলে—ও আপনি, ইয়ে তুমি,—মালতী! আমি—আমি ভেবেছিলুম মিনি—

চিরদিন নির্মল মালতীকে 'তুমি' বলে এসেছে—আজ হঠাৎ মুখ দিয়ে আপনি বেরিয়ে যাওয়ায় উভয়েই অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। মালতী তার স্বভাবসিদ্ধ ধীর পদে অকুণ্ঠিত চিত্তে খাবার নিয়ে ঘরে এসেছিল। কিন্তু নির্মলের এই অপ্রতিভ ব্যতিব্যস্ত অবস্থা দেখে সেও যেন সঙ্কুচিতা হয়ে পড়ে।

কাচের গ্লাস ভরা সরবৎ ও আদা ছোলার রেকাবীখানি টুলের উপর আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বাইরে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। নির্মলের সামনে একা পড়ে তার যেন নিঃশ্বাস রোধ হবার উপক্রম হয়েছিল। জানলে সে কখনও এমন কাজে যেত না। মনে মনে ভাবে আর কোনদিনও সে নির্মলের খাবার-টাবার দেবার কাজে এগোবে না।

মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে নির্মল মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা অনুভব

করে। অথচ মালতীকে মৃণাল বলে ভুল করা এই সামান্য ব্যাপারের মধ্যে এমন কী ভয়ঙ্কর লজ্জা আছে, তার কারণ খুঁজে পায় না। মালতীকে সে অনেকদিন থেকেই দেখে আসছে, এবারে কেন তার সম্বন্ধে বাধো বাধো ঠেকছে! মৃণাল ও মালতী দুজনে একসঙ্গে স্কুলের বাস থেকে নামে। মৃণাল হাসতে হাসতে ছুটে এসে বলে, ছোড়দা, মালতীদি আজ মিউজিক ক্লাসে গানের এগজামিনে ফার্স্ট হয়েছে। তাছাড়া চিত্রাঙ্গদা রেসিটেশনে যা করেছে, চমৎকার।

নির্মল উঠানের রকের উপর বসে বৌদিদির মনুয়াপাখীর তারের খাঁচা মেরামত করতে করতে ঘাড় তুলে মালতীর দিকে তাকিয়ে উৎসাহিত স্বরে মৃদু হেসে বলে, সত্যি মালতী? আমাকে কিন্তু একদিন তোমার গান আর চিত্রাঙ্গদার রেসিটেশন শোনাতে হবে—

মালতী লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠে মৃণালের পেছনে মুখ আড়াল করে সেখান থেকে সরে যায়—।

বালিকা মৃণাল অকারণে উভয়কার মুখপানে তাকিয়ে সকৌতুক হাসি হাসতে থাকে।

মালতী ব্রীড়াবনত মুখে সরে গেলে নির্মল অকস্মাৎ মনে মনে দারুণ সংকোচ অনুভব করে। মালতীকে অমনভাবে কথাটা বলা বোধ হয় ঠিক হয়নি। কী ভাবলে সে, কে জানে! না, মালতী আজকাল বড় হয়েছে, ওর সঙ্গে সমীহ না করে চললে ভাল দেখায় না।

নির্মল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, এবার থেকে সে মালতীর মর্যাদা রেখে কথা কইবে। কিন্তু খানিক বাদে আবার ভেবে পায় না—মালতীর অমর্যাদাই বা সে কোনদিন কি করেছে। নিজে নিজে অকারণে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। মনের মধ্যে একটা লজ্জাবিজড়িত অস্বস্তি অনুভব করে। মালতী স্কুলের জামাকাপড় ছাড়বার জন্যে স্নানের ঘরে খিল দিয়ে ভাবে নির্মল তো তার সঙ্গে বেশ সহজ হেসে কথা কইলে, অকুণ্ঠভাবে গান শুনতে চাইলে, সে কেন সহজভাবে তার উত্তর দিয়ে আসতে পারলে না? কেন সে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পালিয়ে এল? তার এই অহেতুক লজ্জা দেখে নির্মল নিশ্চয় আশ্চর্যবোধ করেছে। নিজের ওপরে অত্যন্ত রাগ হয়—কিন্তু আবার সেই অহেতুকী সংকোচে মন ছুঁয়ে আসে।

কৈশোর-মনবৃন্তে যখন যৌবন-পুষ্পের নব মঞ্জরী ধরে, তখন পুলকহিল্লোলিত মানব-চিত্তের গতি নির্ণয় করা কঠিন। যার মন সে নিজেই তার কিছু ঠিক-ঠিকানা পায় না, চিত্তের বিপুল সুরভি দেহেমনে অপূর্ব শিহরন জাগিয়ে তোলে। কিন্তু কিসের যে সে সুরভি তা নির্ণয় করতে না পেরে অধীর ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে কস্তুরী হরিণেরই মত।

কমলার শাশুড়ী বলে—মালতীর সাথে আমাদের নিমুর বিয়ে দিলে কেমন হয় বৌমা?

কমলার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে—বেশ মানায় না! এর বেশী আর কথা হয় না।

রাত্রে কমলার স্বামী বিমলচন্দ্র খেতে বসলে মালতী মোরব্বা পরিবেশন করতে আসে।

কমলা হাসতে হাসতে সকৌতুক কণ্ঠে বলে, আচ্ছা, তোমার কাছে তো লতি কোনদিন লজ্জা করে না,—দুনিয়াসুদ্ধু লোকের সামনে গান গাইছে, আবৃত্তি অভিনয় করছে, ঠাকুরপোকে দেখলেই ও যেন ভাদ্রবৌয়ের মত লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। কেন বলো তো? বিমলচন্দ্র খেতে খেতে মালতীর প্রতি সস্নেহ চোখে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাস্যকৌতুকপূর্ণ স্বরে বলেন—তার অর্থ আমার চেয়ে মালতীই ভাল জানে। তুমি মাব সামনে বা বাইরের লোকের সামনে আমায় দেখলে লজ্জায় গুটিয়ে গিয়ে ঘোমটাব ভিতর লুকিয়ে পড় কেন?—যান, আপনি ভারী অসভ্য কিন্তু—বলতে বলতে লজ্জাবক্তা মালতী রাগের ভান করে দ্রুতপদে সেখান থেকে পালায়।

কমলা হাসতে হাসতে ডাকে, ওরে ও লতি,—মোরব্বা নিয়ে এলি,—পাতে দিয়ে গেলি না। শুনে যা,—তোর জামাইবাবু ডাকছেন,—মালতী উত্তরও দেয় না, ফিরেও আসে না।

স্কুলে মৃণাল প্রচার করে মালতীদি আমার ছোটবৌদি হবে। ক্লাসসুদ্ধু মেয়ে মালতীকে রহস্যে বিদ্রূপে জ্বালাতন করে তোলে। শান্ত লাজুক প্রকৃতির মালতী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে মালতী কথাটা ভাল করে ভাববার চেষ্টা করে। সকলেই তো একই কথা বলে, তা ছাড়া নির্মলের সম্বন্ধে তার এই বিপুল লজ্জারই বা কারণ কি, কিছু ঠিক করতে পারে না। অন্য অনেক পুরুষমানুষের সামনেও তো সে বেরোয়, কথাও হয়তো বলতে হয়। কিন্তু এমনতর লজ্জা হয় না তো তাদেব সামনে! তবে কি জামাইবাবু যা বলেছিলেন তাই সত্যি! এইটুকু মাত্র ভেবেই সে আর ভাবতে পারে না। লজ্জায় তার সারা মন ছি ছি করে ওঠে।

আবাব ভাবে, কেন তবে সে নির্মলের সামনে বেরুতে সংকুচিত হয়—তার মুখের দিকে চাইতে পারে না, কিন্তু নির্মলকে যে সে মোটে দেখতে ইচ্ছে করে না, তা তো নয়। বরং—এই পর্যন্ত ভেবে মালতী আর ভাবতে পারে না। দারুণ লজ্জায় নিজেকে ধিক্কার দিয়ে আপনি ঘেমে ওঠে।

নির্মলের ছুটি ফুরোয়, শিবপুরে চলে যায়। এবারে শিবপুরে গিয়ে তার যেন কিছু ভালো লাগে না। সব সময়েই যেন একটা শূন্যতা,—কেমন যেন একটা অস্বস্তি মনের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করতে থাকে। মালতীকে ভাবতে বেশ ভাল লাগে। ভারী সুন্দর মিষ্টি স্বভাবের মেয়েটি। যেমনি শান্ত ও নম্র, তেমনি সলজ্জ প্রকৃতি। দেখতে পরমাসুন্দরী না হলেও মুখখানি কিন্তু নিখুঁত; টানা ভুরুর নীচে স্নিগ্ধ শান্ত কালো চোখদুটি—টিকোলো নাকটি, চিবুকে টেপা গড়নটি, কেমনতর যেন মাধুর্যে পরিপূর্ণ।

নির্মল শনিবারের ছুটিতে ভবানীপুরে আসে, মা জিজ্ঞাসা করেন, এবার এত শীগ্‌গির ফিরলি যে নিমু? নির্মল অপ্রতিভভাবে মিথ্যা কথা বলে, ভবানীপুর ব্যাঙ্কে একটু দরকার আছে। মায়ের কাছে মিথ্যা কথা বলে মনে মনে অত্যন্ত কুণ্ঠা ও অপরাধ অনুভব করে।

কমলা বলে,—ঠাকুরপো, এখানকার এম্প্রেস সিনেমায় 'দেবদাস' ফিল্ম এসেছে, আমাদের নিয়ে চলো না। সেদিন লতি বলছিল, ওদেব স্কুলের মেয়েরা নাকি দেখে এসেছে। লতিরও দেখতে ভারী সাধ হয়েছে। কমলার সহাস্য আননের দিকে চেয়ে নির্মলের মনে হয় বৌদির কথার গূঢ় অর্থ আছে। হঠাৎ সে রূঢ়স্বরে বলে ওঠে, 'আমি ওসব পারবো না।' কমলা নিতান্ত বিস্মিত মুখে নির্মলের পানে তাকায়। বৌদির বিস্মিত মুখের পানে চেয়ে নির্মল লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি নরম হয়ে অনুনয়ের সুরে বলে—তোমরা দাদাকে নিয়ে দেখে এসো না বৌদি। আমার যে এবারে একটু কাজ আছে, তাই তো সময় হবে না।

মালতী স্কুল থেকে এসে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দালানের জানলার পাশে দণ্ডায়মান নির্মলের সাথে চোখাচোখি হয়ে থমকে দাঁড়ায়। অপ্রতিভ আবক্ত মুখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে—খাতা ও বইগুলো বুকের উপরে বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরে এগিয়ে এসে নত হয়ে ডানহাত বাড়িযে নির্মলের পায়ের ধুলো নেয়। বেলাশেষের পড়ন্ত রৌদ্র লেগে তখন শ্রান্ত মুখখানি তার টকটকে রাঙা হয়ে উঠেছে। স্বেদাক্ত ললাটে দু'তিন গুচ্ছ কুঞ্চিত চূর্ণালক অবিন্যস্তভাবে ভিজে আটকে আছে। নির্মল তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্তভাবে পিছু হটে সরে গিয়ে বলে ফেলে,—'একি, না—না—'

তার পরমুহূর্তেই নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে সংযত কণ্ঠে বলে—'ভাল আছো তো মালতী?'

মালতী নত নেত্রে মাথা হেলিয়ে উত্তব দেয়—হাঁ। 'পড়াশুনা বেশ চলছে তো?' একটু অপ্রতিভ হাসি হেসে মালতী মৃদুস্বরে উত্তর দেয,—'একরকম।' বৌদি খোকাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বলে, 'ঠাকুরপো, মালতীর গান শুনেছ?' বিপুল ঔদাসীন্য-ভরে নির্মল বলে,—'না।' 'একদিন ওর গান শুনো,— বেশ মিষ্টি গলা।' নির্মল অনাবশ্যক গম্ভীরভাবে একখানি অতি পুরাতন ম্যাগাজিনের পাতা উল্টিয়ে পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপনে মনোনিবেশ করে। বৌদির কথা কানেই শুনতে পায় না। বৌদি হেসে বলে, তুমি আজকাল বেজায ভাবিক্কি হয়ে পড়েচ ঠাকুরপো—নির্মল বই থেকে মুখ না তুলেই বলে,—তাই নাকি?

কমলা রাগ করে শিশু ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে উঠে চলে যায়।—'ওঃ, ভারী তো। এখনও তবু ইঞ্জিনীয়ার সাহেব হওনি। এর মধ্যেই এত দেমাক, আচ্ছা, দেখা যাবে। হাসিমুখে নির্মল ত্রস্তে ব্যস্তে বই ফেলে উঠে পড়ে—বৌদি, ও বৌদি, —যেয়ো না ভাই, শোনো, রাগ করো না—বৌদি ফেরে না।

নির্মল হাসতে হাসতে পিছু পিছু গিয়ে সাধ্য সাধনা করে, বৌদিদির রাগ ভাঙায়।

কমলা বলে,—'কেন? লতি কি আমাদের ফ্যালনা মেয়ে নাকি?'

নির্মল হেসে বলে,—'কে বলেছে এতবড় আস্পর্দ্ধার কথা?'

—'হ্যাঁ, দেখে নেব গো, লতার চেয়ে কত ভাল বৌ আসে তোমার। ওর না হয় রংটাই খুব বেশী কটা নয়। কিন্তু অমন মিষ্টি চেহারা ক'টা পাওয়া যায়? নিজের বোন বলে বলছি মনে কোরো না।'

নির্মল হেসে লুটিয়ে পড়ে,—'আমিও তো কোনওদিন তোমার বোনের চেহাবা তেতো—এমন বলেছি বলে মনে পড়ছে না বৌদি। নিরপবাধ আমার ওপরে অকস্মাৎ তোমার বোষ-নেত্র পড়ল কেন ভাই!'

কমলা রেগে ওঠে,—'হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমাদের জাতকে খুব চিনি মশাই।' কলহ বেড়ে ওঠে। নির্মল সতৃপ্ত হাস্যে উপভোগ করে।

কমলা নির্মলকে শিবপুরে চিঠি লেখে—'ঠাকুরপো, এই শনিবারে অতি অবশ্য বাড়ী এসো। লতা ও মিনাদের স্কুলে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক মূক-অভিনয় হবে। আমাদেব মিনা ও লতা অভিনয়ে নামছে। লতা সাজছে—শকুন্তলা। আমরা সবাই দেখতে যাবো। লক্ষ্মীটি ভাই, শনিবারে ঠিক এসো।'

নির্মল দু'দিন ধরে যাবো কি যাবো-না ভাবে; শেষে যাবোনারই জয় হয়। 'ছিঃ, দাদা কি ভাববেন! তা ছাড়া বৌদি ভারী দুষ্টু। সে হয়তো এই নিয়ে তাকে খুব বিদ্রূপ করবে।...মালতীও হয়তো কিছু ভাবতে পারে। না—না, গিয়ে কাজ নেই।

মানুষের নিয়মই যেখানে সে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল অনুভব কবে সেখানে সহজেই ভয পায়। কল্পনায় নানা বিরুদ্ধ বাধার সৃষ্টি কবে ফেলে। পাছে তার অন্তবের সঙ্গোপিত দুর্বলতাটুকু সকলের সামনে ধরা পড়ে যায় সেই ভয়ে নিজেকেই সে ক্রমাগত প্রতারণা করতে চায়। বৌদিদির পরে নির্মলের রাগ হয়। স্পষ্ট করে অভিনয়ের কথা লেখার কি দরকার ছিল? আবার অভিনয়ে কে কোন পার্ট নিয়ে নামবে সেটুকু পর্যন্ত খবর দিয়ে নিমন্ত্রণ করে প্রকারান্তরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া—শুধু 'শনিবারে নিশ্চয়ই এসো' এটুকু লিখলেই তো ঠিক হত।

সে শনিবারে নির্মল ভবানীপুরে না গিয়ে জোর করে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যায়। সিনেমা হতে ফেরবার পথে পরিচিত বন্ধুর বাডী থেকে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকখানি চেয়ে নিয়ে আসে।

নিশীথ রাতে সুপ্ত নিঃশব্দ কক্ষে মোমবাতির স্নিগ্ধ মৃদু শিখার পাশে সাগ্রহে ঝুঁকে অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়ে। নাটকখানির মধ্যে একটি অফুরন্ত গভীব মধুর রসের নব উপলব্ধি তাকে যেন মোহাবিষ্ট প্রমুগ্ধ করে ফেললে। এই বইখানি তো কয়েক বৎসর আগে কলেজে পাঠ্যপুস্তকরূপে অভিনিবেশ সহকারে পড়েছে। চিরে চিরে টীকা টিপ্পনী দেখেছে। কিন্তু কোথায় ছিল তখন তার এই অমৃতরসায়ন যা চিত্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পুলক-সুরভি বিস্তার করে দেহমন রোমাঞ্চিত করে তুলছে।

কালিদাসের শকুন্তলা যেন তার কাছে অনিন্দ্য সৌন্দর্যে সচেতন ও সজীব হয়ে ওঠে। মনের মণি-মুকুরে স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়ে ওঠে সরমকম্প্র শান্ত দুটি কালো আঁখি—আশ্রমবালারই মত পবিত্র নির্মল চাহনিটুকু তার।

পরের শনিবারে নির্মল বাড়ী আসে। বাড়ী ঢুকে প্রথমে মৃণালের সঙ্গে দেখা। কিরে মিনি, খবর কি তোদের? স্মিতমুখ নির্মলের চোখমুখে সোৎসুক জিজ্ঞাসার ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৃণাল খুশিমুখে ছুটে গিয়ে নির্মলের হাতখানি টেনে ধরে উৎসাহিত কণ্ঠে বলে—তুমি আর-শনিবারে এলে না কেন ছোড়দা? রবিবারে আমাদের স্কুলে শকুন্তলা 'ট্যাবলো' হল।—ভারী তো তোদের ট্যাবলো। শনিবারে আমি হাওড়া সিনেমায় একটা নূতন বিলিতি ফিল্ম দেখতে গিয়েছিলাম।

—ছাই বিলিতি ফিল্ম, আমাদের ট্যাবলোর সুখ্যাতি সমস্ত খবরের কাগজে দেখো দিকিনি—মৃণাল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে যায় কী চমৎকার মানিয়েছিল সেদিন মালতীদিকে যখন রুক্ষ চুলের রাশ পিঠে এলিয়ে, বাকল পরে, গলায় ফুলের মালা আর হাতে ফুলের বালা দিয়ে আশ্রমের ফুলগাছে জল দিচ্ছিলেন, হরিণ-শিশুদের কচি পাতা খাওয়াচ্ছিলেন, তখন এত চমৎকাব দেখিয়েছিল যে—

মৃণালের উচ্ছ্বসিত বাক্যধারা শেষ হবার আগেই ওপরের বারান্দা থেকে বৌদি ঝুঁকে বলেন—এই মিনা, তোকে আর অত শকুন্তলার বর্ণনা করতে হবে না, উপরে উঠে আয় দিকি, কাজ আছে। নির্মল উপরে এসে বলে, আসতে পারিনি বলে রাগ করেছো নাকি বৌদি? কমলা গম্ভীর মুখে বলে, তোমার না আসায় ওদের অভিনয়ের তো কিছু আটকায়নি যে তোমার উপর রাগ করব। নির্মল হেসে বলে, এটা তো রাগেরই কথা। নির্মল অন্য একসময়ে মৃণালকে আবার জিজ্ঞাসা করে —হ্যাঁরে, শকুন্তলার রূপ বর্ণনা তো খুব শুনলুম, আসলে এ্যাকটিং কেমন হয়েছিল কই কিছু তো বললি না।

উৎসাহিতা মৃণাল আনন্দ-প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলে, চমৎকার হয়েছিল ছোড়দা, শকুন্তলার পার্টটাই সবচেয়ে সুন্দর হয়েছিল সবাই বলেছে। অনসূয়ার পার্টও বেশ হয়েছিল। প্রিয়ম্বদা তত ভালো হয়নি। মহর্ষি কণ্ব আর গৌতমীর পার্টে অমিয়াদি আর উষাদিকেও সবাই সুখ্যাতি করেছে। জানো ছোড়দা, গাছে জল দিতে দিতে ভ্রমরের ভয় পাওয়ার জায়গাটা মালতীদি এমন চমৎকার করেছিল যে 'নাট্যকলা'র মতো বিশ্বনিন্দুক কাগজও প্রায় এক প্যারাগ্রাফ ভরে ঐখানটার সুখ্যাতি করেছে।

দুষ্যন্তের পার্টে কে নেমেছিল রে?—মিউজিকের টিচার চপলাদি। দুষ্যন্তের এ্যাকটিং ভাল হয়নি সবাই বলেছে। চেহারাতেও চপলাদিকে মানায়নি বাপু—

মৃণাল আপনমনেই উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনয়ের বর্ণনা করে যায়। অন্যমনস্ক নির্মল আনমনে কি যেন ভাবে। মৃণালের সব কথা কানে পৌঁছায় না। মৃণাল অকস্মাৎ ছোড়দার মুখের দিকে তাকিয়ে বাক্যস্রোত বন্ধ করে ফেলে। খানিক বাদে ক্ষুব্ধ অভিমানে মুখ ভার করে নিঃশব্দে উঠে চলে যায়। ছোড়দা একবার জিজ্ঞাসাও

করলো না—তুই কোন ভূমিকা নিয়ে নেমেছিলি মিনি?

মালতীর সঙ্গে দেখা হয়, নির্মল সপ্রতিভ মুখে স্মিতহাস্যে বলে, তোমার অভিনয়ের যেসব সুখ্যাতি শুনছি মালতী—

মালতী আরক্তিম হয়ে ওঠে—নির্মল কৈফিয়তের সুরে বলে—আমার সেদিন আসতে ইচ্ছে হয়েছিল খুবই— কিন্তু, কিন্তু— একটা কাজের জন্য পারলুম না আসতে।

নত-নেত্রা মালতীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নির্মল ঈষৎ উদাস কণ্ঠে বলে—অনেক সময়ে অনেক ইচ্ছাই তো মানুষের পূর্ণ হয় না।

নির্মলের মা নির্মলের সহিত মালতীর সম্বন্ধ করেন। কমলা উৎসাহিতা হয়ে ওঠে। বিমলচন্দ্র হাসেন, বলেন—আমি কিন্তু নতুর জামাইবাবুই থাকব। নিমুর সঙ্গে নতুন সম্পর্কের খাতিরে পুরোনো সম্পর্ক উঠিয়ে দিলে চলবে না। মৃণাল আনন্দে নেচে-গেয়ে অস্থির হয়। মালতীর চোখে-মুখে একটি গভীরতর আনন্দের সলজ্জ রক্তাভা স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

নির্মলের চলনে চাহনিতে ভঙ্গিমায় যেন অন্তরের পুলক-জোয়ার ক্ষণে ক্ষণে স্ফূর্ত হয়ে ওঠে। মালতীর নয়নের নিবিড় স্বপ্নাবেশের মাঝে নির্মলের তরুণ-জীবনের অরূপ স্বপ্ন রূপ ধরে যেন সার্থক হয়ে ওঠে।

নির্মল বাড়ী থাকলে মালতী গান গাইতে আপত্তি করে। নির্মল শুনতে পাবে বলে। নির্মলের সামনে বেরুতে, তাকে খাবার দিতে, পান দিতে যেতে আপত্তি করে। সামনে পড়লে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে।

মালতীর এই আত্মগোপন-প্রয়াসেব বিশিষ্টতর সলজ্জ ভঙ্গীটুকু নির্মলের কাছে তাব অন্তর-শতদলের পাপড়িগুলি যেন বর্ণে গন্ধে বিকশিত করে ধরে। নির্মলের মর্ম যেন তার সুরভি সম্ভারে বিভোর আবিষ্ট হয়ে পড়ে।

সারা সকাল, সারা দুপুর, সারা সন্ধ্যা বৌদির সঙ্গে গল্প যেন আর ফুরোয় না। বৌদি ঠাট্টা করলে মুখে বলে, তোমরা মেয়েছেলে ভারি বাজে কথা বকতে পারো বৌদি। কিন্তু মন যে তার ঐ 'বাজে কথা' শোনবার জন্যই একান্ত তৃষিত, অন্য কোনো কাজের কথা যে তাকে এত খুশী করতে পারে না— প্রতি ভঙ্গিতেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মা বলেন—কিন্তু কোষ্ঠী না মিললে তো হবে না! আমার নিমুর যে 'নরগণ'। মালতীর কোষ্ঠী ও নির্মলের কোষ্ঠী বিমলচন্দ্র তাঁর জ্যোতিষী গুরুদেবের কাছে দিয়ে আসেন—রাশিচক্র বিচার করতে।

মালতীর মুখ ম্লান হয়ে যায়। জোর করে শুষ্ক-হাসির রেখা অধরপ্রান্তে টেনে রাখে। হাসি নয়—সে যেন প্রচ্ছন্ন কান্না। নির্মলের প্রশান্ত সুন্দর ললাটে উদ্বেগের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে। কোষ্ঠী মেলে না। মালতীর রাক্ষসগণ। তাছাড়া রাশিচক্রে এত অমিল যে—এ-বিবাহে দম্পতির মনের মিল হবে না।

মা পিছিয়ে এলেন। নরে-রাক্ষসে বিয়ে—বাপরে! বিমলচন্দ্র নিজে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চা করেন। বললেন, জেনেশুনে এ বিয়ে তো দেওয়া যায় না কমলা। কমলা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ছাইপাঁশ তোমাদের জ্যোতিষী, আর 'গণ' আর 'রাশিচক্র' —এ-বিয়ে আমি দেবই। মনের মিল ওসব বাদ দিয়েও হয়। কিন্তু কমলার বিদ্রোহের ফল কিছু হয় না, বিয়ের কথা চাপা পড়ে যায়।

নির্মল হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর হযে ওঠে। বেশীরভাগ সময় বাড়ীর বাইরে কাটায়। বৌদির সঙ্গে গল্প করার সময় হয় না। বিলাতে পড়তে যাবার জন্য স্টেট স্কলারশিপের চেষ্টা করে।

মায়ের খুব অসুখ করে। কমলা তখন সদ্য-প্রসূত শিশু নিয়ে সূতিকাগারে। মালতী ও মৃণাল মায়ের শুশ্রূষা করে। নির্মলকেও থাকতে হয়।

মালতী এই ক'দিনেই যেন বদলে গেছে, নির্মলকে দেখে সঙ্কুচিতা হয়ে পড়ে না, পালাবার চেষ্টা করে না। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা দিব্য সহজভাবেই বলে। মুখের রেখাটি পর্যন্ত অবিকৃত থাকে।

নির্মল মালতীর প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ ব্যবহার করে।

মালতীর ক্লান্তিশূন্য সেবা-নৈপুণ্যের প্রতি বিস্ময়-বিজড়িত সশ্রদ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকে, তার সপ্রশংস দৃষ্টির মুগ্ধ ভাষা সেবাকারিণীর প্রতি যেন প্রসন্ন মনের মৌন-অভিনন্দন জানায়।

নিশা-জাগরণক্লান্ত তন্দ্রাজড়িত আঁখি ঘুমে জড়িয়ে আসে—ভোরের হাওয়ার স্নিগ্ধ স্পর্শে মালতী রোগিণীর শিয়র-পাশে ঢুলে পড়ে। নির্মল এসে পাশে দাঁড়ায়। নয়নে তার সুনিবিড় স্নেহচ্ছায়া ফুটে ওঠে। বিপুল মমতায়, সহানুভূতিতে, প্রেমে তাব হৃদয়পাত্র উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মালতীর জাগরণ-পাণ্ডুর করুণ ক্লান্ত মুখখানি যেন বাসিফুলের মতো ম্লান, কাতর বলে মনে হয়। নির্মলের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটি গভীর আঘাতের বেদনা টনটন করে ওঠে। তন্দ্রাবিষ্ট মুখখানির দিকে তাকিয়ে মনে হয এই ম্লান, করুণ মুখখানিকে পরিতৃপ্তির সানন্দ হাসিতে উজ্জ্বল করে তুলতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা বুঝি জীবনে আর কিছু নেই।

তারপরই মনে পড়ে যায় নিজের অক্ষম নিরুপায় অবস্থা। নির্মলের সারাটি মন বালিকার মতো বেদনাকুল হযে ওঠে।

নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে নির্মল ডাকে—মালতি, মালতি—লতা। রোগিণীর ঘুম ভাঙার ভয়ে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিম্ন করে সাবধানে ডাকতে হয়। নিজের অস্ফুট কণ্ঠস্বরের মধ্যে 'মালতী' নাম শুনে নিজেই সে যেন চম্‌কে ওঠে। মনে হয় কণ্ঠ বুঝি তার রুদ্ধ হয়ে আসছে। বুকের ভিতর দুরুদুরু করে মনে হয় সে যেন গোপনে কিছু চুরি করতে এসেছে—

মালতীর তন্দ্রা টুটে যায়, চম্‌কে সসম্বিতে সোজা হয়ে বসে। নির্মল বলে —আমি মার কাছে আছি। তুমি পাশের ঘরে একটু ঘুমোও গিয়ে মালতি—

মালতী বিনা প্রতিবাদে নিঃশব্দে চলে যায়। নির্মল মৃদু কণ্ঠে ডাকে, শোনো —নিশাশেষে অস্ফুট আলো-ছায়ায় নিদ্রিত রোগীর নিঃশব্দ স্তব্ধ কক্ষের মধ্যে নির্মলের অস্ফুট মৃদু কণ্ঠের 'শোনো' ডাকটিতে মালতীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেঁপে ওঠে। মনে হয় সে যেন ভয় পেয়েছে।

মালতী ফিরে নির্মলের পানে সপ্রশ্ন নেত্রে তাকায়। নির্মল বলে, কখন কোন ওষুধ দিতে হবে আমি তো জানি না, বলে দিয়ে যাও। মালতী রোগী সম্বন্ধে কর্তব্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিয়ে চলে যায়।

শেষ রাত্রির নিষ্প্রভ ম্লান তারা তখনও আকাশের গায়ে গোটাকয়েক লেগে থাকে। ঊষার পূর্বাভাষে নৈশ আকাশ সবেমাত্র হয়তো সাদা হয়ে ওঠে।

মালতীর সম্বন্ধে আসে—বিয়ের ঠিক্‌ঠাক্‌ হয়। নির্মলের বিলাতযাত্রার আয়োজন চলে। যাত্রার দিন ক্রমশ এগিয়ে আসে।

নির্মলের মনে হয়—এই আনন্দহীন নিরুৎসাহ মন নিয়ে সে পাস করতে পারবে না হয়তো। পর মুহূর্তেই মনে হয়— পাস না করলেই বা কী এমন ক্ষতি!

মালতীর মুখের দিকে তাকায়—স্নিগ্ধ ম্লান গাম্ভীর্যে সে যেন এক মহিমান্বিতা দেবীমূর্তি। তার কোনোখানে যেন নিবিড় হতাশার কালি বা তীব্র বিষণ্ণতার লেশ নেই। একটি সুকোমল সংযত ভঙ্গি তাকে সকল সময়েই সহজ করে রেখেছে।

নির্মল ভাবে—ভালো ঘরে, ভালো পাত্রে পড়লে মালতী নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে এবং স্বামীকেও সুখী করবে। নির্মল এতদিন যা কল্পনা করে আসছিল সে হয়তো সম্পূর্ণ অমূলক। তার হয়তো মোটেই কিছু সত্য ভিত্তি নেই।

বেদনায় তার অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দুঃখের মধ্যেও যেন তার একটি পুলক ছিল—একটি প্রশান্তি ছিল—যাকে সম্বল করে দুঃখ গ্রহণ করতে খুব কষ্ট হয়নি। কিন্তু এখন যেন মন সান্ত্বনাহীন তীব্র দুঃখে তিক্ত হয়ে ওঠে। সমুদ্রপারে যাত্রার বাকি দিন ক'টাকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে—যাত্রার দিনটিকে সামনে পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। নির্মলের যাত্রার দিন নিকটবর্তী হয়ে আসে। মালতীরও বিবাহের আশীর্বাদ হয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা কি যেন একটা জিনিসের খোঁজে বাড়ীর একটেরে একটি অব্যবহৃত ঘরে নির্মল প্রবেশ করে। দেখে মালতী ঘরের কোণে ছোট তক্তাপোষের উপর উপুড় হয়ে শৃঙ্খলিত মৃণাল-বাহুদুটির মধ্যে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। মনে হল সে যেন কাঁদছে— খু—ব নিঃশব্দ চাপা কান্না। বুঝি তার শব্দ বিধাতারও কানে পৌছায় না—এত সঙ্গোপন ও এত শব্দহীন। যে কাঁদছে সেও বুঝি এ কান্নার অর্থ ও রূপ সম্যকরূপে জানে না।

নির্মল স্তব্ধ হয়ে ঘরের ভিতরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মালতীর গোপন কান্না

যেন ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে তার চারিপাশে শরীরী হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে হল। নির্মল ভয়ে শিউরে ওঠে। বিবর্ণ মুখে নিঃশব্দ পদে ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়। বাড়ীর চারিদিকে দেয়াল যেন কারা-প্রাচীরের মতো ভয়ংকর ঠেকে। অব্যক্ত বেদনাবেগে নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। অধীর চিত্তে বাড়ীর মধ্য হতে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তার ওপরে পার্কের বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ে। কানে তার এখানেও ভেসে আসে বুকফাটা অস্ফুট চাপা কান্না। যেন পাতাল-প্রবিষ্টা অভাগিনী জানকীর বেদনামথিত অন্তরের অফুরন্ত নিঃশব্দ কান্না পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সসাগরা ধরিত্রী যেন তাঁর মাটি, জল, ধাতু, প্রাণী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্যানী দিয়ে বেদনাহতা দুখিনী কন্যার নিঃশব্দ আর্তকান্নার ধ্বনি চাপা দিয়ে রাখতে পারছেন না।

মালতী শ্বশুর ঘর করে। মৃণালও তার স্বামীর কাছে থাকে। নির্মল বিলাত থেকে পাশ করে এসে বোম্বাইয়ে উচ্চপদে কাজ করে। বিয়ের কথা তুললে বলে—ভালো মেয়ে কই? মনের মতো? আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত-অপরিচিত সকলকারই প্রয়াসের অন্ত নেই—এই দুর্লভ পাত্রটিকে করায়ত্ত করবার জন্য। নির্মল হাসে—বলে—বিয়ে করতে তো অ-রাজি নই—কিন্তু পাত্রী কোথায়?

সত্যিই সে মনেব মতোটি পায় না বলেই বিয়ে হয় না। বিয়ের জন্য যে সে নিজেও উৎসুক হয়ে ওঠেনি তা তো নয়।

বম্বের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টারের মেয়ে কুমারী সুমিত্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু উচ্চ উপাধি-ভূষিতা হয়ে স্থানীয় নারী-শিক্ষার সংস্কার এবং সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ কামনায় ব্যাপৃতা থাকেন। তাঁর রূপগুণ ও যশের সৌরভ দূরদূরান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। কার্যব্যপদেশে সুমিত্রার সহিত নির্মলের মেলামেশা করতে হয়। সুমিত্রাদের বাড়ী নির্মল প্রায়ই নিমন্ত্রিত হয়। তাছাড়া দিবসব্যাপী কঠোর নীরস পরিশ্রমের পর অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যাটা সুমিত্রাদের ওখানেই বিলিয়ার্ড বা টেনিস খেলে কিংবা গল্প-গুজব-হাসিতে কাটিয়ে আসে। নির্মলের প্রতি রূপসী বিদুষী সুমিত্রার অনুরাগ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ক্রমশ।

নির্মল নিজের অন্তর হতে কোনো প্রেরণা অনুভব করে না। সুমিত্রার অন্তরের ভাষা বুঝতে পেরে চিন্তিত মনে কত-কী ভাবে। সে ভাবনার যেন কোনো ধারা নেই—কিছু ছন্দ নেই।

সুমিত্রাকে ভালো লাগে না তা নয়, কিন্তু তাকে ভালোবাসা যায় কিনা বুঝতে পারে না। সুমিত্রাকে শ্রদ্ধা করা যায়, প্রীতি দেওয়া যায়, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের আসন নেবারও তার যোগ্যতা আছে, কিন্তু তা বলে কি সুমিত্রাকে সমস্ত মনেপ্রাণে, হৃদয়ের নিবিড় বাঁধনে জড়িয়ে নিয়ে প্রেমের অর্ঘ্য দেয়া যায়?

'বিয়ে' জিনিসটা নির্মলের কাছে ঠেকে যেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের সবচেয়ে নিবিড় অনুভূতি দিয়ে,—সারাটি প্রাণের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য ও সঞ্চিত রস দিয়ে—মানবমনের

সুন্দর ও সুকোমল বৃত্তিগুলিকে একত্র জড় করে—একটি সুন্দরতম নব সৃষ্টি। সারা জীবনের বিকাশ ও পরিণতিকে যেন একটি শতদলরূপে বর্ণে গন্ধে সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত করে জীবনদেবতার পায়ে অর্ঘ্যদান করা। বিয়ে যেন তাই তার কাছে মাধুর্য্যপ্লুত কল্পনা ও রঙিন স্বপ্নের দুর্লভ সামগ্রী হয়ে উঠেছে। বাস্তবের কঠিন মাটির উপরে রক্তমাংসে গড়া একটি আকাঙ্ক্ষিতা নারীকে এই বিবাহ-বাসরে নিয়ে এলে তার চিত্তের লীলা-স্বপ্ন ভেঙে যাবে বলে ভয় হয়।

কুমারী মেয়ে তো অনেক দেখল সে—কিশোরী, তরুণী, পূর্ণ যুবতী, অশিক্ষিতা, অল্প-শিক্ষিতা, উচ্চ-শিক্ষিতা, স্নিগ্ধ সুন্দরী, পরমাসুন্দরী, কিন্তু কই? এতগুলি বাঙালী, ইংরেজ, পার্শী, মাদ্রাজী—বিভিন্ন দেশের নানানতর নারী তার চিত্ত-মন্দিরের সামনে দিয়ে পথ চলে গেল। কিন্তু সে তো কোথাও তাদের পায়ের চিহ্ন খুঁজে পায় না।

প্রথম যৌবনে কিশোরী মালতীর প্রতি অনুরাগের কথা মনে পড়ে। অধরপ্রান্তে করুণ হাস্যের ক্ষীণরেখা ফুটে ওঠে।

অন্তরকে উপভোগ করা যায় অন্তরেরই মধ্যে। বাহিরের দাবি, দেহের দাবি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষ আত্মপ্রতারণা করে তার চিত্তের দাবির দোহাই দিয়ে। নির্মল মনে ভাবে সে কখনও কাউকে ভালোবাসেনি, হয়তো আর বাসতেও পারবে না। বিয়ের জঞ্জাল জড়িয়ে অন্তরের কল্পনা-বিলাস নষ্ট করবে না।

তবুও একদিন বিয়ের ঠিক হয়ে যায়। সেই বোম্বাইয়ের বিদুষী কুমারী সুমিত্রারই কাছে নিজেকে বাগ্‌দত্ত করে দিতে হয়।

বিয়ের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসে। উৎসব আয়োজন চলতে থাকে। সমারোহেব কার্পণ্য নেই। বিবাহের মাত্র দুটি দিন বাকি।

মৃণাল তার স্বামীর কর্মস্থান ভাগলপুর হতে নির্মলকে চিঠি লিখেছে—'মালতিদি তার স্বামীর সঙ্গে আমার কাছে বেড়াতে এসে আট দিনের টাইফয়েডে মারা গেছে। একটিমাত্র মেয়ে রেখে গেছে, তার বয়স তিন বৎসর।. নাম—নির্মলা। মেয়েটিকে সে খুব ভালোবাসতো। একদণ্ড বুক থেকে নামাতো না।

'অসুখে তার জিভ আড়ষ্ট হয়ে কথা বলার শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে মেয়েটির নাম করে তাকে খুঁজত। মেয়েকে সামনে দিলে কিন্তু চিনতে পারতো না।

'মারা যাবার সময় চারিদিকে চেয়ে অস্পষ্টভাবে নির্মলার নাম করেছিল। তাকে দেখতে চাইছিল। আমরা নির্মলাকে সামনে দিয়েছিলুম, কিন্তু সে বিকারের ঝোঁকে চিনতে পারেনি। ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। ঠোঁট ফুলে ফুলে ছোট মেয়েব মতো ঝরঝর্ করে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তারপব সব স্থির হয়ে গেল।'

মৃণাল কান্নাকাটি করে আরও অনেক কথাই লিখেছে। মালতীরই কথায় চিঠিখানির আট পাতা ভরা।

নির্মল নিজের বিবাহ-উদ্যোগের উৎসবসমারোহপূর্ণ প্রাসাদেব পানে তাকিয়ে

নিস্তব্ধভাবে বসে থাকে। সন্ধ্যার রঙীন মধুর আলো তার নয়নে যেন প্রগাঢ় অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়।

গেটের সামনে প্রকাণ্ড সাদা মোটর হতে রঙীন রেশমী মহার্ঘ পরিচ্ছদ-ভূষিতা সুমিত্রা দীপ্ত প্রফুল্ল মুখে নেমে আসে।

মূল্যবান জরির জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দে, অলঙ্কারের মিষ্ট শিঞ্জনে ও বিলাতী সুরভিসারের মধুর সুগন্ধে বাতাস বিধুর হয়ে ওঠে।

বহুমূল্য কমলহীরার এনগেজমেন্ট অঙ্গুরি-শোভিত হাতখানি নির্মলের কাঁধের উপরে রেখে প্রফুল্লমুখী সুমিত্রা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করে, কই, তুমি এখনও তৈরি হওনি যে! সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবে কখন? নির্মল বিহ্বল নয়নে হাস্য-প্রদীপ্ত-নয়না সুমিত্রার প্রেমোজ্জ্বল মুখখানির পানে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে বার করতে চায়। তার কানে তখন যেন ভেসে আসে ধরিত্রীর অতি নিম্নতম প্রদেশ হতে এক অব্যক্ত নিঃশব্দ কান্না, যার শব্দ এতটুকু মাত্রও নেই, কিন্তু অস্তিত্ব অতি গভীর... জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী বলেই মনে হয়।

উত্তরা, আষাঢ় ১৩৩৫

পাতানো-মা

কোঁক্‌ড়া চুল, বুক-পিঠ পাতলা, সরু-সরু-হাত-পা, রোগা-টিঙ-টিঙ-টিঙে ছেলেটি প্রত্যহ সকালবেলা বাঁ-হাতে একটা মাছ্‌-আনা'র তারের গোলাকার খালুই ঝুলিয়ে আর তরকারী বেঁধে আনার মোটা চৌখুপি কাটা ঝাড়নখানা ডান হাতে নিয়ে—ধূলি-বিবর্ণ চটীজুতাব ফটাৎ-ফটাৎ শব্দ তুলে স্যাঁত্‌সেঁতে অন্ধকার একতলা বাড়ীটির উঠানে এসে দাঁড়িয়ে একই রকম টানাসুরে প্রতিদিন ডাকে—দিদ্‌—মা—

ময়লা কেটের কাপড়-পরা শীর্ণমূর্ত্তি বৃদ্ধা বিধবা রান্নাঘরের ভিতর হ'তে বেরিয়ে এসে বলেন—অ বৌমা,—নিতু এসেচে—বাজারের পয়সা দিয়ে যাও—তারপর আঙুলের দাগে সংখ্যা গুণে গুণে পয়সার হিসাব করতে কবতে বলেন—বেগুন তিন পয়সা,-—নটেশাক এক পয়সা,—উচ্ছে এক পয়সা,—আলু আধসেব,—কুমড়ো তিন পয়সা,-—না, থাকগে দু' পয়সার দু' ফালিই নিও, হবে অখন্‌—

এমনি ক'রে হিসাব করেন।

নিতু নিরুদ্যম ভাবহীন মুখে তারের শূন্য খালুইটা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে বলে—মাছ ক'পয়সার আসবে?

বৃদ্ধা আবার নিবিষ্টচিত্তে আঙুলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে হিসাব করেন—কুচো চিংড়ি দু' পয়সা—পারসে আধপো নিও—আর হ্যাঁ—শিঙি কি মাগুর যদি পাও তো একটা এনো—ন্যাড়া'র ক'দিন আমাশা জ্বর হয়েছে—আজ চাট্টি ভাত-পথ্যি ক'রবে—

ঘোমটা-দেওয়া তরুণী বধূ বেরিয়ে এসে নিতুর হাতে আলগোছে পয়সা সিকি দু'আনি গুণে ফেলে দিয়ে আবার নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকে যায়।

এক ঘণ্টা তিন কোয়াটার্‌ বাদে বন্ধ সদর দরজার কড়া কড়কড় শব্দে নড়ে ওঠে।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে সাড়া আসে—খুলে দিচ্ছি—তাবপর ব্যস্ত স্বরে শোনা যায়—অ বৌমারা,—কোথায় গেলে গা?—নিতু এসেছে—সদর দরজা খুলে দিয়ে এসো না মা,—

নাতি-খর্ব্ব নাতি-দীর্ঘ দুটি তরুণী বৌ ভাঁড়ারঘরের ভিতর হ'তে বেরিয়ে আসে—একজনের ডান হাতের আঙুলগুলি চুন-খয়েরের দাগে রাঙা—জলে ভেজা; আর একজনের দু'হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তালুদ্বয়ে ভিজে ময়দা জড়ানো। দু'হাত রগ্‌ড়ে আঙুলে জড়ানো ময়দাগুলি তুলে ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসে।

মাথায় দু'জনাই প্রায় সমান। গায়ের রং একটিব ফর্সা, একটির উজ্জ্বল শ্যাম।

একজনের পরনে রাঙা সরু খড়কে ডুরে—আর একজনের মিলের সরু নরুণ-পাড় ধুতি!

দু'জনেরই গায়ে আধহাতা শাদা প্লেন সেমিজ।

বৌয়েরা গিয়ে দরজার খিল খুলে দেয়। নিতু ঝাড়নে বাঁধা আনাজ ও খালুইয়ে ভরা মাছ নিয়ে বাড়ীর ভিতরে আসে।

ঝাড়নের পুঁটুলির ভিতর হতে পঞ্চমীর চাঁদের গড়নের কুমড়োর ফালি—শাকসুদ্ধ মূলার মুখ, লাউশাকের কচি সবুজ ডগা উঁকি মেরে বেরিয়ে থাকে।

নিতু মাছের খালুই নামিয়ে বাঁ-হাতটা নর্দ্দমার দিকে এগিয়ে ধরে। বৌয়েরা একজন হাতে জল ঢেলে দেয়।

হাত ধুয়ে ঝাড়ন খুলে নিতু আনাজপত্র বে'র ক'রে দাম হিসাব ক'রে পয়সা বুঝিয়ে দেয়। খালুই থেকে গোটাকতক পার্‌সেমাছ আর কচুপাতা মোড়া চিংড়ি বের্ করে' দিতে দিতে বলে—মাগুরমাছ একটা—ছ' পয়সার কম দিতে চাইলে না—পয়সায় কুলোয়নি তাই নিইনি।

তারপব বাকী মাছ-পূর্ণ খালুই ও ঝাড়নে বাঁধা অবশিষ্ট তরকারীর পুঁটুলী নিয়ে চটীর চটাস চটাস শব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

শাড়ী পড়া সুন্দর বৌটি ডেকে বলে—নিতুমামা,—পয়সা নিয়েও গেলেন না? আপনি যে দেড়টা পয়সা বেশী পাবেন হিসেবে।

—এসে নিয়ে যাব—বলে নিতু চলে যায়। সদর দরজার বাইরে থেকে একটু চেঁচিয়ে বলে যায়—মাইমা,—সদর দরজা বন্ধ করে' দেবেন—

নিতাই শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন। উকীল বেহারী চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র।

বয়স তের-চৌদ্দ।

মুখে ক্লান্ত অবসাদ যেন নিবিড় করে মাখানো। সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে চর্ম্মান্তরালবর্ত্তী হাড়গুলির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সুস্পষ্ট দেখা যায়। আধময়লা মিলের ধুতি,—বোতামহীন খাকী শার্টের হাতদু'টো এলিয়ে ঝল্‌ঝল্ করে—বুকের মাঝখানটা খোলা জামার ভিতর দিয়ে সর্ব্বদা সুস্পষ্ট।

চোখদু'টি যেন কাঁচা-ঘুমভরা, নিদ্রালস জড়ানো। তাতে অতৃপ্তি, বিবক্তি, অবসাদ ও ঔদাসীন্য যুগপৎ বিরাজমান।

এত অল্পবয়স্ক বালকের মুখে চোখে ললাটের রেখায় জীবন-যুদ্ধের ক্লান্তি যেন অপরিস্ফুটভাবেই ফুটে উঠেছে। তার দৃষ্টির করুণ-ক্লান্তি, স্বভাবের মৃদুতা সহজেই মানুষের মমতা আকর্ষণ করে।

আশৈশবই মামারবাড়ীতে মানুষ।

. দিদিমা দাদামশায়ও এখন আর নেই।

মামারা পাঁচ-সাতটি ভাই। সকলেই বিবাহিত এবং স-সন্তান।

মামারবাড়ীতে লক্ষ্মীদেবী এবং ষষ্ঠীদেবীর আশীর্ব্বাদের বিশেষ কার্পণ্য ছিল না। —কিন্তু শান্তিদেবী সে-সংসারের ত্রিসীমানায় নেই।

অষ্টপ্রহরই কলহ-কীর্ত্তন—অশান্তি-কিচকিচি চলে। রাগ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা—পরস্পর পরস্পরকে বাক্যে ও ব্যবহারে আহত ক'রবার প্রচেষ্টা—সংসারে প্রতিনিয়ত চলেছে।

পাড়ার সবাই কৌতুক উপভোগ করে। বলে—বিহারী উকীলের বাড়ীর ভিত্তির নীচে ঢেঁকি পোতা আছে। ঢেঁকিবাহন ঋষি তাই ওদের বাড়ী সর্ব্বদাই অধিষ্ঠান ক'রে থাকেন। তাঁরই বীণার সুরে ও-বাড়ীর বৌয়েদের কণ্ঠস্বরের সুর বাঁধা!

নিতাইকে মামীরা দেখতে পারে না।

একজন মামীর কাজ ক'রলে অপর মামী বিরূপ হ'ন্।

এক মামা বাধ্য হ'লে অন্য মামা রুষ্ট হ'ন্।

মোটের উপরে বেচারীর ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় দিন কাটে।

বেহারী উকীলের পাশের বাড়ীতে এক ভদ্র-কায়স্থ পরিবার ভাড়া থাকে।

একটি ছেলে—দু'টি সধবা ও বিধবা বৌ,—শাশুড়ী এবং একটি মা-মরা দৌহিত্র।

এই তাদের সংসার।

বৌদু'টি প্রায় সমবয়সী। বছর পনেরো-ষোল বয়স। শাশুড়ী শোকে-তাপে মমতা-দ্রব-স্বভাব,—মাটীর মানুষ।

উপার্জ্জনশীল ও উন্নতি-আশাযুক্ত ছোট ছেলেটি মৃত। বিধবা বৌ শাশুড়ীরই কাছে থাকে। বড় ছেলেটি চুঁচুড়া হাইস্কুলে সামান্য বেতনে মাস্টারী করে। তারই মাসিক পরিশ্রমের আয়ে কোনওরকমে সংসার চলে।

বৌ-দুটি পরস্পরে গলাগলি-ভাব। সংসারের খুঁটী-নাটী কাজ সারাদিন অশ্রান্ত মৃদু-গল্প-গুঞ্জনের মধ্য দিয়ে অবলীলাক্রমে করে যায়। কোনও কাজই তাদের মনকে নুইযে শ্রান্ত করে ফেলতে পারে না—বিরস করতে পারে না। দু'টি জায়ের অগাধ-প্রীতির অমিয়া মৃদু কথাবার্ত্তা ও হাসি গল্পে গুঞ্জরিত হয়ে মনের মূলে রসসিঞ্চন করে।

শাশুড়ী রান্না করেন—পাড়া প্রতিবেশীর সুখে-দুঃখে রোগে-শোকে বিপদে-আপদে আন্তরিক সহানুভূতিতে সাহায্য করেন। আর্থিক না হোক—কায় মন এবং বাক্যে। মা-মরা দৌহিত্র মুরলী ওরফে ন্যাড়া স্কুল যায়—ঘুড়ি ওড়ায়,—দুরন্তপনা ক'রে ফেরে।

বিহারী উকিলের নাতি নিতাই প্রতিদিন নিজেদের বাড়ীর বাজার করে। তার সঙ্গে পাশের বাড়ীরও বাজার কিনে এনে দেয়। ওদের বাজার করার লোক নাই। —গৃহিণীর ছেলে সুভাষ পৌনে ন'টার মধ্যেই ভাত খেযে আফিস্ বেরিয়ে যায়।

সুভাষের মা নিজ হতে ডেকে স্বভাবসিদ্ধ কাতর অনুনয় সুরে বলে—নিতু -দাদু,—তোমাদের বাজারের সঙ্গে আমাদের বাজারটি যদি রোজ ক'রে দাও,—আমাদের ভারী উপকার হয়,—আমাদের বাজার সামান্যই ভাই।

নিতাই বলে—বেশ তো দিদিমা,—আপনি সেজন্য এত কুণ্ঠিত হ'য়ে বলছেন কেন?

আষাঢ় মাসের মেঘাবগুণ্ঠিত গম্ভীরকান্তি প্রভাত।—নিতাই সুভাষবাবুদের বাড়ীর ভিতরে আসতে আসতে ডাকে—দিদ্—মা—আ—

ভাঁড়ারঘরের সামনে দালানে ব'সে বিধবা বৌটি কুটনো কোটে।

সিঁথার উপরকার ঘোমটা ভ্রূ পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে একটু ইতস্তত ক'রে অস্ফুট স্বরে বলে—মা বাড়ী নেই।

নিতু বলে—বড়মাইমা কোথায় ?

—বটঠাকুরের সর্দি হয়েছে, পায়ে তেল মালিশ করে' দিচ্ছেন।

ও-ও, —বাজারের পয়সা দেবেন কি? কি কি আসবে?

ছোট বৌ একটু ইতস্তত কবে বড় জা'কে ডাকবে কিনা ভাবে। তারপর উঠে ভাঁড়ারঘরের ভিতর ঢোকে।

একটু বাদে বেরিয়ে মৃদুস্বরে বলে—আলু তিনপো,—বেগুন একপো,—সিম, কাঁচকলা, পটোল—ঢেঁড়স্—

ঝমঝম্ শব্দে খুব জোরে বৃষ্টি নেমে আসে।—এই-য্যা। মাটী করলে দেখচি। নিতু উদ্বিগ্ন মুখে উঠান থেকে উঠে এসে টালি-ছাওয়া দালানের উপর এককোণে দাঁড়ায়।

ছোট বৌও দালানে অপর প্রান্ত হ'তে চিন্তিত মুখে আকাশের দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বলে—তাই তো,—

নিতাই উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে বিবস মুখে আকাশেব মেঘের পানে তাকিয়ে কতক্ষণে বর্ষণ ক্ষান্ত হবে তাবই আন্দাজের চেষ্টা কবে।—ভাঁড়ারঘরের পাশেই ছোট্ট রান্নাঘরটিতে কি-একটা ব্যঞ্জনের রস শুকিয়ে গিয়ে কড়ায় সোঁ সোঁ—চোঁ চোঁ শব্দ ওঠে। ছোট বৌ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের ভিতরে প্রবেশ করে।

অনেকক্ষণ বাদে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে—নিতাই ঠিক তেমনিভাবেই দালানের দেয়ালে একটা হাত রেখে বৃষ্টির দিকে চেয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোট বৌ আস্তে আস্তে কুণ্ঠিত স্বরে বলে—নিতুমামা, ঐ বাক্সটার উপরে বসুন না,—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন ?

বৃষ্টির শব্দে নিতাই কথাগুলি ভাল শুনতে পায় না। ছোট বউয়ের দিকে চেয়ে সসম্ভ্রম সুরে বলে—আমাকে কি কিছু বলছেন ছোটমাইমা ?

ছোট বৌ আবার পূর্ব্বকথার পুনরাবৃত্তি করে।

মবচে-পড়া কুলুপ-লাগানো একটা জীর্ণ বিবর্ণ কাঠের সিন্ধুক দালানের এক কোণে বসানো ছিল।

নিতাই তারই উপরে বসে পড়ে হতাশ স্বরে আপনা আপনিই বলে—শীগগির থামবে বলে তো মনে হচ্ছে না। মুস্কিল—

ছোট বৌ আবার রান্নাঘরের ভিতরে চলে যায়।

খানিক বাদে কড়কড় টুংটাং শব্দে শিল পড়তে আরম্ভ হয়।

ছোট বৌ হলুদমাখা হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে উৎসুক নয়নে ঈষৎ অবগুণ্ঠিত মুখে বেরিয়ে আসে। দেখে—নিতাই ডাকঘরের মোহরাঙ্কিত, ঠিকানা লেখা,

মুখ খোলা জীর্ণ পুরানো একখানি খাম হাতে নিয়ে তাব ঠিকানাটার দিকে নির্ণিমেষ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শিলের ঠুংঠাং শব্দে খেয়াল নেই।

ছোট বৌ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দালানে এসে দাঁড়াতে তাব নিমগ্ন ভাবটা যেন কেটে গেল। মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে সেই ছেঁড়া খামখানা উঁচু করে তুলে ধ'রে ম্লান অথচ উৎসুক হাসি হেসে বলে—এই খামেব উপরকার নামটা কা'র মাইমা? আপনাদেরই বাড়ীর কারুর নাকি?

ছোট বৌ একটু এগিয়ে এসে লক্ষ্য করে দেখে—খামের উপরে স্পষ্ট গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে লেখা—'শ্রীমতী অনসূয়া দাসী, কেযাব অফ'—ইত্যাদি—

অনসূয়া ছোট বৌ-এব নিজেরই নাম।

একটু লজ্জিত হয়ে পড়ে মূহূর্ত্তেক ইতস্তত করে' লুণ্ঠিত হেসে বলে—ওটা আমাবই নাম।

নিতাই তার দিকে চেয়ে একটু বিস্মিত স্বরে বলে—আপনারই নাম? ও ও ও,—

তারপর এক মুহূর্ত্ত পরে কৈফিয়ৎ-এব সুরে অন্যদিকে চেয়ে বলে—আমার মায়ের এই নাম ছিল। আমি এ নামটি আব কারুর কখনো দেখিনি। আজ এই খামটার উপরে এ নাম দেখে একটু আশ্চর্য্য লাগলো কিনা, তার জন্যেই—

এই পর্য্যন্ত বলে' কথাটা অসমাপ্তির মধ্যেই নিতাই সমাপ্ত করে দেয়।

শিলগুলো ছিটকে ছিটকে এসে দালানের ভিতরে পড়ে। নিতাইয়ের পায়ের কাছে—কোলের উপরেও দুই এক টুকরা এসে পড়ল।

—খুব শিল পড়ছে তো!—বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে নিতাই শিল ধরে।

অনসূয়া দালানে ছড়ানো বঁটি ও আনাজপত্রগুলি নিতাইয়ের দিক থেকে সরিয়ে অন্যপ্রান্তে এনে ভাঁড়ারঘরের দরজার সামনে বসে কোটে।

নিতাই একমুঠা শিল নিয়ে—কনকনে শৈত্যে ডান হাতে বাঁ-হাতে তোলাপাড়া করতে করতে বলে—মাইমা,—শিল নেবেন? এই নিন—

অনসূয়া একটু ম্লান হেসে কুণ্ঠিতভাবে হাত পাতে।

নিতাই শিলগুলি তার হাতে ঢেলে দিলে পরে সে উঠে গিয়ে সেগুলি ভাঁড়ার-ঘরে খাবাব জলের কলসীর ভিতরে ফেলে আসে।

তারপর খানিকক্ষণ আর কোনও কথাবার্ত্তা হয় না।

ছোট বৌ আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে অন্যমনস্কভাবে কি যেন একটা ভাবে। মুখে অপবিস্ফুট ম্লান ছায়া ঘনায়।

নিতাই হঠাৎ মৌনতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করে—আচ্ছা মাইমা, আপনার বাবা মা আছেন?—

অনসূয়া বঁটি ও আলুর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ম্লান কণ্ঠে বলে—মা নেই, বাবা আছেন।

তারপর আবার একটু চুপ্‌চাপ কাটে।

শিল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। বৃষ্টির বিরাম নেই, সঙ্গে বাদ্‌লা হাওয়ার মাতামাতি।

অনসূয়া কুণ্ঠিত বাধ-বাধ স্বরে জিজ্ঞাসা করে—নিতুমামা, আপনার মাকে কি আপনার মনে আছে?

নিতাই বিষণ্ণ হেসে উদাসভাবে বলে—না। তিনি আমাকে আঁতুড়ে রেখে মারা গেছেন।

অনসূয়ার মুখে ব্যথিত সহানুভূতির ছায়া স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

নিতাই বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে—শুনেছি মা নাকি অনেকটা দেখতে ছিলেন আমার মাসিমাদেরই ধরণের। মেজমাসিমার সঙ্গেই নাকি তাঁর চেহারার বেশী সাদৃশ্য ছিল।

তারপর একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে আবার আপনাআপনি বলে—মা'র কোনও ফটোও নেই। এমন কি তাঁর নামটি পর্য্যন্ত আমি এ অবধি কখনও আর কারুর শুনিনি। এই আজ প্রথম শুনলুম।

অনসূয়া একটু সকুণ্ঠ হাসি জোর করে টেনে এনে আস্তে আস্তে বলে—অথচ ও নামটা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকাল হ'তে—কালিদাসের আমলের সৃষ্টি। অনেকদিনের পুরানো।

নিতাই একটু বিস্মিতভাবে অনসূয়ার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—আপনি সংস্কৃত পড়েছেন নাকি মাইমা?

অনসূয়া নিতান্ত লজ্জিত ও বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বলে—না।

নিতাই বলে—হ্যাঁ,--মায়ের ও' নামটা বহুদিনের পুরানো হ'লেও, আর নামজাদা কাব্যের পাতায় লেখা থাকলেও তেমন চারিদিকে ছড়িয়ে ছি ছি হয়ে পড়েনি।—তারপর দু'জনে নানান্তর এ-কথা সে-কথা চলতে থাকে। কথাগুলি নিতাইযের মৃতা-মাতা অনসূয়াকেই কেন্দ্র করে' পথ পায়।

বৃষ্টি ধরে' যায়।

নিতাই অনসূয়ার কাছ থেকে বাজারের পয়সা নিয়ে চলে যায়।

অনসূয়া আবার রান্নাঘরে ভাঁড়ারঘরে ঘুরেফিরে এটা-ওটা খুঁটিনাটি কাজ করে। ভিজে কাপড়গুলি দেয়ালের পেরেকে পেরেকে আটকে শুখুতে মেলে দেয়। মনটা কিন্তু কি-যেন একটা অস্ফুট বেদনায় ভারী হয়ে থাকে!

বারেবারে মনে হয় নিতুমামা ছেলেটি খুব ভাল।

আহা—ওর মা যদি বেঁচে থাকত। তার কত আনন্দই না হতো ঐ ছেলেটিকে নিজের বলে নেড়ে-চেড়ে আদর-যত্ন করে!

মা বেঁচে থাকলে নিতাইয়ের যে কতটা লাভ হতো বা সে কতটা আনন্দে থাক্‌ত, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকত, সে-কথা অনসূয়ার একবারও মনে হয় না—শুধু নিতু-মামার মতো শান্ত-স্নিগ্ধ সুন্দর-স্বভাব ছেলেটিকে—নিজেরই ছেলে রূপে পেয়ে একান্ত

সহজ-দাবি স্বত্ব ও স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘিরে রাখতে পারলে তার মা কতখানি তৃপ্তি ও আনন্দ পেত—কল্পনায় যেন তারই পরিমাপ করতে চেষ্টা করে নিতান্ত অন্যমনস্ক-চিত্তে।

চৈত্র মাস। অসম্ভব গরম পড়েছে। সন্ধ্যাবেলা, দু'টি বৌ শাশুড়ীর কাছে বসে গল্প করে।

ছোটবৌ শাশুড়ীর পিঠের ঘামাচি খুঁটতে খুঁটতে বলে—জানেন মা, ও-বাড়ীর নিতুমামা একদিন বল্‌ছিলেন, আমার যা নাম, ওঁর মায়েরও নাকি ঐ নামই ছিল।

শাশুড়ী সস্নেহ হেসে বলেন—তোর নামটা তো বাছা কেমনতর অদ্ভুত। আমার মোটে মনেই থাকে না। কী অনুপমা না—অনুসমা—

বড়বৌ মৃণালিনী হেসে বলে—অনসূয়া।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ,—অনশুআ,—অনশুআ,—মনে পড়েছে এইবার;—আমার আবাব ছাই ও'সব নাম মনে থাকে না। বড়বৌমার নামটি ঠিক মনে থাকে—মেরনালিনী। আমার সইয়ের ঐ নাম ছিল।

মৃণালিনী বলে—মা, নিতুমামা ছেলেটি ভা—রী ভালো, নয়? আমাদের নেড়ু যদি অমনি হতো।

শাশুড়ী দু'খিত স্বরে বলেন—তোমাদেব বরাত মা। একটামাত্র ভাগ্নে,—মা' ওড়া ছেলে এত যত্নে সবাই মিলে মানুষ করার চেষ্টা কোরছো,—তা' এর আর ধীর-স্থিব সুবুদ্ধি হল না। ওরও অদেষ্ট, তোমাদেরও অদেষ্ট!

শাশুড়ী বিষণ্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন।

নাতি মুরলী ওরফে নেড়া বা নেড়ু—স্কুলে পড়াশুনা ছেড়ে পাড়ায় সখের থিয়েটার যাত্রা করে' বেড়ায়! খালি সাজ পোশাক বাবুগিরির দিকেই ঝোঁক! স্বভাবও নরম নয়, উগ্র। তার জন্য মামা, মামীদের, দিদিমার সবাইকার মনেই কষ্ট।

অনসূয়া আস্তে আস্তে বলে—নিতাইমামা অতো ভালো ছেলে,—তবু কিন্তু ওর মামীমারা ওকে একটুও যত্ন করে না।

শাশুড়ী বলেন,—কেন? নিতু কিছু বলে নাকি?

অনসূয়া ও মৃণালিনী উভয়েই বলে—না—আ,—নিতুমামা ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়! বুদ্ধিমান খুব,—ভারী চাপা স্বভাব।

শাশুড়ী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেন—মা, ও'রকম অভাগা দুঃখীদের ভগবানই অল্পবয়সে জ্ঞান-বুদ্ধি ধৈর্য্য-সহ্যশক্তি দিয়ে দেন—বলে' অনসূয়ার দিকে একবার বেদনা-গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরান।

শাশুড়ী-বৌ তিনজনে মিলে নিতুর কথা আলোচনা হয়—এমন সময়ে সাইকেলখানা হাতে ধরে তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে নিতু এসে বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে ডাকে—মাইমা—

অনসূয়া মাথার কাপড়টা ঈষৎ টেনে দেয়।

শাশুড়ী বলে—এই যে—এইখানেই আছি দাদা। এসো।—তারপর অনসূয়ার দিকে চেয়ে বলেন—আহা,—নিতুকে দেখে আবার ঘোমটা কিসের বৌমা? ও' তোমার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে—

কথায় কথায় কথা বাড়ে। বয়সের আলোচনা চলে। জন্মের সন সাল মাস তারিখ মিলিয়ে নির্ণীত হয়,—মৃণালিনীর চেয়ে অনসূয়া আট মাসের ছোট, আর অনসূয়ার চেয়ে নিতু এক বৎসর সাত মাসের ছোট।

নিতু বলে—মাইমা, আপনারা আর আমায় 'আপনি' বলতে পারেন না। সম্পর্কে ও বয়সে দুইয়েতেই আপনারাই বড়!

অনসূয়া একটু ম্লান ব্যথিত হাসি হেসে মৃদুকণ্ঠে বলে—কিন্তু জাতে?

নিতু বলে ওঠে—জাত বলে' মার্কামারা কিছু নেই। পৈতে থাকলেই যদি সবাইকার ব্রাহ্মণত্ব থাকতো তা' হলে দুঃখ ছিল না—

শাশুড়ী বলেন—সত্যিই তো বাপু, নিতুকে আবার তোমাদের 'আপনি আজ্ঞে' করা কেন? তোমাদের ন্যাড়াও যে,—নিতুও সে।

শাশুড়ীর কণ্ঠে আন্তবিকতার সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। নিতুকে মৃণালিনী ও অনসূয়া 'তুমি' ছাড়া 'তুই'ও বলে। নিঃসঙ্কোচে কথা কয, ঘরের ছেলের মতো আন্তরিক স্নেহে সহজ আদর-যত্ন করে।

শাশুড়ী সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন কবেন। তিনি নিজে এই বাপ-মা-মরা দুঃখী ছেলেটির প্রতি মমতায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।

নিতু অনসূয়ারই একটু অনুগত বেশী। মৃণালিনীর একটি মেয়ে হয়েছে, সে তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে বেশীরভাগ।

নিতাইয়ের স্কুলে একখানি ম্যাগাজিন ছাপা হয়। নিতাই তাতে লেখে। সে তার গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা যা কিছু রচনা—এনে অনসূয়াকে দেখায়। অনসূয়া যেগুলির প্রশংসা করে সেইগুলিকে ম্যাগাজিনে ছাপ্‌তে পাঠায়।

ছাপা হয়ে এলে—সেই ছাপার হরফে প্রকাশিত রচনাগুলি বার বার পড়েও তাদের তৃপ্তি হয় না।

কা'র আনন্দ বেশী হয়, বলা কঠিন। অনসূযার, না নিতাইয়ের।

নিতাই তার স্কুলের ছেলেদের কথা, পড়ার কথা, এগজামিনের কথা, খেলার কথা,—নব-প্রতিষ্ঠিত ক্লাব ও লাইব্রেরীর কথা অনসূয়ার কাছে সমস্ত গল্প করে।

মাঝে মাঝে এক-একদিন হযতো বলে—দেখুন মাইমা, আপনারা যে আমাদের কেউই নন্—যদি এ'বাড়ী থেকে উঠে আপনারা অন্য কোথাও চলে যান তা'লে আমাদের আর কোনও সম্পর্কই থাকবে না, এ কথা আমার মোটে মনেই থাকে না।

অনসূয়ার প্রসন্ন মুখখানি মুহূর্ত্তে ম্লান হয়ে যায়। কিছু বলে না, চুপ করে

বিষণ্ণ-হাসি হাসে মাত্র।

কোনওদিন হয়তো নিতু নিজের মা'য়ের গল্প করতে করতে বলে ফেলে —মাইমা, আপনার নামটার জন্যই বোধ হয়—আমার মনে থাকে না,—আপনি আমার কেউ নন, আপনারা কায়স্থ, আমরা বামুন।...জানেন মাইমা, আজকাল মা'র কথা ভাবতে গেলে যে মনে হয়—মা আপনারই মতন দেখতে ছিলেন।...নামটা একরকম কিনা।

অনসূয়ার কালো চোখদু'টি ছলছল করে। মুখে কেমন একটা ক্ষুব্ধ গাম্ভীর্য্যের ছায়া নেমে আসে। কিছু বলে না, চুপ করে থাকে।

দু'জনারই মনে একইসঙ্গে একটি গোপন সাধ জাগে।...একটা নূতন সম্পর্ক পাতাবার একান্ত ইচ্ছা মনকে নাড়া দেয়। কিন্তু কেমন একটা সঙ্কোচ আসে, বাধ'-বাধ' ঠেকে, পারে না। চুপ করে থাকে।...

পরস্পর পরস্পরের মুখে সে-প্রস্তাবটা শোনবার জন্য যেন নিজেদের অজ্ঞাতসারেই অপেক্ষা করে।

একদিন অনসূয়ার শাশুড়ীই সেই প্রস্তাবটি তুলে সব দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা চুকিয়ে দেন।

বলেন—আচ্ছা, নিতু তো দেখি ছোটবৌমারই বেশী অনুগত। তা' বেশ হয়েছে বাপু, নিতুরও মা নেই, ছোটবৌমাবও ছেলে নেই—ওরা দু'জনে মা-ছেলে সম্বন্ধ পাতিয়ে নিক, দিব্যি হবে অখন।

অনসূয়া এবং নিতু উভয়েই মনে মনে বিপুল খুশি হয়ে ওঠে।

তারপর থেকে নিতু এলেই শাশুড়ী বলেন—অ' ছোটবৌমা—তোমার ব্যাটা এসেছে বাছা! মৃণালিনী বলে—অনি, তোর ছেলে যে তোকে খুঁজছে।...নিতুকে বলে —তুই আমাকে 'বড়মাইমা' বলিস কেন রে? 'মামী' সম্পর্ক তোর আব নেই। এবার থেকে 'জ্যাঠাইমা' বলবি,—বুঝলি?

প্রথম-প্রথম একটু সঙ্কোচ হলেও ক্রমে তা কেটে যায়।

নিতু অনসূয়াকে ডাকে—মা!

অনসূয়া ডাকে—খোকা—

বৎসরের পর বৎসর কেটে যায়।

অনসূয়া অনেকদিন ধ'রে খুব অসুখে ভুগে' বাপের বাড়ী থাকে।

নিতু আই এস-সি পাশ করে' জব্বলপুরে বন্ধুর বাড়ী চেঞ্জে যায়।

বাপের বাড়ী থেকে ফিরে এসে অনসূয়া নিতাইকে চিনতে পারে না।

চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেছে,—এমন-কি গলার স্বরটি পর্য্যন্ত অন্যরকম হয়ে গেছে। ও যেন সেই রোগা ক্ষীণজীবি দুর্ব্বল 'নিতু'ই নয়।

দৈর্ঘ্য যতখানি উঁচু হয়েছে, প্রস্থেও তারই উপযুক্ত হয়ে উঠেছে।...চোখের

কোল আর বসা নেই,—চোয়াল ঢেকে মুখ ও গণ্ড নিটোল,—মুখে কালো গোঁফের ক্ষীণরেখা সুস্পষ্ট।—মুখে চোখে আগেকার সে করুণ অবসন্নতাও নেই।

বেশ স্বাস্থ্য-দীপ্ত আনন্দোজ্জ্বল প্রদৃপ্ত প্রসন্ন মুখকান্তি।

অনসূয়া নিতাইয়ের পেশীপুষ্ট দীর্ঘ বাহুদু'টির পানে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে বলে—খোকা, তোকে আর খোকা বলতে লজ্জা ক'রছে যে বাবা। —ঈস্—কত মস্ত-বড়ই হ'য়ে উঠেছিস হঠাৎ—

নিতাই হেসে বলে—আর কিন্তু মা দুঃখ ক'রতে পাবে না তুমি আমার রোগা চেহারার জন্যে।... 'এক্সারসাইজ' করে' করে',—কুস্তি শিখে,—আর ক'মাস জব্বলপুরের ঘি-দুধ জল-হাওয়ায় 'স্যাণ্ডো' হয়ে এসেছি।—বলে' গর্ব্বিতমুখে মৃদু মৃদু হাসে।

অনসূয়া একটুখানি ম্লান হেসে চুপ করে থাকে। সে তার দুর্ব্বল শীর্ণ খোকার এই যৌবন-দীপ্ত সুদীর্ঘ-সবল চেহারা দেখে যেন খুব বেশী আনন্দ বা তৃপ্তি পায় না। তার মনে হয়, এর চেয়ে সেই ছোট্ট রোগা—করুণ মুখ—খোকাই যেন ছিল ভাল।

নিতু বলে—কিন্তু মা, তোমাকেও যে আর মোটে চেনা যায় না।...কি ভয়ানক রোগা আর দুর্ব্বল হয়ে পড়েছো, বলো তো?

অনসূয়া ওষ্ঠাধরে উপেক্ষার রেখা ফুটিয়ে উদাস কণ্ঠে বলে—এখন যেতে পারলেই তো ভাল বাবা! এখানে শাশুড়ী, ওখানে বাপ,—এরা থাকতে থাকতে এঁদের কোলে গেলে—তবুও দুর্দ্দশা ভোগ ঢের কম ঘটবে।...নইলে—

বলতে বলতে আর বলতে পারে না। অনাগত অন্ধকার ভবিষ্যতের ভয়াবহ অনিশ্চিত দুঃখ দুর্দ্দশা যেন তার উদাস দৃষ্টির সামনে অপরিস্ফুটভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে।...মুখে চোখে গভীর বেদনাময় হতাশার চিহ্ন—বিষাদ হাসির আকারে ফুটে ওঠে! সে ক্ষীণ হাসিটুকু যেন কান্নার চেয়ে শতগুণ করুণতর।

নিতাইয়ের মুখে বেদনার মেঘ ঘনিয়ে আসে।...মনের মধ্য হতে অনেক কথা ঠেলে যেন বাইরে আসতে চায়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। নিরুপায় নতমুখে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।...অনসূয়ার মৃত্যু-কামনার প্রতিবাদ করে না।

অনসূয়া নিতুর আহত-মুখের দিকে চেয়ে উদাস হেসে বলে—হ্যাঁ খোকা, মরে গেলে মুখাগ্নি করবি তো ঠিক?...

নিতাই হঠাৎ মাথাটা উঁচু ক'রে অনসূয়ার মুখের দিক দীপ্তনেত্রে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে—নিশ্চয়ই—

অনসূয়া একটু সতৃপ্ত হাসি হেসে বলে—সে সময় কিন্তু কায়েতের মড়া বলে' ছুঁতে ঘেন্না করবি না তো? দেখিস—

নিতু মেডিক্যাল কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। চুঁচুড়া হ'তে কলিকাতায় ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে। অনসূয়াদের বাড়ী আগেকার মতোই যাওয়া আসা করে। তবে

এখন আর দৈনন্দিন বাজার করে না।

অনসূয়ার এক পিসশাশুড়ী অনসূয়াদের বাড়ী কিছুদিনের জন্য আসেন।

এর মধ্যে একদিন নিতু এসে বলে—এই যে তুমি এখানে মা, আব আমি সারা বাড়ী তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

অনসূয়া মৃদু হেসে বলে—কেন রে? নিশ্চয় ফরমাস আছে বুঝতে পারছি! কি বল শুনি!

নিতু বলে—আমরা ক'জন বন্ধু মিলে এক জায়গায় মাছ ধরতে যাবো, এখান থেকে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে—আমি ময়দা আলু আর হাঁসের ডিম এনে দেবো, তুমি আমার জন্য পরোটা আর ডিমের তরকারি কবে দিতে পারবে মা?—

অনসূয়া বলে—আচ্ছা। মুখে কিন্তু তার কী যেন একটা দুশ্চিন্তার অপ্রসন্ন ছায়া এসে পড়ে।

নিতুব সঙ্গে অনসূয়াকে গল্প ক'রতে দেখে পিসশাশুড়ী ভ্রূকুঞ্চিত নেত্রে সেদিকে বিস্মিত, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকান।...

সে দৃষ্টিতে অনসূযা ও নিতু উভয়েই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবে ও নিতু একটু বাদেই চলে যায়।

নিতু চলে গেলে পিস্‌শাশুড়ী অনসূয়াকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন— হ্যাঁ ছোটবৌমা, ও ছেলেটা কে গা! পিসশাশুড়ীর দৃষ্টি ও বলার ভঙ্গীতে অনসূয়া সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। একটু ইতস্তত করে বলে—ঐ যে—আমাদের পাশের ঐ হলদে বাড়ীটির ছেলে।

—তা, ছেলেটি তোমার কেউ হয বুঝি?...

অনসূযার মুখখানা যেন বিবর্ণ হয়ে ওঠে। নিশ্বাসরুদ্ধভাবে মাথা নেড়ে বলে —না। ছেলেটির মা-বাপ কেউ নেই,—ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া করে।...

পিস্‌শাশুড়ী কুঞ্চিত ভ্রূ ও ললাট এতক্ষণে বেশ প্রশান্তভাবে মেলে মাথা দুলিয়ে বলেন—ওহ্, এবার বুঝেচি।...আমি ভেবেছিলুম তোমার বাপের বাড়ীর সম্পর্কের কেউ হবে-টবে বা—

অনসূয়া অপরাধীর মতো অবনত মুখে সেখান থেকে সরে যায়।

পিস্‌শাশুড়ীর 'এইবার বুঝেচি' বাক্যটি কণ্ঠ দিয়ে যত সহজসুরে উচ্চারিত হ'ল —চিত্ত হতে তত সরলভাবে উৎসারিত হয়নি—তা' বুঝতে অনসূয়ার বাকী থাকে না।

পিস্‌সাশুড়ী তাঁর ভ্রাতৃবধূকে—অর্থাৎ অনসূয়ার শাশুড়ীকে গঞ্জনা দেন—সোমত্ত বিধবা বৌ—পাড়ার যতসব সোমত্ত ছেলেদের বাড়ীর ভেতরে এনে বৌয়ের সঙ্গে গল্প করতে দেওয়া।...কেন? আক্কেলের কি মাথা খেয়েছিস নাকি?... লোকে চোখে দেখলেই বা বল্‌বে কি?

শাশুড়ী কুণ্ঠিত-কাতবস্বরে বলেন—ঠাকুরঝি, চুপ কর ভাই।...ছোটবৌমা ও-ঘরে আছে, শুনতে পাবে। নিতু ছোটবৌমার চেয়ে ছোট,—দেখতে এখন অতবড় হয়ে উঠেছে,—তা'ছাড়া ও' যে ছোটবৌমাকে 'মা' বলেছে।...

—ন্যাকামি বাখ। 'মা' বলে ডাকলেই হ'ল? ...বয়সটা এখন কী, তা' দেখতে হবে না?...সোমত্ত ছেলে—সোমত্ত বিধবা বৌ—একসঙ্গে মিশ্‌তে দিচ্ছিস্—ভয়ডর নেই?...লোক-সমাজও তো আছে?

পাশের ঘরে অনসূয়া পূজার আসনে বসে, জপ করতে করতে শাশুড়ী পিস্‌শাশুড়ীর আলোচনা শুনতে পেয়ে ঘৃণায় বাগে অপমানে আড়ষ্ট কাঠের মতো স্থির হয়ে থাকে।

কবধৃত জপ-সংখ্যা আঙ্গুলের অর্দ্ধপথেই নিশ্চল হয়ে যায়।

তীব্র-ঘৃণা-লজ্জা-দুঃখে সমস্ত চিত্তটি মথিত নিষ্পিষ্ট হ'তে থাকে। অনসূয়া পীড়িত ক্ষুব্ধ চিত্তে ভাবে—ছি-ছি-ছি—কী ঘৃণার কথা।...মানুষেব বয়সটাই কী তাব সমগ্রতাব পরিচয়? না—বয়োধর্ম্মটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?...তাই যদি হয়, তা হলে মানুষ আব মনুষ্যত্বেব গর্ব্ব কবে কিসে? ইতব জন্তুব সঙ্গে তাব প্রভেদ কি?...'সোমত্ত-বয়সের' বিশ্রী ইঙ্গিত মানুষ মানুষেব প্রতি করে কোন মনুষ্যত্বের পরিচয় দ্বাবা।... বয়স বা প্রবৃত্তিব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বৃত্তি মানুষেব মধ্যেই আছে বলে এবং একমাত্র মানুষই এই বযোধর্ম্মকে জয় কবে প্রবৃত্তিব দাস না হ'যে তাব প্রভুত্ব কবতে পাবে বলেই না সে জীবজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?...

অনসূয়া ভাবে—পিসীমা নিজে সন্তানের মা হযেও 'মা-ছেলে' সম্পর্কের কৈফিয়ৎটাকেও এত সহজে অবজ্ঞা কবলেন কী কবে?

শাশুড়ী অনসূযাকে আড়ালে ডেকে বলেন—ছোটবৌমা, যে ক'দিন তোমার পিসীমা এখানে আছেন, নিতুব সঙ্গে তুমি কথাবার্ত্তা কযো না মা!...উনি ওটা তেমন পছন্দ করেন না।

অনসূয়ার মুখ অপমানে কঠিন হযে ওঠে। মুখ দিযে একটিও শব্দ বেরোয় না। নিশ্চল পুতুলের মতো দাঁড়িযে থাকে।

শাশুড়ী অনসূযার রুক্ষ মাথাটা নিজের কাঁধের উপরে টেনে নিয়ে বেদনা-রুদ্ধ-কণ্ঠে বলেন—কী করবো মা, আজ আমার ননী বেঁচে থাকলে কার সাধ্যি তোকে নিতুব সঙ্গে কথা কইতে বারণ করে?...আমারই বরাত্—নৈলে আমার অমন সুর-বীব ছেলে—বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে যায।

শাশুড়ীর স্নেহস্পর্শে অনসূয়ার স্তূপীকৃত কঠিন বেদনারাশি গলে অশ্রু হযে ঝরে পড়ে। অনসূয়া বাষ্পময়কণ্ঠে বলে—মা, সংসারের লোক কি অন্ধ?...তারা কি মা, চোখে দেখতে পায় না?

শাশুড়ী সান্ত্বনার স্বরে বলেন—না মা, সবাইকারই কি চোখে দৃষ্টি থাকে?...সংসারে

বেশীরভাগ মানুষই চশ্‌মা দিয়ে দেখে! আর তার সে চশ্‌মাব কাঁচ প্রায়ই কালো। কালো-কাঁচের ভিতর দিয়ে কালো বং ছাড়া কিছুতেই তো অন্য বং দেখা যায় না মা!...দুপুরের জ্বলন্ত রৌদ্রও যে সে কাঁচের ভিতর দিয়ে সন্ধ্যার মতো ম্লান দেখায়।...

প্রতিবেশিনীবা বেড়াতে আসে। অনসূয়া সংসারের কাজ করতে করতে তাদের সাথে মিষ্টালাপ করে।

নিতু দ্রুতপদে আসতে আসতে সেখানে প্রতিবেশিনীদেব অবগুণ্ঠিতা হতে দেখে তাড়াতাড়ি সরে যায়। সেখান হ'তে ডাকে—মা, শুনে যাও একবার। অনসূয়া গেলে নিতাই বলে—শীগগিব এই গেঞ্জিটাব দু'টো বোতাম বসিয়ে দিতে হবে—আর এই শার্টটার দু'জায়গা ছিঁড়ে গেছে—এক্ষুনি সেলাই কবে রাখো মা,—আমি একটু বাদে এসে নিয়ে যাব। বড্ড দবকার—

অনসূয়া জামাদুটি হাতে নিয়ে ঘবেব ভিতবে এলে প্রতিবেশিনীরা প্রশ্ন করে—বেহারী উকীলেব নাতি নিতাই না?—

অনসূয়া বলে—হ্যাঁ।

—তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বুঝি?...জ্ঞাতি-সম্পর্ক না কুটুম্ব?...

অনসূয়ার মুখ অন্ধকাব হয়ে ওঠে। বলে—ওরা বামুন, আমরা কায়েত,—জ্ঞাতি-কুটুম সম্পর্ক হবে কি করে?—

অপ্রতিভ হওয়াব ভান কবে জিভ কেটে গালে হাত দিয়ে প্রশ্নকাবিণী বলে—ও মা ঠিকই তো।..আমাব ও'কথা কিন্তু একেবাবেই মনে ছিল না—তুমি যেন কিছু মনে কোবো না বোন—

অনসূয়াকে কিছু মনে কবতে নিষেধ কবে তাঁবা নিজেবা যে অনেক কিছুই মনে ক'রে যান—তার প্রমাণ প্রকাশ হ'তে বড বেশী বিলম্ব হয না।

নিতু সাভিমান কণ্ঠে বলে—মা, আজ ক'দিন ধ'বে আমাব মসলার কৌটায় সুপুরি নেই—তোমায কেটে রাখতে বলেছি—তা' তোমাব বুঝি আব চাট্টি সুপুবি কাটার সময়ও আব হয় না!

অনসূয়া গম্ভীর স্ববে বলে—না, আমার তো ঐ একটিমাত্র কাজ নয।

নিতুর অভিমান প্রবল হয। বলে—থাক। আর কাটতে হবে না। সুপুরি খাওয়া ছেড়ে দিলুম।—

অনসূয়া বলে—বড় বয়েই গেল!—

নিতু বিস্মিতভাবে অনসূয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—ভুগে ভুগে তোমার মেজাজ ভারী খিট্‌খিটে হয়েছে মা।

অনসূয়া দপ্‌ করে যেন জ্বলে ওঠে। কঠোর কণ্ঠে বলে—দ্যাখো নিতু, আমার শরীর ভালো নয়। সব সময়ে তোমার হুকুমমতো কাজ যদি না-ই করতে পারি!... দিনরাত্রিই তোমার ফরমাস লেগে আছে।—কেন? তোমার তো নিজের মামীরা রয়েছে,

তাদের দিয়ে করাতে পারো না?...'মা' বলেচো বলে যেন আমার মাথা কিনেচো।—সত্যিই তো তোমার গর্ভধারিণী মা নই যে, তোমার এত জুলুম সইতে হবে!..

অনসূয়া দ্রুতপদে সেখান থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। নিতাই স্তম্ভিত মুখে সেদিকে চেয়ে নির্ব্বোধের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

শান্ত কোমল প্রকৃতি অনসূয়ার মুখ দিয়ে যে অকারণে এত কঠিন তীব্র কথা বেরুতে পারে নিতাইয়ের যেন ধারণাই ছিল না। নীরবে নত মস্তকে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

মৃণালিনী তার ঘর থেকে নিতাইকে হাতছানি দিয়ে বলে—নিতু, একটু শুনে যাও বাবা।

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখদুটা গোপনে চট করে মুছে নিয়ে ম্লানমুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিতাই মৃণালিনীর ঘরের সামনে দাঁড়ায়।

মৃণালিনী স্নেহস্নিগ্ধ নিম্ন কণ্ঠে বলেন—অনি তোমায় বকেছে—নয়?...কিছু মনে করিসনে লক্ষ্মী বাবা,—একে ওর রুগ্ন শরীর হয়েছে—তার উপরে পাঁচজনের পাঁচরকম কথায় ওর মনের মাথাব ঠিক থাকে না। ওব কথায় যেন মনে কষ্ট করিস্‌নি বাবা আমার।

নিতাই ম্লান হেসে উদাসকণ্ঠে বলে যায়—দূর, মনে আবার কী করবো।

অনসূয়া অম্লশূলেব ব্যারামে ভুগে ভুগে দীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়েছে।

যখন অম্লের বেদনা ওঠে, অত্যধিক যন্ত্রণায় কোনো কোনো সময়ে অজ্ঞানও হয়ে পড়ে।

চেহারা রোগা কাঠির মতো,—চোখদুটি শুধু অস্বাভাবিক বড় দেখায় শরীরের পক্ষে।

অম্লশূলের যাতনায় ক'দিন বিছানা থেকে উঠতে পারে না। সন্ধেবেলা শুয়ে শুয়ে জানালা-পথে দৃষ্টি মেলে সন্ধ্যাচ্ছায়ায়মান আকাশের দিকে চেয়ে ভাবে—মানুষ চিরদিন কেন সমান থাকে না?...খোকা কেন এত বড় হয়ে উঠল! আগেকার মতো সেই ক্ষীণ শীর্ণ বালকটি থাকলে তো আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকত না।...মানুষে যে বয়স এবং চেহারাটা নিয়েই সর্ব্বাগ্রে বিচার ক'রতে বসে—এই বয়সেব এই দু'টি নর-নারীর মধ্যে এই নির্ম্মল স্বচ্ছ অথচ নৈকট্য সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর কিনা।

অনসূয়ার ভাবনাগুলি খেইহাবাভাবে অনির্দিষ্ট পথে শিথিল চরণে ঘুরে বেড়ায়।

নিতু এসে দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে—আজ কেমন আছ মা?

অনসূয়া বলে—একটু ভাল।

নিতু দরজার ঊর্ধ্বে চৌকাটে হাতদুটি তুলে তার উপরে শরীরের ভার রেখে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে নিবিড় বেদনা প্রচ্ছন্ন বাহ্যিক কৌতুকের স্বরে বলে—পরশুদিন

যা ব্যাপার করেছিলে—আমি ভাবলুম খালি পা' কর'তে হয় বা! তিনটে ইনজেকশনেও যখন জ্ঞানের লক্ষণ দেখা গেল না, এদিকে হাত-পা ঠাণ্ডা নীল হয়ে আসছে, —আমি তো তখন বেশ নিশ্চিন্তই হয়ে গেছলুম আর কি,—

অনসূয়া ম্লান হেসে বলে—তখন নিশ্চয়ই তোর ভাবনা হচ্ছিল, কায়েতের মড়া ছুঁয়ে প্রায়শ্চিত্তির করতে হয় বা! না খোকা? তা' মরে গেলে তারপবে তুই কাঁধে নিলি, কি, না নিলি, সত্যিই তো আব দেখতে পাবো না,—ভয় কি?

নিতু অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তারপরে গম্ভীর সুরে বলে—মা, আমি দেখেছি, তুমি কিছুতেই ভুলতে পারো না যে, তুমি আমার নিজের মা নও।...আমি বামুন বলে তোমার হাতে খাইনে, না তোমার পা ছুঁযে প্রণাম করিনে?—কবে তুমি দেখেচো বা উপলব্ধি করেচো বলো তো,—আমি জাতিব পার্থক্য নিজের মনের কোণেও রেখেছি?

অনসূয়া করুণ হেসে বলে—তুই না রাখিস, দুনিযা যে সেটা ভাল করেই রাখে বে।

নিতু উত্তব দেয় না। নতনেত্রে গুম হয়ে থাকে।

অনসূযা মৃদু হেসে আবাব বলে—কথায় আছে না:

জ্যান্তে পায় না ভাত-কাপড,
ম'লে হবে দানসাগব।

তোব মাযের দেখচি সত্যি তাই হবে খোকা। বেঁচে থাকতে ছেলে মায়ের কাছে আসতে পায না—ম'লে মুখাগ্নি কববে!

নিতু গম্ভীর মুখে চুপ কবে থাকে। অনেকক্ষণ পরে, মৌনতা ভঙ্গ করে শান্ত কণ্ঠে বলে—মা, ছেলেকে গর্ভে ধরাব, প্রসব কবাব, দিনেবাত্রে অশ্রান্ত দেহমনে তাকে তিল তিল কবে বড করে তোলার কষ্ট ও দুঃখ কিছু কম না।...'মা' হলে তাকে দুঃখ সইতে হয় এটা একান্ত স্বাভাবিক। তুমি মা, সে কষ্ট সে দুঃখ পাওনি। ...তাই গর্ভে না ধবাব দরুণ অপমান দুঃখ ও আঘাতের ধাক্কা সহ্য করে' তুমি অন্যদিক দিযে মা হওয়াব কষ্টটা পুষিযে নিচ্ছ। কিন্তু সেসব কষ্টই তো তোমাব ছেলেব জন্য। তুমি গভীর সত্যভাবে আন্তরিক কামনায় মা হতে চেয়েছো বলেই দুঃখ আঘাত পাচ্ছো। তাই নয় কি মা?...

অনসূযা কিছুই উত্তর দেয় না। বালিশেব উপর শ্লথভাবে মাথাটি বেখে চোখ বুজে শুয়ে থাকে।

নিতুব কথাটি কিন্তু তাব ভাবী ভালো লাগে। সত্যিই, দুঃখ ও আঘাতেব কণ্টক-মৃণালেই তো মাতৃত্বেব আনন্দ-কমলটি বর্ণে গন্ধে পাপড়ি মেলে বিকশিত হযে ওঠে।...দুঃখ ও আঘাতের বেদনা-কণ্টক-শাখাতেই তো তার এই মা' হওয়ার আনন্দ-গোলাপ ফুটবে।... সে যদি দুঃখই না সহ্য কবে—তবে তার মা হওযার গৌবব কিসের? সার্থকতা কোথায়?

পৃথিবী ঘোরে,—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ—সকলেই আপন আপন গতিচ্ছন্দে ঘুরে চলেছে।—এই অবিরাম ঘূর্ণন হ'তে বিরতি নেই—কিন্তু সকলেই যেখান থেকে যাত্রা করে ঠিক সেইখানটিতেই এসে পুনর্ব্বার ঠেকে,—কেন্দ্রচ্যুত হয় না কেউ!...তা'হলে তো এক একটি খণ্ড-জগৎ-এর সৃষ্টি সমাপ্তি লাভই করে। স্তব্ধ হয়ে যায় এই অভিনব চিরন্তনলীলা।

অনসূয়ার শাশুড়ী মারা গেছেন। তার ভাসুর সুভাষবাবু চুঁচুড়া স্কুলের মাস্টারি ছেড়ে দিযে কলকাতায় এসে এক সদাগরী অফিসে চাকরী নিযে কলকাতাতেই বসবাস কচ্ছেন।

জা' মৃণালিনী এখন অনেকগুলি সন্তান-সন্ততির জননী।...তাঁদের জন্ম মৃত্যু ও বিবাহের হাঙ্গামাব মধ্যে তাঁব জীবনের সমস্ত চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন—কেন্দ্রীভূত হয়ে চাক বেঁধেছে!...বিশ্বদুনিয়ার কোনও দিকে কিছু নজর দেবার বা তার জন্য কিছু খরচ করবার মতো সম্বল তার ভাণ্ডারে নেই।

অনসূয়া রুগ্ন শরীর নিয়ে জায়ের কাছেই বেশীরভাগ থাকে,—তার ছেলেপিলেগুলিকে নাড়ে-চাড়ে।

নিতু ডাক্তারি পাশ ক'রে কোথায় পশ্চিমে দূর দেশে প্রাকটিস করে।

আগে আগে অনসূয়াকে সর্ব্বদা খবরাখবব দিযে চিঠিপত্র লিখতো। এখন আর তা লেখে না। বৎসবান্তে বিজয়ায় একখানা করে প্রণাম-পত্র দেয়, এ-বৎসব তাও আসেনি।

অনসূয়ার মরারও লক্ষণ নেই,—ভোগাবও বিরাম নেই। নানান রোগে ধরেছে।

ভগবানের কাছে সে একান্তচিত্তে এই অসহ্য রোগ-যন্ত্রণার মুক্তি-প্রার্থনা করে।... মৃত্যুকামনা এবং মৃত্যুপ্রতীক্ষাই এখন তাব অপরিণত জীবনের অধিকাংশ ভাগ জুড়ে বসেছে।...

কিন্তু এই মৃত্যু-ইচ্ছাব অন্তরালেও বুঝি সংসারের কোনো একটি অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ হবার সঙ্গোপিত বাসনা নিঃশব্দে চুপি চুপি পায়চারি করে।—

জীবনের কোলাহলময় হাটে যাকে সে ঐকান্তিক আন্তরিকতায় আপনার করতে চেয়েও সে অধিকার নিজে পায়নি এবং তাকেও দিতে পারেনি,—এখন যদি মরণের নিঃশব্দ আঁধারপথের মাঝে সে তাব কাছ হতে সেই অধিকারের একটা কিছু বড় পাওনা পেয়ে যায—এই লোভটাই যেন তার মৃত্যু-স্বপ্নাচ্ছন্ন কল্পনা-নয়নে বার বার প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে।

কল্লোল, শ্রাবণ ১৩৩৫

মূক সাথী

হেমন্তের কুহেলিগুণ্ঠিত রাত্রি।

শুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় এতটুকুও উজ্জ্বলতা নেই,—হিম-কুয়াসায় শুক্লা-চতুর্দ্দশীর চন্দ্রকিরণ ম্লান, নিষ্প্রভ।

নির্জন ছাদের কোণে মিণ্টু কোলের ভিতরে আঁচলচাপা দিয়ে কি যেন একটা জিনিষ সযত্নে লুকিয়ে নিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে আঁচলের ভিতরে নিজের ছোট্ট কচি হাতখানি পুবে'—তার গায়ে সযত্নে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

নীচের তলা থেকে তখন ডাকাডাকি শোনা যাচ্ছে—মিণ্টু—মিণ্টু—ও মিণ্টি —কোথায় গেল বল্ তো হতভাগা মেয়েটা—

ছাদের কোণে মিণ্টুর কানে সে ডাক যে পৌঁছায়নি তা' নয়—কিন্তু তার নীচে নামবার আগ্রহ ছিল না বলে এই ডাকেব কোনো সাড়া দিলে না—ববং আঁচল ঢাকা জীবটিকে দ্বিগুণ স্নেহে নিজেব বুকটির কাছে চেপে—নেড়ে-চেড়ে-দোলা দিয়ে- -গায়ে হাত বুলিয়ে—তারই প্রতি মনোনিবেশ ক'রলে।

ছাদেব সিড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং তাবপরই একটি কিশোরী মূর্ত্তি ছাদেব উপরে এসে দাঁড়াল।

ঝাপসা চাঁদের আলোয় ছাদেব একটেবে কোণটিতে নীলাম্বরী-পরা ছোট্ট মানুষটিকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েই সে উৎসাহিত কণ্ঠে চেঁচিযে উঠলো—ও ছোড়দা—মিণ্টু এই যে ছাদে বসে রয়েচে—তুলোকে নিয়ে—

অদৃশ্য হিমকণা বর্ষণে সমস্ত ছাদ বেশ সিক্ত ও ঠাণ্ডা কনকনে হ'য়ে উঠেছিল।

মিণ্টুর দিদি সবলা এগিয়ে গিয়ে কঠোর শাসনেব সুবে বললে—এই দারুণ হিমে যে ছাদে বসে রয়েছিস—জ্বর হ'লে কে তোকে দেখবে?...

সরলা মিণ্টুর চার বৎসর মাত্র আগে পৃথিবীতে এসেছে! এই চার বৎসর পূর্ব্বে আসার বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার দাবী নিযে সে যখন-তখন তার ছোট দু'টি ভাই-বোন মিণ্টু ও মঞ্জুর প্রতি শাসন ও উপদেশ সম-পবিমাণেই বর্ষণ করে থাকে।

আজও তাই সবলা ডান হাতখানি বাড়িয়ে পাঁচটি আঙুল দিয়ে মিণ্টুর ছোট্ট কানটিতে সজোরে পাক্ দিয়ে দিলে।

অত জোরে কানমলা খেয়েও মিণ্টুর নডবার লক্ষণ দেখা গেল না। গোঁ ভ'রে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—তোমরা সবাই মিলে কেন আমাব তুলুকে মাবলে? ও' কক্ষনো ক্ষীরপুলি চুরি করে' খায়নি! নিশ্চয় আর কেউ খেয়েচে!...

ইতোমধ্যে সরলা-কর্ত্তৃক আহূত ছোড়দাও ছাদের উপরে উঠে এলেন।

—আবার বুঝি সেই হতভাগা বেড়ালটা এসে জুটেছে? রোসো, দেখাচ্ছি মজা —বলতে বলতে ছোড়দা সদর্পে মিণ্টুর দিকে অগ্রসর হ'লেন!

মিণ্টু নিঃশব্দ ব্যাকুলতায় আঁচল-ঢাকা বিড়াল-শিশুটিকে নিজের বুকের নীচে সন্তর্পণে দু'হাত দিয়ে আগলে রেখে মিনতি-করুণ কাতরকণ্ঠে বলে উঠল—ছোড়দা, দু'টি পায়ে পড়ি তোমার—তুলুকে আর মেরো না!...

ছোড়দা মিণ্টুর একখানি হাত ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে ধরে' ধমকের সুরে বল্লে—শীগ্গীর নেমে আয় তা'হলে নীচে—

মিণ্টু কাঁদতে কাঁদতে বললে—ছেড়ে দাও,—আমি আপনিই নীচে যাচ্ছি!...কিন্তু তোমরা তুলুকে আর ঠ্যাঙাবে না বলো?—

ছোড়দা রুখে উঠল—ঠ্যাঙাবো কেন?... এইবার একদিন ওকে গুলি করে' আপদ চুকিয়ে দেব।

সরলা ব্যঙ্গস্বরে বললে—না, ঠ্যাঙাবে না—আরও বেশী করে' ক্ষীরপুলি তৈরী করে খাওয়াবে!...

আট বছরের মিণ্টুরাণী তাব প্রিয় বিড়ালছানার গা'টি তুলোব মত কোমল ও ধব্ধবে শাদা দেখে নাম রেখেছিল তুলো বা তুলু।

নবনীত-শুভ্র কোমল সুন্দর কাবুলি বিডাল। গায়ের নরম লোমগুলি যেন ব্রাশ কবা সুবিন্যস্ত শাদা তুলা।

চকচকে উজ্জ্বল চোখদু'টি মাণিকেব মত জ্বল-জ্বল করে।

গোলাপফুলের পাপড়িব মত গোলাপী রংয়ের পাতলা জিভখানির আগাটুকু দিযে চুকচুক শব্দে দুধ খায়।

ফুটন্ত যুঁইফুলের ঠাস গোড়েমালার মত মোটা শুভ্র লেজটির অহরহ সচঞ্চল লীলায়িত ভঙ্গীটুকু অতি সুন্দর!

তুলুতে ও মিণ্টুতে অগাধ প্রণয়।

সকালবেলা মিণ্টু বাইরের ঘরে পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে মাদুব পেতে পড়তে বসে। তার ডুবে শাড়ীর আঁচলেব কোণে বাঁধা ক্ষুদে ক্ষুদে চাবি-গাঁথা ছোট্ট রিংটি পিঠের উপরে দুলতে থাকে।

তুলু মিণ্টুর পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে তার চাবি বাঁধা আঁচলখানি নিয়ে খেলা করে।

মিণ্টু পড়ায ভুল করলেই তুলুকে ধমক দিয়ে ওঠে—এই তুলো,—পড়তে দিবিনে নাকি? রোস্, দেখাচ্চি মজা—

তুলুর কান ধরে পিঠেব দিক থেকে সামনে টেনে নিয়ে এসে নিজের ছোট কোলটির ভিতর ফেলে—তার মাথায গোটা দুই থাপ্পড় কষিয়ে বলে—চুপ করে' শুয়ে থা'ক—একটুখানি নড়বি যদি,—কান মলে' ছিঁড়ে দেব!

মিণ্টুর কোলেব মধ্যে কুণ্ডুলি পাকিয়ে তুলু বাধ্য শান্ত শিশুটির মত চুপ করে' পড়ে থাকে!

হঠাৎ দেখলে ভ্রান্তি হয়—পেঁয়াজী ডুরে শাড়ীর উপবে বুঝি খানিকটা পরিষ্কার ধোনা-তুলোর ডেলা পড়ে আছে।

শরৎকালে ভোরবেলায় বাগানের বেড়ার ধারে শিউলীগাছের তলায় মিণ্টু—চুবড়ি হাতে ফুল-কুড়ুতে যায়। সঙ্গে থাকে তুলু।

শিশির ভেজা সবুজ দূর্ব্বাদলের উপরে ঝরে' পড়া টাটকা ফুলের নিবিড় আল্পনা আঁকা। শাদা পুষ্পাস্তরণেব ফাঁকে ফাঁকে দূর্ব্বার সবুজ বং উঁকি দেয়!—শিউলি বৃন্তেবা — শাদা ও সবুজের মাঝে বাসন্তী রংয়ের বুটি ফলিয়ে ফুলবাসবেব সৌন্দর্য্য অনিন্দ্য করে' তোলে।

মিণ্টু আঁচল ভরে' ফুল কুড়ুতে কুড়ুতে তুলুর সাথে অনর্গল বকতে থাকে।

—তুলতুল,—এত বড হয়েছিস কিন্তু একটুও কাজকর্ম্ম করতে শিখলি না আজও। তোব দ্বারা বাপু আমি একটিও কাজ পাই না—আব কি ছোটটিই আছিস? এখন একটু বুদ্ধি-বিবেচনা করতে শেখ—

তুলু মিণ্টুর সদুপদেশে বিশেষ কর্ণপাত না করে' ঝরা ফুলগুলিব উপরে ছুটাছুটি কবে' ইঁদুব শিকাবেব ভঙ্গীতে, নুলো বাড়িযে খপ কবে' হযতো একটা শিউলিফুল তুলে নেয। তারপর সেটিকে সাগ্রহে সোৎসুকভাবে নেড়ে-চেড়ে শুঁকে ফেলে দিয়ে —আবার আর একটা ঝরা শিউলি শিকাবে মন দেয।

মিণ্টু হেসে গড়িয়ে পড়ে' বলে—শুঁকছিস কি রাক্ষুসি?...ও কি মাছ, যে কুপ-কুপ করে' খাবি?—

তাবপর রোষভরে ঝঙ্কার দিযে বলে ওঠে—এই,—সরে যা বলছি! ফেব যদি ফুল নষ্ট কববি তো খুন করে ফেলবো।

মিণ্টুব বৌদিদি বাগ করে এসে শাশুড়ীব কাছে নালিশ কবে—মা, ছোটঠাকুবঝিব আদরের বেড়াল আমার খোকার দুধে মুখ ঠেকিয়েচে। ঠাকুবপোকে দিযে একদিন ওকে মার না খাওয়ালে ওর আস্পদ্দা দিন-দিন বেড়ে চলেছে! শাশুড়ী বলেন —দুধ একটু সাবধানে বাখতে হয মা। ঢেকে রাখলেই ল্যাঠা থাকে না।

বৌমা মুখ ভারী কবে' চলে যান।

সন্ধ্যাবেলায় মিণ্টুব ছোড়দা বীরু এসে—হঠাৎ তুলুকে খুঁজে বেড়ায়। হাতে লম্বা ছিপটি।

মিণ্টুব শোবার ঘবে মিণ্টুব বিছানাব ভিতবে তুলুকে আবিষ্কাব করে' দরজা বন্ধ করে বীরু ছিপ্‌টি দ্বারা তুলুর শাস্তি বিধান করে।

তুলুর আর্ত্তনাদ শুনে মিণ্টু ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এসে রুদ্ধ দ্বারেব উপব আছড়ে পড়ে। ব্যাকুল কান্নায় কাকুতি মিনতি করতে থাকে—ও' ছোড়দা, তোমার পায়ে পড়ি, —তুলুকে আর মেরো না গো—মবে' যাবে—

মিণ্টুর ছোটভাই মঞ্জুর টাইফয়েড হয়েছে।

মায়ের ম্লান মুখখানির উপরে চিন্তার নিবিড়-কৃষ্ণ ছায়া ঘনিয়ে আছে।

বাড়ীসুদ্ধ সকলেই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

মিণ্টু সদা সর্ব্বদা তুলুকে আগলে কাছে-কাছে রাখে। পাছে সে রোগীর ঘরের দিকে যায়—কিম্বা ডাকে। বিড়ালের ডাক অমঙ্গলের লক্ষণ।

নির্জ্জন স্থানে তুলুর সাথে নিভৃতালাপ করতে করতে মিণ্টু তাকে সতর্ক করে দেয়—তুলতুল—খবরদার! টুঁ শব্দটি ক'রবি না! বুজেছিস? মঞ্জুর ভারী অসুখ করেচে—এখন যদি তুই ডাকিস—ছোড়দা আব দাদা তোকে গলা টিপে মেরে ফেলবে! বুঝতে পাবছিস তো?

তুলু সে কথা বোঝে কি না বোঝা যায় না। তবে পবম আরামে পালয়িত্রীর ক্রোড়ের ভিতরে পদচতুষ্টয় গুটিয়ে গোলাকার ভঙ্গীতে শুয়ে গম্ভীর মুখে কান খাড়া করে শোনে। মাঝে মাঝে মাথাটি নত করে' কোলেব উপরে নাক মুখ ঘষে' মনের খুশী জানাবার চেষ্টা করে।

রৌদ্র-উজ্জ্বল স্তব্ধ মধ্যাহ্নের সুদীর্ঘ অবসরক্ষণ মিণ্টু বিড়াল-শিশুর সাথে চঞ্চল ক্রীড়ায় আনন্দে অতিবাহিত করে।

তুলুর বসা, হাঁটা, ছুটাছুটি, কুণ্ডলী পাকিযে ঘুমানোর ধরণটুকু, সর্ব্বাঙ্গ ধনুকের মত বাঁকিয়ে উঁচু হযে উঠে রোমাঞ্চিত দেহে হাই তুলে আলস্য ভাঙার মধুর ভঙ্গিমাটি, উডন্ত মাছি শিকারে বিচিত্র লম্ফঝম্ফ--যা' কিছু, সবই মিণ্টুব নয়নে অপরূপ মনোমুগ্ধকব রূপে প্রতীযমান হয়।

দুপুরবেলা একদিন মা কি-যেন দরকাবে মিণ্টুর খোঁজ করেন।

মিণ্টু তখন বাগানের দিকে কুয়াব সান-বাঁধানো উঁচু চাতালে বসে তুলুর সাথে বিশ্রম্ভালাপে তন্ময়।

মিণ্টুর দিদি সবলা সাবা বাড়ী খুঁজে হায়রাণ হয়ে— বাগানেব ধারে কুয়ার পাড়ে মিণ্টুকে বিড়ালসহ দেখতে পেযে তখনি উদ্দীপ্ত রোষে মিণ্টুর পিঠে ঘা' কতক কযিয়ে দিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে—অতবড় মেয়ে—দিনরাত্রি খালি বেড়াল নিয়ে খেলা করা!—চল, মা ডাকছেন,—আজ তোব খেলা করা একেবারে ঘুচবে।

মিণ্টু অশ্রুনিষিক্ত অপরাধ-কুণ্ঠিত মুখে মাযের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই—ছোটদাদা বীরেন তার কানটি ধরে টেনে নরম ফুলো ফুলো গালদু'টির উপরে ঠাশ ঠাশ শব্দে দু'তিন ঘা' চড় কযিয়ে দিয়ে বললে—বুড়োধাড়ি মেয়ে, ছোট ভাইটির এত অসুখ,—এখন দিনরাত বেড়াল নিয়ে খেলিয়ে বেড়ানো হচ্চে!...আপদের মূল বেড়ালকে বাড়ী থেকে না বিদেয় করলে হবে না!—

মা'ও আজ মিণ্টুকে তীব্র ভর্ৎসনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু প্রহৃতা মিণ্টুর অশ্রু-আপ্লুত করুণ মুখখানির পানে তাকিয়ে তাঁর অপ্রসন্নতা ছায়ার মত মিলিয়ে

গেল।

স্নিগ্ধ চক্ষে কন্যার মুখের পানে চেয়ে বললেন—বড় হচ্ছ মা,—সব সময়েই কি খেলা কবতে হয়? ছোট ভাইটির অসুখ,—তাব কাছে এসে বসতে হয়, সেবা-যত্ন করতে শিখতে হয়। মেয়েমানুষ যে তুমি!

ছোটদাদা এবং দিদির তীব্র ভর্ৎসনা ও প্রহারের চেয়ে মায়েব এই মিষ্ট সস্নেহ উপদেশে মিণ্টু মনে মনে অপরাধ-কুণ্ঠিত অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

বীরু অপ্রসন্ন কণ্ঠে বলে—মা আব দাদাব অতিবিক্ত আদরে-আদরেই তো মেয়েটি উচ্ছন্ন যাচ্ছে।

টাইফয়েড ব্যারাম সংক্রামক।

মঞ্জু ভাল হ'য়ে উঠলো, কিন্তু মিণ্টু জ্বরে পড়লো।

জ্ববে টাইফযেডের দুর্লক্ষণগুলি দিনের দিন ক্রমশঃ প্রকাশিত হ'তে লাগল।

সন্ধ্যাবেলা মিণ্টু মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সবেমাত্র একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। মা তাব মাথায় বরফের ব্যাগটি ধবে' বসে আছেন।

ঘরের দরজাব বাইরে দালানে করুণ স্ববে ডাক শোনা গেল—মিঁ—য়ু—

মা তাড়াতাড়ি সন্তর্পণে বরফের ব্যাগটি মিণ্টুর মাথা হ'তে নামিয়ে রেখে পা টিপে ঘব থেকে বেরিয়ে এসে, চাপা গলায তাডনা ক'রেন—হুট্—হুট—দূর হ'—

তুলু নিঃশব্দে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। মা ফিবে এসে আবাব মেয়ের মাথায ববফের ব্যাগ ধবে' বসলেন।

কিন্তু আবার খানিক বাদে দরজার বাইরে হ'তে শব্দ এলো—মিঁ-উ—

মা উঠে গিয়ে বড় ছেলে নবেনকে ডেকে বললেন—নরু, অলুক্ষুণে বেড়ালটাকে মেরে বিদেয ক'বে দে তো বাবা! দিনরাত ম্যাঁও ম্যাঁও করে ডেকে ডেকে বাড়ীতে ছেলেপিলের রোগ ধরিয়ে তবে ছাড়লে।

নরেন বললে—কিন্তু মিণ্টু যে এখুনি ওকে খুঁজবে মা! তুলোকে দেখতে না পেলে সে কেঁদে কেটে অস্থির হবে। শেষে টেমপারেচার বেড়ে মাথায় রক্ত উঠে যাবে!...ওকে তাড়িয়ে কাজ নেই।

মা অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠলেন—কিন্তু বেড়ালেব ডাকে বাড়ীতে অসুখ-বিশুক হযই,—এ একেবারে নিঃসন্দেহ কথা। তাব উপবে ঐ হতভাগা বেড়ালটা আবার এমন কান্নার সুরে ডাকে যে, আমার শুনলে বুক কাঁপে! বেড়াল কাঁদা ভারী অকল্যাণ!

নরেন লাঠি নিয়ে সারা বাড়ী ঘুবে ঘুরে তুলুকে মারধর করে' তাডিযে বাড়ী-ছাডা ক'রলে।

কিন্তু আবার গভীর নিশুতি রাত্রে মিণ্টুর ঘরের ভেজানো দরজাটিব বাইরে মৃদুচ্চাবিত কণ্ঠের সকরুণ সুরে ডাক শোনা গেল—মিঁ—উঁ-উঁ-উঁ—

মিণ্টু ঘুমোয়নি। যাতনায় ছটফট ক'রছিল।

'মিঁউ' শব্দ কানে যাবা-মাত্র সচকিতে উৎকর্ণ হয়ে উঠে চোখ মেলে মায়েব

মুখের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলে—মা, তুলু ডাকচে, নয়? তুলুকে আমার কাছে আসতে দাও মা,—ও' আমার জন্যে কাঁদচে—

মা অপ্রসন্ন মুখে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তুলু মা'র পানে তার উজ্জ্বল চোখের জ্বলন্ত মণিদুটির দৃষ্টি স্থির রেখে, লেজটি ও কানদু'টি খাড়া করে' দ্বিধাপূর্ণ-ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঘরের ভিতবে ঢুকলো না।

তুলুর দিকে রোষ-তিক্ত দৃষ্টি হেনে—মা বিবস মুখে নিঃশব্দে পুনরায় মিণ্টুর পাশে গিয়ে বসলেন।

অনেকক্ষণ নিষ্কম্পভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর তুলু আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দ পদক্ষেপে—সতর্ক ভঙ্গীতে সামনের দিকে তাকাতে তাকাতে মিণ্টুর খাটের কাছে গিয়ে, একেবারে তার বিছানার উপরে উঠে পড়লো। মিণ্টুর পাঁজরাব পাশটি ঘেঁষে তার গায়ের বালাপোষখানিতে নিজের মাথা ঘষতে লাগল।

রুগ্না মিণ্টুর সামনে তুলুর সম্বন্ধে কোনও আপত্তি বা বিরক্তি প্রকাশ কবতে কেউই পারে না। বাড়ীসুদ্ধ সকলেই জানে তুলু মিণ্টুর কতখানি প্রিয়।

রোগীর ঘরের বাইরে মিণ্টুর ছোড়দা বীরেন বলে—রুগীব বিছানায় অমনতর লোমওয়ালা বেড়াল রাখা ভাল নয়।

মা শঙ্কিত মুখে বলেন—কী ক'ববো বাবা! হতভাগা বেড়াল মোটে নড়তে চায় না। আজ ন'দিন মিণ্টুর অসুখ করেছে,—তা ও একরকম খাওয়া দাওযাই ছেড়ে দিয়েচে!...কাল দুপুবে বৌমাকে বললুম—না খেয়ে শেষে কি বাড়ীতে একটা জীব-হত্যে হবে? ওকে এক বাটী গরম দুধ দাও! বৌমা দুধ এনে দিলে, কিন্তু সে দুধ মোটে ও' ছুঁলে না। শুঁকে সবে গেল। ক'দিনই কিছু খাচ্চে না দেখে আজ সকালে বৌমা মিণ্টুর বিছানাব পাশে টেবিলের উপবে এক বাটী দুধ বেখে এলো। মিণ্টু আদব করে গাযে হাত বুলিযে বল্‌লে—তুলু দুধ খা'—তখন দেখি, আস্তে আস্তে টেবিলের উপরে উঠে চকচক করে' সব দুধটা খেয়ে বাটিটা চেটে ঝকঝকে করে তুললে।

সবলা বললে—ওঁর নবাবের মতন মুখ। আমি সেদিন পাতেব মাছের কাঁটা নিয়ে খাওয়াবাব জন্যে এত চেষ্টা ক'বলুম, মোটে ছুঁলে না।

বড ভাই নবেন গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বললে—না, না, টাইফয়েড-বোগীর বিছানায় বেড়াল রাখা ভাল নয়।

নরেন ফোর্থ ইযারে ডাক্তাবি পড়ে।

মা চিন্তিত মুখে বললেন, তা' হ'লে বাপু ওকে তোরা নদীর ওপারে বিদেয় কবে দিযে আয়! বাড়ীতে থেকে— মিণ্টুর কাছে যেতে না পেলে, ও' কেঁদে কেঁদে অকল্যাণ বাধাবে।

তার পরদিনই, তুলুকে মিণ্টুর কাছ থেকে সরিযে নিয়ে চুপি চুপি নদীর ওপাবে

বিদেয় করে দেওয়া হ'ল!

মিণ্টু সদা সর্ব্বদাই তুলুকে খোঁজে। সকলে মিলে তাকে নানা মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে রেখে দেয়।

সতেরো দিনে মিণ্টুর জ্বব ছাড়ল। জ্বর ছাড়াব পবে সে তুলুব জনা আরও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তুলুর বিরুদ্ধে এরা যে একটা-কিছু ষড়যন্ত্র করেছে, তার একটা অস্পষ্ট অনুমান তার মনের ভিতর দৃঢ় হয়ে ওঠায় সে শঙ্কায় ব্যাকুল হ'যে পড়ল।

রাত্রি তখন প্রায় দু'টা বাজে। মিণ্টুর শিযবের কাছে পাখা হাতে মা নিদ্রাবেশে ঢুলে পড়েছেন। উপর্য্যুপবি বহু বাত্রি উৎকণ্ঠা-পূর্ণ জাগরণের পব এখন কতকটা নিরুদ্বিগ্ন হওয়ায় তাঁর সর্ব্বাঙ্গে নিদ্রা যেন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে এসেছে।

মিণ্টুও তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে নিস্তব্ধ অবশভাবে পড়েছিল। হঠাৎ বাইবে থেকে শব্দ ভেসে এলো—মিঁ—উঁ—উঁ—

যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে মৃদু কুণ্ঠিত সুরে দূব থেকে কে কা'কে ডাকছে।

মুহূর্ত্তেই মিণ্টুব পাতলা তন্দ্রাটুকু ভেঙে গেল এবং সে সচকিতে চক্ষু মেলে উৎকর্ণ হ'য়ে উঠল।

আবার অত্যন্ত আস্তে আস্তে মৃদু অথচ স্পষ্ট ডাকটি শোনা গেল!—মিঁ—উ-—উ—উ—

সে সুবে যেন ভীরু কুণ্ঠা ও ভয় জড়িয়ে আছে।

মিণ্টু নিঃসন্দেহ হ'ল—এ তুলুরই গলার আওয়াজ!

ঘরের ভিতবে ল্যাম্পেব নীল কাচাবরণের ভিতর হ'তে মৃদু স্নিগ্ধ নীলাভ আলো সাবা ঘরখানি আধ-আলো আধ-ছায়ায় ভরে' রেখেছে! ঘড়ির 'টিক-টিক' শব্দ ছাড়া আর কোথাও কিছু সাড়া-শব্দ নেই।

মিণ্টু আস্তে আস্তে বাহুতে ভর দিয়ে বিছানার উপরে উঠে বসলো।

তার রক্তলেশশূন্য বিবর্ণ পাণ্ডাস মুখখানি ও কোটরপ্রবিষ্ট নিস্প্রভ চক্ষুদু'টি তখন অস্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। আবার শব্দ এলো—মিঁ—উ—

মিণ্টু খাট হ'তে আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে মেঝেয় নামল। নামতে গিয়ে মাথা একবার টলে' গেল! খাটের বাজু ধরে' কোনওরকমে পতনের বেগটা সামলে নিয়ে তারপরে দেয়াল ধরে ধরে—টলে' টলে' এলোমেলো পদবিক্ষেপে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। পায়ের আঙুল থেকে উরু পর্য্যন্ত থরথর করে কাঁপছে,—সর্ব্বাঙ্গ অবশ বোধ হচ্ছে।

বিপুল মানসিক উত্তেজনা-বশে ঘরের বাইরে বেবিয়ে এসে মিণ্টুর দুর্ব্বল শরীর ঝিম্‌ঝিম করে' অসাড় হয়ে এলো—চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলো—

ঠিক সেই সময়ে সিঁড়িব দিক হ'তে সকরুণ কাতর শব্দ এলো—মিঁ—য়ু...

বহমান বাতাস-স্পর্শে কচি কলাপাতেব মত মিণ্টুর শীর্ণ তনুখানি তখন থরথর

করে' কাঁপছে।—পা'দুটি প্রায় দুমড়ে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে,—কানে ঝিঝির ডাকের মত শব্দ,—চোখের সামনে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হলদে বিন্দু ঘুলিয়ে উঠছে!

তবুও সে প্রাণপণ আগ্রহে ও উত্তেজনায় কেবলমাত্র মনেরই শক্তিতে সিঁড়ির দিকটাতে এগিয়ে গেল।

দেয়ালের অবলম্বন ছেড়ে সিঁড়িব সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই—পা' টলে' মাথা ঘুবে' একেবারে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

ভারী বস্তু পতনেব একটা শব্দ—ও সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বল ক্ষীণ কণ্ঠের একটি অস্ফুট আর্ত্তনাদ—

মায়ের নিদ্রা টুটে' গেল।

চমকে জেগে উঠে দেখেন—বিছানা শূন্য,—মিণ্টু নেই।

যে-দুর্ব্বল রোগী অপরের সাহায্য ব্যতীত নিজের শক্তিতে পাশ ফিবে শুতে পর্য্যন্ত পারে না—সে যে বিছানা ছেড়ে উঠে— ঘরেব বাইরে চলে যেতে পাবে, এ' যেন কল্পনাবও অতীত।

মা পাগলিনীর মত বিস্রস্ত কেশ-বাসে ছুটে ঘর থেকে বেবিয়ে এলেন।

মায়ের ভীতি-ব্যঞ্জক চীৎকারে বাডীব সবাই জেগে উঠল।

নিরুদ্বিগ্ন দ্বিপ্রহর রাতে সুষুপ্তিমগ্ন অন্ধকাব বাডীখানা সচকিতে জাগ্রত ও আলোকিত হয়ে উঠল।

তারপর ছুটাছুটি—শঙ্কা-ব্যাকুল কণ্ঠেব ডাকাডাকি— ডাক্তাবের বাডী দৌড়ানো —ডাক্তার আসা প্রভৃতি পর্ব্ব প্রায ঘণ্টা তিনেক ধবে চ'লল।

ভোরের সদ্যঃবিকাশ লগ্নে—পূর্ব্বদিক যখন সবেমাত্র স্বচ্ছ হ'য়ে উঠছে—মিণ্টুর মায়ের বুকফাটা কান্না সুষুপ্ত পল্লী সচকিত কবে তুললো।

পাঁচ-ছয় ধাপ গড়িয়ে, সিঁডিব বাঁকের মুখে চাতালে ঘাড়-মুখ গুঁজে মিণ্টু পড়ে গিয়েছিল। দুর্ব্বল দেহে মাথায প্রবল আঘাত লেগে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে' নাক দিয়ে বেগে বক্ত ছুটতে থাকে। তাবপর কয়েক ঘণ্টাব মধ্যে সব শেষ!

মিণ্টুকে দাহ করে' তার ভাইয়েরা যখন বাড়ী ফিরে এলো—সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সাবা বাড়ী অস্বাভাবিক নিস্তব্ধ। চারিদিক যেন দারুণ ফাঁকা-ফাঁকা!

শুধু একতলার একখানি কোণের ঘরেব ভিতর হ'তে শোকাতুরা মায়ের শ্রান্ত অবসন্ন কণ্ঠের ক্ষীণ করুণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে—ও মা মিণ্টু—ফিরে আয় মা,— আর আমি তোকে রেখে ঘুমিয়ে পড়বো না! আব তোকে তোর তুলুব জন্যে বোক্‌বো না মিণ্টু—ফিরে আয়—

সন্ধ্যার পরে সদ্যঃশোকাহত আত্মীয় ক'টি—ভাই বোন বধূ সকলে মিলে একত্রিত হয়ে এক জায়গায় বসে' গত রাত্রির দুর্ঘটনার সম্বন্ধে বিষণ্ণ-মন্থর আলোচনা চলছিল।

প্রত্যেকেরই মুখে-চোখে গভীর শোকের ছায়া সুস্পষ্টতর।

এমন সময়ে সিঁড়ি থেকে আর্ত্ত কান্নার সুরে বিড়ালেব ডাক শোনা গেল! -
—ম্যাঁ—ও-ও-ও—ম্যাঁ—ও-ও-ও—

মিণ্টুর বড়দাদা নরেন আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন—ঐ সেই সর্ব্বনেশে বেড়ালটা আবার এসেচে—

মিণ্টুব বৌদিদিবও মুখে আতঙ্কেব ছাযা সুস্পষ্ট হ'যে উঠেছিল। ক্রোড়ে শায়িত শিশুটিকে সন্তর্পণে বুকের উপরে তুলে নিযে স্বামীর দিকে একটু এগিয়ে ঘেঁষে সরে গিয়ে ভীতিবিহ্বল অস্ফুট কণ্ঠে বললে—উঃ, কী ভযানক ডাক ডাকচে—

সরলা উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বললে—ও' বেড়াল নয়, যমদূত এসেচে। আমাদের সবাইকে খাবে, তবে এই বাড়ী ছাড়বে!

সরলা সিঁড়িতে গিয়ে দেখলে—সিঁড়িব যে চাতালটাব উপরে মিণ্টু গতবাত্রে দোতলা থেকে গড়িযে এসে পড়েছিল—সেই চাতালটিতে চঞ্চলভাবে ঘুরে ঘুরে দেয়াল ও সিঁড়ি শুঁকতে শুঁকতে তুলু অদ্ভুত স্বরে অনববত এক-সুবে ডাকছে—ম্যাঁ—ও ও ও—ম্যাঁ—ও ও ও—

তাব সেই ভীষণ অদ্ভুত ডাক যেন আর্ত্তনাদেব চেয়েও ভযাবহ এবং কান্নাব চেযেও করুণতর!

তুলুব কণ্ঠে এমনধাবা ডাক এব আগে আর কখনও শোনা যাযনি।

সবলা একটা ভাঙা খড়ম তুলুকে লক্ষ্য করে' সজোবে ছুঁড়ে মারলে। তুলু আঘাত পেয়ে পালিয়ে গেল।

কিন্তু সেদিন সমস্ত বাত্রি কখনও তেতালার ছাদে— কখনও ছাদের কার্নিশে, —কখনও উঠানে—কখনও সিঁড়িতে—কখনও বাগানেব ধাবে, তুলু অবিশ্রান্ত ঘুবে ঘুবে সেই শোকার্ত্ত কান্নার ডাক্ ডাকতে লাগল।

এক জাযগা হ'তে তাড়না করে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়,—সেখান থেকে সবে গিযে ক্ষণকাল বাদেই আবার অন্য আর এক জাযগায কাঁদতে আরম্ভ করে।

এমনি কবে তিনদিন কেটে গেল। দিনেব বেলায় তুলুর চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায না। কোথায় যে সে থাকে কেউই ঠিকানা পায় না। কিন্তু সন্ধ্যাব পর থেকেই সেই অদ্ভুত আর্ত্তস্বরে কান্না—সমস্ত রাত্রি আব থামে না—সারা বাড়ীটি ঘুবে ঘুবে ব্যাকুল কান্না কেঁদে ফেরে।

সে কান্নার শব্দে মিণ্টুব মা এবং বাড়ীব আর সবাই রাত্রে ঘুমুতে পাবেন না,—আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে বিনিদ্র নেত্রে রাত কাটান!

চারদিনের দিন রাত্রি তখন সওয়া ন'টা হবে, তুলুব সেই বিকট কান্না সুরু হ'ল।

বীরুর হাতের কাছে ভারী লোহার একটি ডাম্বেল পড়েছিল। সেইটি তুলে নিয়ে কান্না লক্ষ্য করে সে উত্তেজিতভাবে ছুটে চল্লো।

সিঁড়ির সেই চাতালটার কোণে তুলু লেজ উঁচু করে' গায়ের সমস্ত লোমগুলি ফুলিয়ে কাঁটার মত খাড়া করে'—ঘুরে ঘুরে ভীষণ স্বরে কাঁদছে! সে কান্নায় সত্যিই

যেন বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!

বীরু দাঁতে-দাঁত চেপে এগিয়ে গিয়ে হাতের নিরেট লোহার ভারী ডাম্বেলটি তুলুকে লক্ষ্য করে' সজোরে ছুঁড়ে মারলে।

ডাম্বেলটি সজোরে গিয়ে ঠিক তুলুর মাথায় লাগল। লাগবামাত্রই একবার খুব জোরে আর্ত্তনাদ করে উঠেই তুলু নিস্তব্ধ হ'য়ে লুটিয়ে পড়ল।

বীরু স্পন্দিত বক্ষে সত্বর নেমে গিয়ে দেখলে টক্‌টকে লাল রক্তে তুলুর দুধের মত ধবধবে মুখখানি সিক্ত হয়ে উঠেছে! ভলভল করে তার নাক কান মুখ দিয়ে রাঙা রক্ত ছুটছে।

নরেন দ্রুতপদে ছুটে এসে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠ্‌লো—হায় হায় কী করলি বীরু? খুন করলি জীবটাকে?

বৌদি ছুটে এলো,—সবলা ছুটে এলো,—বাড়ীতে যে যেখানে ছিল সকলেই ছুটে এসে সিঁড়িতে জড়ো হ'য়ে তুলুকে ঘিরে হা-হুতাশ করতে লাগল।

তখনই বরফ প্রভৃতি এনে বক্ত বন্ধ করাব চেষ্টা কবা হ'ল—সিঁড়ি থেকে উঠিয়ে এনে তুলুকে বাঁচাবার জন্য সকলেই একান্ত প্রয়াস করতে লাগলো। কিন্তু সে-সকল প্রয়াস ব্যর্থ কবে দিয়ে তুলুর শুভ্র-সুন্দর নরম বুকের মৃদু ধুকধুকুনিটুকু কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্তব্ধ স্থির হয়ে গেল।

তিন রাত্রি আগে মিণ্টু যে জায়গাটি তার তপ্ত রক্তে সিক্ত কবে পরপারে চলে গেছল—ঠিক সেই জায়গাটিই তুলুও নিজের টাটকা রক্তে ভিজিয়ে মিণ্টুর কাছে চলে গেল।

তুলু আর নেই—তবুও বাডীসুদ্ধ সকলকারই কানে গভীর নিশীথে কিম্বা নিস্তব্ধ দুপুরবেলায়—যখন তখন যেন বিড়ালের করুণ কান্নার শব্দ ভেসে আসে!

তারা জানে এটা তাদের মনের বিকারমাত্র; কিন্তু তবু তারা এক-একদিন রাত্রে ভাল করে ঘুমুতে পারে না। চমকে চমকে জেগে ওঠে।

তারপরে বহু বর্ষ কেটে গেছে। দুই যুগেরও অধিক। মিণ্টু ও তুলুর ঘটনা যারা জান্‌ত—তাদের জনকতক পরপারে চলে গেছে,—যারা আছে, তারা বহুকাল পূর্ব্বের দুর্ঘটনার বেদনা ভুলেই গিয়েছে! ক্ষীণ স্মৃতিটুকু মাত্র মনের কোনও এক কোণে চাপা পড়ে আছে।

শুধু প্রৌঢ় বীরেন আজও কোনওখানে বিড়ালের কণ্ঠের 'মিঁউ' শব্দ শুনলে হঠাৎ অস্বাভাবিক আতঙ্কিত কিম্বা উত্তেজিত হ'য়ে—তারপরেই নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

চিকিৎসকেরা বলেন—ও' নাকি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত একপ্রকার হিস্ট্রিক্ ম্যানিয়া ভিন্ন আর কিছু নয়।

ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩৩৫

একটি গল্প

শরতের সন্ধ্যা। বালিগঞ্জে একখানি ছোট বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী। রাস্তার ধারে বৈঠকখানাঘরের সামনে দক্ষিণ-পুব খোলা নাটমন্দিরের মত একটুখানি চত্বর। দক্ষিণে চত্বর সংলগ্ন ছোট্ট একটুক্‌রো জমিতে গোটাকতক ফুলের গাছ,—শিউলি, হাস্নাহানা, গোলাপ, রজনীগন্ধা। সকালবেলার হাওয়া শিউলির স্নিগ্ধ গন্ধে সুরভিত হয়ে ওঠে,—টুক্‌রো জমিটুকু শিশিরসিক্ত শাদা ফুলের ঝারায় আল্‌পনাচিত্রিত হয়। সন্ধ্যাবেলা হাস্নাহানার তীব্র সৌরভে বাতাস হয়ে ওঠে চঞ্চল।

সন্ধ্যায় প্রতিদিন এই ছোট্ট বাড়ীখানির ঐ খোলা চত্বরে বসে একটী ক্ষুদ্র সান্ধ্য-মজ্‌লিশ্। মজ্‌লিশ্‌টি যাঁকে কেন্দ্র করে জমে' ওঠে, তিনি হচ্ছেন সবাইকারই বড়দা। দুনিয়ার যত কিছু আশ্চর্য্য খবর এবং মজ্‌লিশী গল্প বলবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ।

সেদিন সন্ধ্যায় মজ্‌লিশ তখনও জমে ওঠেনি ভালো করে। এসেছেন জনকয়েক মাত্র। কথা হচ্ছিল পরলোক সম্বন্ধে। পরলোক আছে কিনা? মানুষ আসে কোথা থেকে,—কোথায়ই বা চলে যায়?...এই যে আমাদের প্রিয়জনকে হারিয়ে আমরা বেদনায় বিরহে ভগ্ন হয়ে পড়ি,—শোকে-দুঃখে আর্ত্তনাদ করি—এই অশ্রু, এই বেদনা তাদের কাছে কি পৌছায়?...তারাও কি আমাদের বিচ্ছেদে এমনিই কাতর হ'য়ে পড়ে পরলোকে?...যদি মৃত্যুর পরেও মানুষের অস্তিত্ব থাকে, তা'হলে আমরা তাদের সাড়া পাই না কেন?...ইত্যাদি।

এইসব কথাবার্ত্তা চলছে, এমন সময়ে এসে পৌছুলেন বড়দা। ফটকের বাইবে রাস্তায় গ্যাসের আলোর নীচে তাঁর বলাকাধবল মাথাটি দেখতে পাওয়ামাত্র একজন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো,—'বড়দা এসে পড়েছেন, ঐ যে! তোমাদের তর্কের মীমাংসা হবে এইবার!' আর একজন বললে, 'সত্যি, বড়দা না এলে গল্প কিছুতেই যেন জমে না।'

অত্যন্ত অনাড়ম্বর বেশভূষা এবং তারও চেয়ে অনাড়ম্বর চালচলন। গায়ে হাফ্‌হাতা ধব্‌ধবে শাদা বেনিয়ান্, পরনে ধব্‌ধবে শাদা থান, পায়ে চটী। অযত্নবিন্যস্ত শুভ্র চুলগুলি কপালের উপর এলোমেলোভাবে এসে পড়েছে, মুখে প্রসন্ন হাসির স্নিগ্ধ রেখা। বড়দা তাঁর নির্দ্দিষ্ট চৌকীতে এসে বসলেন। চাকর নিয়ে এলো তাওয়া চড়ানো গড়গড়া। নলটি হাতে নিয়ে অর্দ্ধশায়িত হয়ে বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন,—'এত তারস্বরে তর্ক হচ্ছিল কি নিয়ে হে!' উত্তর দিলেন একজন।

—পরলোক আছে কি নেই। আচ্ছা বড়দা, আপনি ঐ সম্বন্ধে কী বলেন?

বড়দা বললেন,--'দেখ বাপু! আমি তো এখনও পরলোকে যাইনি,—রয়েছি তোমাদেরই মধ্যে, সুতরাং কী করে বলবো পরলোকের খবর? তবে আমি একটা গল্প বলতে পারি তোমাদের,—সেটা আমাদের পরিবারের মধ্যেরই ঘটনা এবং আমার

স্বর্গীয় পিতাঠাকুরের মুখে শোনা। ঐ গল্পটা থেকে তোমরা পরলোক এবং মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইচ্ছামত বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করে নিতে পার।

ভাগলপুরে ছিল আমার মামার বাড়ী। মামারা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁদের বাড়ীখানি ছিল প্রকাণ্ড এবং তাতে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল তারও চেয়ে বেশী। সেবার অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে অনেক আত্মীয়কুটুম্ব জড়ো হয়েছিলেন। বাবা ছিলেন মাতামহের বড় জামাই। কর্ম্ম করতেন বিদেশে। তিনিও ঐ উৎসব উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন ভাগলপুরে। বাড়ীতে লোক এত বেশী হয়েছিল যে, শোবার ঘরে আর কুলুচ্ছিল না। শীতকাল হলেও মশার উপদ্রব ছিল বেশ। প্রত্যেকের মশারী খাটানোর দরকার। সুতরাং স্থানাভাবে বেশই মুস্কিল ঘটেছিল।

মামার বাড়ীর প্রায় সমস্ত অংশ পাকা দালান হলেও একটা অংশ ছিল মাটীর দোতলা মাঠকোঠা। খোলার ছাদ ও মাটীর দেয়াল হলেও সে ঘর ছিল পাকা দালানেরই মত মজবুত্। সেই মাটীর দোতলার নীচের ঘরগুলি রান্না ভাঁড়ার প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হ'ত। নীচেকার ঘরগুলিব উপরে ছিল একখানি প্রকাণ্ড লম্বা সাইজের ঘর এবং তার কোলে টানা লম্বা বারান্দা। সেই প্রকাণ্ড ঘরখানি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত হয়ে পড়ে ছিল; কেউ বাস করতো না।

বহুকাল পূর্ব্বে এই ঘরখানি আমার ন'দাদামশায়ের অর্থাৎ মায়ের ন'খুড়োর ঘর ছিল। ঐ ঘরে মা'র ন'খুড়ীমা অল্পবয়সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তারপর থেকে কেউ শুতে চাইতো না ও'ঘরটায়।

মায়ের ন'খুড়িমার আত্মহত্যার পর আমার দাদামশাই ভ্রাতৃবধূর আত্মার সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধশান্তি, গয়াতে প্রেতশিলায় পিণ্ডদান প্রভৃতি করিয়েছিলেন। তা'ছাড়া অনেক রকম শান্তিস্বস্ত্যয়ন, হোমযজ্ঞ, তুলসীদান, চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, দোষ কাটাবার জন্য। তবুও কেহই ঐ ঘরে শুতে বা বাস করতে রাজী হত না। সেটা খালিই পড়ে ছিল সুদীর্ঘকাল। প্রকাণ্ড ঘরখানির একপাশে থাক্তো ধূলি-ধূসরিত কাঠের প্রকাণ্ড একটা দোলমঞ্চ। পুরাণো লেপ তোষকের ময়লা তুলার পুঁটুলী দোলমঞ্চের উপর স্তুপীকৃত। অন্যদিকে থাক্তো বাঁশের আলনায় ঝুলানো আঁতুড়ের ময়লা বিছানা! মেঝেয় এককোণে আঁতুড়ে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি ফাটা চটা এনামেলের গ্লাস, বাটী থালা প্রভৃতি। একধারে গোটাকতক পুরাণো কেরোসিন কাঠের বাক্স, ভাঙা চালুনি, একটা অতিজীর্ণ চাকাভাঙ্গা প্যারাম্বুলেটার গাড়ী ইত্যাদি।

আমার মা অল্প বয়সেই স্বর্গে গিয়েছিলেন। বাবা আর বিবাহ করেননি। ছোট্ দাদামশায়েরও স্ত্রী ছিল না। ছোট্ দাদামশাই অর্থাৎ মার ছোটখুড়ো ছিলেন বাবার সমবয়সী। দু'জনের মধ্যে শ্বশুর জামাতা সম্পর্ক হলেও সম্বন্ধ ছিল বন্ধুত্বের।

ঘরের সংকুলান না হওয়ায় বাবা ও ছোট্ দাদামশাই দালানে মশারী টাঙিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। ভাগলপুরে ডিসেম্বরের শীত। তিনখানা লেপ কম্বল

চাপা দিয়েও খোলা দালানে শোওয়া অসম্ভব। দিন দুই দালানে শোবার পর বাবা ও ছোট দাদামশাই পরামর্শ করলেন, তাঁরা দু'জনে শোবেন ঐ মাঠকোঠা দোতলার খালি ঘরটা সাফ করিয়ে নিয়ে।

বাড়ীর অনেকেই ছোট্ দাদামশাই ও বাবাকে নিষেধ করলেন ঐ ঘরে শুতে। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঐ ঘরে শোবেনই। দোতলার অতবড় একখানি ঘর অব্যবহার্য্য করে ফেলে রেখে দিয়ে শোওয়ার ঘরের অভাবে অসুবিধা ভোগ করা —নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা বলেই তাঁরা মনে করলেন। তাই ঠিক করলেন, ঐ ঘরখানিকে শোওয়ার ঘর রূপে ব্যবহার করে—গৃহস্থদের ভয় ভেঙ্গে দেবেন।

দিনের বেলায় চাকর-বাকরদের ডেকে সে ঘরের বাজে ভাঙাচোরা নোংরা জিনিষ-পত্র সরানো হল। ঝাঁট-পাট দিয়ে ঝুল-ঝেড়ে, মেঝে লেপে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাও হয়ে গেল। সন্ধ্যায় ঘরে আলো জ্বেলে ধূনো দেওয়া হ'ল। দু'খানি দড়ির খাটিয়া পাশাপাশি পেতে বিছানা করে মশারী টাঙিয়ে ঠিক করে রেখে দিলে চাকরেরা। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বাবা ও ছোট দাদামশাই সেই ঘরে শুতে গেলেন। দরজা বন্ধ কবে দোরের কাছে হ্যারিকেন লণ্ঠনটির বাতি কমিয়ে রেখে—তাঁরা যে-যাঁর বিছানায় লেপ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন আরামে।

গভীর রাত্রে বাবার ভয়ার্ত্ত চীৎকারে ছোট্ দাদামশাইয়ের ভাঙল ঘুম! তিনি ধডমডিযে উঠে পড়ে—কি হয়েছে?—কি হযেছে? বলে ছুটে এলেন বাবার কাছে।...

বাবা দক্ষিণ পশ্চিম কোণের খোলা ছোট্ট জানালাটির পানে আঙুল বাড়িয়ে হাত তুলে ইসারায় দেখিয়ে দিলেন। ছোট্ দাদামশাই সেদিকে তাকিয়ে বললেন —কৈ? কোথায় কী?...জানালা দিয়ে তো ঘরের মেঝেয় জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শুধু! বাবা বললেন—তুমি উঠে আসতেই সে চলে গেল ছোট খুড়ো!...

—'সে' আবার কে?—

—বাইরে চলো, বল্‌ছি।

ছোট ঠাকুরদা হেসেই আকুল। বললেন,—তুমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছো, মণিলাল!...কাল বাড়ীসুদ্ধু লোক এ কথা শুনলে বলবে কী? পুরুষ মানুষ হয়ে তুমি কিনা স্বপ্ন দেখে এমন ভয় পেলে?—হাঃ—হাঃ—হা—

বাবা বললেন,—স্বপ্ন নয়। আমি ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে দেখেচি, ঐ জানালায় একটি দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠদেহ পুরুষ ঘরের ভিতরদিকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার মুখে ও গায়ে পরিষ্কার চাঁদের আলো পড়ায় সমস্তই সুস্পষ্ট দেখলাম। গায়ের রং ফর্সা, খালি গায়ে মোটা ধব্‌ধবে পৈতার গোছা। পরনে ধব্‌ধবে শাদা থান। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। তার চাউনির মধ্যে বিরক্তি ও রাগ ফুটে উঠেছিল স্পষ্ট। আমি সেই কট্‌মটে চাউনি সহ্য করতে না পেরে ভয়ে চোখ বুজে ঐরকম ভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

বাবা ছিলেন ভূত-প্রেতে ঘোর অবিশ্বাসী এবং অসমসাহসিক মানুষ। তাঁর মুখে এইরকম বর্ণনা শুনে ছোট্ ঠাকুরদা তো হেসেই আকুল! তিনিও ভূত-প্রেতের তত্ত্ব আদৌ বিশ্বাস করতেন না। বললেন,—মণিলাল, এ' কাহিনী আর কারুর কাছে প্রকাশ করে কাজ নেই। লোকে তা'হলে গায়ে থু থু দেবে আমাদের! এ তোমার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয় জেনো।

বাড়ীর লোকের কাছে প্রকাশ করা হবে না বললেও ছোট্ দাদামশায়েরই প্রসাদে সে রাত্রের ঘটনা বাড়ীর কারুরই অবিদিত রইল না। অন্দর থেকে গিন্নীবান্নীরা পুনর্বার একান্ত নিষেধ করলেন ঐ ঘরে শুতে। কিন্তু বাবা ও ছোট্ দাদামশাই কারুর কথায় কান দিলেন না। বরং বাবা নিজেই তখন সকলের কাছে বলতে লাগলেন গত রাত্রির ঘটনাটা নিছক স্বপ্ন। ও-ঘরে যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি স্ত্রীলোক এবং তরুণী ছিলেন। বাবাব দৃষ্ট আকৃতির ব্রাহ্মণ এ বাড়ীতে কেন, পাড়াতেও কেউ মারা যায়নি। সুতরাং ওটা কিছুই নয়।

পরদিন রাত্রে তাঁরা দু'জনে আবার সেই ঘরে শুয়েছেন। হ্যারিকেন লণ্ঠনটির বাতি না কমিয়ে আজ সমান তেজেই জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

আজও রাত্রি আন্দাজ তিনটায় সেই ঘরে একটা ভীষণ চীৎকার ও হুড়মুড় শব্দ শোনা গেল। বাড়ীর অনেকেরই সেই শব্দে ঘুম গেল ভেঙে। তাঁরা ছুটে এলেন—

—কী, কী—কি ব্যাপার?...

আজ আর বাবা চেঁচাননি। চেঁচিয়েছেন ছোট্ দাদামশাই। তিনি এত বিষম চীৎকার করেছেন যে, বাড়ীসুদ্ধু লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেছে!...

বাবা বললেন—তিনি নাকি অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন! হঠাৎ ছোট্ দাদামশাই বিকট চীৎকার করে মশারী ছিঁড়ে, লেপ ও মশারী জড়িয়ে লাফ দিয়ে তাঁর বিছানায় এসে তাঁকে আঁকড়ে ধরায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। বৃত্তান্ত কিছুই জানেন না তিনি!

ছোট্ দাদামশাই বলতে লাগলেন—না বাবা, আর এ-ঘরে শুচ্ছিনি। কিছুতেই না। মণিলাল কাল মোটেই স্বপ্ন দেখেনি, সত্যি দেখেছিল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—'কী দেখলে? কেমন দেখলে?—'

তিনি বললেন,—'হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লেগে শীত বোধ হওয়ায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি,—আমার মশারীর একটা পাশ উঁচু করে তুলে ধরে—' এই পর্যন্ত বলেই ছোট্ দাদামশাই শিউরে চোখ বুজলেন। সবাই আবার সাগ্রহে প্রশ্ন করতে লাগলো—কী? কী দেখলে?

ছোট্ দাদামশাই বললেন,—'মণিলাল যেমনটি বলেছিলেন, অবিকল সেই চেহারা। সেই ফর্সা রং, লম্বা চেহারা, মুখ চোখ পরিষ্কার, খালি গায়ে, গোছাভরা শাদা পৈতা —ফর্সা কাপড়,—সেই ভীষণ রাগ-রাগ চাউনি!!'

একেবারে তাঁর মশারীর এক পাশ উঁচু করে তুলে খাটিয়ার ধারে এসে

দাঁড়িয়েছিল। সবচেয়ে ভয়াবহ নাকি তার চাউনি!...স্মরণেও বারে বারে কেঁপে উঠতে লাগলেন ছোট্ ঠাকুরদা।

সেদিন বাকী রাত্রিটুকু সবাই মিলে একতলায় বৈঠকখানায় জটলা করে কাটিয়ে দেওয়া হল। বাবা ও ছোট্ দাদামশাই উভয়েই বললেন, তাঁরা উঠানেও শুতে রাজী কিন্তু, ও-ঘরে আর·নয়!! তখন মামার বাড়ীর পুরোহিত, ভট্চায্যি বললেন,—'কোনও ভাবনা নেই, আমি শোবো ও-ঘরে।'

এই ভট্চায্যিমশায়ের একটু ইতিহাস আছে। সাবেককালে মামার বাড়ীতে একটি ছোটোখাটো অতিথিশালা ছিল। অনেক সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ সজ্জন সেখানে এসে আশ্রয় নিতেন। একবার এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এসে সেখানে ওঠেন। আমার দাদামশায়ের খুব ঝোঁক ছিল দাবা খেলার। ভট্চায্যিমশায় ভালো দাবা খেলা জানতেন। দাবা খেলার সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার স্বর্গীয় দাদামশায়ের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। দাদামশাই যখন শুনতে পেলেন ভট্চায্যিমশায়ের আপনজন বলতে সংসারে কেউই নেই, চিরদিনের মত সংসার ত্যাগ করে যাযাবরবৃত্তি নিয়ে তিনি বেরিয়েছেন, তখন দাদামশাই তাঁকে বললেন,—'তা হলে আপনার আর এখন কোথাও গিয়ে কাজ নেই, আপনি থাকুন আমার কাছে। এখানে আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না।'

ভট্চায্যিমশায় তাতে আপত্তি করেননি। বোধহয় দীর্ঘকাল দেশবিদেশে ভ্রমণ করে করে, পথিকবৃত্তিতে বিতৃষ্ণা এসেছিল তাঁর, তাই দাদাবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁর বন্ধু ও দাবা খেলার সঙ্গীরূপে ভাগলপুরেই থেকে গেলেন। কালক্রমে দাদামশায়ের মৃত্যু হল, অতিথিশালাও লুপ্ত হয়ে গেল, কিন্তু ভটচায্যিমশায় সংসারেরই একজন গণ্য হয়ে বাইরে বাড়ীতে রয়ে গেলেন। তাঁর সুরসিক স্বভাব, সুন্দর চরিত্র ও একান্ত নির্লোভ প্রকৃতির জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত।

গৃহদেবতা শালগ্রামশিলার পূজার ভার ধীরে ধীরে এসে তাঁরই হাতে ন্যস্ত হয়েছিল যে কবে, তা' কারুরই স্মরণ নেই। পরে ভাগলপুরে আরও পাঁচ বাড়ীতে যজন-কর্ম্মে তাঁর ডাক পড়তে আরম্ভ হয়েছিল। তাঁব অতীত জীবন সম্বন্ধে একমাত্র স্বর্গীয় দাদামশাই যা' কিছু জানতেন; বাড়ীর অন্য কেউই বড় একটা কিছু জানত না।

ভট্চায্যিমশাই বললেন—'আমি ঐ ঘরে আজ দিনের বেলায় নিজে শান্তিস্বস্ত্যয়ন কববো। নারায়ণ শিলা রেখে রাত্রে ঐ ঘরে আমি শোবো।' বাডীর অনেকেই তাঁকে একা সে ঘরে শুতে নিষেধ করলেন। তিনি হেসে বললেন,—'কোনও ভয় নেই ভাই! আমি তো একা শোবো না,—স্বয়ং শালগ্রামশিলারূপী নারায়ণ যে আমার জাগ্রত প্রহরী থাকবেন ঘরের মধ্যে!'

এর উপরে আর কিছু আপত্তি টিকলো না।

দিনের বেলায় সারাদিন ভটচায্যিমশায় সেই ঘরে পূজা হোম প্রভৃতি করলেন। সন্ধ্যায় শঙ্খ কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে ঘরের মধ্যে নারায়ণের আরতি করলেন। পিতলের ছোট্ট সিংহাসন সমেত নারায়ণ শিলা ঘরের মধ্যে রেখে তিনি খাটিয়া পেতে বিছানা

করে শুলেন।

আজও গভীর রাত্রে সেই ঘর থেকে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক-চীৎকার শোনা গেল। তারপর একটা হুড়মুড় আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর গোঙানির শব্দ!!

বাড়ীসুদ্ধু লোক সকলেই আজ সজাগ হয়ে শুয়েছিলেন। মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো চাকর বাকর সকলেই হৈ হৈ শব্দে যে-যার ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠকোঠার দোতলায় ছুটলো। বারান্দায় গিয়ে সকলে দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে ভটচায্যিমশায়কে ডাকতে লাগলো। কিন্তু খিল তিনি খুললেন না। বরং গোঙানির আওয়াজটা ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে এল। বাড়ীর পুরুষমানুষেরা সকলে মিলে তাড়াতাড়ি দরজা ভেঙে ফেলে ভিতরে ঢুকলেন। ভিতরে গিয়ে দেখেন—ভটচায্যিমশায় মশারী ও কম্বল জড়িয়ে খাটিয়া থেকে মাটীতে পড়ে গেছেন। তাঁকে ধরাধরি করে তুলে দেখা গেল—তিনি সম্পূর্ণ অচৈতন্য, অজ্ঞান!

উপর থেকে নামিয়ে নীচে বৈঠকখানা মহলে তাঁর নিজের ঘরে তাঁকে আনা হল। বাকী রাতটুকু সকলে মিলে বহু শুশ্রূষার পর সকাল বেলায় যখন জ্ঞান হল তাঁর,—সকলেই তাঁকে সাগ্রহে প্রশ্ন করতে লাগলো—'ভটচায্যিমশায়! কী হয়েছিল কাল রাত্রে? অত ভয় পেলেন কেন আপনি?' ভটচায্যিমশায় কোনও উত্তর দিলেন না, একেবারে নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। সবাই মিলে তাঁকে যত পীড়াপীড়ি করে—তিনি নতমুখে হেঁট মাথায় বসে কী যেন ভাবতে থাকেন। কিছুই উত্তর দেন না। বাড়ীসুদ্ধু লোকের অনুনয় বিনয় মিনতি ব্যর্থ হল, ভটচায্যিমশায়ের মুখ থেকে একটি শব্দও বার করা গেল না। সুতরাং জানা গেল না, তিনি কি কারণে ভয় পেয়ে খাটিয়া থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছিলেন। ভটচায্যিমশায় কেবলমাত্র বললেন,—'আমায় তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।'

দুপুরবেলায় ভটচায্যিমশায়ের জ্বর এঁলো খুব জোবে। সকলে বলাবলি করতে লাগল—বুড়ো মানুষ, অতিরিক্ত ভয় পেয়েছিলেন। তারই তাড়সে শেষটায় জ্বর এসে গেল।

জ্বর সমানভাবে রইলো তিনদিন। তিনদিন বাদে ভটচায্যিমশায় বাবাকে ও ছোট দাদামশাইকে ডেকে বললেন,—বঙ্কু,—মণিলাল,—বাবা, তোমাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

তাঁরা দু'জনে ব্যস্ত হয়ে বললেন,—আপনি এমনভাবে বলছেন কেন? আমাদের যা আদেশ করবেন,—তাই করবো।

ভটচায্যিমশায় ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন,—আমি বুঝতে পেরেছি, আমার যাত্রার সময় ঘনিয়ে এসেচে। এ অসুখ থেকে সেরে ওঠবার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। আমার একান্ত সাধ, বাবা বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নিয়ে বারাণসীধামে যেন আমার দেহান্ত ঘটে। তোমরা ভিন্ন আর কেউই এই রুগ্ন বৃদ্ধকে অত দূরদেশে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমরা যদি বাবা অন্তিম সাধটি পূর্ণ করবার ব্যবস্থা করতে পার, ভগবান

তোমাদের মঙ্গল করবেন।

বাবা ও ছোট্ দাদামশাই বললেন,—'এ আর বেশী কথা কি? আপনার কাশীযাত্রার বন্দোবস্ত করছি। আমরা সেখানে আপনার কাছে থাকবো। কিন্তু, আপনি বৃথা ভয় পাচ্ছেন। এ সামান্য জ্বর, সেরে যাবে। কাশীতে জলহাওয়ার গুণে বরং শীঘ্রই এই একাজ্বরীটা কাটতে পারে।'

ভট্চায্যিমশায় ম্লান হেসে চোখ বুজে বললেন,—'না বাবা, সে আর হবে না। পারের পরওয়ানা এসে পৌঁছে গেছে।'

ভট্চায্যিমশায়কে বাবা আর ছোট দাদামশাই আবার প্রশ্ন করলেন—'ভটচায্যিমশায়! সেদিন রাত্রে আপনি ও-ঘরে কী দেখেছিলেন?—আমরা দু'জনে যা দেখে ভয় পেয়েছিলুম,—সেই মূর্ত্তিই কি?—', ভটচায্যিমশায় চোখ মুদে নিরুত্তব রইলেন।

যাই হোক্, ছোট্ দাদামশাই ও বাবা ভট্চায্যিমশায়কে কোনোওরকমে কাশীতে নিয়ে গেলেন। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছেই একটি বড় বাড়ীতে তেতলার উপরে একখানি ঘর ভাড়া পাওয়া গেল। সেই ঘরে ভট্চায্যিমশায়কে নিযে গিয়ে তোলা হ'ল। তেতলার ঘরখানি একেবারে রাস্তার ধারে ছিল। জানালাগুলির সামনে দাঁড়ালে নীচে রাস্তা দেখা যেত, গঙ্গা দেখা যেত, এবং হাওযা আলো আসত যথেষ্ট—জানালাব কোলে কোনও বারান্দা ছিল না।

বাবা ও ছোট্ দাদামশাই রুগ্ন ব্রাহ্মণের সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। যেদিন তাঁরা কাশী পৌঁছলেন, তার পরদিন দুপুববেলায় খাওয়া দাওয়ার পব বাবা ও ছোট্ দাদামশাই ঘুমন্ত ভট্চায্যিমশাযের বিছানার পাশে ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে একটু দিবানিদ্রার আয়োজন করছেন,—হঠাৎ তাঁদের দু'জনেরই চোখে পড়লো,—একটি লোক জানালা দিযে উঁকি মারছে। তাঁরা উভয়েই সমস্বরে কে?—কে? করে উঠে দেখতে গেলেন। কাশী জাযগা ভাল নয়। তাঁরা এসেছেন নতুন মানুষ, বোধ হয কোনও বদলোক চুরি-টুরির মতলবে উঁকি মেরে দেখছিল; এই মনে করে তাঁরা ছুটে দেখতে গেলেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু জানালার কাছে গিয়ে তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। কারণ সে জানালা একেবারে রাস্তা থেকে প্রায় ষাট-সত্তর ফিট উঁচু খাড়া দেযালের উপরে। বাইরের দিক দিয়ে সে জানালায় মানুষের উঁকি মারবার মত স্থান বা উপায় আদৌ নেই, অথচ তাঁরা একজন নয়, দু'জনেই সুস্পষ্ট দেখেছেন লোকটিকে। 'কে? কে?' বলতেই চট করে সরে গেল।

যাই হোক্, এ কথা তাঁরা আর প্রকাশ করলেন না। ভটচায্যিমশায় দিন কয়েক পরেই দেহরক্ষা করলেন। বাবা ও ছোট্ দাদামশাই তখন আমাশয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। উভয়েই অনাহারে আমাশয়ের যন্ত্রণায় অস্থির। ভট্চায্যিমশায়ের সৎকারের জন্য তাঁরা কাশীর 'সৎকার সমিতি'তে খবর দিলেন, কাশীতে শবদাহের জন্য ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতির লোক পাওয়া যায়। তাদের টাকা দিলে শব তুলে নিয়ে গিয়ে মণিকর্ণিকায়

সৎকার করে।

ছোট্ দাদামশাই ও বাবা মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে মণিকর্ণিকায় গেলেন। শবদাহকারীরা মোট সাতজন। তার মধ্যে একজনের চেহারা বেশ সুশ্রী সুন্দর। দেখলে উচ্চ ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত বলে মনে হয়। সেই ব্রাহ্মণযুবক মৃতদেহ তুলবার সময় ভট্চায্যিমশায়ের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর খুব যত্ন করে দেহটি সন্তর্পণে ধরাধরি করে নীচেয় নামিয়ে এনে খাটের উপরে বিছানা পেতে শোয়ালে। মনে হল, যুবকটি যেন ভট্চায্যিমশায়ের পূর্ব্ব-পরিচিত কেউ হবে। তাঁর শব দাহ করতে এসে তাঁকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু সে নিজে থেকে কিছু পরিচয় না দেওয়ায় বাবা বা ছোট্ দাদামশাই তাকে আর কিছু প্রশ্ন করলেন না।

ভট্চায্যিমশায়ের মৃতদেহ শববাহকেরা মণিকর্ণিকার ঘাটে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলে,—সেই ব্রাহ্মণযুবক এসে বাবা ও ছোট্ দাদামশাইয়ের কাছে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ভট্চায্যিমশায় ব্রাহ্মণ, সেও সদ্‌ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁরা যদি অনুমতি করেন, তা হ'লে সে তাঁর মুখাগ্নি করতে পারে। বাবা এবং ছোট্ দাদামশাই এতে মত দিলেন।

ছোট্ দাদামশাই বাবাকে বললেন,—'দেখ মণিলাল, এ লোকটিকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে! জিজ্ঞাসা করবো নাকি পরিচয়?'

বাবা বললেন,—'অনেকক্ষণ থেকে ঠিক তাই মনে হচ্ছে ছোট্‌খুড়ো! কিন্তু, ও-যখন "সৎকার-সমিতি"তে কাজ করছে, তখন খুব সম্ভব আত্মপরিচয় দিতে অনিচ্ছুক হবে। ও বোধহয় ভাগলপুরের লোক, ভট্চায্যিমশায়কে চিনত মনে হয়। দেখছো না, কী রকম যত্ন করে আত্মীয়ের মত সৎকারের সমস্ত নিয়ম পালন করছে! সৎকার সমিতির লোকেরা এত সব করে না। দেখ না, আর সবাই বসে বসে গাঁজা টানছে আর গল্প করছে!...আমি লক্ষ্য করলুম, ঐ লোকটি সমস্ত পথ শবদেহ ব'য়ে নিয়ে এল, একবারও খাট ছাড়েনি!'

তারপর বাবা আর ছোট্ দাদামশাই ভাবতে লাগলেন ভাগলপুরের কোন্ পাড়ার লোক ঐ ব্রাহ্মণটি? ছোট্ দাদামশাই বললেন,—'যাই হোক, কথায় যে বলে, যার কেউ নেই তার ভগবান ভরসা! এ কথা ঠিক! ভটচায্যিমশায় লোক অত্যন্ত ভাল ছিলেন। দ্যাখ, আমরা তাঁর কেউই নই, তবু আমাদের দ্বারা ভগবানই তাঁর সেবাশুশ্রূষা যত্নের ত্রুটী রাখলেন না। আবার সৎকারেরও কিছুমাত্র খুঁত বইলো না! লোকের ছেলে থাকলে যা করে এ লোকটি সমস্তই তা করলে! অথচ, কত লোকের বহু আত্মীয় পরিজন থাকতেও অন্তিম সাধ বা অন্তিম সেবা পূর্ণ হয় না।'

তাঁরা বসে বসে এইরকম কথাবার্ত্তা বলছেন, ততক্ষণে চিতা নিভে এসেছে। মুখাগ্নিকারী যুবক খুব যত্নের সাথে মণিকর্ণিকা থেকে কলস ভরে জল এনে চিতাস্থলী ধুয়ে মৃতের অস্থি নিয়ে মণিকর্ণিকায় জলে দেবার জন্য গঙ্গায় নামল।

বাবা ও ছোট্ দাদামশাই আশ্চর্য্যভাবে দেখছিলেন তার কার্য্যকলাপ। খানিক

বাদে সৎকার সমিতির লোকেরা এসে যখন তাঁদের কাছে দাঁড়ালেন, প্রাপ্য অর্থ মিটিয়ে দিতে গিয়ে ছোট্ দাদামশাই জিজ্ঞাসা করলেন,—'মশায়, আপনাদের মধ্যে যিনি শবের মুখাগ্নি করলেন, উনি কে? ওঁর নাম কি এবং নিবাস কোথায় বলুন তো?'

সৎকার সমিতির লোকেরা বিস্মিত সুরে বললে—সে কী মশায়? উনি তো আপনাদেরই লোক।...আপনি কার কথা বলছেন বলুন তো?

ছোট্ দাদামশাই হতভম্বের মত বললেন,—ঐ যে যিনি আপনাদের সাথে ছিলেন! শব বহন করে আনলেন, মুখাগ্নি করলেন, গঙ্গায় অস্থি নিক্ষেপ করলেন—

সৎকার সমিতির লোকেরা বলে উঠলো—বাঃ! উনি আমাদের দলের লোক হতে যাবেন কেন? আমরা তো মোটে ওঁকে চিনিই না। খবর পেয়ে মোট ছ'জন লোক গিয়েছিলুম আমরা! ওঁকে তো শব তোলবার সময় আমাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে দেখলুম। কেন? উনি কি আপনাদেরই নিজের লোক নন?

বাবা ও ছোট দাদামশাই অভিভূতের মত বলে উঠলেন—না তো!

সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে—সেই ব্রাহ্মণ যুবককে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো, কিন্তু তার কিছুমাত্র সন্ধান পাওয়া গেল না।

হঠাৎ বাবা ছোট দাদামশাইকে বলে উঠলেন,—ছোট খুড়ো। তোমার কি মনে পড়ছে, আমরা ভটচায্যিমশায়কে নিয়ে প্রথম যেদিন কাশীতে আসি, তার পবের দিন দুপুর বেলায় জানালায় একটা লোক উঁকি মারছিল। ভেবে দেখ দিকি, এই সে-ই মুখ কি না!

ছোট্ দাদামশাই বলে উঠলেন,—ঠিক বলেছো মণিলাল! তাই কেবলি মনে হচ্ছিলো, মুখখানা যেন বড্ড চেনা চেনা, কোথায় যেন কবে দেখেচি!...

তাবপর বাবা ও ছোট দাদামশাই পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে করতে ভয-জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'মনে পডছে কি, ভাগলপুরের মাঠকোঠার দোতলাতে রাত্রিবেলায় এই চেহারাই তো দেখা গেছলো। খুব রুক্ষ কটমটে চাউনি ছিল তখন!...মনে পড়ছে কি?—'

পবস্পরের কারুরই আর মতদ্বৈধ বইলো না, ভাগলপুবে গভীর রাত্রে ঘরের জানালায় এবং বিছানায় মশারীর পাশে এই লোকটিরই অগ্নিগর্ভ চাউনি দেখে তাঁরা ভয়ানক ভয় পেয়েছিলেন। কাশীতে তেতলায় উঁকি দিযেছিল এই-ই!

বাবা ও ছোট্‌কাকা ভাগলপুরে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা বাড়ীতে বললেন। সকলে খুবই বিস্মিত হল। কারণ, ওরকম চেহারার ব্রাহ্মণ যুবক ভাগলপুরে কখনো কেউ ছিল না এবং মাবাও যায়নি।

ভটচায্যিমশায়ের ঘরে তাঁর একটি ক্যাম্বিস ব্যাগ ছিল। দেশ বিদেশ ভ্রমণে সেই ব্যাগটিই ছিল তাঁর সঙ্গী। ব্যাগ খুলে দেখা গেল, কতকগুলি কাপড় চোপড়

ও অন্যান্য জিনিষপত্রের সঙ্গে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে আছে—প্রতিমাপূজার পৌরোহিত্যে প্রাপ্ত গুটি দুই সোনার নথ, কয়েক প্রস্থ আসন অঙ্গুরীয়ক, এবং ৮৩ টাকা কয়েক আনা মাত্র।

সমস্ত ব্যাগটি তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করে একখানি পুঁথির গায়ে ভট্টচায্যিমশায়ের নাম এবং দেশের ঠিকানা, যশোর জেলায় একটি গ্রামের নাম পাওয়া গেল।

মামার বাড়ীর সকলে সেই গ্রামের পোষ্টমাষ্টারকে পত্র লিখে অনুরোধ করলেন, ঐ গ্রামে উক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য নামে কেউ ছিলেন কিনা এবং তাঁর কেউ উত্তরাধিকারী আছে কিনা? কিছুদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল,—যদুনাথ ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্রাহ্মণ ঐ গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁর সন্তানাদি কেউ জীবিত নেই। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করে বিবাগী হয়ে কোথায় যে চলে গিয়াছেন, তা কেউই জানে না। তিনি তাঁর ভাগিনেয়কে নিজের বাড়ী বাস করবার জন্য দান করে গেছেন। এখন তাঁর বিধবা ভাগ্নে-বৌ ছাড়া আর উত্তরাধিকারী নেই।

মামার বাড়ী থেকে কর্ত্তারা সেই বিধবা ভাগ্নে-বৌকে ভাগলপুরে এসে তাঁর পরিত্যক্ত অর্থাদি নিয়ে যাবার জন্য পত্র লিখে দিলেন। কিছুদিন বাদে এসে পৌছুলেন —ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের বিধবা ভাগ্নে-বৌ! তাঁকে মৃতের পরিত্যক্ত সমস্ত কিছু দিয়ে দেওয়া হল।

ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের জীবনকাহিনী জানবার আগ্রহ সকলেরই ছিল। কারণ তিনি কখনও কিছু বলতেন না কাউকে। বিধবা ভাগ্নে-বৌকে প্রশ্ন করলে তিনি সমস্ত কাহিনী বিবৃত করলেন।

ভট্চায্যিমশায় তাঁদের গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ ছিলেন। পৌরোহিত্যই তাঁদের পুরুষানুক্রমিক পেশা। ভট্চায্যিমশায়ের স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করে মারা যান। ভট্চায্যিমশায় জীবনে আর বিবাহ করেননি এবং সেই শিশুটিকে নিজে বুকে করে মায়ের মত লালনপালন করেছিলেন। ছেলেটি ছিল যেমনি সুন্দর সুশ্রী, তেমনি স্বাস্থ্যসবল বলিষ্ঠ। তার বয়স যখন বাইশ-তেইশ হয়েছিল, ভট্চায্যিমশায় তার বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন করছিলেন। ছেলেটির স্বভাব যথেষ্ট গুণের হলেও ছোট হতে অত্যধিক স্নেহে ও আদরে লালিত হওয়ায় তার অভিমান ও রাগটা ছিল অত্যন্ত বেশী। বাপকে সে অত্যধিক ভালবাসত এবং শ্রদ্ধাভক্তি করত, কিন্তু অভিমান বা রাগ হলে সে বাপের পানেও চাইত না। একদিন কী একটা কথায় ভট্চায্যিমশায় ছেলেকে বুঝি সামান্য ভর্ৎসনা করেছিলেন,—সেই অভিমানে ছেলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে।

ভট্চায্যিমশায় অকস্মাৎ এই ভীষণ শোকের প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে যেন পাথর হয়ে গেলেন। এর পরে আর তিনি সংসারে রইলেন না। গৃহত্যাগী হয়ে নিরুদ্দেশ হন। যাওয়ার সময় ভাগ্নেদের ডেকে বলেন, 'তোমরা আমার এই বাড়ীঘর বিষয় সম্পত্তি ভোগদখল করো, আমার শিষ্য-যজমান উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। আমি

আব ফিরবো না। আমার খোঁজ তোমরা কোরো না। করলেও পাবে না।' এতকাল বাদে তাঁর মৃত্যুর পর এই উদ্দেশ পাওয়া গেল।

বাবা ও ছোট দাদামশাই সোৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা কবলেন, ভট্‌চায্যিমশায়ের ছেলেব চেহারা কেমন ছিল? বিধবা যেমন বর্ণনা কবলেন,—তাতে তাঁবা উভয়ে স্তম্ভিত হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি কবতে লাগলেন; কারণ, তাব চেহারা, রং, গডন, চোখমুখের বিশেষত্ব সমস্ত কিছুই মিলে যাচ্ছিলো কাশীতে ভটচায্যিমশায়ের মুখাগ্নিকারী সেই যুবকের সঙ্গে!

কিন্তু. এ-ই-বা কী করে সম্ভব, বিশ বৎসর আগে যে মানুষ যশোব জেলার গণ্ডগ্রামে মাবা গেছে,—সে ভাগলপুরে ও কাশীতে এমন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো!! সুতরাং এটা কী?...

বডদাব গল্প সাঙ্গ হল। আমরা এতক্ষণ চিত্রার্পিতেব মত শুনছিলাম। একজন জিজ্ঞাসা কবলে,—'বডদা, একি সত্যি হতে পাবে?'

বডদা নির্ব্বিকাবভাবে বললেন,—তা কী কবে বলবো আমি! ঘটনা যা শুনেছি তাই বললুম। ওবে নিধি!...তামাকটা পুড়ে গেছে, কল্‌কেটা বদলে দিয়ে যা বাবা!

গল্প-পুষ্পাঞ্জলি, আশ্বিন ১৩৪২

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কল্যাণীয়াসু

রবীন্দ্র পরিষদে আমার লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করবে শুনে খুব খুশি হলুম। "ঘরে বাইরে" বইখানির উপরে তুমি যে প্রবন্ধ লিখেছিলে সেটা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েচে। ভালো লাগল—সে লেখার প্রশংসা অনেক গুণ লোকের মুখেই শুনেচি। ওর মধ্যে বিচারের গভীরতা আছে। এইভাবে তুমি আমার অন্য গল্পগুলির যদি ব্যাখ্যা করো সাহিত্যে সেগুলি সুপথ্য হবে।

কুমুর আরো কিছু বিস্তারিত পরিচয় তুমি আমার কাছে শুনতে চাও। রচয়িতা সাহিত্য সৃষ্টির যে পরিচয় দেন সে সঙ্কলনের দ্বারা, বিচারক তার পরিচয় দেন বিকলনের দ্বারা। কুমুর জীবনের অনেক-কিছুকে এক করে তুলে তার সমগ্র ছবি খাড়া করা হয়েচে—এইটে হোলো আমার কাজ—তোমার কাজ হচ্চে সেই এককে অনেকের মধ্যে বিকীর্ণ করে তার পবিচয়টিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যাচাই করে নেওয়া। এই দুই বিপরীত কর্ত্তব্যটিকে আমাকে দিয়ে সমাধা করবাব চেষ্টা করো কেন? তবু একটা গোড়াকাব কথা তোমার লক্ষ্যগোচর করে দিই।

সেকালের বনেদী ঘবের মধ্যে কুমুর জন্ম। বনেদীঘর সাধারণত আপন পাকা দেয়ালের মধ্যে আপন সাবেক কালকে বেষ্টন করে রাখে। সেই সাবেক কালের অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু সে আপন আভিজাত্য রীতি দায়িত্ব প্রাণপণে স্বীকার করে, যে কোনো ব্যবহার তার কাছে ইতব বলে...ঠেকে বা কুলগৌববের অযোগ্য বলে সে মনে করে সর্ব্বনাশ হলেও সেটা বর্জ্জন করে। কিন্তু এই বেষ্টনের বাইবে যে সব পবিবর্তন দ্রুত বেগে ঘটচে তার মধ্যে আভিজাত্যের দায়িত্ব গৌরব নেই —তাই তাব ভাষায ভাবে কামনায় কর্মে ভ্রষ্টতার, ইতরতাব বাধা থাকে না। এই কারণেই এই রকম বংশের বাইরের সমাজের একটা প্রভেদ অনেকদিন স্থায়ী থাকে। কুমু যে সময়ে জন্মেচে সেই সময়ে একাকার হবার পালা আরম্ভ হয়েচে কিন্তু তবু ওদের ঘরে আত্মসম্ভ্রমের একটা বাঁধারীতি ছিল। কুমুর জন্ম তারই মধ্যে। বাইরের সমাজ যে কতই পৃথক তা ও কল্পনাও করতে পারত না। ছেলেবেলা থেকে ভাইয়ের স্নেহে পালিত কুমু নিঃসঙ্গিনী—এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় তাব স্বাভাবিক ধ্যানপ্রবণতা কোনো বাধা না পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেচে। যে-যৌবনের মুখে পুরুষের পূর্ণ আদর্শ তার মনকে অন্তরে অন্তরে নিজের অগোচরেও আকর্ষণ করেচে সেই বয়সে তার ঠাকুরের মধ্যে সেই আদর্শের সে প্রতিষ্ঠা করেচে, বস্তুত আপনার নারীর প্রেম পূজার ছলে সেই ঠাকুরকেই দিয়েছিল। এমন কুমু আপন সংস্কারের মোহে কল্পনা করলে যে বিবাহের প্রস্তাবে তার ঠাকুরই তাকে ডেকেছেন—স্বামীর মধ্যে এই ঠাকুরেব আহ্বান সার্থক হবে, এই ঠাকুরের পূজাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। হয়তো ভক্তির জোরে

তাই হতে পারত—হয়ত স্বামীকেও আপন ধ্যানের পরশপাথরে সে সোনা করে তুলত কিন্তু মধুসূদনের স্থূল প্রকৃতি তাকে একান্তই বাধা দিলে—এইখানেই ট্র্যাজেডি। মধুসূদন অত্যন্ত হাল আমলের কৃতী পুরুষ, ধন ও বাহ্যমান উপার্জ্জনে সিদ্ধিলাভেই তার একান্ত লক্ষ্য। তাদের বংশও একদিন সম্মানী ছিল কিন্তু দারিদ্র্যের তলার পাঁকে লিপ্ত তাদের আত্মসম্ভ্রমের দায়িত্ববোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। হাল আমলের প্রচলিত রীতি অনুসারে ধনের গৌরবকেই সে সবচেয়ে বড়ো বলে দাম্ভিকতায় স্ফীত হয়েছিল—এমন অবস্থায় কুমু তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারলে না—তাতে তার আত্মসম্মানে নিরতিশয় ঘা দিলে—এত বড়ো অপমানকর সম্বন্ধ তার পক্ষে ব্যভিচারের সমতুল্য —এ যেন দেবতার অবমাননা—নিজের যা শ্রেষ্ঠ তাকে পঙ্কে বিলুণ্ঠিত করা। কুমুর এই পরিচয়ের মধ্যেই গল্পের সমাধা হোলো। ওর পরিচয়ের পক্ষে আর বেশি কোনো ঘটনার প্রয়োজন নেই। আমার একান্ত সময়াভাব। ইতি

১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়া রাধারাণী

তুমি যে সমস্যার কথা আমার কাছে উত্থাপন করেচ তার গ্রন্থি ত আপনিই খুলে গেছে। জটিলতা কিছুই নেই। মেলবার বাধা কোন পক্ষেই দেখচি নে। সংসারের দিকেও গণ্ডী গেছে মুছে।

বাকি যে কথাটা আছে সেটা এক হিসাবে সামান্য আর এক হিসাবে গুরুতর। যেমন ভূতের ভয়। ভূতটা অবাস্তব বলেই ভয়টা এত শক্ত।

দেহের চির-কৌমার্য্যকে পবিত্র বলে একটা বানানো কথা আছে। প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করবার প্রয়োজন ঘটলে তাকে দমন করায় পুণ্য আছে—কিন্তু তার অভাবটা, হয় শরীরের নয় মনের অপরিণতির লক্ষণ। কোনো কোনো গাছের ফল ধরানো নিরুদ্ধ করে তার ফুল ফোটানোর তেজ বাড়ানো যায় কিন্তু তাই বলে যে গাছ স্বতই অফলা সেই গাছই যে পবিত্র এ কথা একেবারে অশ্রদ্ধেয়। বিশেষ কোনো ব্রত পালনের তাগিদে পুরুষ কিম্বা মেয়েকে কৌমার্য্য স্বীকার করতে হয় কিন্তু যেখানে তাগিদ নেই সেখানে অকারণ ব্রহ্মচর্য্য রোগের মতোই অবাঞ্ছনীয় ত্রুটি। রোগে আহারের ক্ষুধা থাকেনা, সেই ক্ষুধার অভাব শুচিতা নয়, তার বিপরীত। দরকার হলে উপবাসে মৃত্যু স্বীকার করে মনের তেজ দেখাতে পারি কিন্তু আহারের স্বাভাবিক ক্ষুধাটাকেই যদি গাল দিয়ে কেউ উপবাস করে তবে তাকে সুস্থ প্রকৃতির মানুষ

বলে গণ্য করা চলবে না। স্বভাবনির্দ্দিষ্ট সব প্রবৃত্তিই তাব স্বস্থানে সুন্দর ও পবিত্র। স্বভাবের সীমা পেরলেই অশুচি। মানুষ আপন কল্পনার জোরে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অস্বাভাবিক করে বাড়িয়ে তোলে—পশুরা প্রায় তা করেনা। প্রকৃতি আপন কাজ উদ্ধারের জন্যে যেখানে কিছু পরিমাণ চিনির লোভ দেখিয়েছেন মানুষ সেখান থেকে সেই চিনিটিকে ছেঁকে নিয়ে তাকে মদ করে বানিয়েচে। নিন্দে এই অস্বাস্থ্যকর অনাবশ্যক মাৎলামিকে নিয়ে—চিনির ভোগ নিয়ে নয়। ভাইবোনের সম্পর্ককে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক করা যেমন অপরাধ আমার মতে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ককে ভাই-বোনের সম্পর্ক করে তোলা তেমনি অপরাধ। অবশ্য শরীরের মধ্যেই যদি কোনো অনিবার্য্য বাধা থাকে এবং সেই বাধা বশতই যদি দেহের স্বাভাবিক ক্ষুধা দুর্ব্বল হয়ে থাকে তবে সে অন্য কথা। কিন্তু ক্ষুধার একান্ত অভাবকে কিম্বা অকারণেই তাকে দমন করাকে কেউ যেন শুচিতার লক্ষণ বলে গৌরব না করে।

কাল ববিবারে কলকাতায় যাচ্ছি দার্জ্জিলিঙের পথে। যদি দেখা হয় বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। ইতি শনিবার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

জ্বরাভিভূত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

কল্যাণীয়াসু

গরঠিকানিয়া বন্ধু তোমার
ছন্দে লিখেছে পত্র।
ছন্দেই তারে ইনিয়ে বিনিয়ে
জবাব লিখিনু অত্র।
যন্ত্রের যুগে মেঘদূত তার
পদ করিয়াছে নষ্ট,
তাই মাঝে পড়ে খামকা অকাজে
তোমারে দিলেম কষ্ট।
আজি আষাঢ়ের মেঘলা আকাশে
মন যেন উড়ো পক্ষী
বাদলা হাওয়ায় উড়ে উড়ে ফিরে
অজানার পানে লক্ষ্যি।
ঠিকানা তাদের রঙীন মেঘেতে
লিখে দেয় দূর শূন্য।

খামে-ভরা চিঠি না যদি পাঠাই
হয় না তাহারা ক্ষুণ্ণ।
তাহাদেরি চিঠি আন্‌মনাদের
আসে জানালার পার্শ্বে,—
যে পড়িতে জানে সেই বোঝে মানে
চিঠিখানি সবাকার সে।
উত্তর তারি কখনো কখনো
গেয়েছি আমারি ছন্দে
গুঞ্জন তারি ছড়িয়ে গিয়েছে
সিক্ত মাটির গন্ধে।
অচিন মিতার সাথে কারবার
সে তো কবিদেরই জন্য,
তারা তো অধরা সঙ্গীতে ভরা,
কিন্তু তারা যে অন্য।
জানা-অজানার মাঝখানটাতে
যে আছে করিয়া সন্ধি,
কবির সাধ্য নাই তারে করে
পোস্টাপিসের বন্দী।
মর্ত্যেব দেহে মেনে যে নিয়েছে
বাঁধন পাঞ্চভৌত্যে,
তুমি ছাড়া কারে লাগাব তাহার
চার পয়সার দৌত্যে।
জানি এ সুযোগে চাও কিছু কিছু
হাল খবরের অংশ,
হায়রে, আয়ুতে খবরের কোঠা
প্রায় হয়ে এল ধ্বংস।
সেদিন ছিলাম পঁচিশ, আজকে
হয়েছি আটাত্তর,
আমার জীবন ভরিয়া রয়েছে
এ খবর মাত্তর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ আষাঢ়, ১৩৪৫
কালিম্পঙ

৪

কল্যাণীয়েসু

"দুই বোন" গল্পটা সম্বন্ধে কিছু লিখতে ও কিছু শুনতে চেয়েচ। গল্পের ভূমিকাতেই ভিতরকার কথা ফাঁস করে দিয়েছি। সাধারণত মেয়েরা কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুইয়ে মিলে। বাংলাদেশের অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধবয়স পর্যন্তই মায়ের খোকা, তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই কামনা করে। বিবাহে যাবার আগে বর বলে যায়, মা তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি—অর্থাৎ স্ত্রী আসে মায়ের পরিশিষ্ট হয়ে, alma mater-এর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীর মতোই। ছেলে মায়ের কাছ থেকে আশৈশব যে সকল সেবায় অভ্যস্ত, বধূ এসে তারি পুনরাবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়। স্ত্রী সুযোগ পায় না নিজে স্বামীকে স্বতন্ত্রভাবে বুঝে নিয়ে নিজের স্বতন্ত্ররীতিতে তার তৃপ্তিসাধন করে। সংসারকে সম্পূর্ণই আপন প্রতিভায় নতুন করে তোলে। সেই জন্যেই বিবাহের পরেও অনেক পুরুষ মায়েব আওতাতেই থেকে যায়। তাতে তার বাড় কমে সন্দেহ নেই।

আবার অনেক পুরুষ আছে যারা আর্দ্র আদরেব জালে আপাদমস্তক জড়িয়ে থাকতে ভালোই বাসে না। তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, অর্থাৎ তারা চায় যুগল মিলন। তারা জানে স্ত্রী যেখানে যথার্থ স্ত্রী, পুরুষ সেখানে যথেষ্ট পৌরুষের অবকাশ পায় —নইলে তাকে লালনরস-লালায়িত শিশুগিরি করতে হয়—মায়ের দাসীকে নিয়ে থাকার মতো এমন দৌর্ব্বল্য, এমন ব্যর্থতা পুরুষের জীবনে আর কিছু নেই।

শশাঙ্ক নিত্যস্নেহসতর্ক মাকে পেয়েছিল তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় ঊর্ম্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত লাগল, ট্র্যাজেডি ঘটল।

অপরপক্ষে কোনো কোনো অতিনির্ভররত মেয়ে এমন পুরুষকে চায় যে হবে তার জীবন মোটরের শোফার। সে চায় গুরুকে, পায়ের ধূলোর কাঙালিনী তারা। নিশ্চয়ই এমন মেয়েও আছে যারা অতিলালন অসহিষ্ণু প্রকৃত পুরুষকেই চায়, যাকে পেলে তার নারীত্ব পরিপূর্ণ হয়। ঊর্ম্মি বেচারা সেই জাতের। সুরুতেই শোফারকে নিয়ে গুরুকে নিয়ে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময় সে পেলে এমন পুরুষকে যে উৎকণ্ঠিত হয়ে খুঁজচে স্ত্রীকেই। যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই, যে তার জুড়ি। ভাগ্যেব অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হয়ে উঠল, এই হচ্চে ব্যাপারটা।

ইতি ২৭ মার্চ্চ ১৯৩৩ রবীন্দ্রনাথ

পুঃ বলা বাহুল্য, সব মেয়ের মধ্যেই মা আছে প্রিয়া আছে। কোন্‌টা মুখ্য কোন্‌টা গৌণ, কোন্‌টা এগিয়ে আছে, কোন্‌টা আছে পিছিয়ে তাই নিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য।

জলধর সেন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক,
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—"ভারতবর্ষ"

শনিবার

মা রাধারাণী,

তুমি যে কলিকাতায় আছ, তাহা জানিতাম না। মায়ের কাছে ছেলের ত্রুটী গণ্য হয় না, তাই এত বিলম্বেও বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানাইলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি 'লীলা-কমলে'র দেবী তোমার উপর আরও প্রসন্না হোন। এর বাড়া আশীর্ব্বাদ ত তোমার এ বৃদ্ধ ছেলে জানে না মা।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীজলধর

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

College of Science
Calcutta 26. 7. 37

কল্যাণবরেষু

তোমাদের পত্র পাইলাম। তোমরা উভয়ই (স্বামী ও স্ত্রী) সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। সুতরাং তোমরা যদি একটু আমার লেখাটি একটু retouch করিয়া দাও তাহা হইলে বড়ই উপাদেয় হইবে—আশা করি।*

শুভার্থী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

---

* রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত ছোটদের শারদ বার্ষিকী, 'সোনার কাঠি'র জন্য পাওয়া রসায়ন বিষয়ক রচনা।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Purnea
22.10.40

বড় আদরের রাধা,

তোমরা সুখে, স্বাস্থ্যে, শান্তিতে থাকো—এই আমার বিজয়ার আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা।

ঘাটশীলা কেমন স্থান, কিরূপ লাগছে, কতদিন থাকবে, লেখনি কেন! আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবুকে [১] সেখানে পেয়েছো, এইটি সবার বড় লাভ। সমবয়সী পেয়ে সে লাভ হয় না। ও বয়সের ভালোবাসা, নির্ম্মল স্রোতের মতো স্বচ্ছ, স্নেহ মধুর, কোমল স্পর্শমাখা, তিনি যদি ঘাটশীলায় থাকেন তাঁকে আমার সত্যিকারের শ্রদ্ধানত নমস্কার জানিও।

বয়স আর রোগ আমাকে লেখা ছাড়তে বাধ্য করেছে। তদ্ভিন্ন যখন বুঝলুম নিজের লেখায় আর রস বা আনন্দ পাচ্ছি না, তখন, নিজেই ছেড়ে দিলুম। এখন শরীর অশক্ত, মন উৎসাহহীন। ভাটিগো একটু কমতেই লম্বেগো উপস্থিত, উভয়েই যখন 'go'-এর সংবাদ বহন করে' এসেছেন, তখন থাকাও আর ভাল দেখায় না। এ বয়সে তাঁদের ক্ষুণ্ণ করে অপরাধ বাড়িয়েই বা লাভ কি? তার চেয়ে, বাংলার শ্রী ও গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু, আমাদের রবীন্দ্রনাথকে ভগবান আরো কিছুদিন সুস্থ রাখুন, ইহাই সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি।

আর নয় রাধা,—অভিমান কববার লোক রয়েছেন এবং চিরদিন থাকুন।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কামিনী রায়

৪২-এ হাজরা রোড
বালীগঞ্জ, কলিকাতা,
৮ই মে, ১৯৩০

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠিখানি পাইয়া সুখী হইয়াছি। তোমাব বইখানি [২] উপহার পাইয়া তোমাকে আমার বই [৩] ও চিঠি দেওয়ার পব এই পরিবারের উপর দিয়া আর একটা

---

১. প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২. বাধারাণী দেবীর কবিতার বই 'লীলাকমল'।

৩. কামিনী রায়ের কবিতার বই 'দীপ ও ধূপ'।

শোকের ঝটিকা বহিয়া গেল।

তোমার "লীলাকমল", পড়িয়াছি। ভালই লাগিয়াছে। ভিতর ও বাহির দুই-ই সুন্দর হইয়াছে। উভয়ত্রই তারুণ্যের উজ্জ্বল পরিচয়।

তোমার কবিতাগুলির মধ্যে গীতিরূপ উপাদানটি (lyric element) বেশি ফুটিয়াছে মনে হয়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্কুলের ভাষা ও ভাব, ছন্দ ও সুর তোমার আয়ত্ত হইয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে কবি হেমচন্দ্র 'আলো ও ছায়া' সম্বন্ধে যে লিখিয়াছিলেন—"কবিতাগুলি আজকালের ছাঁচে ঢালা"—আমিও তোমার কবিতা পড়িয়া সেই কথাই মনে মনে বলিয়াছি। ইহা নিন্দাচ্ছলে বলি নাই। গদ্যে পদ্যে রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় এবং বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের গুরু। তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করা সহজ নহে। তবে অনুকরণ বিষয়ে সাবধান থাকিলে নিজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় না। তিনি অসম ও বিষম ছন্দ সকল প্রচলন করিতেছেন। তুমি সেদিকে তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়াছ, মনে হয়। ভাষা এবং ভাবের ত্রুটি না থাকিলেও বরফির আকৃতির কবিতাগুলির, প্রাচীনা আমার কাছে একটু ছেলেমানষি খেয়াল বলিয়া বোধ হয়। Art-এর দিক হইতে না হউক heart-এর দিক হইতে সেগুলি যেন একটু কৃত্রিম ও অগভীর।....

সে যাহা হউক, তোমার প্রায় সবগুলি কবিতাই আমার মিষ্ট লাগিয়াছে। নবশক্তির সমালোচনা আমি পড়ি নাই।

তোমার লিখিবার শক্তি আছে। এই শক্তি দিন দিন চিন্তা ও ভাবের গভীরতা, প্রকাশের স্বচ্ছতা এবং বিষয়বস্তুর উচ্চতা ও ব্যাপকতা লাভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুক।

তোমার মতে 'দীপ ও ধূপে' যেগুলি উৎকৃষ্ট তাহা তালিকা দিলে আনন্দিত ও বাধিত হইব।

দীর্ঘ চিঠি লিখিলাম। দেশের এক বিপ্লবের যুগের সূচনা হইল। এ সময়ে অনেক চিন্তাই আসে, কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক শক্তি এখন ক্ষয়োন্মুখ।....

আমার স্নেহাশীর্বাদ লও। আশা করি ও প্রার্থনা করি সুস্থ সবল হইয়া নীচে আসিতে পার।[৪] শিলং সুন্দর স্থান।

আশীর্ব্বাদিকা
শ্রীকামিনী রায়

৪. তখন রাধারাণী দেবী শিলঙে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

প্রমথনাথ চৌধুরী

20, MAYFAIR
BALLYGUNGE
২৫.৭.৩২

কল্যাণীয়াসু,

অনেকদিন পর তোমার চিঠি আবার কাল পেলুম। ইতিমধ্যে আমি যে তোমাকে চিঠি লিখিনি, তার প্রথম কাবণ, আমি তেমন চিঠি লিখিয়ে লোক নই, তাই কাবও চিঠি না পেলে, তার জবাব আগে থাকতেই লিখি নে, আর তার দ্বিতীয় কারণ, আমাব মনে হয়েছিল যে আমি হচ্ছি সেই পৃথিবীর লোক যে পৃথিবীর দিকে তুমি পিঠ ফিরিযেছো। কথাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। তুমি পৃথিবীর দিকে পিঠ ফেরাও নি, তুমি যা করেছ সে হচ্ছে আমাদেব সমাজ নামক পদার্থটির আবিষ্কার। সমাজকে চিনে তুমি অবাক হয়ে গেছ। তুমি কি মনে ভেবেছিলে যে সমাজ জিনিসটে ঠিক তোমাব মনের মত? সে ভুল আমি কস্মিন কালেও করিনি। আমাদের এ সমাজেব প্রধান গুণ হচ্ছে, কাপুরুষতা (তুমি এখন যার পরিচয় পাচ্ছ)। এ বিষয়ে আজকালেব তরুণদের সঙ্গে সে কালের প্রবীণদের বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই—যদিচ এই দুই দলেব mental atmosphere সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং যুগের কথাও আলাদা। আমাদের কথাব সঙ্গে আমাদের জীবন খাপে খাপে মিলে যায় না। নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা নিজের মতামত অনুসারে জীবনে নতুন পথে চলব—আর সমাজ তাতে সহায়তা করবে—এবকম আশা কবা যে ভুল তা তুমি এখন বুঝতে পেরেছ। আমি নিজের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে আমার লেখায় আমি কখনও সমাজের এই জড়তাকে প্রশ্রয় দিই নি। আমি সমাজ বিদ্রোহী নয়—সমাজ থেকে আলগা। এই কাবণেই অনেকে আমাকে cynic বলেন। আমি যে কেন cynic এখন বোধহয় তুমি তা বুঝতে পারছ। এ সমাজ সম্বন্ধে sentimentalism কবা আমার পক্ষে অসাধ্য। তা যদি করতে পারতুম তাহলে আমি একজন একঘরে লেখক না হয়ে লোকপ্রিয় লেখক হয়ে উঠতুম। তুমি যখন বাধ্য হয়ে এসব বিষয়ে ভাবতে সুরু করেছ তখন তোমার অস্পষ্ট ভাবনাগুলোকে লেখার ভিতব ঝংকার কবে তোলো না কেন? সে লেখা reality বঞ্চিত হবে না।

আমাব নিজেব কথা এই—দিন একরকম কেটে যাচ্ছে। এর বেশি কিছু বলবার নেই।

আমি নিশ্চযই সস্ত্রীক তোমার সঙ্গে একদিন দেখা করতে যাব—এবং কবে; কোন সমযে যাব তা তোমাকে লিখব। এ চিঠির জবাব পেলেই দিন স্থির করব।

ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

Morabadi
Ranchi
24.10.37

কল্যাণীয়াসু,

তোমার ও নরেনের বিজয়ার প্রণামী পত্র পেলুম। তুমি ও নরেন আমাদের আশীর্ব্বাদ জেন। এখানে ভালয় ভালয় এসে পৌচেছি ও ভালই আছি। প্রথমে এসে বেশ শীত পেয়েছিলুম। আজ দু-দিন থেকে আবার গরম হয়েছে। অবশ্য কলকাতার মত গরম নয়—তবে রদ্দুর বেজায় কড়া। বেলা দশটার পর বাইরে গেলে মাথা ফেটে যায়। এ নাকি আগামী বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণ। এক পশলা বৃষ্টি পড়লেই পাকা শীত পড়বে।

রবীন্দ্রনাথ তোমার কাছে "ঘোষালের ত্রিকথা"র [১] প্রশংসা করেছেন শুনে খুসী হলুম। যদিচ আমার রচিত গল্পের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মত পূর্ব্ব হতেই জানি। রবীন্দ্রনাথ যদি আমার লেখার গুণগ্রাহী না হতেন—তাহলে আমি লেখার ব্যবসা প্রথম থেকেই ছেড়ে দিতুম। ঘোষালের মুখে তুমি যে ফুলচন্দন দিয়েছ—সে আমার সৌভাগ্য। তবে আশা করেছিলুম যে তুমি তোমার মতামত একটু ফলাও করে লিখবে। এখানে কোন কাজকর্ম্ম নেই, সুতরাং বড় চিঠি পড়তে ভালই লাগে।

ভাল কথা—পূজার বসুমতীতে—প্রগতি-রহস্য [২] বলে একটি লেখা লিখেছি। আধা-ইতিহাস—আধা-উপন্যাস। পড়ে দেখো : কেমন লাগলো দেখো—"সোনার কাঠি"র [৩] যদি দ্বিতীয় সংস্করণ বেরয়, তাহলে, আমার ও আমার স্ত্রীর লেখা দুটির file পাঠিয়ে দিলে খুসী হব। —আজ এইখানেই থামি, তোমার বড় চিঠি পেলে বড় করে উত্তর দেবো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

প্রিয়ম্বদা দেবী

"তারাবাস"
৪৬, ঝাউতলা রোড।
বালীগঞ্জ।
কলিকাতা ২০.৫.৩০

কল্যাণীয়াসু,

'লীলাকমল' দেখবার আগেই তার যশ-সৌরভে আন্তরিক প্রীতিলাভ করেছিলাম।

---

১. প্রমথনাথ চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭-এ প্রকাশিত হয়।
২. ১৩৪৬-এ প্রকাশিত 'অণুকথা সপ্তক' গল্পগ্রন্থে সংকলিত।
৩. রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত ছোটদের শারদ-বার্ষিকী।

তোমার সুন্দর বইখানি পেয়ে খুবই খুসী হলাম। শ্রদ্ধার সহিত দিয়েছ, আমিও স্নেহাশীর্বাদের সঙ্গে গ্রহণ করেছি, জেন।

তোমার প্রায় সব কবিতাগুলিই আমার ভালো লেগেছে, তবে আদ্যন্ত দুটি সবচেয়ে বেশী। প্রথমটির আন্তরিকতা ও সুন্দর প্রকাশের জন্যে, শেষেরটির তার মুন্সিয়ানার খাতিরে।

তোমার হস্তলিপি বইয়ে [১] খুসী হয়েই লিখে দেব—একটি কবিতা বেছে রাখলাম, এসে লিখিয়ে নিয়ো। কবে আসবে আগে একটু জানিয়ো। মাঝে শরীর বড়ই অসুস্থ হয়েছিল, এখনও দুর্বল আছি। চিকিৎসকের আদেশমত প্রতিদিনই সন্ধ্যায় বাহিরে যাই, হয় lake নয়ত গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে থাকি, নির্মল বাতাসের জন্যে। যদিও আমার 'তারাবাসে' তার অভাব কিছুমাত্র নাই।

মুখে কথা কইলে ভাল লাগবে, আমার নতুন কবিতা অনেক জমেছে, শোনাব, ও এবার ছাপাব। রবিদাদা [২] তার পাণ্ডুলিপি একবার দেখতে চেয়েছেন।

তুমি আমার স্নেহ জেন। আশীর্বাদ করি, তোমার নিঃসঙ্গতার দুঃখ এই কাব্যরচনায় লাঘব হ'ক—এ যে কি নিদারুণ বেদনা তার অভিজ্ঞতা আমার আছে—ভুক্তভোগী বলেই সমবেদনায় মন ভরে ওঠে।

আশীর্বাদিকা
শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধা, তোমার চিঠি পেলাম। এর আগের চিঠির জবাব দিইনি—হবেও বা। এ বয়সে সব কথা মনে রাখাই কি সম্ভব? তা ছাড়া আমার কুড়েমির সীমা নেই। দিই দিই করেই মাসখানেক কেটে যায়, তার পরে সমস্ত ভুলে যাই। কিছু মনে কোরোনা ভাই। যে কিছুদিন আরও বেঁচে আছি জবাব পাও বা না পাও মাঝে মাঝে সময় পেলে নিজের খবরটা দিয়ো।

শ্রীকান্ত শেষ পর্ব্বের রাজলক্ষ্মী তোমার মনোমত হয়নি, সেই কথাটা স্পষ্ট করে লিখে জানিয়েছ বলেই রাগ কোরব এমনি বদ-মেজাজি আমি? আমার মত

১. রাধারাণী দেবীর অটোগ্রাফ খাতা। কবিতাটির নীচে তারিখ লেখা ছিল ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তশিষ্ট নিরীহ ব্যক্তি সহজে পাবেনা।

তুমি যা লিখেছিলে আমি তখনই চিন্তা করে দেখেছিলাম। তবুও নিজের ভুলটা ঠিক ধরতে পারিনি। মতভেদ ত থাকবেই।

শেষ প্রশ্নে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত অনেককেই ব্যথা দেব—তবুও যা' ঠিক বলে মনে করি তা বলা দরকার। তার পরেব কথা পরে।

যোড়শী বইটা একবার পোড়ো। বোধহয় তোমার মন্দ লাগবেনা। আর অভিনয় দেখবার যদি সময় পাও, সত্যিই খুসি হবে। শিশির কি শেখানোই শিখিয়েছে। আমি একটি দিন মাত্র দেখেচি, সেদিন আবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে শরীরটা পীড়িত হয়েছিল। তবু চমৎকার লেগেছিল।

কাশীব বুড়িমা আমার মায়ের মত। দেখা করতে ভারি ইচ্ছে করে, কিন্তু এদিকে আমিও তাঁর চেয়ে কম বুড়ো নই। আর জলে জলে এ অঞ্চলের কাদার ভিতরের দুর্গম রাস্তাটি মনে হলে আর পা বাড়াবার ভরসা থাকেনা। একটুখানি রাস্তাঘাট শুখলেই বোধহয় যাবো। কিন্তু তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ত সোজা নয়। যার বয়স কম তার সঙ্গেও যেমন, যাঁর বয়স বেশি তাঁর সঙ্গেও তেমনি। এই কথাটা মনে হলেই মন যেন ছোট্ট হয়ে আসে। দুর্ভাগ্য।

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২৩শে ভাদ্র ১৩৩৪

তোমার বড়দা।

সামতাবেড, পানিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছিলাম এবং বছরের আরম্ভে যে আশীর্ব্বাদ চেয়েছিলে তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করিনি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠেনি। "এই কালই জবাব দেবো" এই একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই করেচি এবং কবতে করতে মাস দেড়েক কেটে গেলো। এমনি স্বভাব। অথচ, তোমাদেব এ জ্ঞান আর জন্মালোনা যে ভাবো দাদা স্বর্গে গেছেন—আর তাঁকে স্মরণ করাই বা কেনো আর তাঁব আশীর্ব্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্যে। আর ক'দিনই বা বাকি আছে,—একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? একটা কথা লিখেচো যে কমলেব স্রষ্টা—রমার স্রষ্টা তো নয় যে ইত্যাদি।

তার মানে যে রমার স্রষ্টাই তোমাকে আদর করতে পারতেন, তোমাকে বুঝতেন কিন্তু কমলেব কথা যে লিখতে আরম্ভ কবছেন তাঁব কাছে আর ভরসা করবার কি আছে? এই না কি? কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে যে পল্লীসমাজের রমা পল্লীসমাজেরই মানুষ। যাদের অস্তিত্ব নিত্যনিয়ত আমরা অনুভব করি। সুখে দুঃখে

ভালোতে মন্দতে যাদের আমরা কাছে পাই। কিন্তু শেষ প্রশ্নের কমলের কাছে সে প্রত্যাশা করা চলে কি কোরে?

আরও একটা কথা রাধু। লোকে লিখতে বলে, না লিখলেও দেখি চলে না, —কিন্তু এই প্রাচীন কালে আগেকাব দিনের অর্থাৎ, যৌবনের সে শক্তি পাবো কোথায়? তাই এখন এই শেষ বয়সের জোর-কোরে-লেখার শতেক ত্রুটি শতেক অভাব লোকের চোখে পড়ে। লেখার দৈন্য এখন নিজেই অনুভব করি। ভাষার সে শ্রীও নেই, বাঁধুনিও গেছে। সব যেন এলোমেলো শিথিল হয়ে দেখা দিচ্চে,—না? দেবার কথাও। আসলে, আমি ত সাহিত্যিক নই। সাহিত্যেব মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাইনে যেমন পাই বিজ্ঞানের মধ্যে। এর জন্যেই হয়ত আমি তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু গ্রহের ফেবে হয়ে গেল ঠিক উল্টো। ভাবি, আবাব যদি কখনো জন্ম হয়, সেবার যেন না এতবড ভুল ঘটে।

কেমন আছো? দেখা সাক্ষাৎ হবারও যো নেই—এমনি তোমার শ্বশুর বাড়ী। বাপেব বাড়ী' যখন আসবে আমাকে চিঠি লিখে জানাবে। ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ '৩৫

বড়দা।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী
সভাপতি : বহবমপুব পূর্ণিমা সম্মিলনী
সম্পাদক : পূর্ণিমা পত্রিকা

শ্রীমতী রাধাবাণী দেবী ৪/৯

কল্যাণীয়াসু,

খুব ঘুরে এলে [১], খবর পেলাম। আশাকরি আনন্দ পেয়েছ।

'পূর্ণিমা' [২] ছাপা আরম্ভ হযে গিয়েছে।....

তুমি একটা লেখা—'নিশ্চয়ই দেবে'—আশ্বাস দিয়েছিলে, তাই লেখাটার প্রতীক্ষায় আছি। শ্রী অরবিন্দের আশ্রমে তো গিয়েছিলে, তাঁর সম্বন্ধে ও সেখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে তোমার চোখে যা দেখলে, তাই গুছিয়ে লিখলে ভারী উপভোগ্য হবে।

---

১. স্বামী-কন্যা সহ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে গিয়েছিলেন রাধারাণী দেবী।

২. যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পাদিত 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় 'অপবাজিতা দেবী' ছদ্মনামে বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

কষ্ট করে একটু তৎপর হও, এই অনুরোধ। আশাকরি ভালই আছ। আমার শরীর বড়ই দুর্বল। কিছুতেই সারতে পারছি না....বোধকরি সমাপ্তির এই সূচনা।

তোমায় স্নেহাশীর্বাদ জানাচ্ছি। ইতি

তোমার দাদাবাবু
যতীন্দ্রমোহন

রাজশেখর বসু

নাম—রাজশেখর বসু
ঠিকানা—
কি প্রয়োজন—শুধু দেখা করা

অনুরূপা দেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী
সম্পাদিকা "এডুকেশন গেজেট"

১৯এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
শ্যামবাজার পোঃ

কলিকাতা, ৩১শে আষাঢ়

কল্যাণীয়াসু,

তোমার হাঁপানীর সংবাদে বিশেষ দুঃখিত। একটি মাদুলী দিলাম, যদি ইচ্ছা হয় মঙ্গলবার বা শনিবার প্রাতে শুচিবস্ত্রে লালসূতায় গলায় পরিবে। পরিবার সময় ৺কালীমাতার জন্য কিছু পূজা তুলিয়া রাখিবে ও প্রত্যহ প্রাতে ৺কালীমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া মাদুলীটা ধুইয়া জল খাইতে হইবে। মাদুলীটা বুকের উপর থাকিবে। আঁতুড়ের বা শ্মশানের ধোঁয়া লাগিতে না পায়। (বিশেষ প্রয়োজন হইলে মাদুলী খুলিয়া রাখা চলিবে)। আশীর্ব্বাদ লইও।

আশীর্ব্বাদিকা
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
নূতনহাট পোঃ
১৭.৩.৫৬

মা,

তোমার চিঠি পেলাম—যিনি তোমাদের ঠিকানা হইতে চিঠি দিয়াছেন তোমাদের পরিচিত লেখিকা হইতে পারেন। বোধহয় 'পাঠশালা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—তোমার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা আমাকেই করাইয়াছে। চিঠিখানি পাঠাইলাম—যদি পরিচিতা হন সেই জন্য। আশা করি সকলে কুশলে আছেন। তাঁকে আমার কথা বলিবে।*

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

নিরুপমা দেবী

শ্রী হরিঃ।

১২.৪.৩৭

প্রিয় ভগিনি,

আপনার প্রেরিত 'লীলাকমল' উপহার পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। আমি স্থানান্তরে গিয়াছিলাম, বাড়ী আসিয়া মাত্র আজ কয়দিন আপনার বইখানি পাইয়াছি, সেজন্য প্রাপ্তি সংবাদটিও এতদিন না দেওয়ার অসৌজন্যতা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি।

আপনি আমার মতামত জানিতে চাহিয়াছেন ইহাতে আরও কুণ্ঠিত হইতেছি। আপনার লেখার সমালোচনা যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারাই মাঝে মাঝে হইয়া থাকে দেখিতে পাই, সেস্থলে আমাদের মত গদ্যপন্থীর মন্তব্যের বেশী কিছু মূল্য আছে মনে করি না, তথাপি যখন এ সম্মান আমাকে নিজ হইতেই দিয়াছেন তখন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই জানাইতেছি যে আপনার লেখা আমার খুব ভাল লাগে। পড়িতে ২ স্থানে ২ মুগ্ধ হইতে হয়। ভাব ভাষা ছন্দ তিনটিই আপনার সমান মুগ্ধকর। 'ধ্যান-মুগ্ধ'

* এক অপরিচিত ব্যক্তি রাধারাণী দেবীর নাম ঠিকানা ব্যবহার করে কুমুদরঞ্জন মল্লিককে লিখেছিলেন যে, 'আমি আপনার খুব ভক্ত। আপনার এক সেট বই উপাধি চাই।' তাতে কুমুদরঞ্জন মল্লিক একটু বিস্মিত হয়ে রাধারাণী দেবীর কাছে খোঁজ নেন। চিঠিটি রাধারাণী দেবীর লেখা নয় জেনে তিনি সেটি রাধারাণী দেবীকে পাঠিয়ে দেন, হাতে লেখা সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে রাধারাণী দেবী সে লেখা চিনতে পারেননি।

কবিতাটি জৈষ্ঠ্যের বিচিত্রাতেও প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতেছি। এ কবিতাটিকে 'অতুল্য' বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য নিজের অনুভবের আনন্দের কথাই মাত্র আপনাকে জানাইতেছি, আশা করি এ কথাগুলোকে সমালোচনা বলিয়া মনে করিবেন না। 'মীরার ব্যথা' 'প্রেম প্রশস্তি' 'নারী ও প্রেম' প্রভৃতি আরও কতকগুলি কবিতা পড়িতে অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। এর বেশী আর আমাব বলার সাধ্য নাই। 'লীলাকমল' নামটি হইতে বইটির চেহারা সবই সুন্দর।

আশা করি আপনার হাত হইতে আমাদের পদ্যসাহিত্যের ভাণ্ডারের আরও অনেক কিছু সঞ্চিত হইবে। কবিতা লিখিতে না জানিলেও কবিতা পড়িতে অত্যন্ত ভালবাসি, রবিবাবুর কলম এখন যেন বিশ্রাম লইতেছে, আপনারাই কয়েকজন কাব্য কবিতা পাঠকদের খোরাক যোগাইতেছেন। আশা করি এখনো আপনাদের নিকটে নূতন বস্তু পাইবার আমাদের অনেক আছে।

হয়ত উচ্ছ্বাস বশে কিছু বেশী লিখিয়া ফেলিলাম। বেশী বকা বয়সের ধর্ম্ম এই ভাবিয়া কিছু মনে করিবেন না। আপনার কুশল প্রার্থনা করি। আমাব সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

শ্রীনিরুপমা দেবী
বহরমপুর

প্রফুল্লকুমার সরকার

TELE. · "ANANDABAZAR" CALCUTTA
PHONE . 1939 BARABAZAR
ANANDA BAZAR PATRIKA, LTD
1 BURMAN STREET

4.11.33

সসম্মান নিবেদন,

আনন্দবাজারের সেবকগণ ১লা অগ্রহায়ণ হইতে 'দেশ' [১] নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর সহযোগিতা ও সাহায্য চিরদিনই আমাদের কাম্য। এই জন্য আপনার নিকট নিবেদন, গল্প, প্রবন্ধ অথবা কবিতা দিয়া আমাদের উদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। নিবেদন ইতি—

বিনীত
শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

১. উল্লেখযোগ্য, একই দিনে একই পত্র আরেকটিও এসেছিল শ্রী নরেন্দ্র দেবের কাছে। একই ঠিকানায় (দেবালয়, লিলুয়া)। তাতে স্বাক্ষর আছে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদাবের।

কান্তিচন্দ্র ঘোষ

"SAIKAT"
KHARDA
24 PARGANAS
১৭ সেপ্টেম্বব, ১৯৩০

মাননীয়াসু,

আপনার উপহারের জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনার বইখানির প্রাপ্তিস্বীকার করতে এত দেরী হয়ে গেল তার জন্যে যে আমি কত লজ্জিত তা বলতে পারি না। বিচিত্রা আপিস স্থানান্তরিত [১] হবাব দরুণ আপনার বইখানি যথাসময়ে আমার কাছে পৌঁছয় নি। মাত্র তিনদিন হল "লীলাকমল" খানি পেয়েছি।

মতামত জানতে চেয়েছেন। আমার মতামতেব বিশেষ কিছু মূল্য আছে বলে মনে হয না। তা বোধহয় আপনারও মনে হবে না যখন জানবেন যে আমি গোড়া থেকেই আপনার কবিতার অনুরক্ত পাঠক। আপনার শব্দচয়ন এবং ছন্দরচনাব ক্ষমতা বরাববই আমার সানুরাগ বিস্ময় উৎপাদন কবে। আপনার কবিতার প্রতিটি কথা inevitable বলে মনে হয়—একটির বদলে আব একটি বসাবাব উপায় নেই। সাধারণতঃ মহিলা-কবিদেব ছন্দের কান নেই (এটা আপনাকে গোপনে বলছি) —অন্ততঃ আমার তাই ধারণা। এবং ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়মের প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয়, তবে আপনিই সেই ব্যতিক্রম যাকে দিয়ে আমার ধারণার সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে।

"লীলাকমলে"র অনেকগুলি কবিতা পূর্ব্বেই পড়েছি [২]। কিন্তু সেইগুলিকে একত্র গ্রথিত অবস্থায় পাওয়ার একটা সার্থকতা আছে। কোন আদর্শ যে আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা এ থেকে বুঝতে পারা যায়। সে আদর্শের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য আপনার সকল পাঠককেই মুগ্ধ করবে বলে মনে হয়। সুন্দরের উদ্দেশ্যে আপনার যাত্রা যে অদূর ভবিষ্যতে সফলতায় মণ্ডিত হবে তা নিঃসন্দেহ। ইতি—

গুণমুগ্ধ
শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

---

১. তখন কান্তিচন্দ্র ঘোষ এবং অমলচন্দ্র হোম ছিলেন 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই প্রধান সহযোগী। 'বিচিত্রা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল (আষাঢ়, ১৩৩১) ৫১, পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের অফিস থেকে। পরে, তাঁদের দফতর স্থানান্তরিত হয় ফড়েপুকুর স্ট্রীটে।

২. 'লীলাকমল'-এর বহু কবিতাই 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ', 'উত্তরা', 'বিজলী', 'প্রবাহিণী' ইত্যাদি পত্রিকায় আগেই প্রকাশিত হয়েছিল।

অসিতকুমার হালদার

রাধারাণী দিদি

শরতে সোনার আলো
শুভ্র মেঘরাশি
বারেবারে আনন্দের
বাজায় যে বাঁশী
বিজয়া বিদায়-ক্ষণে
তারি ব্যথা আনি
প্রীতি ডোরে বাঁধে সবে
শরতের রাণী।।

তোমাদের
অসিত

নরেন্দ্র দেব

আন্নামালাই নগর
চিদাম্বরম, ১৮.৪.৫৪

কল্যাণীয়াসু,

এখানে পৌঁছে চিঠি ও তার পাঠিয়েছি। পেয়েছ নিশ্চয়! আজ রাত্রে বাড়ির দিকে ফিরছি। এই ক'দিনেই বেশ মন কেমন করছে! আশ্চর্য! আর একলা কোথাও যাওয়া চল্‌বে না দেখছি।

এখানে বেশ আছি। জামাই আদরে বললেই হয়, যদিও শ্বশুর কে জানি না! খাওয়া-দাওয়া ভাল। ব্যবস্থা ভাল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী [১] থেকে সকলেই এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে গল্প করব।

২১শে সকাল ১০।। টায় হাওড়ায় পৌঁছবো। স্টেশনে কাউকে আসতে হবে না। একটা ট্যাক্সী নিয়ে চলে যাব।

খুকুকে [২] আমার স্নেহাশিস দিও। দুষ্টুর [৩] খবর কি? ললিতবাবু [৪] কেমন আছে?

ইতি—
আশীর্বাদক
নরেন্দ্র দেব

গুরুদাস মল্লিক (শান্তিনিকেতন) তোমাকে স্নেহাশিস জানিয়েছেন।

Sri Radharani Devi
72 Hindustan Park
Calcutta – 29

১. জওহরলাল নেহরু।
২. কন্যা নবনীতা দেবসেন।
৩. বাড়ির কুকুর।
৪. মেজ ভায়রাভাই।

কালিদাস রায়

Tollygunge
৫.১০.৫৩

কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের অভিনন্দন[১] পেয়ে সুখী হলাম। তোমরাই সর্বপ্রথমে আনন্দজ্ঞাপন করলে। তা করবারই কথাও। যতীনদা[২], মোহিতলাল[৩] আজ নেই। করুণাদা[৪] পেয়েছেন কাজেই এটা গ্রহণ করতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে না। বোধহয় আমাকে শুধু কবিতা লেখক বলে দেয় নি। শিক্ষা সাহিত্যে, সমালোচনা সাহিত্যে, ছন্দ, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ ইত্যাদিতে আমি কিছু কিছু contribution করেছি বলেই বোধহয় আমাকে দিলে। নইলে আমার চেয়ে যোগ্যতর ও বর্ষীয়ান কুমুদরঞ্জন[৫] ও যতীন্দ্রনাথ[৬] রয়েছেন।

করুণাদাদার জন্য গতবার আমরা সমবেত আবেদন জানিয়েছিলাম—তা না হলে হয়ত কর্তাদের মনেও পড়ত না গৃহীতাবসর বিবিক্তবাসী ঋষিকল্প কবিকে।

আজকাল সাহিত্য বলতে কথাসাহিত্যই বুঝায়। আমাদের কথা সাহিত্যিকজন গণনারম্ভে কারও মনেই পড়ে না। এর কারণ অর্বাচীন রবীন্দ্রবিমুখ কবিদের প্রাদুর্ভাব এবং প্রাবল্য। তার ফলে কবিতার প্রতি লোকের একটা বিতৃষ্ণাই জন্মে গেছে।

জগত্তারিণী বৃদ্ধবয়সের Consolation Prize, যাদের মরণ আসন্ন সাধারণতঃ তাদেরই দেওয়া হয়। কাশীকে তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়েছিল। যারা আমার বর্ষীয়ান তাদের ব্যস্ত হবার কারণ নেই, তারা ষাট পার হলেই একে একে পাবে। তবে বাঁচা চাই। সত্যেন[৭] বেঁচে থাকলে পেত। বিভূতিও[৮] পেত। যতীনদার জন্যই দুঃখ হয়। বড় ক্ষোভ নিয়ে তিনি বিদায় গ্রহণ করেছেন। দেশের লোকের স্বতঃস্ফূর্ত মর্যাদা তিনি পান নি। এবং দেশের লোক তাঁকে ভুলতে বসেছে। তোমরা আমার ভালবাসা জানবে। ইতি—

দাদা

প্রসঙ্গ : অমল হোমের চিঠি

হিন্দুস্থান পার্কে যখন রাধারাণী-নরেন্দ্র দেব জমি কেনেন, তখনই গড়িয়াহাটের মোড়ে দ্বিগুণ পরিমাণ জমি কেনেন অমল হোম। তাঁর ধারণা হলো রাধারাণী-নরেন্দ্র গৃহনির্মাণে অপটু, তাঁদের পক্ষে বাড়ি তৈরি করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। বাজি ধরেছিলেন, রাধারাণী-র বাড়ি তৈরি হলে তিনি বোম্বাই খাট উপহার দেবেন। বাজি অবশ্য হেরেছিলেন, কিন্তু খাট দেওয়া-নেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। অমল হোম-ই বরং বাড়ি করেননি, জমি বেচে দিয়েছিলেন।

---

১ কবিশেখর কালিদাস রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক পাওয়ার পর।
২ যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৩ মোহিতলাল মজুমদার ৪ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ কুমুদরঞ্জন মল্লিক ৬ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৭ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১

অদ্য ৪ঠা জুন, ১৯৩৪ তারিখ আমি শ্রীবিহীন অমল হোম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, তাঁহাদের গৃহনির্ম্মাণ শেষ হইলে, তাঁহাদিগকে এক জোড়া বোম্বাই খাট উপহার দিব।

অমল হোম

৪.৬.৩৬

২

The Calcutta Municipal Gazette

OFFICIAL ORGAN OF THE CORPORATION OF CALCUTTA

CENTRAL MUNICIPAL OFFICE

CALCUTTA

Feb. 5, 1944.

প্রীতিনিলয়াসু,

সেদিন আপনি আপনার পাদুকা ও পরিধেয় দিয়ে আমার পত্নীর পদমান রক্ষা করেছিলেন[১]; আমার উচিত ছিল এ পাদুকা শিরে ধারণ ও এ পরিধেয় অঙ্গের আভরণ করে আপনাকে পৌঁছিয়ে দেওয়া। তা করতে না পেরে দুঃখ বোধ করছি। অপরাধ নেবেন না। ইতি—

আপনার কৃপাকণাপ্রার্থী

অমল হোম

শ্রীমতী রাধারানী দেবী করকমলে—

পুঃ

"ভাই রাধারানী"—

(গিরিজাকুমার বসুর[২] অনুকরণে।)

আমার Archaeologic Survey of Temples in Verse-Prose (না Prose-Verse) কেমন লাগলো?

* তুমি সেদিন না আসাতে বড় দুঃখ হয়েছিল। কবিতা বা "গবিতা" তোমাকে শোনাতে পারলাম না। পড়েছিলাম খুব কায়দা করে। হোক না রাবিশ! গদ্য+কবিতা =গবিতা!

---

১. অমল হোম-এব স্ত্রী ইলা-র পোশাক-পরিচ্ছদ বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল। তিনি বাড়ি ফেরেন রাধারাণী দেবী-র শাড়ি-পাদুকায় সজ্জিত হয়ে।

২. 'ভারতী'-গোষ্ঠীর প্রেমের কবি ছিলেন গিরিজাকুমার বসু। সরল, সদানন্দ গিরিজাকুমারেব রোমাণ্টিকতা অল্পবয়সীদের মজার খোরাক ছিল।

দিলীপকুমার রায়

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী
২ চন্দ্র চ্যাটার্জ্জির স্ট্রীট। ভবানীপুর পোঃ
কলিকাতা

৮.১২.৩০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র অনেকদিন বাদে আজ পেয়ে বড় খুশি হওয়া গেল। আপনি নিরুদ্দেশ হওয়াতে দিনকতক হল ভাবনায় পড়েছিলাম কী করে আপনার উদ্দেশ মেলে?...এটা শুধু আপনাকে জানানো যে আপনাকে দুখানি দীর্ঘ পত্র পাঠাচ্ছি। অনেক দীর্ঘ পত্র লিখলাম--আত্মস্তুতিতে ভরা। ইচ্ছে—দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবী পড়ুক। তাই আপনাকে পাঠালাম—যেমন নানা কাগজপত্র চিঠি মাঝে মাঝেই পাঠাই। ও আমার এক ব্যাধি, জানেন ত?...আশালতা, ক্ষিতীশ সেন, সোমনাথ, নীরেন, অন্নদাশঙ্কর[১] এরা সবাই ভুক্তভোগী। ধূর্জ্জটিও[২] মাঝে মাঝে।..অপরাজিতা দেবীর সম্বন্ধে[৩] যা যা লিখেছেন তাতে করে অনর্থক কৌতূহলই গেল বেড়ে। এ কি ভাল কাজ করলেন? না হয় ওঁর আসল নামই গোপন রাখলেন—ধামও না হয় ধামা চাপা থাক। কিন্তু মনস্তত্ত্বও কি বলা বারণ? ইম্পার্সোনাল ট্রীটমেণ্ট? না তাতে বাধা আছে?

বারীনদা[৪] লিখেছেন অপরাজিতা দেবীকে একদম ঘরে তালা চাবি দিয়ে পুরে রাখা হয়েছে আশালতাব মতন। এদিকে আপনি লিখছেন—তিনি নির্ভীকা, খেয়ালিনী, ওজস্বিনী ইত্যাদি। ব্যাপার কি? পাঁচকড়ি দে'র ভাষায়—"রমণী কুহেলিকাময়ী"। কিন্তু চলতি ধারণা অনুসারে সে ত তিনি চিরদিনই। বরং আলোময়ী হলেও নূতনত্ব বাড়ত। কি বলেন?

সত্যি। ওঁকে বলবেন—ওঁর কোনো ভয় নেই। যদি ওঁর অন্য কোনো কবিতা থাকে পড়তে পাঠাবেন। আমি আজকাল অত্যন্ত নিরীহ হ'য়ে পড়েছি—বিশ্বাস করুন।

ইতি—প্রীতিবদ্ধ
শ্রীদিলীপ রায়

১ আশালতা সিংহ, সোমনাথ মৈত্র, নীরেন রায়, অন্নদাশংকর রায়।

২ ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৩ 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামের ব্যাপারটি ১২ বছব অজ্ঞাত রাখা সম্ভব হয়েছিল। রাধাবাণী দেবীর কাছে অপরাজিতা দেবীর প্রশংসা করলে তিনি আশঙ্কা করতেন, প্রকৃত পরিচয় বুঝি আর গোপন নেই। সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্যই তিনি নিজে অপবাজিতা দেবী-র লেখার সমালোচনা করেছিলেন।

৪ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

পুঃ ও চিঠিগুলি ধূর্জ্জটির শ্রেষ্ঠাঙ্গিনী—আমার ছায়াবৌদির[৫] কাছে পাঠান। তাঁকে আপনার চিঠিটিও পাঠালাম—তিনি খুব রসজ্ঞ বলে। হয়ত ধূর্জ্জটি বা তিনি এই ছুতোয় আপনার সঙ্গে আলাপ করে রাখবেন। অন্নদাপত্নী—লীলাময়ী—আমায় চমৎকার বড় বড় চিঠি লিখছেন। বেশ দিলীপদা ব'লে। চিন্তাশীল ও সচেতন মেয়ে সত্যি।

অমিয় চক্রবর্তী

মাননীয়াসু,

গল্পটা নিশ্চয়ই আপনাদের পড়া হয়েচে। কবি[১] একবার খাতাগুলি[২] চাচ্চেন—কী একটা বিশেষ দরকার। বোধ হয় কিছু বদলাবেন। পত্রবাহকের হাতে দেবেন কি?

খাবার পর আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কবি উৎসুক আছেন।

ভবদীয়

শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী।

২

Calcutta University
Calcutta

২০ জানুয়ারি

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

আমাদের পরম শোকের সময়[৩] সমবেদনাপূর্ণ আপনার চিঠিখানি পড়ে আমার পিতৃদেব এবং আমরা সকলে মনে অনেকটা শান্তি পেয়েচি। আমাদের সকৃতজ্ঞ অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

আমার মাতৃদেবী নারীকল্যাণব্রত নিয়ে সুদীর্ঘ রোগদুঃখকে অতিক্রম করেছিলেন, নির্ভীক স্বাধীনতার পথে চলেছিলেন—তাঁর নিয়ত প্রদীপ্ত অধ্যবসায়ের মূল কথা আপনি চিঠিতে লিখেচেন। আমরা জানি কথাটা কতই সত্য।...

আপনি যে কথাগুলি বলেচেন তাই নিয়ে যদি ভারতবর্ষে আমার মাতৃদেবীর

---

৫ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি।

৩ অমিয় চক্রবর্তীর মা অনিন্দিতা দেবীর মৃত্যুর পর।

বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন তাহলে আমরা সকলে সুগভীর সার্থকতা অনুভব করব। আপনার কাছ থেকে তাঁর রচনা এবং মতামতের বিষয় সকলেই শ্রদ্ধান্বিত হয়ে শুনবে।...

আপনারা আমাদের শ্রদ্ধানমস্কার গ্রহণ করুন।

ভবদীয়
অমিয় চক্রবর্তী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদাষু,

আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ আপনাকে ধাত্রীদেবতা দিয়ে গেলাম। সেইটিই আপনাকে আমার এই লেখা স্মরণ করিয়ে দেবে।

শ্রদ্ধানত
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
২১শে আশ্বিন ১৩৪৬

শিবরাম চক্রবর্তী

১৩৪, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা
২০.১১.৩০

অপরাজিতা দেবি,

এই সংখ্যার ভারতবর্ষে আপনার কবিতাটি [১] পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, কবিতাটির শেষে আপনি যে personal touch দিয়েছেন আরো ভালো লাগল সেইজন্যও। কবিতাটির মধ্যে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করার যে অসাধারণ শক্তির পরিচয় আপনি দিয়েছেন তা চমৎকার। দু-তিন সপ্তাহ আগে বিজলীতেও আপনার একটি সম্পূর্ণ কবিতা আমি পড়েছি। [২] আপনি, রাধারাণী দত্ত ও আরো দু-একজন মহিলা কবির রচনা পড়ে বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে আমার মনে হয়। আপনি আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ইতি—
শিবরাম চক্রবর্তী

১. অপরাজিতা দেবী-র "নিশীথ কলহ" প্রকাশিত হয়েছিল 'ভাবতবর্ষ' পত্রিকায়।
২. বিজলীতে প্রকাশিত 'সখী সংগ্রাম'ও ছিল অপরাজিতা দেবীরই লেখা।

অন্নদাশংকর রায়

বাঁকুড়া
১৩ই জুন ১৯৩১

প্রীতিভাজনাসু,

আমার পোষ্টকার্ডখানি আপনাদের হাতে পড়বে জানলে ওতে আরো কয়েকটি কথা সংযোজন করতুম।

বিবাহের দেশকালোত্তর আদর্শই হচ্ছে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের যোজনা। সুতরাং আপনাদের বিবাহ[১] একটি সুদুর্লভ সত্যিকারের বিবাহ।

বিবাহরাত্রিটিতে বিবাহের শেষ নয়, বিবাহের শুরু। অয়মারম্ভ, শুভায় ভবতু। সাহিত্যের দিক থেকে উভয়ের কাছ থেকে পূর্ণতর ও পরিণত-তর সৃষ্টির প্রত্যাশা রাখি। সমাজের দিক থেকে প্রেম-প্রজাত দিব্যসুন্দর সন্তানের প্রতীক্ষা করি।

লোকভয় যেন আপনাদের বিক্ষিপ্ত না করে। আমার একটি কবিতায় লিখেছি :—

অজানিত সমধর্ম্মা কত/দেশে দেশে আমাদেরি মতো/জীবন-মাতাল।/উহারাই মোদের সমাজ/মান যেন উহাদেরি মাঝ/লভি চিরকাল।

আমরা যেমন আনন্দের মধ্যে আচ্ছন্নের মতো বাস করছি, অনুমান করি আপনারাও তেমনি। বিরহটাকে বোধকরি আপনারা পূর্ব্ব হতেই উদযাপন করে চুকিয়ে দিয়েছেন। অতএব আর দুঃখ কিসের? *

উদার হৃদয় স্নেহপ্রবণ সৎসাহসিক নরেন্দ্রবাবুকে আমার শ্রদ্ধা ও আপনাকে আমার নমস্কার জানাই। "লীলাকমলে"র সমালোচনায় যদি আপনার প্রতি কোনোরূপ অবিচার করে থাকি তবে সেটা মনে করে রাখবেন না। একটি প্রসঙ্গ তাতে উল্লেখ করতে ত্রুটি হয়েছে, সেটি আপনার ঋতুপ্রীতি। "লীলাকমলে"র অধিকাংশ দল বিকশিত হয়েছে প্রকৃতির নিয়মে। ইতি—

কুশলপ্রার্থী
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

* আত্মীয়স্বজনের মনে কষ্ট দেবার দুঃখটা বিবহের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য নয়। সেইজন্যে এই ফুটনোটে ওর উল্লেখ। অর্থাভাব সম্বন্ধেও সেই কথা। এসব দুঃখকে ভুলে থাকা যায় না—এরা যে অনবরত হুল ফোটাতে থাকে। তবু এদের জ্বালা কিছুই নয় মিলনেব মূল আনন্দটির স্নিগ্ধতার অনুপাতে।

১. ৩১শে মে ১৯৩১ বালবিধবা রাধারাণী দেবী নরেন্দ্র দেবকে বিবাহ করেন। বিদেশিনী কন্যা লীলার সঙ্গে অন্নদাশংকরও তখন সদ্য বিবাহিত।

ভূপতি চৌধুরী

১৯ আতাবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা
৪.১০.২৮

শ্রীচরণেষু

দিদি, আপনার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছি।

"আমাদের কাগজ"[১] বলে ইতিপূর্ব্বে যে জিনিষটার উল্লেখ কবেছিলুম, আপাততঃ সে জিনিষটার প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব অল্প সুতরাং এখনকার মতো আমার কাগজে লেখা দেওয়ার দায় হতে আপনাকে মুক্তি দিতে পারছি; এই সুখবরটী আপনার শ্রুতিগোচর করা প্রয়োজন মনে করছি।...

ভাল কথা, গত মাসের বিচিত্রাতে দিলীপ রায়ের "ইন্দ্রধনু" ও "গোধূলি"র স্তুতিবাদ সম্পর্কে আপনার প্রশংসাবাদ বোধ করি লক্ষ্যগোচর হয়নি। আপনাব অবগতির জন্য সংবাদটুকু মাত্র উল্লেখ করলাম।

আপনার কবিতাগুলি একত্রিত কবে একখানি বই কী হয় না। আমার ধারণা আপনার এ ধরণের একখানি সংগ্রহ কবিতা-পুস্তক বাজারে প্রচলিত কবিতা-পুস্তকের চেয়ে ঢের ভালো হবে। কারণ আমার বিশ্বাস আপনার কবিতার দৃঢ় অথচ স্পষ্ট সরল প্রকাশভঙ্গী সহজেই মানুষকে মুগ্ধ করবে। আমার এই কথাগুলিকে নেহাৎই আপনার স্নেহানুগত অনুজের শ্রদ্ধাজাত বক্তব্য মনে করবেন না, কারণ লোকের ত্রুটী দেখিয়ে বিরাগভাজন হবার মতো দুঃসাহস যার আছে তার পক্ষে আপনার কোন অন্যায় বা ত্রুটী থাকলে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা থাকত না। সুতরাং এ-কথাটীকে ভালো করে ভেবে দেখবেন।

নরেনদার কাছে শুনেছিলুম আপনার চোখে নাকি ফোড়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর নরেনদার বাড়ীর দিকে যাওয়ার ফুরসৎ না পাওয়ায় তার পরের খবর জানবার সুযোগ হয়নি। নিজের শরীরের অসুস্থতা গোপন করা আমাদের দেশের মেয়েদের একটা স্বভাবের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। এ নিয়ে অনুযোগের আর অন্ত নেই। অথচ আপনারা কেন যে শারীরিক গ্লানিটাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন তা আমার কাছে আজও অদ্ভুত ঠেকে। হয়ত আর কিছু পরে এরকম মনে হবে না। কিন্তু যতদিন না সেরকম অবস্থায় এসে পৌছাই ততদিন এ প্রশ্ন করতেই থাকব।

আপাততঃ আমাদের এখানকার কুশল। আপনি আমার াাম জানবেন।

ইতি বিনীত
শ্রীভূপতি চৌধুরী

---

১. ভূপতি চৌধুরী ছিলেন 'কল্লোল'-এর নিয়মিত লেখক। পরে, লেখকবৃত্তি ছেড়ে পুরোপুরি এঞ্জিনীয়ার হয়ে গিয়েছিলেন 'সর্পিল পন্থা'র লেখক। 'আমাদেব কাগজ' ছিল তাঁরই পরিকল্পনা।

শামসুন নাহার

৭৭ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট
১৫.৮.৪১

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

আশাকরি আপনি ভালো আছেন। কবির শোকসভায় আপনি কিছু বলবেন বলে আমি আপনার নাম প্রস্তাব করেছি। আপনি যদি কবির সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখে পড়েন অথবা তাঁর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছু বলেন আমরা সুখী হব। উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। সকলেই আপনাকে চান।

ইতি বিনীতা
শামসুন নাহার

কাগজে দেখে থাকবেন টাউন হলে ২৮টি মহিলা সমিতি মিলে শোকসভার আয়োজন করেছেন।

সুফিয়া কামাল

পি ২৩৯এ কিম্বার ষ্ট্রীট
পোঃ সারকাস
কলিকাতা

২৫.১১.৪৫

মাননীয়াষু।

কলকাতায় এসে অবধি আপনার সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক ছিলাম। সময় আর হয় না! আজ 'সওগাত' সম্পাদক মহিলা-সংখ্যা 'সওগাত'-এর জন্য লেখা আনতে গিয়ে শুনে এলেন আপনারা মধুপুর গেছেন। ফিরতে দেরী হবে। ফিরে এলে একবার খবর দেবেন, গিয়ে দেখা করব।

এখন আমাদের সবিনয় অনুরোধ—মহিলা-সংখ্যা 'সওগাতে' আপনার একটী লেখার জন্য—আশা করি বিমুখ করবেন না। বরাবরই আপনার লেখা পেয়েছি, এবারেও আশা করচি।

আমাদের সম্ভাষণ নিন। মেয়েটী ভালো? আপনার স্বাস্থ্য যেন ভাল হয়। ইতি

সুফিয়া কামাল

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

VIVEKANANDA MUKHERJEE
ASST. EDITOR, ANANDA BAZAR PATRIKA

132/2B, CORNWALLIS STREET
Calcutta, Dated 29 9 1935

সুহৃদয়াসু,

দিবা দ্বিপ্রহরে আপনার বই দুইটি[১] লইয়া আসিয়াছি এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরে "লীলাকমল" পড়িলাম। পড়িলাম ও মুগ্ধ হইলাম। সম্ভবতঃ বাঙলা সাহিত্যে আপনিই প্রথম মহিলা কবি, যাঁর রচনায় যৌবনের উচ্ছ্বসিত আবেগ এবং আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা দুঃসাহসের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যজগতে এরূপ একটি নারীর সন্ধান পাওয়া ভাগ্যের কথা, সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ আমাদের অন্তঃপুরে। তথাপি আমার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ এই যে, 'লীলাকমলে'র কবি আর বাঁচিয়া নাই। তাঁহার মৃত্যু অথবা অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। যে প্রতিভা একদিন নক্ষত্রের দীপ্তি লইয়া সুমেরু-শিখরে দেখা দিতেছিলো, পূর্ণোদয়ের পূর্ব্বেই তার জ্যোতি নিভিয়া যাইতেছে। যে জীবন বিদ্রোহের পথে চলিতে শুরু করিয়াছিলো, তাহা সংসারের শান্তির মধ্যে আসিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। হে কবি, নিজকে সন্ধান করো! ইতি—

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

পুঃ—বই দুইটির উপর যাহা খুশী লিখিয়া দিবেন এবং পুনরায় পিওনের হাতেই ফেরৎ দিবেন। বোধহয় একটা প্রবন্ধ লিখিব।

বিবেকানন্দ

•

প্রবোধকুমার সান্যাল

8/D Mohanlal Street,
P.O Shambazar
Calcutta
১৪ই আষাঢ়, ১৩৩৭
বিজলী আপিস

মাননীয়াসু,

আশা করি বিজলী নিয়মিত আপনার হাতে পৌঁছচ্ছে। আপনার শিলঙ-এর ঠিকানা না জানায় ইতিপূর্ব্বে প্রয়োজন সত্ত্বেও পত্র দিতে পারিনি।

১. 'লীলাকমল' ও 'বুকের বীণা'।

বিজলীতে আপনাকে প্রায়ই লিখতে হবে—এ পত্রে এই কথাটিই আপনাকে জানাতে চাই। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেয়েদের সম্বন্ধে সকল কথাই আমরা বিজলীর মারফৎ বলতে চাইছি, কিন্তু মেয়ের মুখ থেকে মেয়েদের আলোচনা বের হলে আরো শক্তি সঞ্চয় করতে পারি।

এ গেল অন্য কথা।

সম্প্রতি শুনলাম, আপনি একটি উপন্যাসে হাত দিয়েছেন; অনেকখানি লেখা হয়ে গেছে তাও খবর পেলাম। আপনার এ উপন্যাসখানি [১] বিজলীর জন্যে নেবো এই আমরা মনস্থ করেছি। আপনার মতামত জানতে পারলে সুখী হই। বিজলীর 'কাজল-লতা' [২] শেষ হতে আর দেরী নেই, কেমন হল আপনারাই জানেন। এবার কিছুদিনের মত আপনি তার উপন্যাসের ভারটি নিন। আপনার কলমের তীব্রতা এবং ভাষার উত্তাপের প্রতি আমাদের সত্যিই শ্রদ্ধা আছে।

ইতিমধ্যে আপনার কোনো কবিতা বা প্রবন্ধ যদি হাতে থাকে তাহলে নিশ্চয় পাঠাবেন।...

বিজলী আপনার কেমন লাগছে জানতে চাই।

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

প্রবোধকুমার সান্যাল

২

BIJALI
A BENGALI WEEKLY
SOCIAL, CULTURAL, ECONOMICAL,
POLITICAL & RELIGIOUS LIBERATION
College Street Market CALCUTTA

66A Sonarpura
Benares City,
১৩ই আশ্বিন, '৩৭

নিবেদন,

কলিকাতায় থাকতে আপনার চিঠি ও শ্রীযুক্তা অপরাজিতা দেবীর কবিতা পেয়েছিলাম। যদি সুবিধা পান এই শক্তিশালিনী মহিলা কবির নিকট আমার সশ্রদ্ধ

---

১. শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসের অসমাপ্ত অর্ধ 'বিজলী' পত্রিকায় ছাপতে দেওয়া হয়নি।

২. প্রবোধকুমার সান্যালের ধারাবাহিক উপন্যাস 'কাজল-লতা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল 'বিজলী' পত্রিকায়।

অভিনন্দন পৌঁছে দেবেন। তাঁর কবিতা আমাকে চমৎকৃত করেছে। যদি সময় পাই তাহলে আপনাদের তিন চারটি মহিলা কবির সম্বন্ধে কিছু লিখবার চেষ্টা করবো। মৈত্রেয়ী দেবীর কবিতা আপনি পড়েছেন?

দিন দশেকের মধ্যে কলিকাতায় ফিরে আপনার লেখা আশা করবো, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন।

নমস্কার।

প্রবোধ সান্যাল

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দিগম্বরীতলা
টালিগঞ্জ
কলিকাতা

নবেনদা ও বাধারাণী বৌদি, উৎসাহ পেলাম। হয়ত লেখার সঙ্গে[১] আমিও গিয়ে হাজির হব।

ইতি মানিক।
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২২শে বৈশাখ।

২

ভগবানকে মানা না মানার প্রশ্ন নিয়ে যারা মাথা ঘামায়, ভগবানকে না মানলেও তারা সুখী হয় এইটুকুই আশ্চর্য্য।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭শে বৈশাখ।

১. 'সোনার কাঠি'র জন্য লেখা চাওয়া হয়েছিল।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

পূর্ব্বাশা
ভবিষ্যৎ সংস্কৃতির মুখপত্র

ফোন : ১২৪৯ কলিকাতা
পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু
কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

আগামী আশ্বিন থেকে পূর্ব্বাশা[১] মাসিকপত্র প্রকাশিত হবে। যে নূতন ও সুস্থ সংস্কৃতির পথে ভারতবর্ষের বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা আছে পূর্ব্বাশা তারই বাণী-বাহক হতে চায়। মেয়েদের সামাজিক দাবী সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ আমরা আপনার কাছ থেকে পেতে চাই। কমপক্ষে প্রথম বছর তিনটি প্রবন্ধ দিতে আপনি রাজি আছেন কিনা জানাবেন। আপনাকে তার জন্য কত পারিশ্রমিক...সে সঙ্গে জানিয়ে দেবেন।

নমস্কার জানবেন—ইতি ২৮.৭.৪৩
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সোমবার
১৩ই পৌষ ১৩৫৪
৫বি বেলতলা রোড

দিদি,

যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েছে সে আন্দোলন কোনো মতবাদের অন্ধদাসত্ব নয়, সে আন্দোলন বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সর্বহারা জনগণের মুক্তি আন্দোলন। মুষ্টিমেয় সুখী পরিবারের চিত্ত বিনোদন তাই আমার কাব্যের ধর্ম নয়। ...একটা সত্য উপলব্ধি করেছি সেটা হল বিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে ১৯৪৭ সালের কবি হওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞানেই মুক্তি, বিজ্ঞানেই সুস্থতম জীবনসাধনের পথ। ...আমার রাজনৈতিক বিশ্বাসে কোথাও ফাঁক নেই, "মতবাদের দাসত্ব" নেই, কিন্তু আমার কাব্যবিশ্বাসে নানা গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে, কিন্তু এ সম্বন্ধেও আমি অত্যন্ত সতর্ক। যা বিশ্বাস করি না তা আজকাল লিখি না, সচেতনভাবেই লিখি না।

কান পেতে সারারাত পদশব্দ শুনি, আমাদের উত্তরাধিকারীরা আসছে। আমি

১ সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য-পত্রিকা।

আপনি থাকবো না, তবু যেন তাদের আসন আমরা রচনা করতে পারি। যেমন কোরে আমাদের জন্যে রচনা করে গেছেন আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বগামীরা।

আপনি প্রথমে কবি তারপর দিদি। দিদি তো আমার অনেক আছেন কিন্তু তাঁরা তো কবি নন, তাইতো আপনার কাছে যাই।

সংসারে সহস্র কাজ থাকলেও একথা কোনোদিনই বিশ্বাস করবো না, যে আপনি আর কবিতা লিখতে পারবেন না। নিশ্চয়ই আপনাকে আবার কবিতা লিখতেই হবে। কবি-জীবনের দুটি অধ্যায় আপনার শেষ হয়ে গেছে, এবারে তৃতীয় অধ্যায় সুরু করুন। আপনি এত বোঝেন, এত তর্ক করেন, আপনার কথাবার্তায় এই প্রৌঢ় বয়সেও যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করেছি তাতে আমার মনে হয় আপনার মধ্যে আর এক নতুন কবিত্ব শক্তি প্রত্যাসন্ন। আপনি লিখুন; নিশ্চয়ই আপনাকে আবার লিখতে হবে, আর সেই পুরোনো ঢঙে নয়, সম্পূর্ণ নতুন ঢঙ নতুন ছাঁচ নতুন চিন্তা...আপনাকে নতুন করে বাঁচতেই হবে। আমার পত্রিকায় আপনাকে লিখতে হবে।

বিমল
২৯.১২.৪৮

হরপ্রসাদ মিত্র

ডাকছাপ : জুন ১৯৩৭
৪৫, বরদা দে স্ট্রীট
শ্রীরামপুর

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী—
শ্রীচরণেষু,

আমাকে আপনি চেনেন না। আমারও আপনার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় নেই। আপনার লেখা আমি সযত্নে পড়ে থাকি। আপনার লেখা আমাকে আনন্দ দেয়। কবিতা প'ড়ে কবিকে চিন্‌তে ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার তাগিদেই এই পত্র লিখ্‌চি।

মমতা-দির (শ্রীমতী মমতা মিত্র) [১] কাছ থেকে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করলুম। তিনি লিখেচেন, আপনার শরীর অসুস্থ। হয়তো আপনাকে বিরক্ত করচি। আমায় ক্ষমা ক'রবেন।

আমার বয়স তরুণ। কলেজে পড়ি। সাহিত্য-চর্চ্চার ঝোঁক আছে। মাঝে-মাঝে দু'একটি লেখা সাময়িকপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাই। হয়তো সেগুলি আপনার চোখে

---

১. সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মামার মেয়ে। কবি।

প'ড়েচে। আপনি পূজনীয়া। আপনার কাছে অনেক শিক্ষণীয় কথা শুনতে পাবো। তাই পরিচয় করার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠুন। আমার আন্তরিক শুভকামনা ও প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি ৬ই আষাঢ় ১৩৪২।

স্নেহার্থী
শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

সন্তোষকুমার ঘোষ

শ্রীচরণেষু,

নবনীতা বলল উপরের ঘরে খুব ভিড়। তাই নিচে থেকেই বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে অগত্যা চলে যাচ্ছি। পরে আর এক দিন এসে সাক্ষাৎ পাওয়ার আশা রইল।

ইতি।
সন্তোষকুমার ঘোষ
৫.১০.৭৬

গ্রন্থপঞ্জি

রাধারাণী দেবী

কাব্য

১. *লীলা-কমল।* শ্রীবাধারাণী দত্ত। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৯২৯। ফাল্গুন ১৩৩৬। পৃ. ১০৩। উৎসর্গ : জীবন-দেবতাকে।

উৎসর্গের পরপৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে : তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।/অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।/লভিলাম চির-স্পর্শমণি ;/তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ ক'বেছো আপনি।/জীবন আঁধার হ'লো, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান/সন্ধ্যার দেউল-দীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছো দান।/বিচ্ছেদেরি হোম-বহ্নি হ'তে/পূজামূর্ত্তি ধরে প্রেম, দেনা দেয় দুঃখের আলোতে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'নিবেদন' অংশে আছে : মর্ম্মের মধু-মঞ্জুষায় অফুরন্ত-মধু নেই যা'র—পরিমল-গন্ধ যা'ব দিগন্তে আপনা বিস্তৃত হয় না, তার এই 'লীলাকমল' সংজ্ঞা হয় তো কারুব কাছে উপহাস এবং কারুর কাছে করুণা মাত্র পাবে। তার জন্য লজ্জা পেলেও দুঃখ ক'রবো না। 'লীলাকমলে'র মধ্যে আমি মানব-জীবনের চিরন্তন-তৃষ্ণাতুর একটী দিকের একটি মাত্র অবশ্যম্ভাবী ভা'বের বিচিত্র ও বিভিন্নতর কাব্যরূপেব বিকাশকে, —ফুলের পাপড়ির মতো একবৃন্তে সাজিয়ে দিতে চেয়েছি। আমার এ' প্রয়াসে যদি ত্রুটী থাকে তাব জন্য মার্জ্জনা প্রাথনা কবি। বিনীতা—রচয়িত্রী। 'কৃতজ্ঞতা' অংশে আছে : যে-সব মাসিক পত্রিকা'ব স্নেহ-অঙ্কে 'লীলাকমলে'র দলগুলি প্রথম আঁখি মেলেছিল, আজ এই সুযোগে তাঁদের আমাব আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি। স্বনামধন্য শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন 'লীলাকমলে'র প্রসাধনে তুলি ধ'রে আমাকে গৌরবান্বিতা করেছেন। শ্রীরাধাবাণী দত্ত। কলিকাতা, ফাল্গুন, ১৩৩৬। সূচি : [প্রবেশক কবিতা], লীলা-কমল, বিকাশ, অভিসারিণী, "কালি শুক্লা চতুর্দ্দশী বাতে", আসন্ন-আষাঢ়, নব-বর্ষা, "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ—", পথ-হারা, মধু-সন্ধানী, বিশ্ব-আকৃতি, রক্ত-গোলাপ, পরিণীতার পত্র, সম্বল, মধ্যাহ্ন-স্বপ্ন, রাখাল-রাজা, মীরা'র ব্যথা, যাজ্ঞা, সুন্দরের সন্ধানে, প্রেম-প্রশস্তি, "তোমারি ঝরণাতলা'র নির্জ্জনে", নারী ও প্রেম, গোধূলি-লগ্নে, বসন্তের প্রতি বনলক্ষ্মী, বিরহিণী, মৌন-নিবেদন, "কোথায় চলার শেষ?", ক্রন্দসী, ভুল, বসন্ত-শেষে, বর্ষ-বিদায়। সচিত্র। দাম : ২ টাকা ৮ আনা।

নিচে আমরা *লীলা-কমল* কাব্যগ্রন্থেব দু'খানি সমালোচনা এবং *ভারতবর্ষ* পত্রিকার আশ্বিন ১৩৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের "লীলাকমল" পাঠে নামক কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত করলাম।

লীলা-কমল—শ্রীরাধারাণী দত্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

বইখানি গীতিকবিতার সমষ্টি। কবি যেখানে অকৃত্রিমভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারে, গীতিকাব্যের সার্থকতা সেইখানে। 'লীলা-কমলে'র লেখিকা আপনার অন্তর উদঘাটিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করি। আত্মপ্রকাশ করা পুরুষের পক্ষেও সহজ নয়, নারীর পক্ষে তাহা আরও কঠিন, বিশেষত আমাদের দেশে। সেই বাধা অতিক্রম করিবার সাহস 'লীলা-কমল' রচয়িত্রীর আছে। তাই তাঁহার কবিতাগুলি প্রথাগত হইয়া উঠে নাই। কমলের সহিত একান্ত হইয়া কবি বলিতেছেন,

বক্ষে উতল ঘন-মধু-রস মর্ম্ম সুরভি-ভোর,
প্রভাত-রবির প্রেম অঞ্জনে পরাণে রঙ্গের ঘোর।

কমল যে সূর্য্য-স্বয়ম্বরা, 'সলিল-শয়নে সমাধি হলেও শিশির সহে না তাই।' অতৃপ্তি বাসনার বেদনায় নিপীড়িত প্রাণের আকুল আকৃতি এই কবিতাগুলির মধ্যে শুনিতে পাই।

পরাণভ্রমর জনম ব্যাপিয়া কেঁদে ফেরে অবনীতে,
জীবনপদ্মে মধু-মঞ্জুষা পারেনি উন্মোচিতে।

লেখিকা 'রাণার মহিষী মীরা'র ব্যথা প্রকাশ করিতেছেন,

রাজার ঝিয়ারী রূপসী পিয়ারী কনকপ্রতিমা রাধা
বুঝিয়াছি কেন রাখালের প্রেমে মানিল না কোন বাধা।

'লীলা-কমলে'র মধ্যে রচয়িত্রী মানবজীবনের চিরন্তন তৃষাতুর একটি দিককে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

মর্ম্ম কারা কক্ষে কোন বন্দিনীর নিরুদ্ধ ক্রন্দন,
গুমরি গুমরি ওঠে, ওগো খোলো, খোলো এ বন্ধন।

'প্রেম-প্রশস্তি'তে তাই তিনি প্রশ্ন করিতেছেন,

পৃথিবী মানুষ হ'য়ে রবো বেঁচে আর কতকাল?

ভাষার লালিত্যে এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে এই অন্তরোত্থিত কবিতাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে।

ছাপা ও কাগজ চমৎকার। স্বপ্নের মত সুন্দর প্রচ্ছদপটখানি, উপরে আকাশ, নীচে নীল জল, অপূর্ব্বসুন্দর দেবতা সূর্য্যের চুম্বনে প্রভাত-কমল-দল মেলিতেছে। পদ্মপত্রগুলি পর্য্যন্ত যেন সজীব। রঙে রূপে একটি চিত্রকবিতা। শিল্পী যতীন্দ্রকুমারের যোগ্য বটে।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭

লীলাকমল *

আলোচনা

প্রেম নিয়ে মডার্ণ মানবের মনে নানা রকমের সন্দেহ এবং জিজ্ঞাসা জেগেছে। নরনারীর জীবনের অনেকখানি সার্থকতা এবং আনন্দ তাদের পরস্পরকে পাওয়াব মধ্যে—তাতে সন্দেহ নেই। ভালোবাসার দ্বারাই নরনারী পরস্পরকে পায়। এই ভালোবাসা কি, এ নিয়ে একটা প্রশ্ন আধুনিক কালে উগ্র হয়ে উঠেচে। নর-নারীব মধ্যে যে দৈহিক কামনা আছে তারই আরেক নাম ভালোবাসা এমনি কথাও নানাভাবে বলা হয়েচে এবং দৈহিক কামনাকেই ভালোবাসা ব'লে মনে করতে পাবা অতি-আধুনিকতার একটা মস্ত লক্ষণ এমনি ধরনের কথাও আভাষে ইঙ্গিতে অনেক লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। আপাততঃ কাম এবং ভালোবাসা এক কিনা সে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। লীলাকমলের লেখিকা অতি-আধুনিক কালের কবি-শ্রেণীর অন্তর্গত হ'লেও তাঁর মধ্যে উপরোক্ত অতি-আধুনিক মনোবৃত্তি নেই। তিনি প্রেমকে প্রেম ব'লেই কাম থেকে দৈহিক কামনা থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখেচেন। 'লীলাকমল' কাব্যগ্রন্থ হ'লেও,—বইখানি পড়তে গিয়ে বার বার উক্ত প্রভেদটার কথা মনে আসায় প্রথমেই ও-কথা বললাম।

কাব্যের বিষয়-বস্তুর তো বিচিত্রতার অন্ত নেই। কিন্তু ওই সমস্ত বিচিত্র বিষয়-বস্তুকেই একটি সাধারণ ধর্ম্মেব অধীন হ'তে হয়। কাব্যকে কাব্য হতে হবে; তা যদি না হয তো তার সমস্ত ভাবুকতা, অলঙ্কার, সাজসজ্জা ব্যর্থই হয়ে যায়। সুতরাং কোনো কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা করতে হ'লেই আমাদের কাব্যত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয।

কিন্তু এই কাব্যত্ব বস্তুটি কি? এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কোথাও পাওয়া যায় না; অর্থাৎ যা-কিছু উত্তব পাওয়া যায় তা দিয়ে কোনো সুনির্দ্দিষ্ট বিচাব চলে না। শেষ কালটায় রসবিচারে রসিকের কাছেই জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হ'তে হয়। রসিকটি কে! যিনি কবি তিনি? না, যিনি পাঠক শ্রোতা তিনি? এ নিয়ে মতভেদ অনন্তকাল ধবে আছে এবং থাকবেও।

তাই সমালোচনা একরকম ব্যক্তিগত রুচি হিসেবে মতামত প্রকাশই হয়ে দাঁড়ায়।

কাব্য হচ্চে মানুষের অনুভবেরই সৃষ্টি। কবি-চিত্ত বিচিত্র অনুভূতির স্পন্দনে ছন্দায়িত হয়ে ওঠে এবং তাঁর চিত্তের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না, বেদনা-আনন্দ ছন্দে লয়ে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। অনুভূতিটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার; সকলের একরকমের অনুভূতি হয় কি না তাতে সন্দেহ আছে। তবে একটা বিশেষ কোনো অনুভূতির একান্ত ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা থাকলেও তার একটি বিশ্বজনীন রূপও আছে এমন কথা অনেকেই বলেন এবং এই কারণেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান

* *লীলাকমল*—শ্রীরাধারাণী দত্ত—মূল্য ২।০ টাকা

করতে পারি। শেলির অনুভূতিকে ঠিক শেলির মত আমরা কেউই হয় ত অনুভব করতে পারি না, কিন্তু তবু সংসারে আজ বহু মানব শেলির ছন্দোময়ী বাণী পড়ে আনন্দ পেয়ে থাকেন।

'লীলাকমল' লেখিকার অন্তরের অনুভব-ধারার একটি বিশিষ্ট বিকাশ। এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে লেখিকার অন্তর্জ্জীবনের একটি রূপ চোকে পড়ল; এই হিসেবে একে লেখিকার অন্তর্জ্জীবনের ইতিহাস ব'লে মনে করতে পারি। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসের দিক দিয়ে বইখানির আলোচনা সম্ভব হ'লেও তাকে কাব্য-সমালোচনা বলা চলবে না।

আমাদের একমাত্র প্রশ্ন হচ্চে লেখিকার এই গ্রন্থখানি যে-সব অনুভবকে প্রকাশ করেচে, সেই-সব অনুভবের প্রকাশ এমন একটি universal expression অর্থাৎ রসমূর্ত্তি পেয়েচে কিনা, যা আমাদের চিত্তকেও আবিষ্ট করে? তাঁর কথা কখনো কোনো মুহূর্ত্তে যেন আমাদেরো অন্তরের কথা হয়ে ওঠে কিনা? যদি হয়ে থাকে তা হ'লেই বলব যে, বইখানি সত্যিকার কাব্য হয়েচে। 'আমাদের' বলতে এখানে আমি 'সকলের' বলচিনে বলাই বাহুল্য। যে দুঃখ পায়নি কখনো, সে দুঃখের মূল্য বিচার করবে কেমন ক'রে? 'লীলাকমল' যে-অনুভব নিয়ে সৃষ্টি হয়েচে সেই অনুভূতি যাঁদের চিত্তে অল্পবিস্তর হয়েচে, তাঁরাই এর আবেদন কতখানি তা বুঝতে পারবেন।

এখন দেখা যাক লীলাকমলের অনুভূতিটি কিসের?

এক কথায় বলতে হবে ভালোবাসাই হচ্চে এর একমাত্র বিষয়। কিন্তু ভালোবাসারও অনন্ত বৈচিত্র্য আছে; লেখিকার লীলাকমলে ভালোবাসার অনন্ত বর্ণ-বৈচিত্র্য নেই—তাতে আছে পিপাসিত ভালোবাসার বেদনা-বিষণ্ণ প্রতীক্ষা এবং অন্তিমে পাবার একটুখানি সান্ত্বনা।

"মানস-মক্ষি ত্রিভুবন খুঁজি' ঘুরে ঘুরে মরে খালি,
পরম-পিয়াসা কে মিটাবে তা'র মরমের মধু ঢালি'।
গেছে প্রাহ্ণ, অপরাহ্ণেরো শেষ,
ছেয়েছে প্রদোষ আঁধারের কালো-কেশ,
—কণ্টক-ঘায়ে শোণিতাঙ্কিত-বেশ
ধূলায় পক্ষ ম্লান,
মন-মৌমাছি মনে মনে করে প্রেম-মধু সন্ধান!"
('মধু-সন্ধানী')

"জীবন-অরণ্যচ্ছায়ে আঁধার ঘনায়ে আসে খালি
দীর্ঘ-পথ বাকী,
হে মোর পরম-রম্য! তোমারি প্রেমের দীপ জ্বালি'
চলেছি একাকী।

জানি জানি, জানি বন্ধু! দিক্‌হারা এ' পান্থেরি তরে
তোমাব রজনীগন্ধা আছে জাগি' বনপথ 'পরে,
সুগন্ধেব সুর তার ইঙ্গিতে পরম-সমাদরে,
গৃহে ল'বে ডাকি'!

তোমার বিরহ মোব কামনা-পঙ্কেব মাঝে, প্রিয়!
ফুটায়েছে ফুল ;
বিথারি' সহস্রদল সে কমল হাসে কমনীয়,
ত্রিলোকে অতুল।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মধু সিঞ্চিযাছো প্রাণে প্রাণে মোব,
সুন্দরেব স্বপ্নচ্ছবি মুগ্ধ-আঁখি করেছে বিভোব :
বেজেছে আলোর বাঁশী, ছিন্ন কবি' ঘন-অমা-ঘোর
প্লাবি' প্রাণ-কূল।"

('সম্বল')

লীলাকমলেব মধ্যে যে-প্রাণেব চিত্র পাই, সে প্রাণটি যেন এই জীবনেব পথে একান্তই বঞ্চিত ; এই জীবন যেন তাব কাছে একটা "প্রকাণ্ড মরণ" ; এ জীবনে তাব কোনো সার্থকতার আশা কোথাও নেই। তাই সে যেন কোন জন্মান্তরের দিকে, কোন পরপারেব পানে তার পরম সার্থকতাব আশায চেযে আছে। অনেকগুলি কবিতায় এই একটি সুরেরই নানা রকমেব লীলা দেখতে পাই।

"জানি জীবনেব এই দীর্ঘ-অন্ধকাব নিশাশেষে
স্মিত মৃত্যু উষা
দিবে দেখা শুভলগ্নে অভিসার-প্রসাধিত-বেশে
অঙ্গে পুষ্প-ভূষা।
তিল তিল মৃত্যুভবা এ জীবন প্রকাণ্ড মবণ
কোনো একদিন,
তোমার মিলনপূর্ণ নব জন্মে করিয়া ববণ
হবে সুখ-লীন।" ('মৌন-নিবেদন')

কখনো কখনো কবি-চিত্তে এই জীবন প্রকাণ্ড মরণ ব'লে অনুভূত হ'লেও এখানে একটি দ্বন্দ্ব আছে দেখতে পাই। কখনো কখনো বিরহের মাঝে প্রেমেব নির্ম্মল রূপটি ফুটে ওঠে, তখন যেন তীব্র হতাশার অবসান ঘটে, তাই কবি-কণ্ঠে শুনতে পাই :

"মধুব ধ্যানেব রসে বিচ্ছেদেব শূন্যপাত্র মম
লইয়াছি ভবি',
অন্তবেব হাসি তাই অশ্রু-যূথিরূপে প্রিযতম
পড়ে আজি ঝবি'।

ক্রন্দন—ক্রন্দন নহে, আনন্দের প্রবাহ চঞ্চল,
চিত্তের পুলক-নীর নেত্র-তীরে করে টলমল!
বেদনা হয়েছে সোনা—দুঃখ হ'ল পরম-নির্ম্মল
বক্ষে তারে ধরি'।"

চিত্তের ধ্যানলীন অবস্থায় এই যে প্রেমানুভূতি, এর কথা আজকালকার অতি-আধুনিক কবিতা থেকে লুপ্ত হয়েচে বলে মনে হয়। অথচ বিচ্ছেদের মধ্যে ভালোবাসা এমনি ধ্যানেই তো পরিণত হয়ে থাকে!

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, স্থান সঙ্কীর্ণতার জন্য বিরাম নিতে হচ্চে। লীলাকমলের অনেকগুলো কবিতাই—যেমন 'গোধূলি লগ্নে', 'প্রেম-প্রশস্তি', 'বিরহিণী', 'মৌন নিবেদন', 'কোথায় চলাব শেষ?', 'ক্রন্দসী', 'ভুল', 'সম্বল'—পড়ে ভালো লেগেচে। কবিতার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হ'লেও এই বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি কবিতায় বেশ সুন্দর ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেচেন। ছন্দে এবং শব্দ সমাবেশে ছোটখাটো ভুল নেই তা নয়, তবে এগুলো তিনি তাঁর নিজের সাধনা দিয়েই দূর করতে পারবেন বলে মনে হয়।

লীলাকমলের মহিলা-কবিকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় হই।

কাশী। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়।

উত্তরা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

"লীলাকমল" পাঠে

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ 'লীলাকমল' মধু-পরিমল
প্রাণপুটে কা'র শিহরি' উঠে!
গাহে 'রামকিরি' কে মরুচারিণী?
সম্মুখে শুকতারকা ফুটে।
যে ব্যথার তার বেজেছে তোমার
'মীরা'র গভীর ভজন-সুরে,

'রাখালরাজা'র পূজাডালি ভরি
আরতি-রাগিণী কণ্ঠে স্ফুরে।
দুঃখ পরম নির্ম্মল হয়ে
সজল ক'রেছে আঁখির কোণা
আনন্দ-ঘন রসের পরশে
কাঁদন তোমার হয়েছে সোনা।

ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩৩৮

২. *সীঁথি-মৌর।* শ্রীরাধারাণী দেবী। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। উৎসর্গ : কবিভগিনী স্বর্গীয়া এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং—তুমি জ্বেলে গেছো জীবন-তীর্থে/চির-অমলিন প্রণয়-

আলো;/প্রেম-সোহাগিনি। এ সীঁথি-মৌব/তব সীমন্তে শোভিবে ভালো!—রাধারাণী। প্রবেশক কবিতা সহ। মোট ৩৪টি সনেটের সমষ্টি। প্রত্যেক বা-দিকের পৃষ্ঠা চিত্রাঙ্কিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ও দামের উল্লেখ নেই। ১৭ সেমি x ১০ সেমি। [প্রথম প্রকাশ : ১৯৩২]।

সীঁথি-মৌর কাব্যগ্রন্থের দুটি সমালোচনা মুদ্রিত হল। প্রথম সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল *বিচিত্রা* পত্রিকায়, রচনাটি অস্বাক্ষরিত. দ্বিতীয়টি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা, প্রকাশিত হয়েছিল *উত্তরা* পত্রিকার আষাঢ় ১৩৪০ সংখ্যায়।

সীঁথি-মৌর— শ্রীরাধারাণী দেবী প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

৩৪টি সনেটে গ্রথিত এই সীঁথি-মৌর কাব্যবইখানির বহিরাবরণ দেখলে বিবাহ-রাত্রের বধূর প্রসাধন সীঁথি-মৌর ব'লেই ভ্রম হবে। এর প্রচ্ছদের সম্মুখ পৃষ্ঠাখানি সীঁথি-মৌরের অনুকরণে রাঙতা দিয়ে রচিত। বধূর মাথায় পরিয়ে দেবার জন্যে আসল সীঁথি-মৌরের অনুকরণে ইহাতে একটি বেষ্টনীও সংলগ্ন আছে। সুতরাং এরূপ প্রসাধনে সজ্জিত হয়ে এ বইখানি যে উপযোগিতায় বিবাহরাত্রের উপহারের অপর সকল বইকে পরাস্ত করেছে তা অসংশয়ে ব্যক্ত করা যায়।

এই ত গেল বহিরাবরণের কথা। কিন্তু ভিতরে যখন প্রবেশ করি তখন ৩৪টি সনেটের অনাবিল মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যাই। 'প্রাণ-তীর্থযাত্রী' হয়ে কবি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন,—পথে কত বাধা কত বিঘ্ন কত গ্লানি কত নিন্দা,—তারই আঘাতে সংঘর্ষে এই কবিচিত্তকুসুমগুলি ফুটে উঠেচে। জীবনের যথার্থ স্বরূপ যার চক্ষে প্রতিভাত সে-ই বলতে পারে :

> পঙ্কই দেখিতে পেলে!—পেলে শুধু গ্লানি
> ফুটেছে পঙ্কজ তাহে দেখিলেনা ভাই!
> দিলে মিথ্যা অপযশ,—শুনে লজ্জা পাই!
> সত্য আজি মূলহীন—কেমনে তা মানি?

এই ৩৪টি কাব্যকুসুমের সৌরভে এবং সৌন্দর্য্যে কাব্যরসিকের চিত্ত সরস হবে। সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

বিচিত্রা, বৈশাখ ১৩৪০

একখানি পত্র

তুমি আমাকে মাঝে মাঝে বড় বিপদে ফেল। তোমার স্নেহশীল হৃদয়ের অনেক

পরিচয় পেয়েছি, তাই স্মরণ করে তোমার স্নেহের অত্যাচারকে আমার ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু পারছি না। সদা সর্ব্বদা নিজেকে কৃতজ্ঞতার উঁচুসুরে বেঁধে রাখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কৃতজ্ঞতার চেয়ে বড় কর্ত্তব্য রয়েছে, নিজের ওপর। না যদি থাকত তা হলে রাজকীয় আন্দোলনের কোন সার্থকতাই ছিল না।

তুমি আমাকে রাধারাণী দেবীর *সীঁথিমৌর* দিলে কেন? আমার কবিতা বুঝতে দেরী লাগে, তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে ভয় হয়। আমার বিশ্বাস কবিতা বোঝা এবং বুঝে সমালোচনা করার মতন কঠিন কাজ আর দুটি নেই। আমরা বিংশ শতাব্দীর লোক, পদ্যকে ধীরে ধীরে, তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার মতন সাধনা আমাদের নেই, সময় নেই, প্রবৃত্তি নেই। নেহাৎই রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন, তাই কখনও কখনও ভুলে যাই যে বিংশ শতাব্দীর সময় ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ধেয়ে চলে। তাঁর কবিতায় যন্ত্র-যুগের গতিশীলতা নিরুদ্ধ। বিরামের ভোগ তিনিই বণ্টন করেন। সেই ভোগের নেশায় ও আশায় অন্য কবির লেখা পড়ি। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর লেখাও পড়েছি, ভালও লেগেছে, তোমাকে বলেওছি। তুমি যদি তাই স্মরণ করে তাঁর এই সনেটগুলি আমাকে পড়তে দিয়ে থাক তা হলে তোমাকে দোষ দিই না। কিন্তু না দিলেই ভাল করতে। আমি এক ঘণ্টায় বইখানি শেষ করলাম। মনে আমার কোন দাগ পড়ল না। এমন কি বই-এর ঐ রকম বহুমূল্য মলাট ও ছাপাটাও না। কি মনে পড়ল জান? যেন বিবাহ-বাসরের সালঙ্কৃতা কন্যা সম্প্রদানের জন্য সজ্জিতা হয়ে আড়ষ্টভাবে বসে আছেন। বিবাহ-অনুষ্ঠানটি উচ্চাঙ্গের, সজ্জাও তাই। অবশ্য সাজটি বেনারসী চেলীর নয়, বাংলা দেশেরই কারুশিল্প-খচিত, তবু যেন কোথায় পিত্রালয়ের আটপৌরে শাড়ীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অনটন রয়ে গিয়েছে। আসল ব্যাপার কি জান? কোন বিশেষ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখব মনে করে সত্যকারের কবিতা লেখা যায় না। দু একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি হয়ত পেরেছেন, কিন্তু সাধারণ কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পারেন না। রাজ-দরবারের জন্য, কিংবা প্রীতি-উপহারের জন্য লেখা ক'টি ভাল কবিতা পড়েছ? কারণ বোধ হয় এই, সত্তার স্থানটি যখন প্রতীক অধিকার করে, তখন প্রেরণা সৎ হয় না, অসৎ হতে বাধ্য। অসৎ অর্থে আংশিক। প্রেরণার আংশিকতা গোপন করতে সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, ভাষার আড়ম্বর বৃদ্ধি পায়। যদি সনেট-রূপটি নির্ব্বাচিত হয়ে থাকে, তাহলে আরো বিপদ; সনেটের লাইন কটিতে অত ভার সয় না। যে সনেট দীর্ঘ কবিতায় উপচে পড় পড়, তাকে সনেট বলা যায় না। সনেট একটি সম্পূর্ণ 'চক্র', তাকে gestalt বলতে পার। রাধারাণী দেবীর এই লেখায় অনেক ছেঁড়া সুতো রয়েছে। তাই বলি, এ বই কোন বিশেষ ঘটনার উপযুক্ত হলেও, লেখিকার যোগ্য নয়। এক কথায় *সীঁথিমৌর* নরেনদার স্ত্রীর লেখা—বৌদির লেখা—রাধারাণী দেবীর লেখা নয়। সনেটের সংযম এ বইটিতে নেই। যদি চিঠির বদলে সমালোচনা করতাম, আর হাতে বিস্তর সময় থাকত, এবং সে সময়ের প্রত্যেক ফাঁককে ভারী জিনিষ

দিয়ে ভরে দেবার মতন খেয়াল আমার আসত, তাহলে আশা করি দেখাতে পারতাম অসংযম কোথায় এবং কতটুকু।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

উত্তরা, আষাঢ় ১৩৪০

৩. *বনবিহগী।* শ্রীরাধারাণী দেবী। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৩৮। পৃ. ৮০+[২]। সচিত্র। ১ টাকা ১২ আনা। উৎসর্গ : চিরতরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ নিত্য নবীনেষু। রবির আলোকে যে বিগহী পাখা মেলেছে তাকে রবিকরেই সমর্পণ করলাম আপনার স্নিগ্ধ স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে। রাধারাণী। 'নিবেদন' অংশে আছে : এই কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি ছাড়া বাকি সব ১৩২৯ সাল হতে ১৩৪০ সালের মধ্যে রচিত। সুতরাং বনবিহগীর কণ্ঠে যে পরিচিত প্রাচীন সুরটি ঝঙ্কৃত হয়েছে, তা' সে-যুগের ধ্বনিরই দ্যোতক। অতএব একালের মনোরঞ্জনে এ গীতি যদি অক্ষম হয়, তার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। বনবিহগীকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে আমি সাহায্য নিয়েছি—শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিল্পীশ্রেষ্ঠ নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীমান সুনীল পাল, আশু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রূপকারগণের। বানান সংস্কারে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়। ছবির ছাঁচগঠনে অনেকখানি সহায়তা পেয়েছি —ভারত ফোটো টাইপের শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট। এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রাধারাণী দেবী। সূচি : *মানসলোক*—আকাশ ও নীড়, প্রাণ-ঝাক, উদয়ন, জাগৃহি, অনুচ্চারিত, মিলন মাঙ্গল্য, জীবন দেবতা, সুদূরের প্রেম, অভ্যুদয়, ভ্রষ্টলগ্ন, নর ও নারী, উদ্বোধন, মন-মর্মর। *মৃত্তিকালোক*—প্রতীক্ষা, পার্বতী-পূর্ণিমা, শারদ প্রকৃতি, শারদ প্রতিমা, গভীর নিশীথে, গোপনচারিণী, বাতায়নে, নির্ঝরিণী, কেতকী, নগর বাহিরে, মৌন-প্রশস্তি, নীল আকাশ, শিশির বিন্দু, শিউলি ফুল, সোনালী রৌদ্র, স্থলপদ্ম, কাশবন, কাঁচা ধান, রক্তকমল, হংসবলাকা, শরৎ-শর্বরী, মানবক, গিরিবসন্ত, মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়। [প্রবেশক কবিতা]।

কাব্যানুবাদ

মিলনের-মন্ত্রমালা। শ্রীরাধারাণী দেবী। কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১। পৃ. ৭১। দাম : ৪ টাকা। উৎসর্গ : পরম স্নেহের মীরা ও সুবোধকে—দিদিমণি। 'আমুখ' অংশে আছে : প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্রসমূহে ব্রাহ্ম-দৈব-আর্য-প্রাজাপত্য-আসুর-গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস-পৈশাচ-ভেদে যে অষ্টবিধ বিবাহের বিবরণ দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে

—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিবাহের নানাপ্রকার রূপ লইয়া বহু গবেষণা করিয়াছিলেন, ও ঐ সকল বিভিন্নজাতীয় বিবাহের যেগুলিকে সমাজের পক্ষে শুভফল-দায়ক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন সেই সকল শ্রেণীর বিবাহকেই 'ধর্ম্ম বিবাহ' নামে অভিহিত করিয়া উহাদিগের অচ্ছেদ্যতা প্রতিপাদনে যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহা যে কেবল ধর্ম্ম-শাস্ত্রগুলিরই অভিমত তাহা নহে; মহামতি কৌটিল্যও তদীয় 'অর্থশাস্ত্রে' ধর্ম্ম-বিবাহের অচ্ছেদ্যতা সমর্থন করিয়াছেন—"অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম" (৩/৩/৫৯)। |বিরুদ্ধবাদিগণ এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে—বিবাহের অচ্ছেদ্যতা ছিল প্রাচীন যুগের আদর্শ। কিন্তু যুগে যুগে আদর্শের ত পরিবর্ত্তন ঘটে। এরূপ অবস্থায় বিবাহের প্রাচীন আদর্শই বা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে কোন যুক্তিতে? |ইহার উত্তরে প্রাচীনানুরাগিগণ বলিয়া থাকেন—সত্য বটে, কালবশে সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন ঘটা স্বাভাবিক; কিন্তু বিবাহ ত রীতিনীতি মাত্র নহে—উহা যে সংস্কার-বিশেষ। এ-কারণে উহার পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা নাই। |কিন্তু, এ উত্তর ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত ও হিন্দু-আইন-সঙ্গত হইলেও সকলের মনোমত না হইতেও পারে। সংস্কার হইলেই যে উহা পরিবর্ত্তনের অযোগ্য, তাহার পক্ষে যুক্তি কোথায়? যদি অন্য কোন আধুনিক বিবাহ-পদ্ধতি গুণাধান ও মালিন্যাপনয়নের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সেই অভিনব বিবাহ-পদ্ধতিই বা প্রাচীন পদ্ধতির মত 'সংস্কার' বলিয়া আদৃত হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে—হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সুপ্রাচীন বিবাহ কেবল 'আদর্শ' বা 'সংস্কার' বলিয়াই অচ্ছেদ্য নহে। উহা একটি সনাতন সত্য। আদর্শ বা সংস্কারের রূপান্তর বা পরিবর্জ্জনও সম্ভব হয়—কিন্তু সত্য যাহা, তাহার পরিবর্ত্তন কোন দিনই হইতে পারে না। বিবাহের একাধিক মন্ত্র আলোচনা করিলেই এ তথ্যটি সুস্পষ্ট প্রতীত হইবে। দুইটি মন্ত্র ধরা যাউক--

"সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি বৌ"।

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ"।

মন্ত্র দুইটিরই তাৎপর্য্য এই যে—বধূ ও বর তত্ত্বতঃ পরস্পর অভিন্ন। অর্দ্ধ-নারীশ্বরমূর্ত্তি পরিকল্পনায় এই অভেদ-তত্ত্ব পরিস্ফুট। এই অভেদ কল্পনামাত্র মনে করিলে ভুল হইবে; কারণ অভেদই পরম তত্ত্ব—চরম সত্য।

পরম সত্য এক ব্যতীত দুই হইতে পারে না। কারণ একের অনুভূতি অন্য কোন অনুভূতির উপর নির্ভর করে না; পক্ষান্তরে, দুই বা বহুর অনুভূতি একের অনুভূতি-সাপেক্ষ। তাই অদ্বৈতের অপরোক্ষ অনুভবই একমাত্র পরম সত্য। আর বধূ-বরের ঐকাত্ম্যানুভবই এই অদ্বৈতানুভূতির প্রথম সোপান। এই গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত করিয়াই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ"।

গৃহস্থের দাম্পত্য-জীবনে পতি-পত্নীর মধ্যে যে অভেদোপলব্ধির প্রথম সূচনা,

সমগ্র বিশ্বের সহিত ঐক্যানুভূতি বা ব্রহ্মনিষ্ঠায় উহার চরম পরিণতি—ইহাই হিন্দুর ধর্ম্ম-বিবাহের মূল তত্ত্ব।

বর্ত্তমানে আমরা এই বিবাহ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে একান্ত অনভিজ্ঞ ও উদাসীন হইয়া পড়িতেছি। পাশ্চাত্ত্য হইতে ঋণরূপে ও খণ্ডিতাকারে গৃহীত নানাবিধ 'বাদে'র মোহজাল প্রাচ্যের যে অখণ্ড সাম্যবাদ বা অদ্বৈতানুভূতি হিন্দু-বিবাহের মূল-ভিত্তিরূপে বিদ্যমান তাহাকে আবৃত করিয়া ক্রমশঃ আমাদিগের জ্ঞানের অগোচরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়! মন্ত্রার্থজ্ঞানের অভাব আমাদিগের এই অধঃপতনের অন্যতম মুখ্য কারণ। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বর-বধূ বিবাহাঙ্গ মন্ত্রগুলির অর্থ না বুঝিয়াই উহাদিগের বিকৃত আবৃত্তি করিয়া থাকেন। আর যাঁহার উপর মন্ত্রগুলি পড়াইবার ভার অর্পিত থাকে, তিনিও প্রায়ই মন্ত্রগুলির অর্থ বুঝাইয়া দিবার আয়াস স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক থাকেন। এ-কারণে বর-বধূর অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে হিন্দু-বিবাহের আধ্যাত্মিক উদার ও মহিমময় রূপটি ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পায় না। ফলে দম্পতী এ গভীর তত্ত্ব-সম্বন্ধে চিরদিনই অজ্ঞ থাকিয়া যান। বিবাহের মন্ত্রগুলির বঙ্গানুবাদ একাধিক মুদ্রাপিত বিবাহ-পদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও নানা কারণে সেগুলি দম্পতীগণের অন্তরে বিশেষ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয় না। অনুবাদের ভাষার কাঠিন্য এই সকল কারণের অন্যতম। সুপ্রসিদ্ধা মহিলা-কবি শ্রীযুক্ত রাধারাণী দেবী মহোদয়া দম্পতীগণের কল্যাণার্থ 'মিলনের মন্ত্রমালা' নামে এই যে পুস্তিকাখানি প্রকাশিত করিলেন, ইহাতে বহুদিন হইতে অনুভূত এই অভাবটির অন্ততঃ আংশিক মোচনও হইবে—এ আশা করা যায়। ইহাতে মন্ত্রগুলির পদ্যে ভাবানুবাদ প্রদত্ত হওয়ায় সহৃদয় দম্পতীগণের উহা চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। অবশ্য এ গ্রন্থখানিকে একটি সম্পূর্ণ বিবাহ-পদ্ধতি মনে করা অনুচিত হইবে। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা বিবাহ-পদ্ধতি হইতে দৃষ্টান্তরূপে কয়েকটি বিশিষ্ট মন্ত্র চয়ন-পূর্ব্বক সুললিত ছন্দে উহাদিগের ভাষান্তর করিয়াছেন। তিনি সুকবি—তাই মনে হয় তাঁহার রচনায় সুপ্রাচীন ক্রান্তদর্শী কবিত্বের ভাব-গাম্ভীর্য্য ও রস-মাধুর্য্য যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে। এখন গ্রন্থখানি হিন্দু-দম্পতীগণের চিত্ত-বিনোদন ও আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি-প্রসার দ্বারা সার্থকতা লাভ করুক—শ্রীভগবানের চরণে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রী অশোকনাথ শাস্ত্রী

'নিবেদন' অংশে আছে : হিন্দুসমাজের বরবধূকে বিবাহমণ্ডপে উভয়পক্ষের পুরোহিত যখন অগ্নি ও শালগ্রাম সমক্ষে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন, তখন তাঁরা অনেকেই কেবল মাত্র পারিপার্শ্বিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্কেতেই বোঝেন যে আজ পরস্পরে স্বামী-স্ত্রী রূপে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযুক্ত হলেন।

মন্ত্রের সাহায্যে পবিত্র যে প্রতিশ্রুতি, সংকল্পবাক্য ও আদর্শবাণী উচ্চারণ করে তাঁরা মিলিত হন সেগুলির অর্থ তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য বা অজ্ঞাতই থেকে যায়।

বর্তমান যুগে সংস্কৃত ভাষায় সর্বসাধারণের সম্যক জ্ঞান না থাকায়, হিন্দু বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান বা মূলভিত্তি যা মন্ত্রপাঠ তা' প্রায় নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একে সার্থক করে তুলতে হলে বৈদিক মন্ত্রগুলিকে আমাদের অধুনা প্রচলিত মাতৃভাষায় সুবোধ্য ও ছন্দগ্রথিত রূপে প্রকাশের প্রয়োজন অনেকদিন থেকেই অনুভব কবেছি। দীর্ঘকাল অপেক্ষায় ছিলাম আমা হতে যোগ্যতর কেউ যদি এ কাজে অগ্রসর হন। পরিকল্পনার বহুকাল পরে শেষপর্যন্ত নিজেই এ কাজেব ভার নিয়েছি। দুঃসাহস যে করেছি, সন্দেহমাত্র নেই ; তবে এ কাজে আমাদের সুহৃদোত্তম প্রসিদ্ধ ভাযাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট এবং অধ্যাপক পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, এম-এ, পি, আর, এস বুধদ্বয়ের অকৃপণ সদুপদেশ ও উদাব সাহায্য লাভের সৌভাগ্য হওযায দায়িত্ব অনেকটা লঘু বোধ হয়েছে। এ জন্য আমি এই দুই শ্রদ্ধাস্পদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবছি।

পণ্ডিত শ্যামাচবণ কবিরত্নের 'পুরোহিত দর্পণ' পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বিবাহমঙ্গল' পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বিবাহ পদ্ধতি' থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি।

চিত্র-শিল্পী শ্রীচারু রায় ও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী বইখানিকে সচিত্র করেছেন, মুদ্রণ-শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় এর মুদ্রণ পারিপাট্য সম্পাদন করেছেন এবং মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স একে শোভন সংস্করণ রূপে প্রকাশিত করেছেন বলে এঁদেবও নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১। বাধারাণী দেবী। হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

গল্পসংগ্রহ

গল্পেব আলপনা। রাধারাণী দেবী। কলিকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর, ২২/৫বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। মহালযা ১৩৬২। পৃ. ১৬২। সচিত্র। দাম : ২ টাকা। উৎসর্গ : কল্যাণীয়া আশাপূর্ণা দেবী, স্নেহাস্পদাসু—

সাহিত্যতীর্থে তোমার লেখনী যাত্রা করেছিল শিশুদের গল্পের সবল পথ দিয়ে। যে-পথের উর্ধ্বে ছিল রঙীন কল্পনাব সীমাহীন অবাধ আকাশ, মাটিতে ছিল অফুরন্ত আনন্দ আর সরস-কৌতুকেব অজস্রতা।

আজ তোমার লেখনী মানবহৃদয়ের রহস্যগভীর নানাবিচিত্র পথে সার্থকতার উজ্জ্বল আলো বিকিবণ কবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তার দৃষ্টি সূক্ষ্ম, অনুভব সুতীক্ষ্ণ, বিচার নিবপেক্ষ, সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

সাহিত্যে সিদ্ধিলাভ করেছে তোমার লেখনী।

কিন্তু, তুমি তো জানো, পাকা মনের পুরু আড়ালে সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে কাঁচা মন। যে-মন শৈশবে জাগ্রত হয় বিপুল কৌতূহলে, বিস্ময়ে আর আনন্দের

প্রাবল্যে। বিশ্বকে প্রথম আস্বাদনের আর আবিষ্কারের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা যে-মনের সম্পদ। আমরণকাল মানুষের মনেব অন্তঃপুরে জীবন্ত থেকেও যে-মন বাইবে বেরুতে লজ্জা পায়।

তোমার শৈশব ও বাল্যের সেই গল্পাস্বাদী মনের কাছে এই গল্পেব আলপনা এগিয়ে দিয়ে মহাকবির ভাষায় বলি,—

"—দেখ তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না?"

৭ই আশ্বিন, তোমাদের বৌদিদি
১৩৬২ বাধাবাণী দেবী

'নিবেদন' অংশে আছে :
বইখানিব ফলেব ভাব প্রকাশকের হাতে দিয়ে আমি শুধু অনেকগুলি অদেখা কচি কচি মুখ মানসচক্ষে দেখছি। যাবা, পাঠ্যপুস্তক পড়তে বসাব প্রবল তাগিদ শিক্ষক আব বাবা কাকা দাদাব কাছেই নয়, মমতাময়ী মাযেব কাছেও পেযে পেযে হাঁফিয়ে ওঠে। এদেরই ক্ষুধিত মনের আকাঙ্ক্ষিত বাল্যভোগ সাজিয়েছি এই বইখানিতে।

এর মধ্যে "প্রয়োজনীয় মূল্যবান বিষয় বস্তু" পাওয়া যাবে না। যা' ওবা বড়ো হয়ে উঠবাব অনেক আগে থেকেই আমরা আজকাল ওদেব মনের ভাণ্ডার বোঝাই কবে তুলবার চেষ্টা করি।

এখানে আছে শুধু শিশুমনেব স্বচ্ছন্দ কল্পনাবৃত্তিকে যেমন-খুসি উড়ে যেতে দেওয়াব মত অনেকখানি খোলা আকাশ।

২৪শে সেপ্টেম্বর, বাধারাণী দেবী
১৯৫৫

সূচি : অভীক কুমার, দৈত্য ও বাজকন্যা, শুকসারী আর রাজকন্যা, রাজপুত্র আর দুই বন্ধু, অবণ্যের অধিপতি, তেপান্তরের মাঠ, কুহকের দ্বীপ, পাঁচ কথা (১. অমৃত আর বিষ, ২. অসি আর লেখনী, ৩. লোভের পরিণাম, ৪. হাতী আব বাঘ, ৫. বানরের বন্ধুবাৎসল্য), সন্ন্যাসীর বিপদ, এক যে রাজার সাত-রাণী, ময়ূর ও মরাল, চম্পকলতা কন্যা, বন্দিনী রাজকন্যার গল্প, ডাইনী বনের গল্প, মায়া-কানন, কে খুনী?, দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

প্রবন্ধ

শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প। রাধারাণী দেবী। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৭৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ : মার্চ ১৯৮০। উৎসর্গ :

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু—। সূচী : বন্ধনহীন গ্রন্থি, অদৃশ্য তর্জনী, শেষের পরিচয়, পরিশিষ্ট (রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের অভিমত-সংবলিত)। পৃ. ১৯৪। দাম : ১৫.০০। পূর্ণেন্দু পত্রী অঙ্কিত প্রচ্ছদ। ২১.৫ x ১৪ সেমি।

'কৃতজ্ঞতা স্বীকার' অংশে লেখিকা বলছেন :

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালা দিতে সম্মত হয়েছিলুম প্রধানত অধ্যাপক বন্ধু মাননীয় শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের উৎসাহে ও ভরসায়। ১৯৭০-এর বক্তৃতা দিতে দিতে ১৯৭৫ হয়ে গেল।

কিন্তু মুখের বলা মুখেই মিলিয়ে যেত। প্রায় ত্রিশ বছর বাদে জোর করে আমার হাতে কলম গুঁজে দিয়ে এই বইটি লিখিয়ে নেওয়ার পূর্ণ দায়িত্ব আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের স্কন্ধেই ন্যস্ত করছি। তাঁর অটুট ধৈর্য, অক্ষয় উৎসাহ, এবং অসীম সহানুভূতি ব্যতীত এ বই লেখা অথবা ছাপা হত না।

এ ব্যাপারে আমার কন্যা নবনীতা দেব সেন 'ঘরের শত্রু'র ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাগাদায় তাগাদায় মন্থর ও লেখনীবিমুখ আমাকে অস্থির করে তুলে হাতে-নাতে কাজ আদায় করে নিয়েছেন তিনিই। অতি যত্নে প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন স্নেহাস্পদ শ্রীমান অমিয় দেব। প্রয়োজনীয় বইপত্র সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন কল্যাণীয় শ্রীমান সুবীর রায়চৌধুরী।

'পরিশিষ্ট' অংশে তাঁদের মূল্যবান অভিমত প্রকাশের অনুমতি দিয়ে ধন্য করেছেন শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক তিনজন বিশিষ্ট মনীষী : দেশবরেণ্য ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, জাতীয় আচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ও ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসের অদ্বিতীয় গবেষক শ্রীসুকুমার সেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

এ ছাড়া ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই অসংখ্য শরৎ-অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের, যাঁরা 'দেশ' পত্রিকায় বক্তৃতাগুলি বেরুনোর সময়ে চিঠি লিখে আমাকে পুস্তক প্রকাশে ক্রমাগত উৎসাহিত করেছেন। সব চিঠির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি।

এই বক্তৃতামালা গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমার ঋণ অবশ্যস্বীকার্য।

'আনন্দ পাবলিশার্স' আমার নানা ত্রুটি, বিলম্ব ইত্যাদি সহ্য করেছেন, এজন্য তাঁদের কাছেও ঋণী।

বলা বাহুল্য, বইয়ের ত্রুটিবিচ্যুতির দায় আমার একার।

'ভালো-বাসা' রাধারাণী দেবী

৭২ হিন্দুস্থান পার্ক

কলকাতা-২৯

৩১ ভাদ্র ১৩৮৩

ভূমিকা/রচনা-সংবলিত গ্রন্থ

১. *কবি-পরিচিতি।* রবীন্দ্র-পরিষদ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। পৃ [।০], ৷৵০, ২০৪, কান্ত পাবলিশিং হাউস।

সপ্ততিতম রবীন্দ্র-জন্মতিথিতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক রচনার সংগ্রহ। 'ঘরে-বাইরে' (পৃ ১২৭-৪৪) রাধারাণী দেবী-কর্তৃক লিখিত। সংকলনের অন্যান্য লেখকদের নাম : প্রমথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমনাথ মৈত্র, নীহাররঞ্জন রায়, গিরিজা মুখোপাধ্যায় এবং মৈত্রেয়ী দেবী।

প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্রপরিষদে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ, এবং ৭০ বৎসরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাও আছে।

২. *অষ্টমী।* উপন্যাস। কলকাতা, কাত্যায়নী বুক স্টল, অগ্রহায়ণ ১৩৫২। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২০১।

আটজন লেখকের লেখা আটটি অধ্যায়ে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। প্রথম অধ্যায় লিখেছিলেন নরেন্দ্র দেব। অন্যান্য লেখকদের নাম : শচীন সেন, মৃণাল সর্বাধিকারী, রাধারাণী দেবী, প্রবোধকুমার সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আশালতা সিংহ ও অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল।

৩. *রসচক্র।* বারোয়ারী উপন্যাস। শ্রীকালিদাস রায় সম্পাদিত। কলকাতা, রসচক্র সাহিত্য-সংসদ। অক্ষয় তৃতীয়া, ১১ই বৈশাখ ১৩৪৩। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২২৯। 'রসচক্রের সদস্যগণের দ্বারা পরিকল্পিত ও রচিত বলিয়া উপন্যাসখানির নাম দেওয়া হইল "রসচক্র"।'

১–৩১ পরিচ্ছেদের মধ্যে ৭–৮ পরিচ্ছেদ নরেন্দ্র দেব এবং নবম পরিচ্ছেদ রাধারাণী দেবী লিখেছিলেন (প্রকাশ : উত্তরা, শ্রাবণ ১৩৩৯)। অন্যান্য লেখকদের নাম : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু, বিশপতি চৌধুরী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

৪. *শেষের পরিচয়।* শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। পৃষ্ঠাসংখ্যা, ৪, ৪১৪। ১৯৩৯।

শরৎচন্দ্র তাঁর মৃত্যুর আগে পঞ্চদশ অধ্যায় অবধি সমাপ্ত করে যেতে পেরেছিলেন। প্রকাশক তাঁর নিবেদন অংশে লিখেছেন : 'শরৎচন্দ্রের আকস্মিক তিরোধানের পর...শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে "শেষের পরিচয়" শেষ করিয়া দিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি। কারণ, শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার এই অসমাপ্ত রচনা সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করিবার সুযোগ ইনি লাভ করিয়াছিলেন।'

১৬-২৬ অধ্যায় রাধারাণী দেবী লিখে সম্পূর্ণ করেন। *শেষের পরিচয়* লেখার পশ্চাৎ-ইতিহাস বিষয়ে রাধারাণী দেবী তাঁর *শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প* বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে ('শেষের পরিচয়') বিশদ আলোচনা করেছেন। উল্লিখিত বইটি বর্তমান সংকলনভুক্ত হয়েছে।

৬. *বসন্তের লিপি।* প্রেম-গীতিকাব্য-সংকলন। শ্রীঅমিয়কুমাব মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ : ১৯৫১। রাধারাণী দেবীর ভূমিকা সংবলিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮৪।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস থেকে শুরু করে আধুনিক কবিদের সর্বমোট ৭১টি কবিতার সংকলন।

সংকলিত গ্রন্থ

কিশোর-সাহিত্য। প্রথম ভাগ। ইংবেজী বিদ্যালয়সমূহের তৃতীয শ্রেণীর জন্য রচিত। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা লেখিকা 'লীলাকমল', 'সীঁথিমৌব' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িত্রী শ্রী রাধারাণী দেবী-প্রণীত। (হাওড়া) লিলুয়া 'দেবালয়' হইতে গ্রন্থকর্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ। ঢাকা, আর. কে. বসাক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসুকুমারচন্দ্র দে সরকার-দ্বারা মুদ্রিত। ১৩৪১। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭৩। সচিত্র। ১৭ সেমি x ১২ সেমি। মূল্য : পাঁচ আনা।

'ভূমিকা অংশে আছে :

"কিশোর-সাহিত্য" প্রথম ভাগ ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের তৃতীয় শ্রেণীর নিমিত্ত প্রণীত হইল। বিষয়-নির্ব্বাচনে শিক্ষাবিভাগেব কারিকুলামের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

তৃতীয় শ্রেণীর বালকদের বয়সের অল্পতা বিবেচনা করিয়া, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান ও জীবজন্তুবিষয়ক রচনাগুলি কথোপকথনচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, যাহাতে এই সকল বিষয় ছাত্রদের কঠিন বা তিক্ত বোধ না হইয়া বরং চিত্তাকর্ষক হয়। রচনাগুলির মধ্য দিয়া বিবিধ প্রকারে চরিত্রগঠন-মূলক শিক্ষা যাহাতে সুকুমারমতি বালকবালিকাদের জীবন-গঠনে সহায়তা করে তাহারই চেষ্টা করিয়াছি।

গল্পগুলি সমস্তই সদ্ভাবমূলক ও নৈতিক শিক্ষাপ্রদ। উহাদের নূতনত্বের দিকেও দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

ছোট ছোট বালকবালিকাদের পাঠ্যপুস্তক যাহাতে তাহাদের ভীতিপ্রদ না হইয়া প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। কৌতুককর "রামসুক তেওয়ারী" ও "হাঁদারাম" গল্পটি সেইজন্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্পবয়স্কদের নিমিত্ত বইখানির ভাষাও যথাসম্ভব সরল ও সহজবোধ্য করিয়াছি।

কয়েকটি খ্যাতনামা কবির কবিতা এই বইখানিতে সঙ্কলিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি—

১লা ফাল্গুন
১৩৪০

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী

কিশোর সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ। ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য রচিত। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা লেখিকা 'লীলাকমল', 'সীঁথিমৌর' প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িত্রী শ্রীরাধারাণী দেবী-প্রণীত। (হাওড়া) লিলুয়া 'দেবালয়' হইতে গ্রন্থকর্ত্রী-কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রিন্টার শ্রীসুকুমারচন্দ্র দে-সরকার, আর, কে, বসাক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা, ১৩৪১। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৮৪। সচিত্র। ১৭ সেমি x ১২ সেমি। মূল্য : পাঁচ আনা।

'ভূমিকা অংশে আছে :

কিশোর-সাহিত্য, দ্বিতীয় ভাগ, ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের চতুর্থ শ্রেণীর নিমিত্ত প্রণীত হইল। বিষয় নির্ব্বাচনে শিক্ষাবিভাগের কারিকুলামের সাহায্য লওয়া হইয়াছে।

ছাত্রছাত্রীদের চিত্তাকর্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি কথোপকথনচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। গল্পগুলির দু-একটী পৌরাণিক, অধিকাংশই ঐতিহাসিক এবং সত্য ঘটনামূলক। "কোনও বস্তুই তুচ্ছ নয়" গল্পটি, বৌদ্ধজাতকের আখ্যানভাগের অনুসরণে রচিত। "শুদ্ধকথা" শীর্ষক কৌতুক-কবিতাটি এবং "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" শীর্ষক গল্পটি, ছেলেমেয়েদের আমোদপ্রদ হইবে, অথচ উহার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুও যথেষ্ট আছে। "বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধটির মধ্যে, ছেলেমেয়েরা যাহাতে, স্বদেশীয় শস্য, ফল, ফুল প্রভৃতির নাম শিখিতে পারে এবং জগদ্বিখ্যাত বাঙালীদের মোটামুটী নাম জানিয়া রাখিতে পারে, সেইটুকু চেষ্টা করিয়াছি।

চরিত্র গঠনমূলক গল্প, জীবনী ও কবিতা এবং সাধারণ জ্ঞানমূলক বিষয়সমূহের সমাবেশে বইখানি যাহাতে সুকুমারমতি বালকবালিকাদের জীবন গঠনে সহায়ক হইতে পারে, তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। পুস্তকখানি ছাত্রছাত্রীদের জীবনে সুফলপ্রদ এবং চিত্তবিনোদক হইলে, শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

উদ্ধৃত কবিতাগুলির জন্য, কবিদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪০।

বিনীতা
গ্রন্থকর্ত্রী

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত

১. *কাব্য-দীপালি*। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত। দ্বিতীয়

সংস্করণ। [১৩৩৮]। কলিকাতা। এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স। মূল্য ৪ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : চৌদ্দ + ৩৮৩। বোর্ড বাঁধাই। সচিত্র। ২৪.৫ সে.মি x ১৬ সে.মি।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে রাধারাণী দেবী, অপরাজিতা দেবী ও মৈত্রেয়ী দেবী পর্যন্ত মোট ৫৮ জন কবির মোট ১০৩ টি কবিতার সংকলন-গ্রন্থ। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে *কাব্য-দীপালি-র* প্রথম সংস্করণ সম্পাদনা করেছিলেন নরেন্দ্র দেব। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রাধারাণী দেবী লিখেছেন :

কাব্য-দীপালির প্রথম সংস্করণ বৎসর শেষ হবার আগেই নিঃশেষিত হ'য়েছিল, কিন্তু, সম্পাদকের সময়াভাববশতঃ তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে বহুদিন হাত দিতে পারেন নি। প্রথম সংস্করণে আমি যে সামান্য একটু সাহায্য ক'রেছিলাম তাঁকে, সেটা তাঁর কাজে লাগায় তিনি আমাকেই এবার তাঁর সহকারী সম্পাদক ক'রে নিয়ে অনেকদিন পরে দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিয়েছেন। সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণের ভালো-মন্দর জন্য আমি তাঁর সঙ্গে সমানভাবেই দায়ী।

আমরা এবার কাব্য-দীপালিতে যে সব গীত-কবিতা নির্ব্বাচিত ক'রে দিয়েছি তার অনেকগুলিই প্রেমাত্মক। দ্বিতীয় সংস্করণের কাব্য-দীপালিকে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠ গীত-কবিতার সঙ্কলন বলা যেতে পারে। প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ কবিতাই বর্জ্জন ক'রে সেস্থলে তৎতৎ কবির নূতন নূতন কবিতা সংযোজন করা হয়েছে, এবং যে সব কবির রচনা প্রথম সংস্করণে দিতে পারা যায়নি এবার তাঁদেরও অনেকের রচনা দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হ'য়েছে। বাংলার কাব্য-সাহিত্যের গত পঞ্চাশ বছরের পরিচয় এই সঙ্কলনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

প্রথম সংস্করণে যে সব দোষ ত্রুটি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকেরা আমাদের জানিয়েছিলেন, যতদূর সম্ভব আমরা সেই অনুসারে এবার বহু পরিবর্ত্তন করেছি। প্রথম সংস্করণের কবিদের মধ্যে একজন শক্তিশালী নূতন কবি দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর রচনা প্রকাশ করতে অনুমতি না দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁর রচনা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্য-দীপালির আকার অনেকখানি বেড়ে ওঠায়, এবার মূল্য কিছু বৃদ্ধি করতে হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের কাব্য-দীপালি যদি সকল দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও প্রথম সংস্করণের চেয়ে কাব্যরসিকদের মনোরঞ্জন ক'রতে পারে—তবেই আমার সার্থকতা।

দেবালয়, লিলুয়া
শ্রীরাধারাণী দেবী

১লা আষাঢ় ১৩৩৮

কাব্য-দীপালি, দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গপত্রটি এইরকম :

যাঁরা বাংলা ভাষার প্রথম-প্রভাতের কবি,
যাঁরা অসামান্য প্রতিভা-বলে

এ দেশে কাব্য-সাহিত্য
সৃষ্টি করেছেন
ও
তাঁকে সুসমৃদ্ধ ক'রে গেছেন,
বিগত যুগের সেই সকল বরেণ্য কবির
অমর স্মৃতির উদ্দেশে
এই
কাব্য-দীপালি
শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ ক'রে
ধন্য হলেম

সচিত্র এই কাব্য-সংকলনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রকুমার সেন, চারুচন্দ্র রায় প্রভৃতি এগারোজন প্রখ্যাত শিল্পীর আঁকা মোট ২০টি ছবি আছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় নরেন্দ্র দেব যথার্থই বলেছিলেন: 'এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ ক'রে বহু বিখ্যাত শিল্পীর মোহন তুলিকার যাদুস্পর্শও এই সংগ্রহের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে, সুতরাং এ বইখানিকে এদিক থেকে বোধ হয় চিত্র-দীপালিও বলা যেতে পারে!' *কাব্যদীপালি* ২য় সংস্করণের একটি সমালোচনা নিচে পুনর্মুদ্রিত হল।

_কাব্যদীপালি_—শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, হইতে এম-সি সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ টাকা।

গীতি কাব্যের ভিতর দিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতে নয়। তাই সকল দেশের সাহিত্যের মধ্যে এই প্রকৃতির কাব্য সংগ্রহের চেষ্টা দেখিতে পাই। ইংরেজীতে anthology-র অসদ্ভাব নাই। বাংলার পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থও এইরূপ গীতিকাব্যের ভাণ্ডার। আধুনিক কবিতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে এমন একখানি বাংলা কাব্যচয়নিকার একান্ত অভাব ছিল। 'কাব্যদীপালি'তে সেই প্রয়োজন মিটাইবার প্রথম চেষ্টা হইয়াছে। সম্পূর্ণ নূতন পথের পথিক হইয়া প্রকাশকও আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের পারিপাট্যে পুস্তকখানি নয়নমনোহর হইয়া উঠিয়াছে। বহু প্রখ্যাতনামা চিত্রকরের অঙ্কিত ছবি বইখানিকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম লেখকের রচনা পর্য্যন্ত এ সংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। এখানি 'কাব্যদীপালি'র দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি পূর্ণতর হইয়াছে। অনেকগুলি সুপাঠ্য নূতন কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং পুরাতন কবিদের কাব্যনির্ব্বাচনে সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োগ করা হইয়াছে। দেখিতেছি সম্পাদকদ্বয় গীতিকবিতা বলিতে বিশেষভাবে প্রীতিকবিতাই বুঝিয়াছেন। এক প্রধান অংশ হইলেও প্রেমের কবিতাতেই গীতিকাব্য সম্পূর্ণ নয়। এরূপ হইলে কোন সংগ্রহে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতাগুলির স্থান পাওয়া

ভার হইত। সঙ্গীতময় ছন্দে ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশই গীতিকাব্যের বিশেষত্ব। প্রেম জীবনের তীক্ষ্ণতম অনুভূতি হইলেও, মাত্র একতম অনুভূতি নয়। কাব্যসংগ্রহকারদের মধ্যে প্যালগ্রেভের নাম অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার রসানুভূতি 'গোল্ডেন ট্রেজারি'কে গীতিকাব্য সংগ্রহের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নির্ব্বাচন রসবৈচিত্র্যে অতুলনীয়। এই বৈচিত্র্যের অভাব কাব্যদীপালিতে লক্ষিত হইল। দু' একজন ভাল কবির লেখাও এবার বাদ পড়িয়াছে। এমন মুদ্রণপারিপাট্যের মধ্যে বর্ণাশুদ্ধি সত্যই বিসদৃশ লাগে। পরবর্ত্তী সংস্করণে আশা করি এ সকল ত্রুটি থাকিবে না। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ উদ্যম নূতন বলিয়া কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা থাকিয়া গেলেও এ সংস্করণের 'কাব্যদীপালি' সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে।

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৮

২. *সোনার কাঠি।* কিশোরপাঠ্য কবিতা, গল্প, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, জীবনী ও ইতিহাসের সংগ্রহ। কলকাতা, দেব সাহিত্য কুটীর। আশ্বিন ১৩৪৪। পৃষ্ঠাসংখ্যা : [।।০], ২৮৮। সচিত্র।

৩. *কথা-শিল্প।* রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত। কলকাতা, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রকাশ তারিখ নেই। মূল্য : সাড়ে তিন টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৩৬৮, ৬। সূচি : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'ইতিহাস', আশাপূর্ণা দেবী : 'বাজে খরচ', সুবোধ বসু : 'আজাদী', বনফুল : 'অর্জুন মণ্ডল', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বুড়ো হাজরা কথা কয়', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : 'দ্বিখণ্ড', বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : 'ফুলেশ্বরী', সরোজকুমার রায়চৌধুরী : 'অকাল বসন্ত', গজেন্দ্রকুমার মিত্র : 'প্রেরণা', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'চক্রান্ত', অন্নদাশঙ্কর রায় : 'রূপদর্শন', প্রবোধকুমার সান্যাল : 'প্রশ্ন', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'কামধেনু', বাণী রায় : 'ডাঃ দীপান্বিতা চৌধুরী'।
'কৈফিয়ৎ' অংশে সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন :
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানি একটি সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান। রসায়ন-বিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ যে রস নিয়ে কারবার করেন তা আর যাই হোক, সাহিত্যরস যে নয়, একথা অনস্বীকার্য। দেশবাসীর দেহের সৌন্দর্য্যবিধান ও স্বাস্থ্যরক্ষাই যাঁদের ব্রত আজ তাঁরা অকস্মাৎ দেশের রসপিপাসু নরনারীর অন্তরের ক্ষুধা মেটাবার জন্য এরূপ এক আয়োজন করেছেন কেন—এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে আসা স্বাভাবিক।

এই জন্য কৈফিয়ৎ স্বরূপ দু' একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। দেশের খ্যাতনামা কথা-শিল্পীদের কাছে তাঁদের রচনা প্রার্থনা করে যে আবেদন পত্র আমরা পাঠিয়েছিলাম এখানে তার একটি প্রতিলিপি দেওয়া হল :—

কলিকাতা, ১০ই চৈত্র, ১৩৫১

সুহৃদ্বরেষু,

কোনও একটি প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বন্ধুগণ বাংলা সাহিত্যের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাশীল। তাঁরা সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থায় একখানি গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই বইখানির জন্য বাংলার গল্পলেখকদের শ্রেষ্ঠতম গল্প সংগ্রহের ভার আমাদের উপরে দিয়েছেন। আপনাকে আমরা বাংলাসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীরূপে শ্রদ্ধা করি। আপনার প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় গল্পটির মধ্যে যাতে থাকে, তার ভার আপনারই উপর। এই গল্পটি আপনার রচনাবলীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গল্পরূপে ভবিষ্যতকালে যাতে গৃহীত হয়, তার জন্য আপনার যত্ন ও মনোযোগিতা প্রার্থনা করি।

আমরা জানি, উপযুক্ত দক্ষিণার ব্যবস্থা ব্যতীত উৎকৃষ্ট রচনা পাওয়া দুর্লভ। তাই প্রত্যেকটি গল্পের জন্য একশত টাকা মর্যাদা দেওয়া স্থির হয়েছে। গল্পটি যেন ডবল ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা বইয়ের এক ফর্মা অর্থাৎ ৪০০০ শব্দের কম না হয়। রচনাটি আগামী ২৫শে বৈশাখ ১৩৫২ রবীন্দ্র জন্মদিনের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে আমাদের কাছে পাঠাতে হবে। গল্পটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণার একশত টাকা আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। যদিই কোনও কারণবশতঃ গল্পগুলি প্রকাশ করা সম্ভব না হয়ে ওঠে তবে অবিলম্বে রচনাটি আপনি ফেরত পাবেন।

শুনে সুখী হবেন, এই গল্পগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করার মূলে উদ্যোক্তাদের কোনও লাভজনক ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। তাঁদের উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের উপর দীর্ঘকাল যে অবিচার হয়ে আসছে তার সামান্য প্রতিকার করা।

উপরোক্ত একশত টাকা দক্ষিণা ছাড়া, গল্পগুলির জন্য আরও হাজার টাকা সংরক্ষিত আছে। যে গল্পটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, লেখকের উৎসাহ বর্ধনার্থে সেই টাকা তাঁকে অতিরিক্ত যৌতুক দেওয়া হবে। রচনার জনপ্রিয়তা নির্ধারণের জন্য পাঠকদের মতামত গ্রহণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। গল্পগুলি প্রকাশের পর আটমাসের মধ্যেই ভোটের ফলাফল প্রকাশ কবা হবে। যদি দেখা যায় জনপ্রিয়তার তারতম্য হিসাবে পরস্পরের মধ্যে ভোটসংখ্যার অতি সামান্যমাত্র ব্যবধান, তবে, উক্ত হাজার টাকা সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত প্রথম তিনটি গল্পেব লেখকদের মধ্যে ৫০০, ৩০০ ও ২০০ হিসাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

আপনাদের রচনাটির উপর উদ্যোক্তাগণ একটি মাত্র সর্ত আরোপ করতে চান। রচনাটি আগামী ১৯৪৬ খৃঃ অব্দের ৩১শে অক্টোবব পর্যন্ত আর কোনও পুস্তক বা পত্রিকায় প্রকাশ করবেন না। আপনার গল্পের রসোত্তীর্ণতার গৌরবের কাছে এই আর্থিক মূল্য যেন তুচ্ছ হয়ে যায়, কামনা করি। ইতি—

এই আবেদনপত্র থেকেই বুঝতে পারা যাবে যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা মাত্র নীরস বৈজ্ঞানিক ও নিছক ব্যবসায়ী নন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি এঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা

ও দরদ আছে। এদেশের সাহিত্যিকগণ যে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার যোগ্য মূল্য পান না এবং আমাদের কথা-সাহিত্য যে সেই কারণেই অনেকটা পিছিয়ে পড়ছে এই রূঢ় সত্য তাঁদের মনকে বেশ একটু নাড়া দিয়েছিল।

তারই একটা উপায় বা পন্থা স্বরূপ প্রত্যেক গল্পের জন্য একশত টাকা প্রণামী অর্থাৎ তদানীন্তন প্রচলিত দক্ষিণার চতুর্গুণ বেশী দিয়ে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্পের জন্য অতিরিক্ত হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে এই কথাশিল্প গ্রন্থখানি প্রকাশের সংকল্প হয়। বলা বাহুল্য যে জনসাধারণের বিচারে বা তাদের ভালো লাগা-না লাগার উপর কথা-শিল্পীর যোগ্যতা ও প্রতিভার তারতম্য নির্ভর করে না। তবে একথাও একেবারে অস্বীকার করা চলে না যে পাঠক-সমাজের রুচি ও রসবোধকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও কোনো রচনার সার্থকতা লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা চাই সেই পাঠক সমাজেরও রুচি ও রসবোধ যাতে এই সঙ্গে কতকটা পরিচ্ছন্ন ও উন্নত হয়ে ওঠে। কথাশিল্পের এই গল্পগুলির দিকে পাঠক সাধারণের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এবং তাঁদের সমালোচনামূলক বিচার শক্তি উদ্বুদ্ধ করার অভিলাষেই প্রত্যেক রচনাটির সম্বন্ধে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত চেয়েছি। লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবিধার জন্য তাঁদের আলেখ্য, স্বাক্ষর ও স্বল্প জীবনীও রচনার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

১৩৫২ সাল থেকে ১৩৫৩ সাল অবধি বহুবার বহু তাগিদের পর যে কটি রচনা গতমাস পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারা গিয়েছে আবেদনের সর্তানুসারে রচনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে আসছে বলে সেইগুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হল। সুখের বিষয় এই যে আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে কথাশিল্পীদের রচনার দক্ষিণা আগের চেয়ে এখন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য এদিক দিয়ে কতকটা সার্থক হয়েছে বলা যায়।

লেখকগণের লিপিকুশলতার বিচার করে বা প্রবীণতার অনুপাতে অথবা নামের আদ্যক্ষর অনুসারে না সাজিয়ে, গল্পগুলি পরের পর যেমন পাওয়া গেছে ঠিক সেই ভাবেই পরের পর সাজিয়ে মুদ্রিত হল। পরিশিষ্টে বিজ্ঞাপনের অংশ যেটুকু রইল সেটা যে এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আশা করি, পাঠকেরা তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

পুস্তকের প্রচ্ছদপট, গল্পের শিরোনাম ও লেখকদের চিত্রগুলির জন্য আমরা শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেশ পাল মহাশয়ের নিকট ঋণী।

কলিকাতার বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির জন্য ‘কথাশিল্প’ প্রকাশে বহু বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় বইখানি প্রকাশে বিলম্ব হয়ে গেল এবং অপ্রত্যাশিত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাজ করার ফলে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতিও রয়ে গেল। একে কিছুতেই আশানুরূপ সুন্দর করে প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ দেশের অবস্থা বুঝে নিজ গুণে সকল ত্রুটি মার্জনা করবেন।

৭২/২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা, **রাধারাণী দেবী**
১৫ই আশ্বিন ১৩৫৩ **নরেন্দ্র দেব**

অপরাজিতা দেবী

কাব্য

১. *বুকের বীণা*। কবিতাসংগ্রহ। ১৩৩৭। পৃষ্ঠাসংখ্যা [।।০], ৫৬। ১৩৩৭। মোট তেরোটি কবিতার সংগ্রহ। সূচি : জন্মদিন, কলেজ বোর্ডিং, দিনের সুরু, নিশীথ কলহ, বাদল-বিলাস, সন্ধির সূত্র, সখী-সঙ্গমে, বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি, আঁধারে আলো, দম্পতির দ্বন্দ্ব, মধ্যস্থ, শেষ রাত্রি, কৈফিয়ৎ।

বুকের বীণা কাব্যগ্রন্থের চারটি সমালোচনা পুনর্মুদ্রিত হল। প্রথম সমালোচনাটি শ্রীঅন্নদাশংকর রায়-কৃত, প্রকাশিত হয়েছিল *বিচিত্রা* পত্রিকায়। *ভারতবর্ষ* ও *প্রবাসী* পত্রিকাদ্বয়ের সমালোচনা দুটি অস্বাক্ষরিত, *শতদল* পত্রিকায় দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র দাশ, প্রতিটিই ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

"বুকের বীণা" *

অপরাজিতা দেবীর লিখনভঙ্গী লঘু তরল প্রয়াস-বর্জ্জিত ও বেগবান। এঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে গুরুত্ব কিম্বা গাম্ভীর্য্য না থাকায় ইনি আমাদেব মহিলা কবিদের সনাতন রীতি যে গজেন্দ্রগামিনীত্ব তার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। এই দুই নূতনত্বের দরুণ ইনি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক সমাজে আলোড়ন এনেছেন। বাংলার নারীরচিত কাব্যসাহিত্যে এই পুস্তিকাখানি যুগ পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিন্তু এ খানিতে কবিতা আছে দুটি কি একটি। যেমন, "শেষ রাত্রি" ও "কৈফিয়ৎ"। বাকীগুলিতে কবিতার পাঁপড়ি ইতস্তত ছড়ানো থাকলেও সেগুলিকে আমরা মডার্ণ মেয়েলি ছড়া ছাড়া অন্য কিছু বল্‌তে পারিনে। কিন্তু ক'জন লেখিকা এঁর মতো মডার্ণ, এঁর মতো মেয়েলি, এঁর মতো নিখুঁৎ তাল ও মিল দিতে সমর্থ? 'দম্পতীর দ্বন্দ্ব', 'সন্ধির সূত্র', 'বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি'—প্রত্যেকটিই পাকা রচনা, পরম সুখপাঠ্য। এ গুলিতে একটি স্বাস্থ্যবান মনের রসিকতাপূর্ণ রংমশালের আলো সাংসারিক খুঁটিনাটির উপর ঠিক্‌রে প'ড়ে বাঙালীর গৃহজীবনকে রঙিন ক'রেছে। রুচিবাতিকগ্রস্তেরা এগুলির স্থলে স্থলে অ-মার্জ্জনার গন্ধ পাবেন। আমরা বলি, মার্জ্জিত হলে সেই জিনিষই ঝক্‌মকে হয় স্বভাবত যা মলিন। 'দিনের শেষে'র একটি কথাও শুধরে দেওয়া যায় না। দিলে তার যাদুটুকু অন্তর্হিত হয়। অপরাজিত দাম্পত্য তুচ্ছতার যাদুকর।

আশা করা যাক্ ভবিষ্যতে এঁর রচনায় কবিত্ব আস্‌বে, এবং ইনি তুচ্ছতার থেকে উচ্চে উত্তীর্ণ হয়েও এমনি সুরসিকা থাকবেন।

বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৩৮ — শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

* ছাপা ও বাঁধাই নববধূর মতো অলঙ্কারবহুলা। সুতরাং নববধূ সাধাবণের উপহারের যোগ্য।

বুকের বীণা—শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী প্রণীত এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বইখানি সুদৃশ্য। চমৎকার কাগজে পরিষ্কার ছাপা, মার্জ্জিনে ছবি। বাঁধাই ভাল। বহিরাবয়বের মত ভিতরের কবিতাগুলিও সুন্দর। বইখানি বড় ভাল লাগিল। কবিতাগুলি সরস এবং মোটেই গতানুগতিক নয়। কবির সাহস এবং কাব্যনৈপুণ্য দুই-ই আছে। কয়েকটি কবিতার মধ্যে দু-একটি চরিত্রচিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 'কলেজ বোর্ডিং' নামক কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মীরা প্রেমে পড়িয়াছে। সে বোর্ডিঙে থাকে। বাড়ি হইতে হঠাৎ খবর আসিল তাহার বিয়ে। সখী বুঝাইতেছে, 'কলেজ রোমান্স শুধু কাব্যেই চলে, বাস্তব জগতে নয়'—

"কবি মুকুলের কোন কথা আর থাক্‌বে না মনে তোর
ফুলশয়নেই নয়নে মিলাবে কুমারী স্বপন ঘোর।
প্রেমে পাগলিনী হয় কি সবাই! মীরা নয় মীরাবাঈ।"

প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৮

বুকের বীণা।—কবিতার বই। রচয়িত্রী শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী, ৬৪ পৃঃ, মূল্য ১।০ টাকা। শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নবাগতা। কিন্তু স্বীয় অসামান্য প্রতিভা ও রচনা-বৈশিষ্ট্যের গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই কবি-খ্যাতি অর্জ্জন ক'রতে পেরেছেন। নিতান্ত ঘরোওয়া কথা নিয়ে ইনি যে অপূর্ব্ব রস-রচনা করেছেন তা যথার্থই অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। তাই, মনে হয় ইনি একজন জন্ম-কবি, জাত কবি, নইলে ভাষা ভাব ছন্দ ও ব্যঞ্জনার উপর এতখানি দখল সচরাচর নূতন লেখকদের, বিশেষ করে আবার মহিলাকবিদের মধ্যে দেখা যায় না। দু'টি নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের নানা খুঁটিনাটি ঘটনা, যার মধ্যে সাধারণতঃ আমরা কোনোরকম কাব্যেরই সন্ধান পাই না, শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও বিশিষ্ট রসানুভূতি তারই ভিতর হ'তে যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত আহরণ ক'রে আমাদের পরিবেশন ক'রেছেন, তা' শুধু মধুর ও উপভোগ্য নয়, বিস্ময়করও বটে! কারণ তিনি মানব-জীবনের এমন একটা দিকের মোহন ছবি এঁকেছেন যা কোনো মহিলা এ পর্য্যন্ত ছুঁতে সাহস করেননি। এঁর প্রত্যেক কবিতাটি পড়লে রসহীনেরও মন রসাবিষ্ট না হয়ে পারে না। আমরা এই ছন্দ-শক্তিশালিনী ও সাহসিকা নবাগতাকে সাহিত্যক্ষেত্রে সাদরে বরণ করে নেবার সুযোগ পেয়ে ধন্য বোধ করছি। 'বুকের বীণা'র কাব্য-সৌন্দর্য্যের ভিতর রচনার যে অভিনবত্ব রয়েছে বইখানির বহিঃসৌন্দর্য্যের ভিতরও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ততোধিক নূতনত্বের সমাবেশ ক'রেছেন। মূল্যবান আর্টপেপারে রঙীন কালিতে দু'রঙে ছাপা প্রত্যেক পৃষ্ঠাই শোভন চিত্রালঙ্কৃত। রজতশুভ্র সমুজ্জ্বল প্রচ্ছদপটের উপর পাষাণের বুকে বীণা ঝরণার সুরে বেজে

চলেছে, শিল্পীর এই পরিকল্পনা ভাবুকের মনকে নাড়া দেয়। বইখানির ছাপা বাঁধাই এমন সুন্দর, সুরুচিপূর্ণ ও পরিপাটি হ'য়েছে যে প্রিয়জনের হাতে নিয়ে গিয়ে তুলে দেবার জন্য স্বতঃই মনের মধ্যে একটা আগ্রহ জাগে।

ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৩৮

'বুকের বীণা'

অতি-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আসরে যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন, তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অধিক হলেও নারীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়। অতি-আধুনিক সাহিত্য বল্‌তে আমরা রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যকেই বুঝবো। এ যুগের অধিকাংশ সাহিত্যই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও ভাবে অনুপ্রাণিত এবং ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণে পরিপুষ্ট। কিন্তু এ অনুকরণের ভিতর দিয়েই বাংলা সাহিত্য তার গণ্ডীর পরিসর অনেকখানি বিস্তৃত করে তুলেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা সীমার আবেষ্টনে অসীমের ইন্দ্রিয়াতীত স্তুতি শুনেছি ; কিন্তু এরূপ অপার্থিব সৌন্দর্য্য-স্তুতি তাঁর পরবর্তী যুগের সাহিত্যে নেই। তাঁর সাধনা উচ্চতর আদর্শ-বাদের প্রভাবে রূপ লাভ করেছে ; কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে সৌন্দর্য্যকে ততখানি Abstract কল্পনা করে সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়নি। যুগ ও জীবনের ঐক্য স্থাপন করতে গিয়ে এ যুগের সাহিত্যিকগণ নেহাৎ তুচ্ছ ঘরোয়া ছোট ছোট হাসিকান্না, মানুষের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ প্রভৃতিকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করে তুলেছেন ; জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ কামনা এবং জীবনের যে দিকটা কুৎসিত ও নগণ্য বলে এতদিন মনে করা হতো, তাকেও এ যুগের সাহিত্যিকেরা সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সহায় বলে ধরে নিয়েছেন। এতে করেই তাঁদের সাহিত্যে একটা নতুন বাস্তবতার (Realism-এর) সুর আরম্ভ হয়েছে। জীবনের পরিপূর্ণ উপভোগের ইচ্ছার পথে যে বাধাবিঘ্ন, তাকে সমূলে ধ্বংস করে আপনার ভিতর প্রাণের অপর্য্যাপ্ততা অনুভব করার বাণী শুনিয়েছেন এ যুগে 'কালাপাহাড়ের' কবি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার। পরবর্ত্তীকালে এ পিপাসাই বিভিন্ন আকারে 'মরুশিখা'র কবি যতীন্দ্রনাথ, নজরুল, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার প্রভৃতির কাব্যের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই নতুন জয়যাত্রার সঙ্গিনী হয়ে কয়েকজন স্ত্রী-কবিও তাঁদের দানে সাহিত্যকে শোভিত করেছেন।

আমাদের দেশের স্ত্রী-কবিদের ভিতর ইতিপূর্ব্বে তেমন প্রাণখোলা লেখা আর হয়নি। এর একমাত্র কারণ হয়তো, নারী (অবশ্য সকলেই তো আর 'কমল' নয়!) সমাজের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তত সহজে দাঁড়াতে পারে না, যত সহজে পুরুষ পারে। এতদ্ব্যতীত তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি একান্ত অন্তর্মুখীন হওয়ায়, বাইরেব আবহাওয়ার সাথে সমান তালে পা ফেলে চল্‌তে এঁরা ভয় পান। কিন্তু বর্ত্তমানে নারী-প্রগতি যে শক্তি লাভ করেছে, তাতে কেবল তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিসরই বাড়েনি ; অপিচ,

তাঁদের চিন্তা-ধারায়ও অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এসেছে। এতদিন তাঁদের এটুকু হয়নি বলেই গীতিকাব্যে কোন স্ত্রী-কবি তেমন নাম করতে পারেননি। আবেগের অকুতোভয়তা না থাকলে গীতিকাব্যের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। অতি আধুনিক সাহিত্যে স্ত্রী-কবিদের ভিতর প্রথমেই নাম করতে হয় রাধারাণী দেবীর। তাঁর 'লীলাকমল' বাংলা-সাহিত্যে, ইংরেজী সাহিত্যের *Jane Eyre*-এর কাজ করেছে। তিনিই প্রথম নারীর অন্তর্নিহিত সযত্ন-পোষিত প্রেম-কাহিনীকে ভাষা দিয়েছেন—সমাজের নিষেধকে উপেক্ষা করে। এত বড়ো সত্যকে গলা টিপে মেরে তিনি আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করেননি। তাঁর কিছুদিন পরেই স্বল্প-লেখিকা দুঃসাহসিকা অপরাজিতা দেবী বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের অবতারণা করলেন।

বেশীদিন হয়নি তাঁর "বুকের বীণা" প্রকাশিত হয়েছে—কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তিনি নিজের আসন করে নিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের আসরে।

তাঁর লেখার মস্তবড়ো সুর হয়েছে Realism-এর। বাস্তবতা এতখানি সংযম ও সুষ্ঠুতার সহিত অতি-আধুনিক খুব কম কবির ভিতরই দেখা যায়। 'বুকের বীণা'র কবিতাগুলির রামধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যেব ভিতর দিয়ে কেবল একটী কথাই প্রকাশ করা হয়েছে যে—

> মূঢ় সমাজের বিধি নিষেধের বিপুল শাসন মিছে,
> মানুষের প্রেম নিকষিত হেম—সে নহে কাহারো নীচে!
> —শুনহ মানুষ ভাই—
> সবাব উপবে মানুষ সত্য তাহাব উপরে নাই।

প্রেমকে যারা পৃথিবীর খেলাধূলার পরশ থেকে বঞ্চিত করে—স্বর্গীয় করে তোলেন, অপরাজিতা তাঁদের একজন নন। এ হিসাবে তাঁর সঙ্গে অনেকটা মিল আছে "প্রেমিকপ্রবর" Rupert Booke-এর সাথে। পৃথিবীর মাটীর মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ও মানুষের ছোটখাটো ঘরকন্নার সুখদুঃখের বিচিত্র কাহিনীর সঙ্গে। বিগত জীবনের স্মৃতির পাপড়িগুলি একটী একটী করে বিকশিত করে তিনি সেখানে পেয়েছেন জীবনের মধুর প্রেমের স্বাদ। জীবনের ব্যর্থতা, অভিমান, বিফলতা, বেদনা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে রূপ পেয়েছে তাঁর নারীসুলভ ভাব। কবিতাগুলি এজন্য এত realistic ; কিন্তু এতে Art for Art's Sake-পন্থীদের কলুষিত ও ক্লেদাক্ত বাস্তবতার গন্ধ নেই। অপিচ, প্রায় সবগুলি কবিতায়ই একটা 'feminine stamp'—মেয়েলি ভাবের ছাপ বর্ত্তমান। বিশেষতঃ তাঁর বলার ভিতর এতখানি স্বতঃস্ফূর্ত্তি, অকপটতা, ও আবেগ-গভীরতা আছে যে, এতে তাঁর কবিতা অভিনব গীতিকাব্যোচিত রসে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে—কোথাও বর্ষার কাজল-কালো মেঘের ব্যথাঘন মন্থরতায় তা আকুল হয়ে উঠেছে, আবার কোথাও নদী-জলে-পড়া-আলোর মতন পুলক-চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঠিক এই ধরণের কবিতা রবীন্দ্রনাথেও নেই। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটী কথোপকথন কবিতা (dialogue poems) লিখেছেন সত্য, কিন্তু সেখানেও তাঁর ভাব ও ভাষা গুরু-গম্ভীর।

অপরাজিতার কবিতার ভাষা সহজ সরল কথাবার্ত্তার ভাষা; ভাষার এ শেষোক্ত গুণেই তাঁর কবিতা Turneresque হয়ে উঠেছে। (তাঁর 'মধ্যস্থ' কবিতাটী এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ)। তাঁর কবিতার আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, তারা হাল্‌কা কথার ভিতর দিয়ে অতি সুগভীর সত্য শুনিয়ে দেয়—সে সত্যের অপ্রিয়তা পীড়া দেয় না—'It is rather a genial shock of welcome.' তাছাড়া তাঁর কবিতায় অতি সুনিপুণ ও অকপট মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ রয়েছে।

'জন্মদিনে' কবিতায নায়িকা সাতপাঁচ ভেবে এত করে খেটে ঘর সাজিয়েছে। অনেক দেখেশুনে 'সমীর সেনের' পছন্দসই সেই নীলসাগরের ঢেউয়ের মতন ঘননীল শাড়িখানি পরে তারই প্রতীক্ষা কবছে—হৃদয় তার দুরুদুরু করে উঠছে—কি জানি যার জন্য এত আয়োজন সেই যদি না আসে! আসবার আগেই এ সব ভেবে সে আকুল হয়ে পড়েছে—সাতপাঁচ ভেবে অকপটে বলে ফেলছে—

—সে এসে দাঁড়ালে কাছে?
তত কবে ভয—যত আনন্দ ঢেউ তুলে বুকে নাচে!
গান যদি বলে শোনাতে সে নিজে! কেটে যাবে না ত তাল?
কিছুতে গেল না সঙ্কোচটুকু! ছি, ছি, একি জঞ্জাল?

প্রেমাস্পদের আগমনের প্রতীক্ষা-পীড়নের পূর্ব্বক্ষণে ভয়ার্ত্ত ও আনন্দ-হিল্লোলিত নারীহৃদয়ের অপূর্ব্ব আলেখ্য এ কয়টী লাইন।

"কলেজ বোর্ডিং" কবিতাটী বোর্ডিং-নিবাসিনী ছাত্রী-জীবনের হুবহু ছবি। মেয়েরা এখানে কাউকে ভয় করে না—এমন কি 'নেকড়ে-বাঘের' মতো মিস পাকড়াশীকেও তারা কেয়ারই করে না—"They are monarchs of all." মেয়েদের এক একজনের পরিচয়-রীতি অতি সুন্দর। চালিয়াৎ 'ডলী' যেন 'বিদ্যের বুক-শেল্‌ফ', দিনরাত শুধু 'স্টাইল' নিয়েই আছে, 'চামেলী' বরং ওর চেয়ে ভালো—'লাভ্‌লী মেয়ে'—কিন্তু পড়তে পড়তে একেবারে 'ড্রাই' হয়ে গেছে—জীবনে পড়াশুনায় খুব ভাল করেনি হয়তো, তবুও সে পড়ছে, আর—

* * * দিবানিশি যেন গোপে—
ইংল্যাণ্ড থেকে এন কে বাসুর ফির্‌তে ক'মাস আর?
প্রাণপণে পড়ে, এসে দেখে যাতে খুসী হয় স্বামী তার।

—তাছাড়া 'মীরা' 'রেণু' প্রভৃতি কয়েকটী রোমাণ্টিক মেয়ের চিত্রও সুন্দর হয়েছে। কার মন-ক্যামেরায় কোন ছেলের মুখ আঁকা পড়েছে, কোন ছেলেটীর চেহারা কেমন, ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে একটী ছেলে সম্বন্ধে একটী মেয়ে বলছে—

ভেরি হ্যাণ্ডসাম্ হেলদি-চেহারা—ফাইন ফিজিক্—টল,
'থরো এথিলেট!' জুড়ি নেই তার! কোথা লাগে 'নির্ম্মল'।
বাপ্ বড়লোক, প্রকাণ্ড বাড়ী, মোট্যর দু' তিনখানা।
বি-এস্‌সি দিয়ে বিলেত যাবেই—বিয়ে কোরে—এ তো জানা!

এই আলোচনার ভিতর নারীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতির ক্ষমতার পরিচয় আছে —অপিচ কতগুলি ইংরেজী শব্দ এত সহজে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তারা বিজাতীয় ভাষার বলে মোটেই মনে হয় না। এ ছাড়া অন্যান্য কবিতায়ও ইংরেজী শব্দের প্রচুর ব্যবহার করে কবি বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন।

'দিনের সুরু' কবিতাটী স্বামী-স্ত্রীর সোহাগ-লীলার জীবন্ত ছবি। সময়ে অসময়ে স্বামীর আদর-সোহাগের দাবী মিটাতে গিয়ে স্ত্রীকে অনেক সময় লজ্জায় পড়তে হয়, কিন্তু—

যত নষ্টের গোড়া বউটাই
বোল্‌বে এখন যে কেউ এলে

—অভিমানাহত স্ত্রী স্বামীকে এ বললেও স্বামী-সোহাগকে সে অবমাননা করেনি।

'নিশীথ কলহে'র বিভিন্ন কণ্ঠ-বিলাসের সঙ্গে যে নারী-চিত্রের ছবি পাওয়া যায় তা "variable as the shade by the light quivering aspen made." কিন্তু স্বামীর আগমনে তা আবার স্নিগ্ধ হয়েছে—যাকে এতক্ষণ পীড়া দিয়েছে তাকে শেষে মুগ্ধ কণ্ঠে আহ্বান করছে—

অভিমানে দ্বার রুধেছিনু। —দূর! ঘুমাবো কেন?
দুষ্টু! ...কিছুই বোঝে না যেন!।
ওগো করো মাপ্। —অবুঝের মতো বলেছি যা' তা'—
অভিমানে জ্ঞান হারাইয়ে ঠিক ছিল না মাথা।
জানি, জানি, জানি, বলিতে হবে না, পরাণতম!
তোমারি প্রেমেতে মুখরা যে-জন, তাহারে ক্ষম!

স্বামী-সোহাগ লাভের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বন্দ্বরেখায় দাঁড়িয়ে 'দিনের সুরু'তেও স্ত্রী বলছে—

স্পর্দ্ধা তোমার বেড়েছে বড়ো!
ও বোগের আমি ওষুধ জানি!
*　　*　　*
দাও ছেড়ে দাও! দোব খোল, যাই!
আট্‌কে রেখো না কাজের বেলা;
বোস্‌বো না আমি তোমার চেয়ারে,
তবু কি যে করো!—কেবলি খেলা!

প্রেমের এ নতুন ভঙ্গী দেখে রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে হয়—

'ভালবাসা আপনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতায় কেবল সত্যকে নহে, অলীককে, সঙ্গতকে নহে, অসঙ্গতকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সুন্দরকে সুন্দর বলিয়া যেন আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না; ভালবাসার ধনকে ভালবাসি বলিলে যেন ভাষায় কুলায় না; সেই জন্য সত্যকে সত্যকথা দ্বারা প্রকাশ করা সম্বন্ধে একেবারে হাল ছাড়িয়া

দিয়া ঠিক তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়; তখন বেদনার অশ্রুকে হাস্যচ্ছটায়, গভীর কথাকে কৌতুক এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। এইসকল কথার যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময় উহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।'

'বাদলবিলাস' কবিতাটীতে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার দিনে' কবিতার ছায়াপাত হয়েছে। বর্ষার সজলস্নিগ্ধ দিনটীতে মেঘছায়া-আঁকা শাড়ীটি পরে সিনেমায় যাওয়া ঠিক হয়েছিলো—কিন্তু সহসা তেতালার ছাদে যুঁই ফুল ফুটেছে দেখে, তাদের আর যাওয়া হলো না। সৌন্দর্য্যের কত বড়ো শক্তি, তাই এ কবিতায় অপরাজিতা দেখিয়েছেন —সত্যি, "Beauty draws us by a single hair." কাজেই, আজ মেঘলা দিনে জগতের চিরন্তন বিরহের সুরে ঐকান্তিকতা অনুভব করার জন্য নায়িকা বলছেন—

ফ্যানের বাতাস, 'প্রীচোরিয়া', 'পাম্'
সাজানো আবাস নয়নাভিরাম।
আজ থাক! ওগো চলো চ'লে যাই, আমাদের সেই পল্লীবাসে,
নীলগগনের চরণ যেখানে ছুঁয়েছে মাঠের শ্যামল ঘাসে!
এসো বাতায়নে বসি পাশাপাশি,
আজ দু'জনার মন যা'ক্ ভাসি
মানসের তীরে বলাকার মতো। 'মেঘদূত' পড়ে শুনাও তুমি।
যক্ষের ব্যথা বক্ষে বাজুক্। হোক গৃহ মোর অলকাভূমি।

'সখীসঙ্গম' কবিতাটী সোহাগ-বঞ্চিতা প্রেমিকার ক্ষুব্ধ নিবেদন। শ্রাবণ মেঘের মৃদঙ্গ যেদিন সবার প্রাণে মিলনের রাগিণী জাগিয়ে তুলেছে, নদীর ওপার দিয়ে যখন মেঘের তলে ঝালর বুনে হাঁসের দল চলছে, তখনো কিনা তার প্রেমিক 'নীটচে' ও 'এমার্সনে' মত্ত। অথচ, এ লোকটিই একদিন তাকে কত করে ভালবেসেছিলো; আজ তার এমনি ধারা দেখে প্রেমিকা বলছে—

পুরুষ জাতের স্বভাব জানিস্?—হঠাৎ প্রেমোচ্ছ্বাসে
দু'কূল-ভাঙা জোয়ার তুলে ব্যাকুল বেগে আসে।
* * *
বুঝলি পারুল? —আর যা করিস বিয়ের ফাঁসি প'রে
প্রেমের দফা রফা এমন কবিসনে আর; —ওরে,
ভালই যদি বাসিস্ কারে, পেলেও প্রতিদান—
আমার মতন দিস্নে ধরা। তবেই রবে মান।—

অভিমানাহত নারীর এ ক্ষুব্ধ নিবেদনে আত্মজীবনের অতৃপ্তির কাহিনী অতি মর্ম্মন্তুদ হয়ে ফুটেছে।

'বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি' দুটী মেয়ে-জীবনের বৈপরীত্যের নিখুঁত চিত্র। কবি রাণুর জীবনে এখন—

—এসেছে গগনে ছড়ায়ে চুল,
রূপসী বরষা, চরণে জড়ায়ে বিকশিত বনফুল।

কিন্তু অপরাজিতার জীবনে কোনো রোমান্স নেই,—তাঁর 'অমুক বাবু'র দাঁতের গোড়ায় ব্যথা ; ছেলেপিলেগুলি রোগে ভুগে কাবু হয়ে গেছে—সর্দ্দি কাশি তো লেগেই আছে ; 'কলতলা' শ্যাওলায় পিছল হয়েছে ; ভিজে ঘুঁটে দিয়ে তাঁকে পাক করতে হয় ; স্নান করে এসে তাঁর চুল শুকোয় না, তাই নিজের গলাব্যথা হয়েছে ; 'নুনের কেঠোটা রসে হয়ে গেছে লবণ-হ্রদের তরী' ; 'কোলের ছোট্ট ছেলেটার কাঁথা শুকোয় না দিনে রাতে।' এমনতর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে গৃহস্থবধূ কবিবধূকে লিখছে—

বিকচ কদম, ঘন কেয়াবন, কোন্‌দিকে জানি না তা।
আজ আসি তবে, —চিঠি দিও। ইতি
তোমার অপরাজিতা।

কর্ম্মবহুল বাস্তবজীবনের চিত্রের সঙ্গে কবিজীবনের ভাববিলাসময় জীবনের কী অদ্ভুত বিভেদ!

'আঁধারে আলো' কবিতায় আব্দারের মাত্রা অতিমাত্রায় বাস্তব। বহুদিন ধরে বলে বলে স্ত্রী হয়রান হয়ে গেছে—জিনিষ তো আর তেমন কিছু না—'দেড় গজ কারপেট' ও 'দু পেকেট উল্'—এ আর আনা হয়ে উঠে না—কাজেই স্ত্রী অভিমান করে 'গোপালনগর' (বাপের বাড়ী) চলে যাওয়াই প্রশস্ত মনে করেছে। এমন সময় তো তার ফরমাস্ রুজু হয়েছে। তখন, এক নিমিষের মধ্যে তার রাগ কোথায় চলে গেলো—কত যেন সোহাগের সুরে সে বলতে লাগলো—

তাই আজ দেরী হোলো ফির্‌তে তোমার?
সত্যি? —এনেছো? ...বলো, গা ছুঁয়ে আমার।
কী মিথ্যা কথা তুমি কইতে যে পারো!
দেখি-দেখি, —দাও—বাঃ—উঃ—ছাড়ো—ছাড়ো—

গৃহিণীর এ চিত্রে স্কটের কথাই মনে পড়ে—

Oh, woman! ın our hours of case
Uncertain, coy and hard to please.

'দম্পতি-দ্বন্দ্বে'র স্ত্রীর পত্রে রুগ্ণ প্রণয়-বিবাহের বিষময় ফল প্রকাশ করছে। বিবাহের ফলে সে জনক-জননীর স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়েছে ; ভগিনী ও বন্ধু-প্রীতি অনেকদিন তার কাছে স্তব্ধ হয়ে গেছে ; কিন্তু লাঞ্ছনাগঞ্জনাময় দুর্ব্বিষহ জীবনের সর্ব্বরিক্ততার ভিতর সে যে পরম কৌস্তুভ-রতন পেয়েছে, তাকেই লক্ষ্য করে বলছে—

ভালবাসা বোন্! দুঃখ-দহন-শিখা—
তবু সে নারীর জীবনের জয়টীকা।

'মধ্যস্থ' কবিতায় সাত মাসের খোকনটীকে সাক্ষী করে, স্বামীর ব্যবহারের প্রতিবাদ

অতি সুচিত্রিত। বলার ভঙ্গীর সহজতা ও স্বাভাবিকতা একে আরো সুন্দর করেছে। খোকনের আধ-আধ কথার সুরে কত সুন্দর মানিয়েছে এই কথা কয়টা—

—তুমি হেথায় কেন? —যাও না তোমাব কাজে,
করছো মিছে ভেনর ভেনর্! ব'কছো শুধু বাজে!
ঢের শুনেছি ওসব কথা—নতুন কিছু নয়—
এখন তুমি এ ঘর থেকে নড়লে ভালো হয়।
বড্ড গরম! মাথায় কাপড় খুলবে এবার মা—
কেমন-তবো ভদ্র তুমি? ...বাইবে সবো না!!

'শেষরাত্রি' কবিতাটী বিদায়ের বিষণ্নসুরে বিধুর অথচ ওর অনুভূতির তীক্ষ্ণতা আনন্দজনক। নায়িকার প্রেমাস্পদ কালই অনেক যোজন দূরে চলে যাবেন—তাঁর কাছে তার একমাত্র অনুরোধ—

*   *   * আমায ভুলে তো যাবে না শেষে?
মনু'কে তোমাব হাবিয়ো না যেন বিদেশিনীদেব দেশে।
শত রূপসীর আঁখির অতলে কালো মনুয়ার স্মৃতি
দেখো যেন ডুবে না যায়। জগতে ঘটেও এমন নিতি!

কিন্তু এ বলেও তার শান্তি নেই; যার জন্য সে কলঙ্ককে চন্দন মনে করে গ্রহণ করেছে, লোকলজ্জায় ভীত না হয়ে যাকে সে ভালবেসেছে, কী করে সে তাকে ছেড়ে থাকবে? —আজ রাত্রেই মরণের স্পর্শে তাদের মিলন-রাখী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হোক, এই তার কামনা; কাজেই সে বলছে—

ওগো এ সময় মরণ আসে তো তার বাড়া সুখ নেই,
তোমার বুকেতে লীন হয়ে থাকা আমাব স্বর্গ এই!
*   *   *
সব ছাড়া যায় তোমারি জন্য, তোমারেই ছাড়া দায়—
আমার ভুবন শুধু তোমাময়, ছেয়ে প্রাণ-মন-কায়।

এ কবিতার বিচ্ছেদব্যথার সকরুণতা আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে 'কৈফিয়ৎ' কবিতায়। সেখানে রুণু তার ব্যথাহত জীবনের অধ্যায় প্রকাশ করছে। নীরুদির কাছে চিঠিতে আজ তার সবই জানানো হয়েছে—যে তার 'আত্মার আত্মীয়', যিনি তাকে সারা-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিভব দান করলেন, তাকে লাভ করে সে দাগী হয়েছে সত্য, কিন্তু তার এ দাগ চন্দনের ফোঁটার ন্যায় পবিত্র ও আরাধ্যতম; কারণ—

পিতামাতা-স্বজন-বন্ধু-ভাই-বোন—সবই তিনি।

প্রেমাস্পদকে এত বড়ো স্থান দিতে গিয়ে অপরাজিতা এখানে Shelleyan হয়ে উঠেছেন। Shelleyও তাঁর 'Soul of the Soul', 'adored Nightingale' Emily-কে লক্ষ্য করে বলছেন—

Would we two had been twins of the same mother!
*   *   *

Spouse! Sister! Angel! Pilot of the fate
Whose course has been so starless!

মহাকবি বাল্মীকিও দশরথকে দিয়ে কৌশল্যার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়েছেন—

যদা যদাচ কৌশল্যা দাসীবচ্ চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ ভগিনীবচ্ চ মাতৃবচ্ চোপতিষ্ঠতে।।

—কৌশল্যা স্বামীর নিকট একাধারে রমণীর সকল ভাবের সকল সম্পর্কের প্রতিমূর্ত্তি —দাসী, সখী, ভার্য্যা, ভগিনী এবং মাতা।

রুণুর নবজন্মের ভূমিকার নতুন অভ্যুদয়ের দিনে তাকেই লক্ষ্য করে আবার বলছে—

আমি যার, ওগো জন্মে জন্মে, তারই কাছে গেছি ফিরে—
নীরুদি। সবারে একথা ব'লো গো—আমার মাথার কিরে!—

—সমাজের বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে এতখানি তীব্র প্রতিবাদ, প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিবেদনের অন্তরায়ের বিরুদ্ধে এতখানি অভিযান, কোনো নারী-কবি এ পর্য্যন্ত করেননি। রাধারাণীর ভিতর মানুষের প্রেমের জন্য বিরহ-গাথা অস্ফুট সুরেই শুনেছি ; কিন্তু অপরাজিতা সত্যি এখানে অপরাজেয়া!

তাঁর 'বুকের বীণা'র বঞ্চিত ব্যথার গানের 'full throated ease'-এ যে আকৃতি, তাতে অধিকাংশ আধুনিক লেখকের sensuous strain আছে সত্য, কিন্তু তার বিকৃতি নেই ; প্রকাশের ভঙ্গিমা সংযমের বাঁধনে সুন্দর হয়ে উঠেছে। এ ধরনের *Vers de Société* কবিতা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম—ইংরেজী সাহিত্যে অবশ্য Austin Dobson, Gay প্রভৃতির লেখা কবিতায় এ ধরণ যথেষ্ট আছে। বাংলা সাহিত্যের নবযুগের প্রভাতে তাঁর এ দান কম নয়—সাহিত্য-সরস্বতীর শ্রীচরণে যাঁরা যতো নির্ম্মাল্য দান করেছেন, তন্মধ্যে অপরাজিতার এ অশ্রু-সজল পুষ্পগুচ্ছ অতীব মনোরম। তাঁর প্রতিভার নতুন সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের আরো গৌরব বৃদ্ধি করুক, এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

শতদল, ১৩৩৮ শ্রীশচন্দ্র দাশ।

২. *আঙিনার ফুল।* (শ্রীমতী অপরাজিতা দেবীর কবিতার খাতা)। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্। তৃতীয় সংস্করণ। ১৩৪০। দুই টাকা। উৎসর্গ : কবি ঠাকুরদা —শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণেষু। আমাদের গৃহ আঙিনাতে দাদু আপনি যে ফুল ফুটছে।/জীবন ফলকে প্রতিদিনকার সহজ যে ছবি উঠছে,—/আমি নই কবি, —সে ফুল সে ছবি পারি নি গুছিয়ে তুলতে।/তবু তাই নিয়ে করি ছেলেখেলা অবসর বেলা ভুলতে।/তুমি এনে দেছো স্বপনপুরের সুন্দর সুর ছন্দ,/কল্পলোকের নব নব রূপ,—মন্দার মধুগন্ধ।/আমি এনে দিনু তোমার চরণে অনাদৃত ফুলগুচ্ছ,/

জানি বিদুরের তণ্ডুলকণা নহে মাধবের তুচ্ছ। অপরাজিতা। পৃ. ৬২। প্রকাশতারিখ নেই। আর্টপেপারে ছাপা।

৩. *পুরবাসিনী।* শ্রীঅপরাজিতা দেবী। কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। আড়াই টাকা। উৎসর্গ: রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের করকমলে—। প্রবেশক কবিতা সহ। পৃ. ৬৬। প্রকাশতারিখ নেই। আর্টপেপারে ছাপা।

৪. *বিচিত্ররূপিণী।* শ্রীমতী অপরাজিতা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশতারিখ নেই। পৃ. ৫৮। মূল্য—দেড় টাকা। প্রবেশক কবিতা : *চিত্রা* কাব্যগ্রন্থের 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে/ তুমি বিচিত্ররূপিণী...'। উৎসর্গ : বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম কবির উদ্দেশে—। ২০ সেমি x ১৭ সেমি।

রচনাবলী

অপরাজিতা-রচনাবলী। সম্পাদক : নবনীতা দেব সেন। প্রকাশক : অন্তরা দেব সেন, পরিবেশক : কলকাতা, করুণা প্রকাশনী। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪। মূল্য ২০.০০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা : বারো, ১৯৩। সূচী : *বুকের বীণা, আঙিনার ফুল, পুরবাসিনী, বিচিত্ররূপিণী,* সংযোজন। নবনীতা দেবসেনের দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সহ। প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : পূর্ণেন্দু পত্রী।

'নিবেদন' অংশে আছে :

স্বর্গত প্রমথ চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

এখনকার কুশীলবেরা অপরাজিতার লেখা কবর থেকে তুলে এনে ছাপছেন পঞ্চান্ন বছর বাদে। আধ শতাব্দী কেটে গেছে। পরীক্ষার সময় ঠিক এখনই বটে। আপনার কাছে কলমের শান-পরীক্ষা দিয়েছিলো রাধারাণী নামে একটি নিঃশব্দ জেদী মেয়ে। সে পরীক্ষায় আপনি নিজে, এবং বাংলা সাহিত্যে যাঁকে আপনি চূড়ান্ত স্বীকার ও শ্রদ্ধা করতেন আপনার সেই 'রবিকা', এই নতুন কলমকে অনার্সমার্ক দিয়েছিলেন।

ব্যস্, রাধারাণীর কাজ ফুরোলো, অপরাজিতার লতা মুড়োলো।

'রাধারাণীর কবিতা ও অপরাজিতার পদ্য বিপরীত স্বভাবের।' ধরতে তো কেউ পারেননি আপনারা দুই সখীর পরিচয়?

আধ শতাব্দী বাদে অবিশ্যি আশা করি না এ পদ্য কারো ভালো লাগবে। পৃথিবীর

স্বাদ গন্ধ ঢের বদলে গেছে। তবু, পঞ্চাশ বছর আগের ঘরোয়া ছবি তো এখানে ধরা রইলো! আপনিই এই বই গ্রহণ করুন।

২৯/২/৮৪ প্রণতা,
'ভালো-বাসা' রাধারাণী

চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রয়াত অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য *অপরাজিতা-রচনাবলী*'-র যে সমালোচনা করেন সেটি নিচে প্রকাশিত হল।

***অপরাজিতা-রচনাবলী*—সম্পাদক নবনীতা দেব সেন। পরিবেশক : করুণা প্রকাশনী, কলকাতা–৯। কুড়ি টাকা।**

অপরাজিতা দেবী যে রাধারাণী দেব—এই পরিচয় লেখিকা নিজে স্বেচ্ছায় দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ চেপে রেখেছিলেন। দ্বাদশবর্ষ বোধ করি পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকে মনে রেখে। প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখার ফলে অপরাজিতা নিজেকে 'নাত্‌নী'র সাজে সাজান, আর তাঁর চিঠির জবাব দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু দাদু হয়েই ওঠেন না, তাঁকে 'অপরাজিত' পরিচয়ে দাঁড়াতে হয়। 'প্রহাসিনী' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আধুনিকা' এবং চতুর্থ কবিতা 'গরঠিকানি' অপরাজিতার উদ্দেশ্যেই রচিত। এই অপরাজিতা যে রাধারাণীর প্রিয় বান্ধবী নন বরঞ্চ স্বয়ং রাধারাণী, সে-কথা কবি নিজে জেনে যান নি। জানবার প্রধান মুশকিল ঘটান রাধারাণী—'পুরবাসিনী' কাব্যটিকে 'রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব'কে উৎসর্গ করে।

আসলে কথাটা তুলেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন রাধারানীকে যে মেয়েরা লিখলেও, ভালো লিখলেও, তাদের লেখায় নাকি ঠিক স্বকীয়তার ছাপ ফুটে ওঠে না। 'অর্থাৎ মেয়েদের নিজস্ব উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি, মেয়েলি স্বর ও সুর তাদের রচনায় প্রকাশ হয়,নি'। এই কথাবার্তার পর দর্পিতা রাধারানী 'লীলাকমলে'র বদলে 'বুকের বীণা'য় দিলেন টংকার। ধরলেন 'অপরাজিতা'র ছদ্মবেশ এবং 'চলচপলার চকিত চমকে' সেদিন পাঠক-পাঠিকাদের আনকোরা শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ উপহার দিলেন। রাধারাণী আর অপরাজিতার মধ্যে আর কোনো মিল রইল না, নতুন চালের কবিতায় অপরাজিতার জয়-জয়কার পড়ে গেল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখন 'মহুয়া' শেষ করেছেন, তাঁর যৌবনদৃপ্তেরা বলছে, 'আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।' ঠিক তার পরের বছর বার হল 'বুকের বীণা' (১৯৩০)। বইটি রবীন্দ্রনাথ পড়লেন এবং চিঠিতে জানালেন তাঁর মতামত—

> এই রকম কবিতাকে ইংরেজিতে বলে সোসাএটি ভার্সেস্‌। এদের নৈপুণ্য যতই থাক স্থায়িত্ব অল্প।...তোমার কাব্যে প্রজাপতি দেখা দিয়েছে, তাদের পাখার লীলা দেখলুম, কিন্তু পাখীর গানও শুনতে চাই। যারা তোমার কবিতাকে অশ্লীলতার অপবাদ দিয়েছে তাদের কথায় কাণ দিয়ো না। তাদের মন অশুচি। (২৯শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

বছর দেড় পরে আবার এই 'বুকের বীণা'কে উপলক্ষ করে অপরাজিতাকে লেখেন—

> তোমাব লেখায় যে ভঙ্গী যে রঙ্গ কটাক্ষ, হাসির যে কলকল্লোল, ভাষার যে বিচিত্র নাট্যলীলা, বাংলা সাহিত্যে আর কারো কলমে সেটা এমন করে চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। দুষ্টু ঘোড়ার মতো ওর অবারিত চাল, অথচ খানাডোবাগুলো পার হয়ে যায় এক এক লাফে। কারো বলবার জো নেই তোমার হাসি আর কারো হাসির মতো, তোমার গলার সুর আর কারো সুরে সাধা...(১৮ কার্তিক, ১৩৩৯)

রবীন্দ্রনাথের এই স্নেহসিক্ত তারিফ মিলবার পর বার হল পর-পর 'আঙিনার ফুল' (১৯৩৪), 'পুরবাসিনী' (১৯৩৫), 'বিচিত্ররূপিণী' (১৯৩৭)। কিন্তু তার পরই অপরাজিতার প্রস্থান এবং অন্তর্ধান বাঙলার কাব্যমালঞ্চ থেকে। তাঁর প্রবেশ আর প্রস্থান দুটিই নাটকীয়। এই আকস্মিক প্রস্থানই কিন্তু অপরাজিতাকে সেদিনের তরুণ পাঠক—যাঁরা এখন বার্ধক্যের সিঁড়িতে পা রেখেছেন, তাঁদের কাছে স্মরণীয়া করে রেখেছে।

বাঙলা কবিতায় একসময় বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দচন্দ্র দাস গার্হস্থ্যরস কিছু এনেছিলেন। দাম্পত্যজীবনের নানা টুকিটাকির মধ্যে 'রোমানসে'র আলো ফেলে তাকে রঙিন করে তুলেছিলেন, 'পারিজাত'-'অশোক'-'গোলাপগুচ্ছে'র কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন—

> ঘোমটা খুলিবে নাকো? থাকো তবে বসি
> আমি করি কাব্যপাঠ যামিনী জাগিয়া—

অথবা অকালপ্রয়াত 'নতুন খাতা'র কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের আবদারের কবিতা 'বেলফুল চাই না, যুঁইফুল দাও'—অনেকেরই মনে আছে।

অপরাজিতার প্রস্থান ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) আগে। সে-যুগে যৌথ পরিবারপ্রথা, ভোগ্যপণ্যের দামে স্থিতাবস্থা বজায় ছিল। কলেজের ছাত্রেরা অনেকে বিবাহিত, নববধূরা পঞ্চদশী থেকে অষ্টাদশী। শাশুড়ী, ননদ, জা, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে শ্বশুরালয়ে দিন কাটত। তখনকার জীবনযাত্রার সঙ্গে আজকের মিল পাওয়া কঠিন। রাধারাণী দেবী নিজে 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছেন—

> 'পৃথিবীর স্বাদ গন্ধ ঢের বদলে গেছে'।

এবং আজকার সবদিক দিয়ে রূপান্তরিত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে এই কাব্যের ছবি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না—তবু দূরবনগন্ধবহ হাওয়ার মতো কবিতাগুলি এখনো মনকে খুশি করে তোলে।

আদর সোহাগ অভিমানে জড়ানো মধুর সুখের দিন-রাত যেমন এর চারদিকে ছড়ানো, তেমনি নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের একটি গৃহবধূর জীবনে বর্ষা যে কী দুঃসহ তার অত্যন্ত নিখুঁত বাস্তব ছবি পাই 'বর্ষায় বান্ধবীর চিঠি'তে—

শেওলা পিছল কলকাতা দিদি
ঘষে ঘষে মরি ঝামা!
...
ভিজে ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরানো
ব'লে বোঝাবার নয়!
...
বিকচ কদম ঘন কেয়াবন কোনদিকে
জানিনি তা—
আজ আসি তবে, চিঠি দিও।
ইতি তোমারি অপরাজিতা।

বিস্ময় লাগে, যখন পড়ি 'বিচিত্ররূপিণী' (১৯৩৭)। আমাদের ভারতীয় রসশাস্ত্রে নায়িকাপ্রকরণে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা প্রভৃতির যে রূপলক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে, তাকে সামনে রেখে আধুনিক কালের নায়িকার মধ্যে তাদের ফুটিয়ে তোলা খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু অপরাজিতা সগৌরবে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আমি আশা রাখি সাম্প্রতিক কালের পাঠকবর্গ বইটি মুগ্ধচিত্তে পড়বেন এবং রাধারাণী দেবী বলবেন—'কে তুমি পড়িছ বসি/আমার কবিতাখানি/কৌতূহলভরে'?

এই বইটির উল্লেখযোগ্য অংশ 'সংযোজন' অংশটি। কেন অপরাজিতা লিখেছিলেন 'নারীপ্রগতি' আর তার জবাব দিলেন রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিকা' লিখে : নাতনির পত্র আর দাদুর উত্তর উভয়ই কবিতায় : অথবা রাধারানী ও অপরাজিতাকে লেখা কবির ছন্দোবদ্ধ পত্র; অপরাজিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি এই সংকলনের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে।

এমন সুমুদ্রিত, পরিচ্ছন্ন, সৌষ্ঠবময় গ্রন্থপ্রকাশ আজকাল বড়ো চোখে পড়ে না।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

নীতি ও গল্প (কলকাতা, ইউ. এন. ধর, ১৯৫৩); *কিশোর সাহিত্য*, তৃতীয় ভাগ, (১৯৩৪); সুষমা মিত্র : *আকাশ-পথের যাত্রী* (১৯৫১, রাধারাণী দেবীর ভূমিকা সংবলিত) এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : *রজনী* (কলকাতা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, রাধারাণী দেবীর ভূমিকা সংবলিত)—এই চারটি বই দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। এই বইগুলোর প্রকাশনা-সংক্রান্ত কোনো বিশদ তথ্য দেওয়া গেল না।

সংযোজন ১

রাধারাণী-নরেন্দ্র দেব বিবাহ : কন্যার আত্ম-সম্প্রদান

গতকল্য রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় লিলুয়ার "দেবালয়" গৃহে প্রথিতযশা কবি বালবিধবা শ্রীমতী রাধারাণীর সহিত সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহের সকল কার্য্য হিন্দু-শাস্ত্র-মতে নারায়ণ শিলা সাক্ষ্য করিয়া খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। বিবাহের প্রধান বিশেষত্ব এই যে কন্যা সম্প্রদান কার্য্য স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছে—শাস্ত্রমতে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা নিজেই সম্প্রদান করিতে পারেন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে। পাত্র ও পাত্রী উভয়েই কলিকাতার খ্যাতনামা বনিয়াদী কায়স্থ বংশ-সম্ভূত। তাঁহারা স্বেচ্ছায় সৎসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া সম্পূর্ণ বৈদিক শাস্ত্রমতে যে বিবাহ সম্পাদন করিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গলার সর্ব্বত্র অনুসৃত হইবে এবং প্রাণের দাবী, মনুষ্যত্বের দাবী, প্রাণহীন সামাজিক বিধিনিষেধের উচ্চে স্থান লাভ করিবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। নবদম্পতির অবশিষ্ট জীবন মধুময় ও সম্পদশালী হউক—ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এই বিবাহ উপলক্ষে লিলুয়ার "দেবালয়" গৃহে বাঙ্গলার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিল্পীর সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, শিল্পী যতীন্দ্রনাথ সেন, চারু রায়, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, গোপাললাল সান্যাল, হেমেন্দ্রলাল রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, "চন্দ্রশেখর" গিরিজাকুমার বসু, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সুবোধ রায়, নলিনীকান্ত সরকার, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। "জলধর দাদা" গামছা কাঁধে লইয়া এই বৃদ্ধ বয়সেও যেরূপ আগ্রহসহকারে বরযাত্রদের তুষ্টিবিধানের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। ইহা ব্যতীত নরেন্দ্র বাবুর সাহিত্যিক বন্ধুগণ সপত্নী বিবাহের সকল উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছেন। "দেবালয়"-এর কুঞ্জবাটিকার এই আনন্দময় বিবাহবাসরের কথা সহজে ভুলিবার নয়।

দৈনিক বঙ্গবাণী, সোমবার, ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

সাহিত্যের আসরে

এ সপ্তাহের সাহিত্যের আসরে সবচেয়ে জমকালো খবর আমাদের 'মেঘদূত' 'ওমর খৈয়ামে'র কবি নরেনদা—ওরফে শ্রীনরেন্দ্র দেবের সাথে কবি শ্রীমতী রাধারাণী দত্তের

'সুতহিবুক যোগে' শুভ-পরিণয়। যে "স্নেহাস্পদা অনুজা" কাব্য-দীপালি সাজাবার বেলায়ই শুধু নরেন-দা'র পাশে এসে কোমর বেঁধে লাগ্‌তেন, আজ তিনি দাদার গৃহ প্রাঙ্গণে প্রতিদিনকার দীপালি সাজাবার ভার গ্রহণ করলেন। দিদি আমাদের বিধবা হইয়াও কুমারীসুলভ কমনীয় পবিত্রতার অধিকারী (vide 'বঙ্গের মহিলা কবি', শ্রীনরেন্দ্র দেব-প্রেরিত রাধারাণী দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী) ছিলেন, এবার আমাদের বৌদিত্বে উন্নীত হইয়াও সে গোঁ না ধরেন। সত্যি কথা বলতে কি নরেন-দার আইবুড়ত্ব আমাদের চক্ষুশূল ছিল, তাঁর একটা হিল্লে হওয়ায় আমরা যেন বাঁচলুম্‌।

আর বৌদি! "লীলাকমল" বেরুনো পর্য্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে আমাদের উদ্বেগের কারণ ছিল না; কিন্তু তারপর থেকেই আমরা দিদির একটা 'হিল্লে' চেয়েছি। এবারে যে তিনি সন্ধির সূত্র খুঁজে পেয়ে বুকের বীণা বাঁধ্‌বার ভার নরেন-দাকেই দিলেন, এ আনন্দ আমাদের দো-তরফা। থ্রি চিয়ার্স্‌ ফর্‌ আওয়ার গুঁফো নরেন-দা! থ্রি চিয়ার্স্‌ ফর্‌ আওয়ার বৌদি রাধারাণী দেবী! থ্রি চিয়ার্স্‌ ফর্‌ দি গড্‌ কিউপিড্‌!

গেল রবিবার আঠারই জ্যৈষ্ঠ লিলুয়ার 'দেবালয়ে' এই শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের সদাহাস্যময় সুরসিক সেজ-দা—নরেনদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—নিজে আগাগোড়া উপস্থিত থেকে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছিলেন। আমাদের জলধর দাদা একাই একশো হয়ে তদ্বির ক'রে ফির্‌ছিলেন। তাছাড়া উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুত প্রমথ চৌধুরী, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সপত্নী), হেমেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রলাল রায় (সপত্নী), ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু, প্রফুল্ল সরকার, গিরিজা বসু (সপত্নী), যতীন্দ্র বাগ্‌চী, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার বসু, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (সস্ত্রীক), নলিনী সরকার (সস্ত্রীক), শিল্পী চারু রায় (সপত্নী), যতীন্দ্র সেন, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী, অমূল্য সেন, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী (সপতি) প্রভৃতি।

একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি—ভূতপূর্ব্ব দিদি—বর্ত্তমান্‌ বৌদি এ বিয়েতে স্বয়ংবরা হয়েছিলেন। আমাদের পাঠিকা-মহল আর কিছু মনে কর্‌বেন না—কন্যাকর্ত্তার অভাবে বৌদি নিজেই নিজেকে দান এবং স্বয়ংবর গ্রহণ করেছিলেন। শালগ্রামশীলা সাক্ষী করে হিন্দু-বিবাহে এটা নাকি নতুন নয়, যদিও যুগপ্রথা এর বিপরীত। যাহৌক্‌ —বাংলা দেশে খ্যাতনামা পুরুষ কবি এবং স্ত্রী কবির মধ্যে বৈবাহিক মিলন এই প্রথম।

আর একটা কথা শুনে আমরা সুখী হলুম—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এই বিবাহে প্রীতি উপহার দিয়েছেন বৌদির একটি নূতন নামকরণ করে—নামটি হচ্ছে—"নবনীতা"। এই নবপরিণীতা নবনীতা ও নরেনদার ভাবী জীবন মধুময় হউক এই আমাদের কামনা।

ভগ্নদূত, ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

Poet Marries Poetess. Dev-Dutt Wedding at Lillooah.

Calcutta, May 31. There was quite a distinguished gathering at "Devalaya", the garden house at Lillooah of Mr. Narendra Nath Dev this evening to celebrate the marriage between Srimati Radharani Dutt and Mr. Dev. The function was unique from more than one point of view. Both the bride and the bridegroom are well-known to literary Bengal as Poets of a high order and the occasion is rare when a poet marries a poet. Further importance attaches to the function in that Srimati Radharani is a girl widow and it is rare when a girl of her class and status remarries.

The function it is understood has been blessed by Rabindra Nath Tagore who has sent a long letter to Srimati Dutt from Darjeeling. Among those who attended the function were Mr. P. Chaudhuri, Mr. Hari Dass Chatterji of Messrs. Gurudas Chatterji and Sons, Mr. and Mrs. Saurendra Nath Mukherji, Mr. and Mrs. Charu Roy, Mr. and Mrs. Premankur Atharthi, Prof Dhar of Indore, Mr. and Mrs. Girija Kumar Bose, Mr. Nalini Ranjan Sircar, Mr. Gopal Sanyal, Editor of "Bangabani", Mr. Jatindra Nath Bagchi, Mr. Subodh Roy ("Bangabani") and a number of journalists.

Rai Bahadur Jaladhar Sen, Editor of "Bharatvarsha" took a leading part in the ceremony which was solemnised under strict Hindu Shastric rites. (A.P.I.)

Leader, Monday, June 1, 1931.

মেঘদূতের যক্ষ এবং লীলাকমলের কমল লীলা

কবি-বন্ধু, সাহিত্যিক সমাজে "বিরহী যক্ষ" নামে পরিচিত [কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দের 'মেঘদূত' কাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া এই খেতাব লভ্য হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই!] শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এতকাল পরে তাঁহার প্রিয়তমাকে পরিণয়-পাশে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন। মেঘমালার দেশে নয়, কুন্দকেতকীর বনেও নয়, এই ট্রাম-বাস-মোটর-লরী-গরুরগাড়ী-ভঁয়সাগাড়ীর শব্দে মুখরিত ও কানমাথাপ্রাণ-ঝালাপালায়িত কলিকাতা শহরেই তাঁহার প্রিয়তমাটি আত্মগোপন করিয়াছিলেন। যক্ষের বিরহ-বেদনায় ব্যথাহতা নারী চম্পক-অঙ্গুলিতে "লীলাকমল" লইয়া আমাদের কবি-বন্ধুর ঘরে আলো, শোভা এবং সুবাস লইয়া উদিতা হইয়াছেন। "লীলাকমলে"র কবি শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত—বর্ত্তমানে আমাদের বান্ধবী—শুনিয়াছি

তাঁহার কবিতার মধ্যে (বান্ধবী মাপ করিবেন, কবিতা পড়িয়া রসাস্বাদ করিবার বয়স আমাদের বহুকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় কমলের লীলা দর্শন করিতে বড়ই শঙ্কিত হইয়া পড়ি!) করুণ ব্যথার ও বেদনার একটি অশ্রান্ত ঝঙ্কার সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইত! —হইবারই কথা বটে। কমল বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই, কালের কঠিন স্পর্শে কমল-কলি উৎপাটিত হইয়াছিল—স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়াছিল। আমাদের দরদী বন্ধু নরেন্দ্রনাথ বাবু স্নেহের সলিলে স্নাত করাইয়া, প্রেমের আগুনে তাতাইয়া লইয়া, এবং কাব্যের বাতাসে সঞ্জীবিত করিয়া, লীলা কমলটিকে বুকে ধরিয়াছেন, তাঁহার মঙ্গল হৌক! আশা করা যায়, এখন হইতে বান্ধবীর কোমলকমলপরশলাভধন্য নরেন্দ্র দেব আর দন্তভাঙ্গাচ্ছন্দে কবিতাদি না-লিখিয়া মধুর ও কোমল ছন্দে কথার মালা গাঁথিবেন।

সাপ্তাহিক বাঙলা, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮ : ৫ জুন, ১৯৩১

রাধারাণী দত্ত + নরেন্দ্র দেব

শ্রীমতী রাধারাণী বাংলা ১৩১১ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে কোচবিহার রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুত আশুতোষ ঘোষ ঐ সময়ে কোচবিহারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জন্ম হইতে কৈশোরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত রাধারাণী কোচবিহারেই বাস করিয়াছেন।

লেখাপড়ায় রাধারাণীর বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন এবং বাড়ীতেও গৃহশিক্ষক রাখেন। বালিকাও মন দিয়া পড়াশুনা করিয়া লেখাপড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। বাল্যকাল হইতেই বাংলা সাহিত্যের প্রতি রাধারাণীর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বাংলা কবিতা পাঠ করিতে তিনি সমধিক আগ্রহান্বিতা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই পদ্য মিলাইতে অভ্যাস করেন।

কিন্তু বেশীদিন রাধারাণীকে লেখাপড়া করিতে হইল না। কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে রাধারাণীর পিতা তাঁহার বিবাহ দেন। রামপুর রাজ্যের ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত রাধারাণীর বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে স্বাস্থ্যবান, উপার্জ্জনক্ষম ও উচ্চশিক্ষিত পাত্র পাইয়া আশুতোষ আর দ্বিধা করিলেন না। রাধারাণীর এই বিবাহে মত ছিল না; পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তিনি পুনঃপুনঃ বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আশুবাবু কন্যার কথা কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করিলেন না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরেই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে পত্নীকে তিনি আপনার কাছে লইয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে

ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার সময় ছিল না। দুরন্ত রোগে সত্যেন্দ্রনাথ ইহলীলা সংবরণ করিলেন। তাঁহার আকস্মিক বৈধব্যে স্বজনবর্গ সকলেই শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। পুত্রশোকাতুরা শাশুড়ীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য রাধারাণী তাঁহার কাছে রহিলেন। শাশুড়ীও বধূকে কোলে করিয়া নিদারুণ পুত্রশোকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন। স্বামীর আত্মীয় ও প্রিয়জনদিগের সেবা করিয়াই সুশীলা বালিকার দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের স্বজনবর্গ সকলেই বালবিধবা রাধারাণীর প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার পুনর্ব্বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। রাধারাণী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার সুদৃঢ় আপত্তিতে পুনর্ব্বিবাহের কথার উল্লেখ করিতে কেহ সাহসী হইলেন না। সারল্য ও শুচিতা রাধারাণীর জীবনের বৈশিষ্ট্য। বিধবা হইবার পরে এই শুচিতা আরও বাড়িয়া উঠিল। ফলে বিধবা হইলেও তাঁহাতে যেন কুমারী-সুলভ পবিত্রতা ও নির্ম্মলতায় ঘিরিয়া রাখিল।

কয়েক বৎসর পরে আত্মীয় স্বজনের সহিত রাধারাণী কলিকাতায় আসিলেন। এই সময়ে সম্পর্কীয় ভ্রাতা শ্রীযুত নরেন্দ্র দেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ ঘটিল। নরেন্দ্র ও রাধারাণীর মধ্যকার পূর্ব্ব-সম্পর্কটি যে সঠিক কি—মাসতুতো না পিসতুতো ভাইবোন, সে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম না। তবে তাঁহারা যে ভাইবোন (cousin) ছিলেন, একথা নরেনবাবু হইতেই আমরা জানিতে পারিয়াছি। কারণ, রাধারাণীর সহিত বিবাহেব পূর্ব্বে সম্পাদিত কাব্য-সংগ্রহগ্রন্থ কাব্য-দীপালির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় উহাব সম্পাদক শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব লিখিয়াছেন—"এই বিরাট কার্য্য সম্পাদন আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠ্‌তো যদি না আমার স্নেহাস্পদা অনুজা শ্রীমতী রাধারাণী দত্তও এসে আমার সঙ্গে কোমড় বেঁধে না লাগতো।" অনুজা বলিতে সাধারণতঃ সহোদরা ভগ্নীই বুঝায় ; তবে নরেনবাবু নিশ্চয়ই শব্দটি সে অর্থে ব্যবহার না করিয়া cousin অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে একথাগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

নরেনবাবু নিজেও কবি। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া রাধারাণীর কবিতা-শক্তি বিকশিত হইবার সুবিধা প্রাপ্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সুবিধা হইল প্রচারের। মাসিক-পত্র "ভারতবর্ষ" সম্পাদনায় নরেনবাবু উহার সম্পাদক রায় শ্রীযুত জলধর সেন বাহাদুরকে অনেক সময় সাহায্য করিয়া থাকেন। বাংলা ১৩৩০ সালে রাধারাণীর কবিতা সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইল। তৎপরে মাসিক বসুমতী, মানসী ও মর্ম্মবাণী প্রভৃতি মাসিক-পত্রেও রাধারাণীর কবিতা প্রকাশিত হইতে দেখা গেল। প্রকাশের সুযোগ পাইয়া রাধারাণীও অধিকতর উৎসাহে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাধারাণীর বৈধব্য-জীবনের দুঃখ-বেদনা তাঁহার কাব্যে সকরুণরূপে ফুটিয়া উঠিত—

"মধুর ধ্যানের বসে বিচ্ছেদের শূন্য পাত্রে মম
লইয়াছি ভবি,

অন্তরের হাসি তাই অশ্রু যূথি রূপে প্রিয়তম
পড়ে আজি ঝরি।
তোমার বিরহ মোর কামনা পঙ্কের মাঝে প্রিয়,
ফুটিয়াছে ফুল—"

এখন তাহাতে সান্ত্বনার ভাব দেখা গেল—

আমার এ রিক্ত প্রাণে পরম পূর্ণতা বন্ধু তাই
আমি সর্ব্ব সুখী,
তুমি বাসিয়াছ ভালো, আর কোন দৈন্য ক্ষোভ নাই
নহি নহি দুঃখী!
তুমি বাসিয়াছ ভালো, তুমি ভালো বাসিয়াছ বঁধু,
যত স্মরি' তত প্রাণে উছলি উথলি উঠে মধু,
বিরহ-বেদনা তাই গন্ধ ধূপে পরিণত আজি
ঊর্দ্ধ অভিমুখী

অন্তরের পরিপূর্ণতা বুঝি বাহিরকে পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিতে পারে না—মিলন অন্তরের ও বাহিরের। এই মিলনাকাঙ্ক্ষা অভিনব কাব্যরূপ হইয়া দেখা দিল—

"উচ্ছসিত প্রাণরসে দেহমনে স্বপ্নাবেশ লাগে,
নয়নে লাবণ্য ছুরে, অধরে অতৃপ্ত তৃষ্ণা জাগে,
আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বসন্তের চর্ম্মগন্ধ রাগে
দীপ্ত ঝলমল;
জীবনের অন্ধবীজ অঙ্কুরেতে পরিণতি মাগে
আলোকে উজ্জ্বল।"

হৃদয়ের গোপন-কামনা কি চমৎকার অভিব্যক্ত—"জীবনেব অন্ধবীজ অঙ্কুরেতে পরিণতি মাগে।"

রাধারাণীর এই সকল কবিতা সংগৃহীত হইয়া লীলা-কমল নামে কাব্যগ্রন্থ-রূপে প্রকাশিত হইল। তিনি যে আধুনিক বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা-কবি তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না।

দুঃখবাদের উপরে লীলা-কমলের ভিত্তি কিন্তু সেই দুঃখবাদ প্রথম অস্পষ্ট—পরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই সময়ে শ্রীযুত নরেন্দ্র দেবকে তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া cousin-বিবাহের সমর্থন করিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া "খেলার পুতুল" ও "যাদুঘর" নামক বই দু'খানিতে তিনি নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়া cousin-বিবাহ সমর্থন করাইয়াছেন। তাঁহার যাদুঘর হইতে দু'একটি অংশ আমরা এস্থলে উদধৃত করিব—

ভোলানাথ উমার পিস্‌তুত ভাই আর প্রকাশ উমার দাদা। প্রকাশ উমাকে বলিতেছে :—

"পৃথিবীর আর সব দেশের মতো আমাদের সমাজেও যদি cousin-marriageটা প্রচলিত থাক্‌ত, তাহ'লে এই ভোলাটা যতই idiot হোক্, ওর সঙ্গে আমি নিশ্চয় তোর বিয়ে দিতুম!"

আর এক জায়গায় ভোলানাথ প্রকাশকে বলিতেছে—

"কিন্তু উমা না আমাব বোন? ওকে তুমি আমার সম্বন্ধে আমারই সামনে যে-সব ঠাট্টা করো—most objectionable and very bad taste too!_"

ইহার উত্তরে প্রকাশ বলিতেছে :—"Nonsense! Cousins are always the best of friends, তুই অতো ক্ষেপে উঠিস্ কেন? কই উমি তো রাগ করে না!"

এই যাদুঘর উপন্যাসখানি প্রথমে অধুনা-লুপ্ত মাসিকপত্র কল্লোলে প্রকাশিত হইয়াছিল। "Cousins are always the best of friends" এই বাক্যটি কল্লোল হইতে রূপান্তরিত হইয়া গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইয়াছে; কল্লোলে ছিল—"Cousins are always the best targets." কথাটা লইয়া তখন চারিদিকে ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছিল। রাধারাণীর সহিত নরেনবাবুর সম্পর্কের কথাটা লোকের জানা ছিল, তাই একটা গুজবও রটনা হইয়াছিল—নরেন দেব রাধারাণী দত্তকে বিবাহ করিবেন। কিছুদিন পরে কাব্য-দীপালিতে নরেনবাবুর স্বহস্তে লেখা "স্নেহাস্পদ অনুজা শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত" কথাটি দেখিয়া লোকের মন হইতে সে ধারণা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

নরেনবাবুর দুইজন অগ্রজ বিবাহ করেন নাই, তিনি নিজেও যৌবনের প্রায় বারো আনা কাল অবিবাহিত অবস্থায়ই অতিক্রম করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনিও যে তাঁহার অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় চিরকুমার অবস্থায় জীবন কাটাইয়া দিবেন, লোকের মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হওয়াই স্বাভাবিক; হইয়াছিলও তাহাই। রাধারাণীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক কাব্য-চর্চ্চার সহযোগিতার সম্পর্ক—ইহাতে কখনও আবিলতা দেখা দেয় নাই। তাহার উপর নরেনবাবুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, রাধারাণীর বয়স সাতাশ। তবে যে বস্তুটির মধ্য দিয়া উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, সে বস্তুটি কাব্য-চর্চ্চা—অন্তরের কোমলতম তন্ত্রীটিতে যাহা আঘাত করে। কাব্য-জগতে সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব-জীবনেও সহযোগিতার জন্য দুইজনে প্রস্তুত হইলেন।

একদিন সংবাদপত্রসমূহের মারফৎ প্রচারিত হইল—শ্রীযুত নরেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী রাধারাণী পরস্পরের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। তারপর বাংলা ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের এক পবিত্র রজনীতে লিলুয়ার বাগানবাড়ীতে বহু বন্ধু-বান্ধব, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের উপস্থিতিতে কবি-যুগলের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। বরের পক্ষে বরের অগ্রজগণ উপস্থিত ছিলেন। কন্যাপক্ষীয় কেহ উপস্থিত না থাকায় রায় শ্রীযুত জলধর সেন বাহাদুর কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ হিন্দুমতে অনুষ্ঠিত হয়।

পুনর্ব্বিবাহের পরে রাধারাণীর কাব্য-চর্চ্চা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিবাহের পরবর্ত্তী এক বৎসরের মধ্যে তিনি যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন এয়োতির

চিহ্ন সিঁথিমৌরের সুন্দর অনুকৃতি যুক্ত প্রচ্ছদপটে শোভিত হইয়া "সিঁথিমৌর" নামে তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবাহে যে তিনি সুখী হইয়াছেন, তাঁহার অতৃপ্ত অশান্ত আত্মা যে ইহাতে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া—সিঁথিমৌরের বহু কবিতায় এরূপ আভাস পাওয়া যায়। কোন সখীকে লক্ষ্য করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"দুঃখই দেখেছ শুধু, কিন্তু দেখ নাই
পেয়েছি ঐশ্বর্য্য কিবা দুঃখসিন্ধু ছানি।
পঙ্কই দেখিতে পেলে! পেলে শুধু গ্লানি
ফুটেছে পঙ্কজ তাহে দেখিলে না ভাই!"

আর একটি কবিতায় তিনি আপশোষ করিয়া বলিয়াছেন—

"কেহ বা শাপিয়া কহে—'কেন মরিলে না?
এত শিক্ষাদীক্ষা তার এই পরিণাম?'

জীবন-মালঞ্চ মম পত্রপুষ্পহীন
ছিল শুষ্ক শূন্য মরু দীর্ঘযুগ ধরি।
অসার নিন্দার সার পড়েছে যেদিন
ফুলে ও ফসলে সে যে উঠিয়াছে ভরি।"

ঐ সিঁথিমৌরেরই আর একটি কবিতায় প্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

"তুমি এসে দাঁড়াইলে চিত্তদ্বারে মম
মর্ম্মে আঁকা রূপরেখা মূর্ত্ত হল যেন
প্রাণ চেতনার মন্ত্রস্পর্শে,—প্রিয়তম!
বিস্ময়ে কহিনু—"ওগো, মোর দ্বারে কেন
দাঁড়ালে অতিথি হয়ে? কিছুই তো নাই
মোর চির-শূন্য বুকে;—কহেছিলে হেসে,
'শূন্যতাই দাও তুমি, তাই লয়ে যাই,
রিক্ত করে ফিরিব না তব দ্বারে এসে!'"

তাঁহার এই সিঁথিমৌর অক্ষয় হৌক।

[সূত্র : শ্রীমতী শৈলসুতা দেবী : *পরিণয়ে প্রগতি*, কলকাতা, দি বেঙ্গল বুক এজেন্সী, পৃ. ১৫০-১৫৫]।

সংযোজন ২

পত্র ১

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য

আমার 'শরৎচন্দ্র' ১ম খণ্ড বইয়ে লিখেছি—'হিরণ্ময়ী দেবী নিজে বলেছেন, তাঁব বিয়ে হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের আত্মীযেরাও বলছেন বিয়ে হয়েছিল। শবৎচন্দ্র নিজেও হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলে গেছেন। আব সে কথা শুধু মুখেই নয়, লিখিতভাবেও তিনি বলে গেছেন। অতএব ব্রজেনবাবু ও নরেনবাবুর ন্যায হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রেব জীবন-সঙ্গিনী বা সঙ্গিনী না বলে স্ত্রী বলাই ঠিক হবে বলে মনে করি।'

আমার এই লেখাটা নিয়েই শ্রদ্ধেয়া রাধারাণী দেবী ১৭ই মাঘ তারিখের দেশ পত্রিকায় তাঁর ধাবাবাহিক প্রবন্ধে লিখেছেন—'হিরণ্ময়ী দেবী ও শান্তি দেবী উভযকেই বিবাহিতা পত্নী বলে বইতে লেখা নরেন্দ্র দেব ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব পক্ষে কেন যে সম্ভব হয়নি, 'গোপালবাবুকে আমাব স্বামী বুঝিয়ে বলাব চেষ্টা কবেছেন। কেন যে তবুও একটি ভ্রান্ত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এত পরিশ্রম কবছেন।...'

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য—নরেনবাবু তাঁর বইয়ে হিবণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গিনী বললেও শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী বলে লিখেছেন। আর ব্রজেনবাবুর বইযে শান্তি দেবীব তো কোন কথাই নেই। তাই আমি নরেনবাবু এবং ব্রজেনবাবু উভয়কেই শুধু হিরণ্ময়ী দেবী সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনারা যে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের স্ত্রী না বলে জীবনসঙ্গিনী বা সঙ্গিনী লিখলেন, এ খবব পেলেন কোথায? এঁরা উভয়েই বলেছিলেন—বিয়ে হয়নি আমরা শুনেছি। কিন্তু কোথায়, কার কাছে শুনেছিলেন তা কিছুতেই বলেন নি। এখন রাধারাণী দেবীর লেখায় দেখছি—শুধু হিরণ্ময়ী দেবীকেই নয়, শান্তি দেবীকেও যে শরৎচন্দ্র বিযে কবেন নি এ কথা শরৎচন্দ্রের ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রই একদিন নবেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীকে বলেছিলেন।

এখন কথা হচ্ছে—প্রকাশবাবু এ কথা জানলেন কি করে? প্রকাশচন্দ্র শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে বহু ছোট। প্রকাশচন্দ্র যখন অত্যন্ত শিশু তখন তাঁকে জলপাইগুড়িতে এক আত্মীয়র কাছে রেখে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যান। পরে একসময় রেঙ্গুন থেকে এসে তাঁকে এনে অগ্রদ্বীপের জমিদারদের বাড়িতে রেখে যান। প্রকাশচন্দ্র এই জমিদারদের যাত্রার দলে সখী সাজবার জন্য প্রথমে এখানে আসেন এবং এখানেই বহু দিন থাকেন। শেষে শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে প্রকাশকে কাছে আনেন। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, বয়সে অত ছোট প্রকাশকে ডেকে শরৎচন্দ্র কখনই বলেন নি যে, তিনি শান্তি দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবী কাউকেই বিযে করেন নি। অতএব এ সম্পর্কে প্রকাশবাবুর কথা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

রাধারাণী দেবী লিখেছেন—'শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি শুনেছেন—তিনি বিবাহ করেছেন? শরৎচন্দ্র কখনও কারও কাছে এ কথা উচ্চারণ করেননি। এ বিষয়ে তিনি একান্ত কঠোর ও সতর্ক ছিলেন। বার্মায় তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল বলে যা প্রচারিত এবং স্বর্গীয় নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' বইতে যে বিষয় তিনি লিখে গিয়েছেন, সে তথ্যটি শরৎচন্দ্রের নিজের মুখ থেকেই আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে একত্রেই শুনেছি। গোপালবাবু তাঁর বইতে কেন যে লিখেছেন—"নরেনবাবু বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বিবাহ-কাহিনী ও তাঁর পুত্রের কাহিনীটিও আমি গিরীন্দ্রনাথ সরকারের কাছেই শুনেছিলাম।" এখানে আমার বিস্ময় ঠেকেছে। এই তথ্যটি তো শরৎদারই নিজের মুখে নরেন্দ্র দেব ও আমার একত্রেই শোনা। গোপালবাবুর হয়তো ভুল হয়ে থাকবে—আমার স্বামী যে তথ্য শরৎচন্দ্রেরই মুখে শুনেছিলেন, তা গিরীন সরকারের কাছে পেয়েছেন বলবেন কেন?'

আমার বক্তব্য—রাধারাণী দেবী একবাব বলছেন—'শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি শুনেছেন—তিনি বিবাহ করেছেন',—আবার বারবার বলছেন—শরৎচন্দ্রের নিজের মুখেই তাঁরা শুনেছেন, শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রের বিয়ে করার কথা এবং শান্তি দেবীর গর্ভে একটি পুত্রেরও কথা। এখানে তাঁর কথাটা তো স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী হচ্ছে।

বিবাহ করেছেন—এ কথা রাধারাণী দেবীদের মত আবও অনেকেই শুনেছেন। যেমন (১) কলকাতার বীণা দেবী সরস্বতী রাধারাণী দেবীর মতই শরৎচন্দ্রের স্নেহধন্যাদের অন্যতমা। তিনি রাধারাণী দেবীরই প্রায় সমবযস্কা এবং আজও জীবিতা। রাধারাণী দেবী ১৭ই মাঘ তারিখের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই আমার বই থেকে যে অংশটা উদ্ধৃত করেছেন, তার ঠিক আগেই বীণা দেবীর কাছে শুনে আমি লিখেছি—'আমাকে লোকে ঐ রকম ভুলই বুঝে থাকে। আমাকে নিয়ে তারা যে কত জল্পনা-কল্পনা করে তাব ইয়ত্তা নেই। এই দেখ না, তোমার বউদিকে আমি ধর্মমতেই বিয়ে করেছি, তবুও লোকে বলে আমি নাকি তাঁকে রক্ষিতা রেখেছি।'

(২) এ বছরের একটি শরৎ শতবার্ষিকী সংখ্যা সাপ্তাহিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর কন্যা পারুল বন্দ্যোপাধ্যায়ও হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গে বলেছেন—'বিয়ে হিন্দু মতেই হয়।...মামীমার বাবার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রেই বিয়ে করে তাঁর কোন কথা দেওয়া দায়িত্ব পালন করেন। এ কথা মামা আমাকে বলেছেন।'

(৩) শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের বরাবরের বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী বারবার বলেছেন। এ কথা তিনি নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের মুখে শুনে থাকবেন।

নরেন্দ্র দেব লিখেছেন—শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শান্তি দেবী এবং শিশুপুত্র আটচল্লিশ

ঘণ্টার মধ্যেই প্লেগে মারা যান। গিরীনবাবুর বইয়ে শান্তি দেবীর মৃত্যু এবং শবদাহে গিরীনবাবুর সাহায্যের কথা থাকলেও কোথাও শিশুপুত্রের উল্লেখ নেই। এই নিয়েই আমি একদিন নরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শরৎচন্দ্রের পুত্রের কথা তো গিরীনবাবুর বইয়ে নেই, আপনি কোথায় পেলেন? এরই উত্তরে নরেনবাবু আমাকে বলেছিলেন—শরৎচন্দ্রের বিবাহ-কাহিনী এবং পুত্রের কাহিনীও গিবীনবাবুর কাছেই শুনেছি।

রাধারাণী দেবী বলেছেন—এ কথা তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে শরৎচন্দ্রের মুখেও শুনেছেন। সে তো আরও ভালো কথা। তা হলে বলা যেতে পারে, শান্তি দেবীকে বিয়ে করার কথা শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীদের যেমন বলেছিলেন, তেমনি গিরীনবাবুকেও বলেছিলেন। অতএব, বিবাহ করেছেন, শরৎচন্দ্র কখনও কারও কাছে এ কথা উচ্চারণ করেন নি—রাধারাণী দেবীর এই কথা আর টিকলই না। আর প্রকাশবাবু যে বলেছিলেন—দাদা কখনও কাউকে বিবাহ কবেন নি, উনি ব্যাচেলাব —এ কথাও মিথ্যা প্রমাণিত হ'ল।

শান্তি দেবীকে শরৎচন্দ্রেব বিয়ে কবাব প্রসঙ্গে নবেন্দ্র দেব শরৎচন্দ্রের কাছে শুনে যা লিখেছেন, এখন তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। শান্তি দেবীর বাবা চক্রবর্তী যখন ঘোষালের সঙ্গে কন্যা শান্তির বিবাহের ব্যবস্থা করে, তখন শরৎচন্দ্র ঐ বিবাহে বাধা দিতে গেলে তাঁদেব উভয়ের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে নরেনবাবু লিখছেন—'চক্রবর্তী বলে—মেয়ে বিযের যোগ্য হয়েছে—বিয়ে দেব না? আমি গবীব মানুষ, এই বিদেশে ওর চেয়ে ভাল পাত্র আর কোথা পাব? ঘোষালেব টাকা আছে...আর যদি বয়সেব কথা বল বাবু, বেটাছেলের আবার বয়স কি?'

শরৎচন্দ্র অনেক বোঝাবার চেষ্টা কবলেন, কিন্তু চক্রবর্তী সে পাত্রই নয়। ঘোষালেব দেনা শরৎচন্দ্র মিটিয়ে দেবেন বললেন, তবুও বলে—না, মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে না? শেষকালে চক্রবর্তী ধরে বসলো—'এতই যদি তোমার প্রাণে দয়ামায়া বাবু, তুমিই কেন এই গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাত-কুল বক্ষা কব না!'

এখানে দেখা যাচ্ছে, চক্রবর্তী বারবাব বলছে—মেয়ের আমার বিয়ে দিতে হবে। এ ছাড়াও চক্রবর্তী যখন বলছে—তুমিই এই গরীব বামুনের মেয়েটাকে নিয়ে আমার জাতকুল রক্ষা কর না, তখন চক্রবর্তী তার মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যই শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ কবেছিলেন। জাতকুলের ভয়ে ভীত চক্রবর্তী কখনই শরৎচন্দ্রকে এ কথা বলেন নি যে—আমার এই বিবাহযোগ্যা মেয়েটিকে তুমি অমনিই নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে একত্রে বাস কর গে। তাই যতই নামমাত্র হোক, একটা বিবাহ অনুষ্ঠান হয়েছিলই।

ঠিক এমনিই হিরণ্ময়ী দেবীর ক্ষেত্রেও বলা যেতে পারে, তাঁর বাবা কৃষ্ণদাস অধিকারীও কখনই শবৎচন্দ্রকে বলেন নি, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে না করে

অমনিই নিয়ে যাও এবং একত্রে বাস কর গে। মাতৃহারা হিরণ্ময়ী দেবী (তখন নাম ছিল মোক্ষদা) তাঁর পিতার আদরের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। সেকালে কেন —আজও কোন পিতাই তাঁর কন্যা সম্বন্ধে এমন অন্যায়, নিষ্ঠুর ও অসামাজিক ব্যবহার করতে পারেন না। আর নারী-দরদী শরৎচন্দ্রও কখনই এতটা হীন ও নিকৃষ্ট ছিলেন না যে, দু দুটা মেয়েকে তাদের বাপের কাছ থেকে অমনিই নিয়ে এসে তাদের সামাজিক মর্যাদা না দিয়ে শুধুই জীবনসঙ্গিনী করেছিলেন। বিশেষত শরৎচন্দ্র যখন সমাজে বাস করে সমাজে বিশ্বাসী ছিলেন আর অন্তত নামমাত্র বিবাহ অনুষ্ঠান করাটাও যখন এমন কিছু বেগ পাওয়ার মত ব্যাপারই নয়। তাই শান্তি দেবী এবং হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহিতা স্ত্রী এ কথা বিভিন্নজনের কাছে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে বলা এবং নিজের উইলে হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও আজ এতকাল পরে সে সব অস্বীকার করে রাধারাণী দেবী কোন 'সত্য'কে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন বুঝতে পারলাম না।

গোপালচন্দ্র রায়
কলকাতা

পত্র ২

গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখিকা রাধারাণী দেবী আমার স্বর্গত জ্যেষ্ঠতাত অবিবাহিত ছিলেন প্রমাণ করিবার যে ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন তাহাতে আমি ও অন্যান্য নিকটতম আত্মীয়েরা স্তম্ভিত হইয়াছি। তিনি শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের মৌলিকত্ব প্রদর্শনে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং এই অপচেষ্টায় অনেক কাল্পনিকতা ও অসত্যের আশ্রয় লইয়াছেন। যেমন, তাঁহার উক্তি 'অনিলা দেবী' 'কোন দিন হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্নগ্রহণ করতো না' সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কি আমার স্বর্গত পিতা প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখে অসত্য উক্তি আরোপ করিয়া তাহাও লেখিকা তাঁহার ইষ্টসাধনে ব্যবহার করিয়াছেন। 'দাদা যে কখনও কাউকে বিবাহ করেননি, উনি ব্যাচেলার এতো আপনারা ভালোই জানেন'—আমার পিতা এরূপ উক্তি কখনও কাহারও নিকট করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও লেখিকার কল্পনাপ্রসূত অথবা বুঝি বা লেখিকার এই বয়সে স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। তাঁহার থিসিস প্রমাণ করিবার উৎসাহে লেখিকা শরৎচন্দ্রের ও হিরণ্ময়ী দেবীর উক্তি ও আচরণ এবং গোপালবাবুর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিয়া অন্যের অসমর্থিত বা কাল্পনিক

উক্তি নিজের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করিয়াছেন। আশা করি গোপালবাবু ইহার যথাযোগ্য উত্তর দিবেন।

মুকুল চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

পত্র ৩

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত মূল্যবান রচনার আমি একজন আগ্রহী পাঠক। নিয়মিত পড়ি, আনন্দিত ও উপকৃত হই।

এবার আমার একটি নিবেদন আছে।

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীব রচনা থেকে একটি তথ্য পাওয়া গেল যে গিরিজাকুমার ও তমাললতা বসুর পুত্রশোকে শরৎচন্দ্র শোকার্ত পিতামাতার কাছে দীর্ঘ সান্ত্বনাবাক্য উচ্চারণ করেছেন ; এবং সেই সান্ত্বনাবাক্য থেকে এই ধারণাই প্রশ্রয় পায় যে শবৎচন্দ্রের একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল এবং নিতান্ত অল্প বয়সে সে মারা গেছে। ('দেশ', ৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৬, পৃ. ২৫)

কিন্তু গিরিজাকুমার বসুর স্ত্রী তমাললতা বসু লিখেছেন :

"আমি প্রথম দেখবার সৌভাগ্য লাভ করি শরৎদাদাকে শিবপুরে। সেখানে আমরা কাছাকাছি থাকার দরুন তিনি প্রায়ই যেতেন আমাদের বাড়ীতে তাঁর প্রিয় গড়গডাটি হাতে করে।

তখন থেকেই তিনি আমাদের ভারী স্নেহ কবতেন ও ভাল বাসতেন। আমাদের স্নেহের পুত্র অমিয যখন ম্যাট্রিক পাশ করে সবেতে ফার্স্ট হয়ে সব কটা প্রাইজ ও সোনা রূপোর মেডেল পেলে, ভাল ছেলে বলে ও কামাই না করার দরুনও প্রাইজ পেলে, তখন তাঁব সে কী আনন্দ। প্রাইজ সুদ্ধ তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সকলকে দেখালেন।

আবার ১৯ বছর বয়সে যখন বি এ, পড়তে পড়তে সেই অমিয় দারুণ টাইফযেড রোগে ৪৮ দিন ভুগে মারা গেল, তখন তার কী দুঃখ, কী সমবেদনা —সান্ত্বনা দান। বললেন, 'তোমরা তো ওকে ১৯ বছরের জন্যে পেয়েছিলে ও ভোগ করেছিলে, এই যে আমার মোটেই ছেলেপুলে হয়নি।' তাঁর সে স্নেহ মমতা ভালবাসা জীবনে ভুলবো না।" (তমাললতা বসু : "শরৎদাদা", 'দীপালি', ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮, পৃ. ৩১)

আলোচ্য বিষয়ে তমাললতা বসুর সাক্ষ্য নিতান্ত উপেক্ষাযোগ্য নয়। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর কাছে আমার প্রার্থনা যে তিনি যেন অনুগ্রহপূর্বক একবার এই সাক্ষ্যটি বিবেচনা করে দেখেন।

অরবিন্দ গুহ
কলকাতা

দেশ, ৪৩ বর্ষ : ১৭ সংখ্যা, ৮ ফাল্গুন, ১৩৮২

পত্র ৪

শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে

৪৩ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা (১৭ই মাঘ, ১৩৮২) দেশ পত্রিকায় বাধারাণী দেবী লিখিত 'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য' (২১) পড়লাম। প্রবন্ধটির মধ্যে শ্রীগোপাল রায়ের 'শরৎচন্দ্র' প্রথম খণ্ডের মধ্যে শরৎচন্দ্রের বিবাহ-ব্যাপারে যেসব তথ্য উল্লেখিত আছে তার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

শ্রীগোপাল রায় দীর্ঘদিন শরৎচন্দ্রের ওপর গবেষণা করে এইসব তথ্যকে এমন প্রামাণ্য যুক্তির দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন যাতে কবে তাঁকে উপেক্ষা করা যেমন কঠিন, তেমনি শরৎচন্দ্রের স্নেহধন্যা রাধারাণী দেবী, যিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বেশ কিছুকাল মেলামেশা করে কাছের মানুষ হিসেবে অনেক কিছু জেনেছেন, তাঁর কথাও একেবারে অগ্রাহ্য করা মুশকিল। তবুও শরৎ-সন্ধিৎসু হিসেবে রাধারাণী দেবীর এই প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।

২৪ পৃষ্ঠায় রাধারাণী দেবী লিখেছেন, 'শরৎচন্দ্র তাঁকে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদায় সংসারে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। কিন্তু আইনগতভাবে এই সম্পর্কটিকে বৈধ করে নেননি।'

এ সম্পর্কে আমি মণীন্দ্র চক্রবর্তীর 'দরদী শরৎচন্দ্র' গ্রন্থটির উল্লেখ করছি। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, '...হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রেব বিবাহ ব্যাপারটি গ্রন্থে যে ভাবে উল্লিখিত আছে তাতে দোষ কিছু নেই। তবু এ ব্যাপারটির মধ্যে কোথায় যেন ফাঁক আছে, এমনি একটা মনোভাব তাঁদের মধ্যে স্থান না পেলে পরবর্তীকালে (শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে) সামতাবেড়েয় বৈষ্ণব মতে তাঁরা কণ্ঠি বদল করে নূতন করে বিবাহের বিধি পালন করতেন না।'

মণীন্দ্র চক্রবর্তীর তথ্যটি যদি নির্ভুল হয় তাহলে দেখা যায়, শরৎচন্দ্রের হয়তো প্রথমে বিধিসম্মতভাবে বিবাহ করা সম্ভব হয়নি, পরে তিনি সেটিকে বিধিসম্মতভাবে

গ্রহণ করেন। রাধারাণী দেবী হয়তো শরৎ-সান্নিধ্যে থেকেও এ ব্যাপারটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারেননি।

অন্যত্র রাধারাণী দেবী বলেছেন, (২৪ পৃ.) : 'শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি কখনও শুনেছে—তিনি বিবাহ করেছেন?'

মাসিক বসুমতী, ১৩৬১ আশ্বিন সংখ্যায় (৯০৬পৃ.) শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় 'হিরণ্ময়ী দেবী' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'কেন জানি না, এক দুর্বল মুহূর্তে একটি অসঙ্গত প্রশ্ন বৌদিকে জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা বৌদি! আপনার বিয়ে কোথায় হয়েছিল। রেঙ্গুনে না এখানে? এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানাতে চাই যে, আমি নিজে বহুদিন পূর্বে দাদাকে ঐ একই প্রশ্ন করেছিলাম—তাতে তিনি বলেছিলেন যে, মেদিনীপুরে যখন তিনি ছিলেন তখন এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক অসুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করে তিনি ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করেছিলেন।...বৌদি বললেন যে, তিনি মেদিনীপুরের মেয়ে ও তাঁকে সেখানেই বিবাহ করেছিলেন।'

এখন যদি মণীন্দ্রনাথ রায় ও মণীন্দ্র চক্রবর্তীর তথ্যগুলির মধ্যে কোন ত্রুটি না থাকে তাহলে রাধারাণী দেবীর 'আইনগত সম্পর্কটিকে বৈধ কবে নেননি' এবং 'নিজেব মুখে কেউ কখনও শুনেছে' মেনে নেওয়া যায় না।

কাউকে হেয় করার জন্য নয়, নিছক শরৎচন্দ্রের বিবাহ-ব্যাপারে মত পার্থক্যের জন্য উদ্ধৃতিগুলি পরিবেশন করলাম।

চণ্ডী ঘোষ
হাওড়া-৬

দেশ, ৪৩ বর্ষ : ২০ সংখ্যা, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৮২

পত্র ৫

শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী

হিরণ্ময়ী দেবী কি শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন?

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে প্রশ্নটি তুলেছেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী।

'দেশ' পত্রিকায় "শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য" শিরোনামায় তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধের এক অংশে এ বিষয়ে তিনি আলোচনা করে প্রমাণ করতে চান,—হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না।

তাঁর ঐ রচনা প্রকাশের কয়েক মাস পূর্বে একদিন তিনি টেলিফোনে আমাকে তাঁর এই অভিমত জানান। আমি তখনি তাঁকে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত মত জানাই,

এবং বলি, এ প্রসঙ্গের এখন আলোচনার প্রয়োজন কী? শরৎ-সাহিত্য-বিচারে তার সার্থকতাই বা কোথায়?

টেলিফোনে এই কথোপকথনের বিষয় সেই সময়েই আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে গল্পও করি। আশা ছিল, এ প্রসঙ্গের সেইখানেই শেষ। কিন্তু, এখন দেখি, রাধারাণী দেবী এ সম্পর্কে তাঁর স্বকীয় সিদ্ধান্ত ছাপার হরফে প্রকাশ করেছেন।

অতএব, আমারও এই বিষয়ে যা ব্যক্তিগতভাবে জানা, তা এখন প্রকাশ না করলে পরলোকগত শরৎচন্দ্রের ও হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়।

হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিবাহ হয় নি বলে লেখিকা যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তা প্রকাশিত হয়েছে 'দেশ' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় —৩১ জানুয়ারী, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ২৩-২৫ এবং ৭ ফেব্রুয়ারী, পৃ. ৯৩-৯৫। লেখিকার প্রদত্ত যুক্তি, প্রমাণ ও মন্তব্যগুলি সাজালে যা দাঁড়ায় তাই একে একে উল্লেখ করে সেগুলির প্রতিবাদে আমার মন্তব্য ও প্রমাণগুলি দিই।

এক

লেখিকা লিখেছেন, "পরিবারের প্রায় সকলেই জানতেন,—ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদেরও অজ্ঞাত ছিল না শরৎচন্দ্র বিধিমতে হিরণ্ময়ী দেবীব সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হননি" (দেশ, ৩১/১, পৃ. ২৩)।

লেখিকার উল্লিখিত "ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের" মধ্যে আমি আসি কিনা জানি না, তবে এ কথা আমার জানা নেই। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর কোন ঘটনাচক্রে কিভাবে যোগাযোগ হয় এবং তাঁরা যে তখন "বিধিমতে পবিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নি"—শরৎচন্দ্রের পরিবারবর্গের অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন বলে কখনও শুনি নি, লেখিকাও বলেন না। তাই, মুখে-বলা "জানা"টাও প্রমাণ হতে পারে না। কি করে তাঁরা জানলেন তারই এক প্রমাণ হিসাবে লেখিকার দ্বিতীয় যুক্তির অবতারণা।

দুই

শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী "কোনো দিন হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্ন গ্রহণ করতেন না...তার সাক্ষী এখনও অনেকেই জীবিত আছেন।" (দেশ ৩১/১, পৃ. ২৩)। এই সাক্ষীরা কে কে জীবিত আছেন, লেখিকা তা প্রকাশ করেন নি। তবে, তিনি নিজে যে এর সাক্ষী, তাও দাবি করেন না। এ সম্পর্কে আমারও নিজের কিছু জানা নেই। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে—শিবপুরে, সামতাবেড়ে, বালিগঞ্জে—বহুবার গিয়েছি, অনিলা দেবীর এই অন্নগ্রহণ না করার কথা কারো কাছে কখনো শুনি নি। অতএব, রাধারাণী দেবীর এখনকার এই উক্তি আমার কাছে অভিনব সংবাদ।

তিনি নিজেই স্বীকার করেন, হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র "স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদায় সংসারে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন" (দেশ ৩১/১, পৃ. ২৪)। অথচ, নিকটে শরৎচন্দ্রের দিদির বাড়ি—দুই বাড়ির পরিবারবর্গের মধ্যে যাতায়াত আছে, কিন্তু দিদি "কোনো দিন হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্ন গ্রহণ করতেন না"—যদিও "হিরণ্ময়ী দেবী ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন সত্য" এবং "হিরণ্ময়ী দেবীর প্রকৃতি ও আচরণ দেখে কারুর সন্দেহ হওয়ার উপায় ছিল না তিনি বিবাহিতা নন" (দেশ ৭/২, পৃ. ৯৩)।

অনিলা দেবী ভাই-এর বাড়িতে এসে ভ্রাতৃ-বধূর "স্পর্শিত অন্নগ্রহণ" কখনো করেন না,—এত বড় দৃষ্টিকটু এবং শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবীর পক্ষে লজ্জাদায়ক ও অপমানসূচক ঘটনা কারুর মনে কোন "সন্দেহ" জাগাতো না,—এও কি বিশ্বাসযোগ্য?

কিন্তু, ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। অনিলা দেবী হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্ন গ্রহণ করতেন—এইটেই স্বাভাবিক ও প্রকৃত বৃত্তান্ত। লেখিকার অনামা সাক্ষীদের বিপবীত সাক্ষ্য পাওয়া যায় অন্তত তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে।

প্রথম, এ অনিলা দেবীরই কন্যা,—শ্রীমতী পারুল দেবী। শ্রীগোপালচন্দ্র রায় আমাকে লিখে জানিয়েছেন : "অনিলা দেবীর কন্যা পারুল দেবী (আজও জীবিতা, বয়স বোধ করি সত্তরের কাছে) আমাকে বলেছেন, তাঁর মামীমার (হিরণ্ময়ী দেবীর) ছোঁয়া অন্ন খেতে তাঁর মাকে (অনিলা দেবীকে) অসংখ্যবার দেখেছেন।"

দ্বিতীয়, শরৎচন্দ্রের আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী,—শ্রীমতী মুকুল চট্টোপাধ্যায়। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রতিবাদপত্রে জানিয়েছেন, অনিলা দেবী কোনদিন হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্ন গ্রহণ করতেন না—এই উক্তি "সম্পূর্ণ মিথ্যা" (দেশ ২১.২.৭৬, পৃ. ২৫২)।

তৃতীয়,—শ্রীনকুলচন্দ্র পতি। এঁর দেশ সামতাবেড়ে। নকুলচন্দ্রের ভিটাব পাশেই শবৎচন্দ্রের বাড়ি তৈরি হয়, সেখানে এসে তাঁরা বসবাস শুরু কবেন। সেই থেকেই নকুলচন্দ্র তাঁদের সংস্পর্শে আসেন. শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজনও হন। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল। কলকাতায় এলে শরৎচন্দ্রেব বালিগঞ্জের বাড়িতে নকুলচন্দ্র তাঁদের পরিবারভুক্ত হয়ে থাকতেন। নার্সিং হোম-এ শবৎচন্দ্রের সেবার জন্যও তিনি কলকাতায় আসেন। অপারেশনের পর শরৎচন্দ্রের দেহে যে রক্ত দেওয়া হয় নকুলচন্দ্রই সে রক্ত দান করেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরও নকুলচন্দ্র প্রায় তিরিশ বছব শরৎচন্দ্রের বালিগঞ্জের বাড়িতেই তাঁদের পরিবারভুক্ত হয়ে ছিলেন। রাধারাণী দেবীরও তিনি সুপরিচিত। 'দেশ' পত্রিকায় রাধারাণী দেবীর লেখাগুলি পড়ে নকুলচন্দ্র বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হন, আমার সঙ্গে এসে দেখা করেন এবং নিজে থেকে লিখে দিয়ে যান : "বড়দিদিমার (হিরণ্ময়ী দেবীর) স্পর্শিত অন্ন দিদিমা (অনিলা দেবী) গ্রহণ করতেন না বলে রাধারাণী দেবী যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ ভুল। আমি নিজেব চোখে অনিলা দেবীকে হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্ন গ্রহণ করতে দেখেছি ব হু বা র,—সামতাবেড়ের বাড়িতে ও বালিগঞ্জের বাড়িতেও।"

নকুলচন্দ্র বলেন, এই বিষয়ে সমর্থনকারী আরও সাক্ষী জীবিত আছেন।

এখন, এ ব্যাপারে বিশ্বাস করা উচিত কাদের,—রাধারাণী দেবীর অনামা সাক্ষীদের, না, এই প্রত্যক্ষদর্শীদের?

তিন

হিরণ্ময়ী দেবী নিজ মুখে তাঁদের বিবাহকে "বিয়ে" বলে উল্লেখ করে গেছেন, —তবুও লেখিকা এটা বিবাহের "ঐতিহাসিক প্রমাণ" বলে গ্রহণ করতে রাজি নন। তিনি লেখেন, হিরণ্ময়ী দেবী "সাধারণ অর্থেই ওটি ব্যবহার করেছেন,—শরৎচন্দ্রের অর্ধাঙ্গিনী হওয়াই তাঁর 'বিয়ে' হওয়া।" (দেশ, ৩১/১, পৃ. ২৪)।

হিরণ্ময়ী দেবীর নিজের বিবাহ সম্পর্কে এই স্বীকৃতি এইভাবে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। "সাধারণ অর্থে" হিন্দু নারীর কাছে 'বিয়ে'—বিবাহই। বিয়ে না করে কারও "অর্ধাঙ্গিনী হওয়া" বিয়ে নয়,—এ কথা হিরণ্ময়ী দেবীরও অবশ্যই অজানা ছিল না। তবুও, রাধারাণী দেবী তাঁর কথার মূল্য দিতে রাজি নন, বিবাহের প্রমাণ বলে স্বীকার করে নিতেও চান না!

চার

এর পর লেখিকা শরৎচন্দ্রের উইলের কথা তোলেন। শরৎচন্দ্র উইলে হিরণ্ময়ী দেবীকে "আমার স্ত্রী" বলে বর্ণনা করে সই করে গেছেন। রাধারাণী দেবী এই সম্পর্কে লেখেন, "তাঁর উইলে 'ওয়াইফ' শব্দটি আছে, শরৎচন্দ্র নিঃসঙ্কোচেই আইনের ঘোরপ্যাঁচ কাটানোর সুবিধার জন্য এটর্নীর লিখিত তাঁর ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে নিজের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সহায়তা করে গিয়েছেন আমরা সকলেই তা জানি" (দেশ, ৩১/১, পৃ. ২৪)।

কি করে "সকলে" এবং লেখিকাও শরৎচন্দ্রের মনের এই গূঢ় অভিসন্ধি জানলেন, বুঝি না। রাধারাণী দেবীকে একদিনও নার্সিং হোম-এ দেখি নি। উইল করার সময়ও তিনি ছিলেন না। তারপরও শরৎচন্দ্র যে ক'দিন জীবিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে লেখিকার দেখা হয় নি। অতএব, উইলে হিরণ্ময়ী দেবীর এই "স্ত্রী" অভিধা লেখিকা উড়িয়ে দিতে চান দুইটি কারণ দেখিয়ে :

(ক) এটর্নী লিখিত উইলে 'ওয়াইফ' শব্দেব প্রয়োগ। কিন্তু, এটর্নী যে স্বয়ং নির্মলচন্দ্র চন্দ্র (তিনি উইলের একজন সাক্ষীও) এবং শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অকৃত্রিম ভক্ত,—শরৎচন্দ্র নির্মলচন্দ্রের বাড়িতে বহু বার গেছেন, নির্মলচন্দ্রও অবসর পেলেই শরৎচন্দ্রের নিকটে আসতেন, এ সব কথা লেখিকা অবশ্যই জানেন, —তবুও নির্মলচন্দ্রকে শুধু একজন 'এটর্নী' আখ্যায় উল্লেখ করেন। শরৎচন্দ্র যেভাবে তাঁর উইল লেখা হবে বলেছিলেন, নির্মলচন্দ্র ঠিক সেই মতই উইল প্রস্তুত করেন, —এ বিষয়ে পরে বলছি।

(খ) "আইনের ঘোরপ্যাঁচ কাটানোর সুবিধার জন্য" এবং "নিজের ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে" উইলে 'ওয়াইফ' শব্দের ব্যবহার—লেখিকার এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিভাবে উইল সম্পাদিত হয় রাধারাণী দেবীর জানা সম্ভব নয়, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হয়, এ বিষয়ে আইন সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান নেই। উইলখানি অতি সাধারণ দলিল, দেখলেই তা প্রমাণ হয়। হিরণ্ময়ী দেবীকে 'ওয়াইফ' আখ্যা দিয়ে "আইনের ঘোরপ্যাঁচ কাটানো"র বা "নিজের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত" রাখার কোন প্রয়োজনই ওঠে নি। উইলে যে কোন ব্যক্তিব অনুকূলে সম্পত্তি দানের আইনে বাধা নেই। বহু উইলে দেওয়াও হয়। হিরণ্ময়ী দেবী 'বিবাহিতা স্ত্রী' না হলেও তাঁর নাম উল্লেখ করেও তাঁকে সম্পত্তি দেওয়া যেত। কিন্তু, সাধারণত উইলদাতার সঙ্গে গ্রহিতার কোন সম্পর্ক থাকলে তার বর্ণনা দেওয়াই প্রথা। এ বর্ণনা যে দিতেই হবে এমন কোন আইন নেই। এখানে সম্পর্ক থাকায় শরৎচন্দ্র নিজেব মুখেই হিরণ্ময়ী দেবীকে "আমার স্ত্রী" জীবনস্বত্ব পাবেন বলে নির্মলচন্দ্রকে লিখতে নির্দেশ দেন। নির্মলচন্দ্রও সেই মত উইল তৈরি করেন। এ সকল কথাবার্তা আমার সাক্ষাতেই হয়। হিবণ্ময়ী দেবীকে "আমার স্ত্রী" বলে শরৎচন্দ্র উল্লেখ করেন, স্বকর্ণে শুনি। লেখিকা লিখেছেন, "শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে কেউ কি কখনও শুনেছে —তিনি বিবাহ করেছেন? শরৎচন্দ্র কখনও কারো কাছে এ কথা উচ্চারণ করেন নি আমি জানি।" (দেশ ৩১/১, পৃ. ২৪)।

কি করে লেখিকা জানলেন, জানি না। হিরণ্ময়ী দেবীকে "আমাব স্ত্রী" বলে শরৎচন্দ্রের ঐ বর্ণনা আমি নিজে শুনেছি, নির্মলচন্দ্রও আজ জীবিত থাকলে এ কথার সমর্থন করতেন। উইলে তাঁর সাক্ষীরূপে স্বাক্ষরও সেই প্রমাণই করে।

শরৎচন্দ্র "স্ত্রী" শব্দের অর্থ জানতেন না, অথবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে একটা মিথ্যা সম্পর্কেব রটনা করে গেছেন,—অকল্পনীয়।

এই উইল সম্পাদন বিষয়ে শরৎচন্দ্র কতখানি সতর্ক ছিলেন, লেখিকার জানা নেই। উইল হয়ে যাবার পব নির্মলচন্দ্রের দপ্তর (G C Chunder & Co) থেকে আমার কাছে উইলের একটি কপি ও দলিল সম্পাদনা সংক্রান্ত সলিসিটরের দপ্তবে সংরক্ষিত দিনপঞ্জী—ডায়েরীর প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করে সেই সময়ে পাঠিয়ে দেওযা হয়। সে কাগজগুলি এখনও আমার নিকট রয়েছে। সেই ডায়েরীব অনুলিপি থেকে দেখা যাবে কিভাবে উইলটি সম্পাদিত হয়।

শরৎচন্দ্র তখন পার্ক নার্সিং হোম-এ। ১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৮ সাল। শরৎচন্দ্রের অস্ত্রোপচার হবে স্থির হয়েছে। তিনি আমাকে বলেন, নির্মলকে এখানে আসতে খবর দাও, আজ আমি উইল করব।

নির্মলবাবুকে আমি টেলিফোন করি। পরের ঘটনাবলী এটর্নী অফিস থেকে তৎকালে প্রেরিত ডায়েরীর কপি থেকে উদ্ধৃত করি :

Tuesday the 11th January 1938.
Sarat Chandra Chatterji
Re : Will

Attending on Babu Umaprasad Mukerji on the 'phone when he asked our Mr. Chunder to come to the Park Nursing Home as client was wanting him (3.30 p.m.).

Attending on client at 4 p.m. at the Park Nursing Home when he asked our Mr. Chunder forthwith to draw the will.

Returning to Office when our Mr. Chunder was informed by Mr. Mukerji on the 'phone that client would not like Mr. Chunder's office to know of the contents of the will.

Writing out the will by our Mr Chunder and attending therewith again (5.30 p.m.) at Park Nursing Home when after reading same client corrected the description of the house and the correction was embodied in the will and thereafter client signed same and our Mr Chunder and Mr Mukerji attested at client's request

G. C. CHUNDER & CO.

উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায়, উইল সই করার আগে শরৎচন্দ্র সেটি পড়েন, এক জায়গায় সামান্য একটু ভুল সংশোধন করান, এবং তারপর স্বাক্ষর করে নির্মলবাবুকে ও আমাকে উইলের 'সাক্ষী' হতে বলেন। আমবা দুজনে সেই মত সাক্ষীরূপে সইও করি। উইলে দু জায়গায স্ত্রী—'ওয়াইফ' শব্দটির উল্লেখ আছে : এক জায়গায় আমার স্ত্রী 'My wife' শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী এবং অন্যত্র শুধু 'My wife', নাম উল্লেখ না করে।

এই উইল ছাড়াও হিরণ্ময়ী দেবীকে "স্ত্রী" বর্ণনা করে শরৎচন্দ্রেব সই-করা আরো এক স্বীকৃতি আমার দেখা। তাঁর মৃত্যুর পর হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের একটি জীবন-বীমাপত্র—Life Insurance Policy আমাকে দেখান। তাতে প্রকাশ পায়, মৃত্যুর বহু পূর্বে শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে 'স্ত্রী' বর্ণনা করে তাঁর nominee মনোনযন করেন এবং বীমা অফিসে যথাবিধি আইনত জানিয়েও রাখেন। এই মনোনয়নের বলে হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর প্রাপ্য টাকাও পান।

এর পরও কি আমাদের এখন অপরের মুখের কথা শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন না?

• পাঁচ

রাধারাণী দেবী লিখেছেন, উইল করার আগে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ রেজেস্ট্রি করানোর আলোচনা ও পরামর্শ একাধিকবার হয়। তার বিস্তারিত বিবরণও তিনি দেন। বিবাহ-না-হয়ে-থাকার এও এক প্রমাণ বলে তিনি দেখাতে চান।

সারা জীবন স্বামী-স্ত্রীরূপে কাটিয়ে মৃত্যুর আগে রেজেস্ট্রি করে বিবাহ "বৈধ" করিয়ে নেওয়ার এই পরামর্শ কাহিনী যে কতখানি অবাস্তব এবং পাত্র-পাত্রীর পক্ষে

কী গভীর লজ্জার ও অসম্মানের ব্যাপার তা কী রাধারাণী দেবীর বোঝবার ক্ষমতা নেই?

সেকালে রেজেস্ট্রি করে বিবাহকে বলা হত,—'সিভিল ম্যারেজ'। লেখিকা তা জানেন। তবুও তিনি তাঁর বর্ণনায় দেখিয়েছেন, এটা যেন অতি সাধারণ তুচ্ছ একটা ঘরোয়া ব্যাপার, হিরণ্ময়ী দেবীকে সম্পত্তিতে শুধু অধিকার দেবার জন্যই একটা "কাগজে সই" করা! শরৎচন্দ্রকে তাঁর উপদেষ্টারা বোঝাতেন, "ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে তাঁদের বৈঠকখানায় আনিয়ে নিরালায় একটা সই করিয়ে সেই কাগজখানি তাঁদের কাস্টডিতে তুলে রেখে দিতে চান" (দেশ ৭/২, পৃ. ৯৩)। কিন্তু, লেখিকা কি জানেন না, সেই ধরনের বিবাহের আগে নোটিশ প্রদানের নিয়ম? আর, সই কি শুধু শবৎচন্দ্রকেই করতে হত? রেজিস্ট্রাবের সম্মুখে এসে হিরণ্ময়ী দেবীকেও বলতে হত, তিনি অবিবাহিতা এবং এখন শরৎচন্দ্রকে বিবাহ কবতে চান। তাই সাক্ষীসাবুদ রেখে উভয়ে আজ রেজিস্টারে সই করে বিবাহ করছেন! (আইনত সে বিবাহে তিনজন সাক্ষীব উপস্থিতি ও স্বাক্ষবও প্রয়োজন হত। মূল সই-কবা রেজিস্টার সরকারী দপ্তরে থাকত)।—মৃত্যুব আগে এইভাবে বিবাহ করার পরামর্শ হতে পারে, কখনো কি ভাবা যায়? আরও এক কথা। সেকালে এই ধরনের 'সিভিল ম্যারেজ'-এ রেজেস্ট্রিকরণই ছিল বিবাহের আইননির্ধারিত এক পদ্ধতি ও প্রমাণ। রেজিস্ট্রেশনই সেই বিবাহের অনুষ্ঠান। সেই দিন থেকে বিবাহিত জীবনেরও শুরু। এতে অবিবাহিত নর-নাবীর প্রাগ-রেজেস্ট্রি আমলের "অবৈধ" জীবনধারাকে পরিশুদ্ধ বা "বৈধ" করে দিত না।

ভাগ্যক্রমে শরৎচন্দ্রের জীবনে সে সমস্যার কোন স্থানই ছিল না।

আমার সাক্ষাতে এই ধবনের আলোচনা কখনো হয়নি, অসাক্ষাতে হওয়ার কথাও শুনি নি।

শরৎচন্দ্রের "বিশেষ ঘনিষ্ঠ হিতার্থী বন্ধু"গণ যদি নিজেদের মধ্যে এইভাবে রেজেস্ট্রি করার আলাপ-আলোচনা-পরামর্শ করেই থাকেন, সে সব তাঁদের কল্পলোকের গালগল্প ; হয়তো, শরৎচন্দ্রও যাতে প্রশ্রয় দিয়ে মজা দেখতেন এবং সে সব মজলিস-এ, রাধারাণী দেবীর বর্ণনাতেই দেখা যায়, শরৎচন্দ্র বসে থাকতেন "নিরুত্তর নির্বিকার" (দেশ ৭/২, পৃ. ৯৩), কী জানি, মুচকে মুচকে হাসতেনও কি না,—কেননা, সেই রকমের রহস্য-পরিহাস-প্রিয় ছিলেন শরৎচন্দ্র।

তাঁর "হিতার্থী বন্ধুদের" এই তথাকথিত পরামর্শ কি শরৎচন্দ্রের বিবাহ-না-হওয়ার একটা প্রমাণরূপে কখনো গ্রাহ্য হতে পারে?

ছয়

রাধারাণী দেবীর তূণে হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহকে আক্রমণ করার শেষ শাণিত অস্ত্র, শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্রের প্রদত্ত তথ্য। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রকাশচন্দ্র

নরেন্দ্র দেবের 'শরৎচন্দ্র' বই-এ লিখে দেন, সে বই-"এর মধ্যে কোন অসত্য বা অতিরঞ্জন নেই" এবং এই লেখাটি লেখবার সময়ে প্রকাশবাবু বলেছিলেন, —"দাদা যে কখনও কাউকে বিবাহ করেন নি, উনি ব্যাচেলার, এ তো আপনারা ভালোই জানেন। লিখিতভাবে ওঁকে বিবাহিত বলে প্রচার মিথ্যাচার", (দেশ, ৩১/১, পৃ. ২৪)। এই উক্তির উপরই নির্ভর করে রাধারাণী দেবীর স্বামী, নরেন্দ্র দেব, তাঁর বই-এ হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্রের "সঙ্গিনী" বলে প্রচার করেন, তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী বলেন না।

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, প্রকাশবাবুই বা জানলেন কি করে বিবাহ হয় নি? হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কিভাবে যোগাযোগ হয় প্রকাশচন্দ্র তো সে সময়ে ছিলেন না, দেখেনওনি, এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জ্ঞানও থাকতে পারে না। তবে কিসের ভিত্তিতে এবং কি কারণেই বা তিনি জোর গলায় এ কথা বলে যান? এবং, প্রথম বলছেন কখন? "শরৎচন্দ্রের তিরোধানের কয়েক মাস পরে" (দেশ, ৩১/১, পৃ. ২৫)।

একটি অতি অপ্রীতিকর বিষয় এইখানে আমাকে বলতেই হয়। এ সম্পর্কে লিখতে আমার কলমে বাধে, মনে বেদনা জাগে। কারো সম্বন্ধে অপ্রিয় ভাষণ —সত্য হলেও—আমার রুচি ও সংস্কার বিরুদ্ধ। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে না বলেও উপায় নেই, তাই যত সংক্ষেপে হয় লিখি।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের উইল করার প্রয়োজনের বিষয়ও ওঠে।

উইলখানি অতি ক্ষুদ্রকায়। বক্তব্য মাত্র বারো লাইনে। (গোপালচন্দ্র রায়ের "শরৎচন্দ্র" [১ খণ্ড—জীবনী] গ্রন্থের ১ম সংস্করণের ৪৯২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে)।

উইলের প্রথম শর্ত, স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে সমস্ত সম্পত্তি জীবনসত্বে দান।

[সে সময়কার আইন অনুযায়ী, উইল না করে গেলেও, স্ত্রীর এই অধিকারই ছিল। জানি না, মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি সতর্ক করিয়েছিল কিনা, যে, হিরণ্ময়ী দেবী তাঁর প্রকৃতই স্ত্রী তা লিখিতভাবে সুস্পষ্ট ঘোষণা করে যাওয়া প্রয়োজন।] এর পরের শর্ত—তাঁর স্ত্রীব জীবনস্বত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁর ভ্রাতা (অর্থাৎ প্রকাশচন্দ্র) ও তাঁর পরিবারবর্গ শরৎচন্দ্রের অশ্বিনী দত্ত রোড-এর বাড়িতে যেমন বসবাস করছেন তেমনি করতে থাকবেন।

[উইলে এ শর্ত না থাকলে আইনত তাঁদের এভাবে বসবাসের অধিকার থাকতো না।]

উইলের পরের শর্ত, শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যুর পব প্রকাশচন্দ্রের তৎকালীন বর্তমান পুত্র বা পুত্রগণ পূর্ণস্বত্বে সম্পত্তির অধিকারী হবে। এ ছাড়া, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা ব্যয়িত হবার ব্যবস্থাও থাকে।

উইলের এই হোল বিষয়বস্তু।

উক্ত শর্তগুলি থেকে দেখা যায়, তৎকালীন আইন অনুযায়ী, স্ত্রীর মৃত্যুর পর,

ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র জীবিত থাকলে তাঁরই পূর্ণ স্বত্বে সম্পত্তি পাবার কথা, উইলের বলে প্রকাশচন্দ্রের সেই অধিকার লুপ্ত হয়ে তাঁর পুত্রের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

অশ্বিনী দত্ত রোড-এর বাড়িতে বসবাসের অধিকার ছাড়া ত্যক্ত সম্পত্তিতে প্রকাশচন্দ্রকে কোন স্বত্বাধিকার না দেওযা উইলের প্রধান লক্ষণীয বিষয়। যে কোন কারণেই হোক, এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সুদৃঢ় ধারণা ছিল, সম্পত্তি প্রকাশচন্দ্রের হাতে গেলে রক্ষা পাবে না।

উইল করার পাঁচ দিন পরে শরৎচন্দ্রের দেহাবসান হয়। মৃত্যুর পরই উইলেব শর্তগুলি প্রকাশচন্দ্র জানতে পারেন এবং নিরতিশয় ক্ষুব্ধ, বিচলিত ও ক্রোধান্বিত হন। তাঁর এই মনোভাব আদৌ বিচিত্র নয়।

এরই "কয়েক মাস পরে" তিনি বাধারাণী দেবীর উদ্ধৃত শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে উক্তিগুলি করেন, "দাদা যে কখনও কাউকে বিবাহ করেন নি, উনি ব্যাচেলাব" ইত্যাদি। এবং নরেন্দ্র দেবের বই-এ বর্ণিত ঘটনাবলীর সমর্থন কবে লিখে দেন।

উইলের মর্ম জানার পর শরৎচন্দ্রের ও হিরণ্ময়ী দেবীর বিরুদ্ধে প্রকাশচন্দ্রের মনের গতি ও তার বহিঃপ্রকাশ কীরূপ রূঢ় ও কঠোর হয়, তা আমার কিছু জানা থাকলেও প্রকাশযোগ্য নয়, প্রচার করার সার্থকতাও নেই। তবে, সেই সময়ে তিনি কতখানি অসত্যের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন, তার একটি লিখিত প্রমাণ এখনও আমার নিকট রয়েছে। দুঃখের সঙ্গে তা এখানে প্রকাশ করছি।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় আট মাস পরে—৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে তিনি এক চুক্তিপত্র নিজে লিখে স্বাক্ষর করে কলকাতার এক প্রখ্যাত পুস্তক প্রকাশকেব নিকট শবৎচন্দ্রের একখানি গ্রন্থ প্রকাশনার স্বত্ব দান করেন, স্ট্যাম্পের উপর সই করে কিছু অর্থও নেন এবং সেই চুক্তিপত্রে নিজেকে "আমি আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হিসাবে" বর্ণনা করেন। উইলেব কথা লেখেন না, হিরণ্ময়ী দেবীর নামও উল্লেখ করেন না। সেই প্রকাশক পরে উইলের খবর জানতে পেবে ও এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। সেই চুক্তিপত্রখানিও আমাকে দিয়ে যান। সে কাগজ এখনও আমার কাছে রয়েছে। প্রকাশকও জীবিত।

সেই প্রকাশচন্দ্রের তৎকালীন তথাকথিত অসমর্থিত উক্তিগুলির উপর নির্ভর করে রাধারাণী দেবী এখন প্রমাণ করতে চান—হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন, প্রভাসচন্দ্র স্বামী বেদানন্দ। তাঁর মুখেও হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহের কথা কেহ কেহ শুনেছেন। ('কথাসাহিত্য', শারদীয়া সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৮২, শ্রীভোলানাথ রায়: 'টুকরো কথা', পৃ. ২৫)। তা ছাড়া, শরৎচন্দ্রের শ্বশুর মহাশয়কেও শরৎচন্দ্রের শিবপুরের বাড়িতে অনেকে আসতে দেখেছেন। শরৎচন্দ্র যে তাঁকে আর্থিক সাহায্যও

করতেন, রাধারাণী দেবী নিজেও তা স্বীকার করেন। (দেশ, ৩১/১, পৃ. ২৩)। সেকালে কোন পিতা তাঁর অবিবাহিতা কন্যা অনাত্মীয় এক ব্যক্তির নিকট স্ত্রীর মতন থাকেন, তাঁকে সেই বাড়িতে দেখতে আসেন, এও কি সম্ভব? পিতা আসেন তাঁর বিবাহিতা কন্যা ও জামাতার নিকট, এই-ই তো স্বাভাবিক।

আইন আদালতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তির বিবাহের প্রমাণ দিতে গেলে যিনি বিবাহে পৌবোহিত্য করেছিলেন, অথবা যাঁরা বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সাক্ষ্য, অথবা বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রাদি বিচারকালে পেশ করা হয়। (শরৎচন্দ্রের লোকান্তরের বহু পরে হাল আমলে স্বাধীন ভারতে বিবাহের নতুন আইন কানুনের প্রবর্তন হয়েছে)। শবৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ প্রমাণ করতে সেই শ্রেণীর সাক্ষী বা প্রমাণ কিছু নেই। থাকবার কথাও নয়। এই ধরনের প্রমাণের অভাবে আদালত বিচার করে দেখেন, দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীভাবে থাকতেন কিনা, নিজেদের বিবাহ স্বীকার করতেন কিনা, আত্মীয়স্বজনরাই বা তাঁদের কি দৃষ্টিতে দেখতেন।

রাধারাণী দেবী নিজেই স্বীকার করেন শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে "স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদায় সংসারে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন" (দেশ, ৩১/১, পৃ. ২৪) এবং "হিরণ্ময়ী দেবীর প্রকৃতি ও আচবণ দেখে কারুর সন্দেহ হওয়ার উপায় ছিল না তিনি বিবাহিতা নন" (দেশ, ৭/২, পৃ. ৯৩)। তাঁর পরনে "চওড়া লালপাড় তসরেব শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, সাদা শাঁখা আব এক গোছা ঝকঝকে সোনার চুড়ি"-হাতে (দেশ ৭/২, পৃ. ৯৫)। এসব রাধারাণী দেবীর প্রদত্ত হিরণ্ময়ী দেবীর সধবাকালের বর্ণনা। শরৎচন্দ্রের শ্রাদ্ধ দিবসে পরলোকগত স্বামীর উদ্দেশে শাস্ত্রানুযায়ী স্ত্রীর করণীয় অনুষ্ঠানাদিও তিনি করেন, আমি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। এর পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, হিন্দু বিধবার বেশে বৈধব্যজীবনের নিয়ম পালন করে গেছেন, তাও দেখেছি। এ ছাড়া, শরৎচন্দ্র তাঁকে তাঁর স্ত্রী বলে উল্লেখ করেছেন আমার স্বকর্ণে শোনা, উইলে ও ইনশিওরেন্স পলিসিতেও সেই মত লেখা ও তাঁর সই করা। হিরণ্ময়ী দেবীও তাঁদের বিয়ে হয়েছিল নিজ মুখেই বলে যান।

এসব সত্ত্বেও, তাঁদের বিবাহ হয়নি এখন প্রচার করা যেমন অশোভন ও অসমীচীন, রাধারাণী দেবীর যুক্তি-প্রমাণগুলিও তেমনি অসার ও ভিত্তিহীন।

এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে রাধারাণী দেবীর রচনা সম্পর্কে আর একটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করি। সেটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত। অন্যের কাছে তার মূল্য কতোখানি, জানি না।

রাধারাণী দেবী স্বীকার করেন, শরৎচন্দ্র তাঁর কাছে যেসব কথা বলেছিলেন, অথবা অপরের কাছে কথিত বলে রাধারাণী দেবী লোকমুখে শুনেছিলেন, সেই সব কথা তিনি সে সময়ে লিখে রাখেননি। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পরে কেবলমাত্র

"স্মৃতিকে অবলম্বন করে" "আমার যতদূর মনে আছে" বলে নানান কথা এখন তিনি লিখছেন। অথচ তাঁর রচনায় বহু স্থলেই দেখা যায়, উদ্ধৃতিচিহ্নের সাজ পরিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা তিনি শরৎচন্দ্রের উচ্চারিত কথা বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের উদ্ধৃতির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু আছে, যথা, নিরুপমা দেবী, শান্তি দেবী, তাঁর সন্তান, হিরণ্ময়ী দেবীর নিত্য পাদোদকপান সম্পর্কে পরিহাস ইত্যাদি ত আছেই, এমন কি শরৎচন্দ্র কিভাবে তাঁর উপন্যাস রচনা করছেন, চরিত্রগুলিকে কিভাবে ফুটিয়ে তুলবেন—এবং সেসব চরিত্র সৃষ্টির যুক্তিই বা কি, এসবই বক্তৃতা দিয়ে রাধারাণী দেবীর সাক্ষাতে বলে গেছেন, শ্রোতাদের সঙ্গে তর্কাতর্কিও করেছেন। শরৎচন্দ্রের মুখে বসানো কথাগুলি এমনিভাবে লেখিকা এতদিন পরে পরিবেশন করছেন যেন সেকালে টেপ-রেকর্ডে ধরে রাখা শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাবলী এখন আবার মেশিন চালিয়ে শ্রোতাদের শোনানো।

শুধু একটা কথাই এখানে সবিনয়ে নিবেদন করতে পারি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমারও কথঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁকে অতি নিকটে পাবার, তাঁর মুখে বহু কথা শোনবার আমারও সৌভাগ্য হয়। রাধারাণী দেবী এখন শরৎচন্দ্রের মুখের কথা বলে যে-সব উদ্ধৃতি সাজিয়েছেন, শরৎচন্দ্র কখনো সেভাবে কথা বলতেন না, ঐ ধরনের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষাও প্রয়োগ করতেন না, নিজের জীবনের গূঢ় কথা কখনো প্রকাশও করতেন না। অতএব, রাধারাণী দেবীর ঐ সব উদ্ধৃতির বহুলাংশই শরৎচন্দ্রের জীবনী রচনায় ও তাঁর সাহিত্য বিচারে, অন্য কোন প্রমাণ অভাবে, নির্ভরযোগ্য ও উপযোগী উপাদান রূপে স্বীকার করে নিতে আমি অক্ষম।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১২৬ আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলি-২৫

দেশ, ৪৩ বর্ষ: ২৪ সংখ্যা, ২৭ চৈত্র, ১৩৮২

পত্র ৬

শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী

১০ই এপ্রিল তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী' সম্পর্কীয় লেখাটি পড়লাম।

সরোজবাবু লিখেছেন—শৈশবভূমি দেবানন্দপুরের প্রতি শরৎচন্দ্রের গভীর আকর্ষণ থাকলেও হিরণ্ময়ী দেবীর কারণেই সেখানে তাঁহার যোগাযোগ ছিল না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—হিরণ্ময়ী দেবীর কারণেই শৈশবভূমি দেবানন্দপুরের

সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল না, এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফেরার পর অনেকবারই দেবানন্দপুরে গেছেন এবং দেবানন্দপুরের নানা কাজের সঙ্গেও যুক্ত থেকেছেন। এ সম্পর্কে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবানন্দপুরে যে পল্লী-সেবক সমিতি গঠিত হয়, শরৎচন্দ্র ছিলেন তার সহ-সভাপতি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর তারিখের দৈনিক ফরোয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায়, ক'দিন আগে ৩রা তারিখে দেবানন্দপুরে পল্লী-সেবক সমিতির ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র যে প্রস্তাব করেছিলেন ও ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ঐ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র সেদিন সামতাবেড় থেকে দেবানন্দপুরে গিয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, শরৎচন্দ্র একবার তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেবানন্দপুরে গিয়েছিলেন। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকেও জানা যায়, দেবানন্দপুরের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ভালই যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর কিছু দিন আগেও শরৎচন্দ্র একবার দেবানন্দপুরে গিয়েছিলেন। তিনি এক সময় ওখানকার পাঠাগারে বহু বই ও আলমাবি দিয়েছিলেন। সে সব আজও দেবানন্দপুরের পাঠাগারে আছে।

সরোজবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্রকে বার-বার ১২০ টাকা হিসাবে সংসার-খরচ দিবার পাকাপাকি প্রতিশ্রুতি পাঠাইবার পরে শরৎচন্দ্র বর্মা মুলুকের চাকরি ছাড়িয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

আমার বক্তব্য—এ কথা সত্য নয়। শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে হঠাৎ দুরারোগ্য পা ফোলা রোগে আক্রান্ত হলে, কবিরাজী চিকিৎসা করাবার জন্য অফিসে এক বৎসরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসবেন স্থির করেন। সেই সময়েই হরিদাসবাবু শরৎচন্দ্রকে কলকাতায় থাকাকালে মাসে ১০০ টাকা করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। ঐ ১০০ টাকার মধ্যে ভারতবর্ষে লেখার জন্য ৫০ টাকা এবং তাঁর বই বিক্রির হিসাব থেকে ৫০ টাকা। এ কথা হরিদাসবাবু নিজে আমাকে বলেছিলেন এবং তাঁর জীবিতকালেই তাঁদের দোকান থেকে প্রকাশিত আমার 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' গ্রন্থে তাঁরই নির্দেশে ঐ কথা লিখেছিলাম।

শরৎচন্দ্র ছুটি নিয়ে আসবেন স্থির করলেও অফিসে শেষ দিন উপরওয়ালা সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছিলেন। হরিদাসবাবুও তাঁর আশ্বাস দেওয়া ঐ হিসাবের ১০০ টাকা করে অনেক দিন দিয়েছিলেন।

সরোজবাবু লিখেছেন—১৯১২ সালে শরৎচন্দ্র যখন বর্মা হইতে চাকরিতে ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসেন, তখন মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে হিরণ্ময়ী দেবীর সহিত পরিচিত হন।

এ কথাও সম্পূর্ণ অসত্য। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শরৎচন্দ্র অফিসে এক মাসের ছুটি নিয়ে যখন দেশে আসেন, তখন তিনি কলকাতায় ছিলেন না।

ছিলেন হাওড়ায় খুরুট রোডের কাছে একটা বাসায়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের সে-বাসায় গিয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্রের তখনকার প্রায় প্রতিদিনের কথাই তিনি তাঁর 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখে গেছেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের বাসায় যে আগুন লেগেছিল, সেদিন হিরণ্ময়ী দেবীও সেখানে ছিলেন। এ কথা হিরণ্ময়ী দেবী নিজে আমাকে বলেছেন। এ থেকে দাঁড়ায়, ১৯১২'র ফেব্রুয়ারির আগেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরণ্ময়ী দেবীর বিয়ে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ছ মাসের ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক, এমনকি ভেলু কুকুরকেও নিয়ে যখন দেশে আসেন, তখনই তিনি কলকাতায় চোরবাগানে ছিলেন।

সরোজবাবু লিখেছেন—হিরণ্ময়ী দেবী অল্প বয়সে বিধবা হইয়া মেদিনীপুরের গণ্ডগ্রাম হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন।...হিরণ্ময়ী দেবী পিতৃগৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন।

আমাব প্রশ্ন—হিরণ্ময়ী দেবী পিতৃগৃহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং কলকাতায় স্থানান্তরিত হযে কাব কাছে, কোথায়, কিভাবে ছিলেন? কিছু না জেনে অনুচিতভাবে এই সব অসত্য লিখে, ভদ্রমহিলাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে অযথা হেয় করা হয়েছে।

হিরণ্ময়ী দেবী নিজে আমাকে বহুবার বলেছেন, তাঁর খুড়তুতো ভাই মেদিনীপুরেব শ্যামচাঁদপুব নিবাসী বৃদ্ধ হরিদাস অধিকাবীও বলেছেন—রেঙ্গুনেই হিরণ্ময়ী দেবীব সঙ্গে শবৎচন্দ্রের বিয়ে হযেছিল। মা-হারা বালিকা হিরণ্ময়ী দেবী (তখন নাম মোক্ষদা) সেখানে তাঁর পিতার কাছে ছিলেন।

শবৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর কন্যা পারুল দেবীও সম্প্রতি একটি পত্রিকায় লিখেছেন—তিনি শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে শুনেছেন, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনেই হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন।

সরোজবাবু লিখেছেন—আমার পিতা স্বর্গীয় হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের মুখে আমি দীর্ঘকাল ধবিয়াই শুনিয়াছি, হিবণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিত পত্নী ছিলেন না। ...বাস্তবে যাহা ঘটে নাই, কাগজে ও কলমে তাহাই গোপালবাবু ঘটাইয়া দিয়াছেন।

আমার বক্তব্য, হরিদাসবাবুর জীবিতকালে তাঁর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আমি দশ বছর কাজ করেছি এবং তাঁর জীবিতকালে তাঁরই আগ্রহে ও নির্দেশে একটানা তিন বছর ধরে আমি 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে নানা প্রবন্ধ লিখেছি। সেই সময়েই একটানা পাঁচ মাস ধরে 'শরৎচন্দ্রেব বিবাহ-প্রসঙ্গ' নামে ভারতবর্ষে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধও লিখেছিলাম। তাতে হিরণ্ময়ী দেবী, শরৎচন্দ্রের দিদিব বাড়িব লোকজন, হিরণ্ময়ী দেবীর খুড়তুতো ভাই প্রভৃতির মুখে শুনে এবং নানা সূত্র থেকে জেনে লিখেছিলাম—হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল।

হরিদাসবাবুর কাগজে এই সব প্রবন্ধ লেখার সময় তিনি আমার সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করতেন। হরিদাসবাবু দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বহু

কথা ও কাহিনী আমাকে শুনিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনও দিনই, এমনকি আমি যখন 'শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধটি লিখি তখনও, আমাকে বলেননি, হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। বরং তাঁর মুখে এই কথাই শুনেছি যে, হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রীই ছিলেন। আর এইজন্যই তিনি আমার লেখা 'শরৎচন্দ্রের বিবাহ-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পড়ে আগ্রহ সহকারেই তাঁর কাগজে সেটি প্রকাশ করেছিলেন।

গোপালচন্দ্র রায়
কলকাতা-১২

দেশ, ৪৩ বর্ষ : ২৬ সংখ্যা, ১১ বৈশাখ, ১৩৮৩, পৃ. ৯৪১-৪৪

পত্র ৭

শরৎ-বৃত্তে নিরুপমা

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকা শরৎ-শতবর্ষে 'শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য', 'শরৎ-বৃত্তে নিরুপমা দেবী' ও প্রাসঙ্গিক নানান মূল্যবান আলোচনা প্রকাশ করে সাধারণ পাঠক সমাজকে যথেষ্ট তথ্য ও তত্ত্বের সাথে পরিচয় করিয়েছেন। এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ধারাবাহিক প্রবন্ধে রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্র ও নিরুপমা দেবীর মধ্যে "হৃদয়ের বন্ধনহীন গ্রন্থনা"র অনুসন্ধান করেছেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনে "অদৃশ্য-তর্জনী"র শাসন ও তার পরিণতির কথা বলেছেন। আবার দুর্গাদাস ভট্ট তাঁর প্রবন্ধে নিরুপমা দেবীকে সযত্নে শরৎ-বৃত্তের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ফলে হৃদয়ঘটিত অতি সূক্ষ্ম এক সূতোয় দুজনেই অত্যন্ত বিপদজনকভাবে একাধারে কেন্দ্রমুখী ও কেন্দ্রাতিগ গতির শিকার হচ্ছেন। অথচ শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের কলমেই এ সম্পর্কে নানান তথ্য দিয়ে গেছেন। যার ভিত্তিতে এ বিপদ থেকে উত্তরণের নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া যায়।

অন্তত দুটি ক্ষেত্রে, এক, "যমুনা"র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল ও লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায় এঁদের কাছে নিরুপমা দেবী সম্পর্কে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, নিরুপমা তাঁর ভগ্নী ও ছাত্রীতুল্য।

রেঙ্গুন থেকে ১৯১৩ সালে লেখা এক চিঠিতে তিনি ফণীবাবুকে বলছেন —"নিরুপমাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া যদি তাহার লেখা বেশি পাইতে পারেন চেষ্টা করিবেন। সে বাস্তবিকই ভাল লেখে। সে আমার ছোট বোনও বটে, ছাত্রীও বটে।"

শেষের কথাগুলি লক্ষণীয়। কেবল আক্ষরিক অর্থে নয়। ভাবের ও প্রকাশভঙ্গির সারল্যে।

হাওড়া বাজে শিবপুর থেকে ২৯/৭/১৯ তারিখে লেখা এক চিঠিতে লীলারানী গঙ্গোর সাথে নিরুপমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন এইভাবে—

"আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে আপনার বোধ করি অপরিচিত নয়। 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'বিধিলিপি' ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ, এই মেয়েটিই একদিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, "বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।" তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই। এইটি আমার বড় গর্বের জিনিস।"

ঘটনায় দেখা যাচ্ছে সাহিত্যের মধ্য দিয়েই তাঁদের পরিচয়। সাহিত্যের আঙিনায় নানান পুষ্প-সম্ভারের বিকাশেই তাদের পরিণতি। তাই ৭ই ভাদ্র ১৩২৬ তারিখের পত্রে শরৎচন্দ্র আক্ষেপ করেছেন, "বুড়ির (নিরুপমার ডাক নাম) ওপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটা 'দিদি' ছাড়া আর কিছু লিখতে পারলে না। কেন জানো? বার-ব্রত জপ-তপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে তার যা-কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যেই না হলে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এ-সব ব্যাপার কিছু কিছু না করে?" (লীলারাণী গঙ্গোকে লেখা। 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত।)

একটা পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য তথ্যের সমাবেশ ঘটান বা পছন্দসই নাটকীয় পরিবেশ তৈরী করার যে সুযোগ গল্প-উপন্যাসে আছে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় সে সুযোগ নেই। অভিজ্ঞতার কষ্টসাধ্য সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে আন্তরিক অনুভূতি ও অসামান্য শিল্পশৈলীর সাহায্যে শরৎচন্দ্র যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার মূল্যায়ন করতে গিয়ে অবশ্যই তাঁকে অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে একটা 'রোমান্টিক' অবস্থার মধ্যে একাত্ম করে তুলতে হবে, তাই বা কেন?

নর-নারীর হৃদয় সম্পর্ক কি একটিমাত্র ছাঁচে ঢালা পদ্ধতির মারফৎ যাচাই হবে? শরৎচন্দ্র নিজেই কি তাঁর সাহিত্য ও জীবনের পথে অন্য নজির খাড়া করেননি? বিদগ্ধজনেরা নিশ্চয়ই কথাটা ভেবে দেখবেন।

বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৩৬

দেশ, ৪৩ বর্ষ : ২৭ সংখ্যা, ১৮ বৈশাখ, ১৩৮৩

পত্র ৮

শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী

আলোচনা বিভাগে শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রটিতে 'প্রমাণ ও মন্তব্য' দাখিল করবেন, এমন দাবী ছিল। কার্যত দেখা গেল গঠন সৌকর্য এবং মন্তব্যটুকুই সার। প্রমাণ নেই। শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ীর বিবাহ প্রসঙ্গে উমাপ্রসাদবাবুর চিঠি থেকেই উদ্ধৃত করছি: 'শরৎচন্দ্রের পরিবারবর্গের অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবেব্র মধ্যে কেউ সে সময় উপস্থিত ছিলেন বলে কখনও শুনিনি। লেখিকাও বলেন না। তাই মুখে-বলা "জানা"টাও প্রমাণ হতে পারে না' (দেশ, ১০ এপ্রিল, '৭৬)। দুর্ভাগ্যবশত উমাপ্রসাদবাবু নিজেও রাধারাণী দেবীর অভিমত খণ্ডন করতে বসে কেবলমাত্র 'মুখে-বলা জানা' তথ্য ভিন্ন কিছুই দাখিল করতে পারেননি। রাধারাণী দেবীর লেখায় যদি প্রমাণ না হয়ে থাকে যে শরৎচন্দ্র বিবাহের অনুষ্ঠান করেননি তবে উমাপ্রসাদবাবুর সুদীর্ঘ প্রত্যুত্তরেও প্রমাণ করা যায়নি যে তিনি বিবাহ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

উইলে 'ওয়াইফ' শব্দের ব্যবহার নিয়ে রাধারাণী দেবী যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন উমাপ্রসাদবাবু সেটি স্বীকার না করে আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শরৎচন্দ্রেব প্রকাশক সংস্থার অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিরপেক্ষ পত্রেও এই 'ওয়াইফ' শব্দের একটা ব্যাখ্যা আছে যেটি রাধারাণী দেবীর সঙ্গেই মিলে যায়। একটি ঘটনার তিনজনের মুখ থেকে দুটি ব্যাখ্যা পেলাম—দুটি ভাষ্য। সত্যাসত্য কেউই প্রমাণ করেননি। এত বাতবিতণ্ডার শেষে আমাদের হাতে রইলো রাধারাণী দেবীর শ্রুতিভাষ্যের বিপরীতে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শ্রুতিভাষ্য। বর্মামুলুকে শরৎ-হিরণ্ময়ীর বিবাহ হয়েছিল কিনা তা কেউই জানে না। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে হয়নি তা সকলেই জানি। সেই বিবাহেব একটি মাত্রও সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলে কুচক্রী গ্রামবাসীরা শরৎচন্দ্রকে ওইভাবে 'একঘরে' করতে সাহস পেতো না নিশ্চয়। এবং প্রমাণাভাব না থাকলে শরৎচন্দ্রও তা মেনে নিয়ে সরে থাকতেন না।

উমাপ্রসাদবাবুর এবং গোপালচন্দ্র রায়ের এই ভূয়সী প্রচেষ্টার পরে আরো যেন স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে 'বিবাহ হয়েছিল', এই কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার মত নির্ভবযোগ্য তথ্য বা যুক্তি আমাদের হাতে নেই। থাকলে তা এখনই দেখতে পাওয়া যেতো। অবশ্য এতে বিবাহ নিশ্চিতভাবে অপ্রমাণিত হচ্ছে না। যা প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করা যায় না, সেই ঘটনা নিয়ে কোনো দীর্ঘায়িত বিদগ্ধ বিতর্ক সম্ভবপর বলে মনে হয় না। এ তো কেবল একজনের ব্যক্তিগত অভিমতের পাশাপাশি আরেকজনের ভিন্নতর ব্যক্তিগত অভিমত রাখা।

শ্রীযুক্ত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্রে উমাপ্রসাদবাবুর উল্লেখিত অনেকগুলি বিষয়েরই স্বতঃ উল্লেখ রয়েছে। যেমন প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনির্ভরযোগ্য স্বভাব, যেমন উইলে 'ওয়াইফ' শব্দটির ব্যবহার, যেমন অনিলা দেবীর কন্যার প্রসঙ্গ। কিন্তু প্রসঙ্গগুলি ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনিও শরৎচন্দ্রের বিবাহের

প্রসঙ্গটির প্রকাশ্য আলোচনা পছন্দ করেননি, স্বীকার করেছেন। তবু যখন তা হয়েছে, সত্যের খাতিরে এই বিষয়ে তাঁর যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তা জনসমক্ষে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা কিন্তু রাধারাণী দেবীর কথিত ব্যাখ্যার স্বপক্ষেই যায়। হিরণ্ময়ী দেবীর সামাজিক মান বিষয়ে অনিলা দেবীর কন্যাকে সাক্ষী মেনেছেন গোপালচন্দ্র রায়, আর গোপালচন্দ্র রায়কে সাক্ষী মেনেছেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই দুই-তিন মুখ-ফেরতা মৌখিক ও পরোক্ষ সাক্ষীসাবুদের চেয়ে ঢের সোজাসুজি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছেন সরোজবাবু, স্বয়ং শরৎচন্দ্রের চিঠি উদ্ধৃত করে। সরোজবাবুর পিতাকে শরৎচন্দ্র ওই অনিলা দেবীর কন্যারই বিবাহের প্রসঙ্গে চিঠি দিয়েছেন যে সেই বিবাহে তাঁর অর্থ সাহায্য করা অত্যাবশ্যক কিন্তু কায়িক উপস্থিতি অনাবশ্যক—এই পরম দুঃখের কথা তিনি নিজের মুখে স্বীকার কবে গেছেন। গোপালবাবুর টীকাতেই স্পষ্ট জানানো আছে যে, শরৎচন্দ্রের 'একঘরে' হওয়ার কাবণ তাঁর হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে বিধিসম্মত বিবাহের অনিশ্চয়তা। পরিবারের অভ্যন্তরে কে কার হাতে ভাত খেলেন না খেলেন, তা সমাজের কাছে জরুরী নয়। জরুরী কথা হলো সামাজিক ক্রিয়াকর্মে হিরণ্ময়ী দেবীর স্থান কি বকম ছিল। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অবাধে যোগদানের সহজ সুযোগ যে তাঁর ছিল না, এই চিঠিই তাব যথেষ্ট প্রমাণ।

উমাপ্রসাদবাবুর পত্রের শেষতম অংশটি দু' তিনবার পড়তে হল। যে তীব্র উষ্মা, যে ব্যক্তিগত আক্রমণের কটুকথার রসে পত্রটি প্রথম পংক্তি থেকেই সিঞ্চিত, তার যেন চরম প্রকাশ এই অংশে। এটি তাঁর পত্রের দুর্বলতম অংশও বটে। আশ্চর্য হযে ভাবতে হয় যে, হিমালয়-বিলাসী, সংসার-উদাসীন, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হয় তো অন্য একজন ব্যক্তি। একই মানুষ ক্ষেত্রভেদে কতোদূর ভিন্নতর ব্যক্তিত্বে প্রকাশিত হতে পারেন, তার এর চেয়ে ভাল প্রামাণ্য উদাহরণ আর কোথায় মিলবে? হিমালয় প্রসঙ্গে তাঁর যে মার্জিত রুচি, সুমধুর উদাত্ত স্বর—হিন্দু সামাজিক প্রথা ও আইনকানুনের ক্ষেত্রে তাঁব সেই কণ্ঠেই এ কী রুক্ষতা, এ কোন অসৌজন্য?

বলা বাহুল্য, নরেন্দ্র দেব-রাধারাণী দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে পর্যন্ত ভ্রূকুটি করা এ-ক্ষেত্রে নেহাৎই ব্যক্তিগত উষ্মার মতন দেখিয়েছে। নানানজনের ভূরি ভূরি চিঠিপত্রে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরেই নানা প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এই যোগাযোগের অসংখ্য অবিসংবাদিত প্রমাণ রয়ে গিয়েছে। এ-বিষয়ে উমাপ্রসাদবাবুর নতুন কোন মতামত গ্রাহ্য নয়।

শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে যে-সুরে বাক্যালাপ করতেন ঠিক সেই সুরে ছাড়া অন্য কোনো সুরেই যে বাক্যালাপ করতেন না ('শরৎচন্দ্র সে ভাবে কথা বলতেন না'), এত বড়ো অযৌক্তিক দাবী আইনজ্ঞ হয়ে উমাপ্রসাদবাবু কি করে করলেন? যতই ঘনিষ্ঠ হোন, তাঁর পক্ষে শরৎচন্দ্রের সর্বক্ষণের সকল কথাবার্তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে থাকা সম্ভবপর নয়। প্রথমত, সকলেব সঙ্গে মানুষ সব কথা বলে না। দ্বিতীয়ত, সকলের সামনেও মানুষ সব কথা বলে না। তৃতীয়ত, সবার সঙ্গে মানুষ একই সুরে, একই স্বরে কথা বলে না। উমাপ্রসাদকে লিখিত শরৎচন্দ্রের

চিঠির পাশাপাশি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ও রাধারাণী দেবীকে লেখা চিঠিগুলি সাজিয়ে দেখলেই এই সত্যই স্পষ্ট ধরা পড়বে। এতে ঘনিষ্ঠতার তারতম্য বোঝায় না, সম্পর্কের তারতম্য বোঝায়। শরৎচন্দ্র উমাপ্রসাদবাবু ও রাধারাণী দেবীর সঙ্গে একই সুরে কথা না বললে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরং সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

দুঃখের বিষয়, উমাপ্রসাদবাবুর পত্রটিতে একটি অনস্বীকার্য বিদ্বেষের স্বর, যুদ্ধের দামামা শোনা যাচ্ছে বলে, তাঁর প্রতিবাদ পত্রটিকে গুরুত্ব দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ সর্বদাই বক্তব্যের মূল্য নষ্ট করে দেয়। রাধারাণী দেবীর শরৎচন্দ্র বিষয়ক স্মৃতিচারণ উমাপ্রসাদবাবুর মনের মতো না হলেও, আমাদের মতো নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে বাংলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সংযোজন বলে অবশ্যগ্রাহ্য হয়ে থাকবে।

কৃষ্ণা দত্ত
গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্র ৯

ইহা নিশ্চয়ই বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে জীবনীমূলক আলোচনাও কোনো-কোনো লেখকের সাহিত্য বুঝিবার একটি উৎকৃষ্ট, নির্ভরযোগ্য ও আবশ্যিক উপায়। উপরন্তু এই সব লেখকদের জীবন দ্বন্দ্বে ও নাটকীয়তায় ভরপুব হইলে তো কথাই নাই —তখন ইঁহাদের জীবনকে জড়াইয়া বহুবিধ দুর্মার কিংবদন্তী ও জনরব শুনা যাইতে থাকে। মধুসূদন দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নজরুল ইসলাম—ইঁহারা সাধারণ পোষমানা রক্ষণশীল বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ হইতে নানা দিক দিয়া আলাদা ; আর ইঁহারা যে ব্যতিক্রম, এই জন্যই ইঁহাদের লইয়া আমাদের কৌতূহল জল্পনা ও অভিনিবেশের অবধি নাই, ইঁহাদের লইয়াই রচিত হইয়াছে কত না নাটক ও উপন্যাস বা যাহাকে বলে 'জীবনীমূলক উপন্যাস'—ইঁহাদের সম্পর্কে যে-কোনো আস্থাভাজন গ্রন্থপঞ্জীর পৃষ্ঠা উলটাইলেই পাঠক তাহা লক্ষ করিতে পারিবেন।

সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রকে লইয়া এই-যে নানা প্রকার কূটনৈতিক তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে, তাহাতে আমরা—বেচারা সাধারণ পাঠকরা—ক্রমেই তাজ্জব হইয়া যাইতেছি। শরৎচন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় কখনও হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন কি করেন নাই, ইহাই এই তুমুল হট্টগোলের কারণ! যাঁহারা জীবনীমূলক আলোচনায় আস্থা রাখেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র—তাঁহারা বলিবেন, বিবাহ করেন নাই তো করেন নাই, বহিয়াই গেল! সাহিত্যের তাহাতে কী আসে-যায়? যাঁহারা উলটা মতের মানুষ, তাঁহারা বলিবেন : সাহিত্য ও জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ; একটা আরেকটাকে বুঝাইতে বা বুঝিতে সাহায্য করে। বিশেষত কোনো লেখকের

রচনা যদি সামাজিক বিধি, বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া হয়, তবে সে-সব ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের জীবনের তথ্যাদিও অতীব জরুরী হইয়া ওঠে। খটকা বাধিয়াছে তো কী হইয়াছে? শরৎচন্দ্রের লেখা হইতে উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইলেই তো ল্যাঠা চুকিয়া যায়। আমি নানা বই হইতে নয়, একটি উপন্যাসের দুটি অংশের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। উদ্ধৃতির জন্য আমি ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য ও শ্রীগোপালচন্দ্র রায় সম্পাদিত জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ: ১ (পৃষ্ঠা ১৫৮-৫৯) ব্যবহার করিয়াছি। পাঠক সত্যই অনুমান করিয়াছেন, উদ্ধৃতিদ্বয় 'শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্ব' হইতে—যে-উপন্যাসের মধ্যে অনেক গবেষক সমালোচক শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের বহু উপাদান খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

উদ্ধৃতিদ্বয় পরস্পরসম্পৃক্ত—যেমন হয়তো বা শরৎচন্দ্রের বিবাহ ও 'রহস্যময়' ও 'ধাঁধাজাগানো' ইষ্টিপত্রও পরস্পরসম্পৃক্ত। প্রথম উদ্ধৃতির প্রসঙ্গ এই প্রকার: দেশের বাড়িতে আসিয়া শ্রীকান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে এবং এই খবর পাইবামাত্র রাজলক্ষ্মী আসিয়া হাজির হইয়াছে; শ্রীকান্ত সারিয়া উঠিলে রাজলক্ষ্মী তাহাকে পাটনায় লইয়া যাইতে চায়। তারপর পড়ুন:

> ...আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি।
>
> রাজলক্ষ্মী কহিল, দানপত্র ত সেখানেই রেজেস্ট্রী কবতে হবে। লেখাপড়া সব এক রকম কবে বেখেই এসেচি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত হতে পারবে না।
>
> অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসেব দানপত্র? কাকে কি দিলে?
>
> বাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি দুটো বঙ্কুকেই দিয়েচি। শুধু কাশীর বাড়িটা গুরুদেবকে দেব ভেবেচি। আর কোম্পানীর কাগজ, গয়না-টয়নাগুলো ত আমার বুদ্ধি-বিবেচনামত এক রকম ভাগ কবে এসেচি, এখন শুধু তুমি বললেই—
>
> বিস্ময়ের আব অবধি বহিল না। কহিলাম, তা হলে তোমার নিজেব বইল কি? বঙ্কু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তাব নিজেব সংসাব হলো, যদি সে শেষে তোমাকেই খেতে না দেয়?
>
> আমি কি তাই চাইচি নাকি? নিজের সমস্ত দান কবে কি অবশেষে তাবই হাত-তোলা খেয়ে থাকবো? তুমি ত বেশ?

ইহা হইতে আশা করি বোঝা যায় লোকে (অথবা শরৎচন্দ্র স্বয়ং) কেন ইষ্টি-পত্র রেজিস্ট্রি করিবার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃটিতে সরাসরি শরৎচন্দ্রর জীবন ও সাহিত্যকে মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী নাকি কতগুলি তথ্যোদ্‌ঘাটন করিয়া অনপনেয় অপরাধ করিয়াছেন: কিন্তু তিনি তাঁর রচনায় কোন্ কোন মহাভারত কেন অশুদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বোঝা গেল না বলিয়াই, এবং তাঁহাকে বেশ সমর্থন করা যায়, এই ভাবিয়াই শরৎচন্দ্রের নিজের লেখার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার এই চেষ্টা। শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে বহু প্রকার দ্বন্দ্ব ছিল, তাহার প্রমাণ তো তাঁহার নিজেরই গল্প-উপন্যাস; তাহা ছাড়া সমাজের পাণ্ডা ও মাতব্বরদের যে তিনি ভালোই চিনিতেন, এবং উহাদের মুখ ঠাণ্ডা করিবার জন্য কী দরকার তাহা যে

তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, তিনি যে ইহাও জানিতেন কোন্ বিবাহের কী-রূপ মন্ত্র, কেননা বঙ্গদেশীয় সর্পকুলের হাঁচি যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, তাহারও বিস্তর নজির তাঁহার লেখাতেই আছে। 'আমার স্ত্রী', 'আমার স্বামী'—এই সব কথার ব্যক্তিগত ও সামাজিক তাৎপর্য কী, তাহা বুঝাইতে পারে বলিয়াই এই দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি নেহাৎ ফ্যালনা নহে। গ্রামের মাতব্বরেরা রাজলক্ষ্মীকে অসুস্থ শ্রীকান্তের পার্শ্বে দেখিয়া অতীব বিস্মিত বোধ করিতেছেন এবং মাতব্বরদের দেখিয়াই 'রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে।' অতঃপর পড়ুন—

> একবার আমার (শ্রীকান্তর) সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব। এবং পরক্ষণেই তাহার (রাজলক্ষ্মীর) হাতের উপর একটি চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী। ঠাকুরদা, ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

সামাজিক সত্য, সামাজিক মিথ্যা—ইহা লইয়াই সম্ভবত শরৎচন্দ্রর সাহিত্য। শরৎচন্দ্রর অনুরাগী পাঠকগণ নিশ্চয়ই এইসব প্রসঙ্গে তাঁহার অন্যান্য পুস্তক হইতেও লাগসই ও লক্ষভেদী উদ্ধৃতি দিতে পারিবেন। আর এই উপলক্ষে যে শরৎচন্দ্র আবারও একবার পড়া হইয়া যাইবে, ইহাই বা কম লাভ না কি?

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-২৯

দেশ, ৪৩ বর্ষ : ২৮ সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৩

পত্র ১০

শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী

৮.৫.৭৬ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় কৃষ্ণা দত্ত লিখেছেন, 'হিরণ্ময়ী দেবীর সামাজিক মান বিষযে অনিলা দেবীর কন্যাকে সাক্ষী মেনেছেন গোপালচন্দ্র রায়।'

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য—'সামাজিক মান বিষয়ে' নয়, রাধারাণী দেবী যে লিখেছিলেন—'অনিলা দেবী যে কোনদিন হিরণ্ময়ী দেবীর স্পর্শিত অন্ন গ্রহণ করতেন না, সে কথা গোপালবাবু নিশ্চয়ই জানেন না; কিন্তু তার সাক্ষী এখনও অনেকেই জীবিত আছেন।'—রাধারাণী দেবীর এই কথার সত্যতা যাচাই-এর জন্যই আমি শুধু অনিলা দেবীর কন্যাকেই নয়, শরৎচন্দ্রের দিদির বাড়ির বহু প্রাচীন ও প্রবীণা, যাঁরা অনিলা দেবী ও হিরণ্ময়ী দেবী উভয়কে তাঁদের একই সময়ে জীবিতকালে দীর্ঘদিন ধরে দেখেছেন, তাঁদের জনে জনে জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন—রাধারাণী দেবীর ও-কথা সম্পূর্ণ অসত্য।

কৃষ্ণা দেবী এই প্রসঙ্গ নিয়েই আবার লিখেছেন—'পরিবারের অভ্যন্তরের কে কার হাতে ভাত খেলেন, না-খেলেন তা সমাজের কাছে জরুরী নয়। জরুরী কথা হলো সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অবাধে যোগদানের সহজ সুযোগ যে তাঁর ছিল না, এই চিঠিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।'

আমার বক্তব্য—'এই চিঠিই তার যথেষ্ট প্রমাণ', এ কথা আদৌ সত্য নয়। 'এই চিঠি'র কথা পরে বলছি, তার আগে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অবাধে যোগদানের সহজ সুযোগ যে হিরণ্ময়ী দেবীর ছিল, সে সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের নিজেরই লেখা একটা চিঠি এখন এখানে উদ্ধৃত করছি। শরৎচন্দ্র ৮.২.৩২ তারিখে সামতাবেড় থেকে তাঁর স্নেহভাজন বেহালার জমিদার মণীন্দ্রনাথ রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'মণি,...সরস্বতী পুজোর সময়ে আমার বাড়ির বার হওয়া চলে না। আমি অন্যান্যবারে তার পরের দিন বাইরে যাই। কিন্তু এবারে শনিবারে বড় বউ-এর একটা ব্রত প্রতিষ্ঠাব বাকি বামুন খাওয়ানোর দিন, আমার এ কথাটা সেদিন মনে ছিল না।'

শরৎচন্দ্র যে সরস্বতী পুজোর সময়ে বাড়ির বাইরে যেতে পারতেন না, তার কারণ, তিনি বাড়িতে জাঁক করে সরস্বতী পুজো করতেন এবং পুজোর দিন গ্রামের কাঙালগরীব থেকে শুরু করে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে (এঁদের মধ্যে অনেক সমাজপতিও থাকতেন) নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। এ কথা আজও ঐ অঞ্চলের লোকেরা মুক্ত কণ্ঠে বলে থাকেন।

হিরণ্ময়ী দেবী সামতাবেড়েয় থাকার সময় বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, পঞ্চমী ব্রত প্রভৃতি নানারকম বারব্রত করতেন। সেই সব ব্রত উদ্‌যাপনের সময় শরৎচন্দ্র গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু ব্রাহ্মণকেই ভোজন করাতেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই থাকতেন সমাজপতিও।

হিরণ্ময়ী দেবীর যদি সামাজিক মর্যাদা না থাকত তা হলে স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা ও সমাজপতিরা কখনই তাঁর ব্রত প্রতিষ্ঠায় অন্নগ্রহণ করতেন না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, হিরণ্ময়ী দেবী শুধু সামতাবেড়েয় থাকার সময়েই নয়, রেঙ্গুনে থাকার সময়েও অর্থাৎ তাঁর প্রথম জীবন থেকেই বার-ব্রত নিয়েই থাকতেন। তাই শরৎচন্দ্র ৯.৮.১৩ তারিখে রেঙ্গুন থেকে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—ইনি তো দিনরাত পুজো-আচ্চা নিয়েই থাকেন।

যাক্, হিরণ্ময়ী দেবীর সামাজিক মর্যাদার আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি—শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমারের বিবাহের সময় বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে অন্য কারও নাম না দিয়ে নিমন্ত্রণকারী হিসাবে হিরণ্ময়ী দেবীরই নাম ছিল (এবং তাতে হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের স্ত্রী এই কথাই উল্লেখ ছিল)। শুধু এই নয়, অমলকুমারের পুত্রের অন্নপ্রাশনের সময়ও নিমন্ত্রণপত্রে হিরণ্ময়ী দেবীরই নাম ছিল। এই দুটি চিঠিই আজও আমার কাছে আছে। অমলকুমারের বিবাহে এবং তাঁর পুত্রের অন্নপ্রাশনে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সমাজের সকলেই এসেছেন ও খেয়েছেন। তাই অতি সহজেই বলা যেতে পারে যে, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে হিরণ্ময়ী দেবীর অবাধে যোগদানের সহজ সুযোগ রীতিমতই ছিল।

এবার সেই চিঠিটির কথা—শরৎচন্দ্র ২৯.৬.১৬ তারিখে হাওড়া থেকে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন—'জানেন বোধহয় আমার ভগ্নীর [sic.] বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার।...এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে, দেশে আমি 'একঘরে'।'

শরৎচন্দ্র এই চিঠিটি যখন লেখেন, সেই সবে মাত্র তিনি রেঙ্গুন থেকে দেশে ফিরেছেন। তিনি বিখ্যাত হয়ে দেশে ফিরলে তাঁর দিদির বাড়ির অঞ্চলের কেউ কেউ হিরণ্ময়ী দেবী কোথাকার কি জাতের মেয়ে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করত। তাদের কেউ কেউ নাকি জেনেছিল, হিরণ্ময়ী দেবী, বৈষ্ণবের মেয়ে এবং ঠিক হিন্দু প্রথায় নাকি তাঁদের বিয়ে হয়নি। তাই যারা শরৎচন্দ্রের বিবাহিত জীবন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করত, তারা শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রকে একঘরে করেছিল।

কৃষ্ণা দেবী লিখেছেন—'গোপালবাবুর টীকাতেই স্পষ্ট জানানো আছে যে, শরৎচন্দ্রের একঘরে হওয়ার কারণ, তাঁর হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে বিধিসম্মত বিবাহের অনিশ্চয়তা।'

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরলে তাঁর দিদির বাড়ির অঞ্চলের কেউ কেউ তাঁর বিয়ে নিয়ে যে জল্পনা-কল্পনা করেছিল, এই এখানে যা বললাম, হুবহু ঐ কথাগুলোই আমার শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড (পত্রাবলী) গ্রন্থের ঐ চিঠিটির 'একঘরে' শব্দের টীকায় বলেছি।

আমি বারবার বলেছি, শরৎচন্দ্রের বিবাহ নিয়ে তখন 'কেউ কেউ' জল্পনা-কল্পনা করেছিল। আর দূরে বসে এই এদের জল্পনা-কল্পনা যে ঠিক ছিল, তাও তো নাও হতে পারে।

তা ছাড়া, গ্রামে বসে শহরবাসী শরৎচন্দ্রকে মাত্র কয়েকজনের 'একঘরে' করা, সেটা প্রায় একেবারেই অর্থহীন। শরৎচন্দ্র দিদির বাড়ির কাজেকর্মে গেলে এরা বড়জোর একটা গোলমালের চেষ্টা করত। তাও এরা গোলমালের চেষ্টা করে সফলকাম তো নাও হতে পারতো।

যাই হোক, শরৎচন্দ্র বড় হয়ে হঠাৎ দেশে ফেরায় তখনই যা কয়েকজনে এই জল্পনা-কল্পনা করেছিল। পরে যত দিন গেল এদের এই জল্পনা-কল্পনা এবং একঘরে করার চিন্তাও উবে গেল। তাই শরৎচন্দ্র কিছু দিন পরেই ঐ দিদির বাড়ি অঞ্চলেই বাড়ি করে সস্ত্রীক সুখে বাস করেছিলেন।

কৃষ্ণা দত্ত লিখেছেন—উমাপ্রসাদবাবুর এবং গোপালচন্দ্র রায়ের এই ভূয়সী প্রচেষ্টার পরে আরো যেন স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে, 'বিবাহ হয়েছিল' এই কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করার মত নির্ভরযোগ্য তথ্য বা যুক্তি আমাদের হাতে নেই। ...যা প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করা যায় না, সেই ঘটনা নিয়ে কোন দীর্ঘায়িত বিদগ্ধ বিতর্ক সম্ভবপর বলে মনে হয় না।'

আমার বক্তব্য—হিন্দু সমাজে কারও বিয়ে সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য অর্থাৎ বরকর্তা, কন্যাকর্তা, বরযাত্রী বা পুরোহিত কাকেও যখন আর পাওয়া যায় না, তখন

তাদের স্বামী-স্ত্রীর মুখের কথাকে, বিভিন্ন সূত্রের লিখিত বিবৃতিকেই সত্য বলে ধরে নিতে হয়। এ সবের বিরুদ্ধে নিজের হাতে কোন অকাট্য প্রমাণ না থাকলে কেউ কখনই জোর করে বলতে পারে না যে, না, ওদের বিয়ে হয়নি।

বহু লোকের কাছে বহু প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিজের মুখে বলা এবং হিরণ্ময়ী দেবীরও বলা, আর উইলে, জীবনবীমায় প্রভৃতিতে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎচন্দ্র স্ত্রী বলে যাওয়া সত্ত্বেও, রাধারাণী দেবী কোন প্রমাণ না দেখিয়ে জোর করে বলছেন —শরৎচন্দ্র হিরণ্ময়ী দেবীকে বিয়ে করেননি।

ঠিক এইভাবেই শরৎচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী শান্তি দেবীর বাবা শরৎচন্দ্রের কাছে বারবার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা বলা সত্ত্বেও, রাধারাণী দেবী বলেছেন, শরৎচন্দ্র শান্তি দেবীকেও বিয়ে করেননি।

শান্তি দেবীর বাবার কথা থেকে, শরৎচন্দ্রের নিজের এবং হিরণ্ময়ী দেবীরও কথা থেকে এবং এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের লিখিত স্বীকৃতি থেকে আমরা অতি স্বাভাবিকভাবেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের 'বিবাহ হয়েছিল'। এজন্য আমরা আদৌ ভূয়সী প্রচেষ্টা করিনি। রাধারাণী দেবীই বরং শূন্যহাতে শরৎচন্দ্রের একটা স্বীকৃত সত্যকে অসত্য প্রমাণ করবার জন্য ভূয়সী প্রচেষ্টা করে চলেছেন।

গোপালচন্দ্র রায়
কলকাতা-১২

দেশ, ৪৩ বর্ষ : ৩১ সংখ্যা, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

পত্র ১১

শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী

"দেশ" পত্রিকার মাধ্যমে হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না এই বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে ঐ মত প্রমাণাভাবে দুষ্ট। তাঁহাদের কথা কতকটা শরৎচন্দ্রের স্বীকারোক্তি ও পরোক্ষ জীবনের ঘটনাবলী। শবৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় এই কথা তুলিতে কেহ সাহস করেন নাই, এমনকি হিরণ্ময়ী দেবীর জীবৎকালেও।

১৯১৬ সাল হইতে শরৎচন্দ্রের এবং তারপরে হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহাদের সহিত আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তাঁহারা আমাদের বাটীর সন্নিকটে বাজে শিবপুরে ভাড়া আসিলেন ১৯১৬ সালে। আমার বয়স তখন ১১ বৎসর। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধেই তিনি শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ লইয়া আমরাও শরৎচন্দ্রের পরিবারের একজন

বলিয়া গণ্য হইতাম। হিরণ্ময়ী দেবী আমাদের বাটী আসিতেন, আমার পিতামহী এবং মাতার সহিত কথাবার্তায় যোগ দিতেন। শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনিলা দেবীর দেবর-কন্যা রানু দেবী ও বনমালা দেবীর আমাদের বাটীর সন্নিকটে বিবাহ হইয়াছিল। তাই সেদিন যে কথা ভাবি নাই আজ সেই কথা মনে হইতেছে যে, বিবাহ না-করা কোন স্ত্রীলোককে লইয়া এই আত্মীয়দের বাটীর সন্নিকটে তদানীন্তন সমাজে বসবাস করা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল কি? ঐ রানু দেবীর ভাশুরপুত্র ইন্দুদাই তো ওঁদের বাজে শিবপুরে আনিয়াছিলেন।

শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী অনিলা দেবী ও তাঁহার স্বামী পঞ্চানন মুখুজ্জে মহাশয় ও কন্যা পারুল দেবীকে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের বাসা বাটীতে সহজভাবেই মেলামেশা করিতে দেখিয়াছি; একত্রে খাওয়া দাওয়া তো ছিলই।

১৯২৭ সালের শেষে শরৎচন্দ্র তো অনিলা দেবীর বাটীর কাছেই সামতাবেড়ে বাটী করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন সমাজে ইহাও কি সম্ভব ছিল?

তাহার পর অশ্বিনী দত্ত রোডের বাটীতে তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে লইযাই বসবাস করিতে লাগিলেন এবং সে সময় কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রকাশচন্দ্র তাঁহার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সকলে একত্রে বসবাস করিতেন।

শরৎচন্দ্র তাঁহার উইলে হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলিয়াই স্বীকৃতি জানাইয়াছেন, বাজে শিবপুরে থাকাকালে আমি তো বহুবাব শরৎচন্দ্রের শ্বশুর (হিরণ্ময়ী দেবীর পিতাকে) শিবপুর পোস্ট অফিস হইতে মনিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইয়াছি। মনিঅর্ডার ফর্ম শরৎচন্দ্র নিজ হস্তে লিখিয়া দিতেন আর কুপনের নীচে বাবাকে প্রণাম জানাইয়া হিরণ্ময়ী দেবীও দু-এক ছত্র লিখিয়া দিতেন। ইহা তো একবার নয়, বহুবার এইজন্য আমি পোস্ট অফিসে গিয়াছি।

হিরণ্ময়ী দেবীর অসুস্থতায় হাওড়ার প্রখ্যাত চিকিৎসক ও মিউনিসিপ্যালিটিব ভাইস চেয়ারম্যান ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে শরৎচন্দ্রের পত্র লইয়া চিকিৎসার জন্য দুই একবার ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছি। সেই পত্রে এবং ডাক্তাববাবুকে, হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলিয়াই পরিচয় দিতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।

আমাদের কলিকাতায় ২, গোয়াবাগান স্ট্রীটে যে ভিক্টোরিয়া প্রেস ছিল তাহাতে শরৎচন্দ্রের বহু পুস্তক ছাপা হইয়াছে। আমি শরৎচন্দ্রের লেখা পাণ্ডুলিপি লইয়া কোনদিন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অথবা জলধর সেন মহাশয়কে দিয়া আসিয়াছি, প্রুফ লইয়া আসিয়াছি, আমার মারফতে বহুদিন পত্রের আদানপ্রদান হইয়াছে, আমি তখন স্কটিশচার্চ কলেজের ছাত্র। নিজের অসুস্থতা ও হিরণ্ময়ী দেবীর অসুস্থতার জন্য নিজের ও স্ত্রীর খবর চিঠিতে জানাইতেন। ভারতবর্ষের হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও বসুমতীর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাটীতে আসিতেন এবং শরৎচন্দ্রের নিকটেও যাইতেন। তাঁহাদের কথাবার্তায় ও আলাপ-আলোচনায় হিরণ্ময়ী দেবীকে স্ত্রী বলিয়াই পরিচয় দিতেন, এবং শরৎচন্দ্র নিজে তো সর্বদাই হিরণ্ময়ী দেবীকে বড় বউ বলিয়াই সম্বোধন করিতেন।

আমার 'শরৎ পরিক্রমা' গ্রন্থে রেঙ্গুনে মিস্ত্রিপাড়ায় শরৎচন্দ্র দুর্গাপূজার পৌরোহিত্য করিয়াছেন এবং হিরণ্ময়ী ভোগরন্ধন করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এ কথা হিরণ্ময়ী দেবী আমাদের শরৎচন্দ্রের সাক্ষাতেই বলিয়াছেন এবং তখন তাঁহাকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণই দেখি নাই। হিরণ্ময়ী দেবী বিবাহিতা ও ব্রাহ্মণ কন্যা না হইলে এই ব্যাপারে তিনি কি হাত বাড়াইতেন? এতো বড় দুঃসাহস তাঁহার নিশ্চয়ই হইত না। আমাদের বাটীতে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্রের মাতা বসুমতী গিন্নী আসিলে আমার পিতামহী (পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের পত্নী) শরতের বউ বলিয়া হিরণ্ময়ী দেবীকে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। অধ্যাপক অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের সহিতও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার কাছেও শুনিয়াছি হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী।

এত কথার অবতারণা করিতেছি এই জন্য যে, আমরা সকলেই প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, ১৯১৬ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী একত্রে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করিয়াছেন এবং একথা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীবাও স্বীকার করেন। তাঁহাদের কাছে আমাব একটি প্রশ্ন যে, তাঁহারা কি জ্ঞাত আছেন যে ভারতবর্ষের আইনের বিধান অনুসারে বহুদিন যাবৎ যাঁহারা স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রে বসবাস করেন, আইন তাঁহাদের বিবাহিত বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য করে? Indian Evidence Act-এ ১১৪ ধারা মতে এই Presumption-এর একটি আইনসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে।

এই আইনবলে শরৎচন্দ্র ও হিরণ্ময়ী দেবী পরস্পর বিবাহিত ছিলেন বলিয়া ধরা আইনসঙ্গতও বটে। ইহার সহিত Hindu Marriage Validity Act, 1949 and Hindu Marriage Disabilities Removable Act, 1946 বিবাহ সংক্রান্ত অনেক বাধাই দূর করিয়াছে। ১৯৫৬ সালের Hindu Marriage Act প্রযুক্ত হইবার পূর্বে শাস্ত্রীয় হিন্দু বিবাহে কোন লিখিত নথিভুক্তির বিধান ছিল না। এখন কিন্তু শাস্ত্রমতে হিন্দু বিবাহও চলে ও ভবিষ্যৎ প্রমাণের জন্য ঐবকম বিবাহ নথিভুক্ত হইবার নিয়মও প্রবর্তিত হইয়াছে। এখন যদি কেহ নালিশ রুজু করেন এবং বিরুদ্ধপক্ষ বিবাহ না হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারেন তাহা হইলে আইনবিরুদ্ধ উক্তি ও চরিত্র হননের জন্য তাঁহারা কি দোষী সাব্যস্ত হইবেন না? তাঁহারা কি এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন?

আমার শেষ অনুরোধ, প্রমাণ হাতে না লইয়া অযথা কোন মানুষের চরিত্রে নিজের বাহাদুরি কিনিবার জন্য কলঙ্ক লেপন যেন কেহ না করেন; ইহা অত্যন্ত মানহানিকর ও কুরুচিপূর্ণও বটে।

বলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
হাওড়া-২

দেশ, ৪৩ বর্ষ : ৩২ সংখ্যা, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

পত্র ১২

শরৎচন্দ্র-হিরণ্ময়ী

হিরণ্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন কিনা এই নিয়ে বেশ কিছুকাল ধরে একটি বিতর্ক চলছে। দুপক্ষই মনে হয় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সমান শ্রদ্ধাশীল। শরৎচন্দ্রের সংস্কারমুক্ত বিদ্রোহী ব্যক্তিসত্তাকেই উদ্‌ঘাটন করতে আগ্রহী হয়েছিলেন রাধারাণী দেবী। আবার শরৎচন্দ্র যে জীবনসঙ্গিনীর প্রতি সামাজিক সুবিচারের আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন সে কথা প্রতিষ্ঠিত করতে বেশি উৎসাহী রাধারাণী দেবীর প্রতিপক্ষ। এই সৎ উদ্দেশ্যে দুই পক্ষই সাক্ষী সাবুদ যা দাঁড় করিয়েছেন তার বিচার না হয় ইতিহাসের ছাত্ররা তথ্যবিচারের আধুনিকতম নিক্তির সাহায্যে করে দেখুন দুই বিরুদ্ধমতের কোনটি বেশি টেঁকসই। ইতিমধ্যে আমার মতো অনেক সাধারণ পাঠকেরই বোধহয় এ হেন বিতর্ক থেকে লাভ হল এই যে, আমরা আর একবার জানলাম, শরৎচন্দ্র মনে মনে এবং অনেক সময় কার্যতও যতই সংস্কারমুক্ত হোন না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি সামাজিক রীতিনীতির কাছে মাথা নত করেন। হৃদয় ও বুদ্ধির নির্দেশই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়, সামাজিক সংস্কারও চূড়ান্তভাবেই মেনে নেন তিনি সাহিত্যে ও জীবনে। হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে যদি তাঁর আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়েও থাকে তবু তা যে সনাতন হিন্দু প্রথাসিদ্ধ নয় এবং সেই কারণে বেশ কিছুটা নিন্দিত ও সেই পরিমাণে 'বৈপ্লবিক' একথা সম্ভবত গোপালচন্দ্র রায় মহাশয়রা অস্বীকাব করবেন না। অপরপক্ষে এই জীবনসঙ্গিনীকে সনাতন হিন্দুকুলবধূরূপে সমাজের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতেও যে শরৎচন্দ্র আগ্রহী, তাঁর এই 'দুর্বলতাটুকুও' নিশ্চয়ই শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীর দৃষ্টি এড়ায়নি।

অর্থাৎ তিনি জীবনে যা করেছিলেন, সাহিত্যেও তাই। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত বিদ্রোহী। সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করেছেন, আবার সামাজিক স্বীকৃতির প্রত্যাশাও ত্যাগ করেননি। তাই নয় কি?

গৌরী আইয়ুব
কলকাতা-১৭